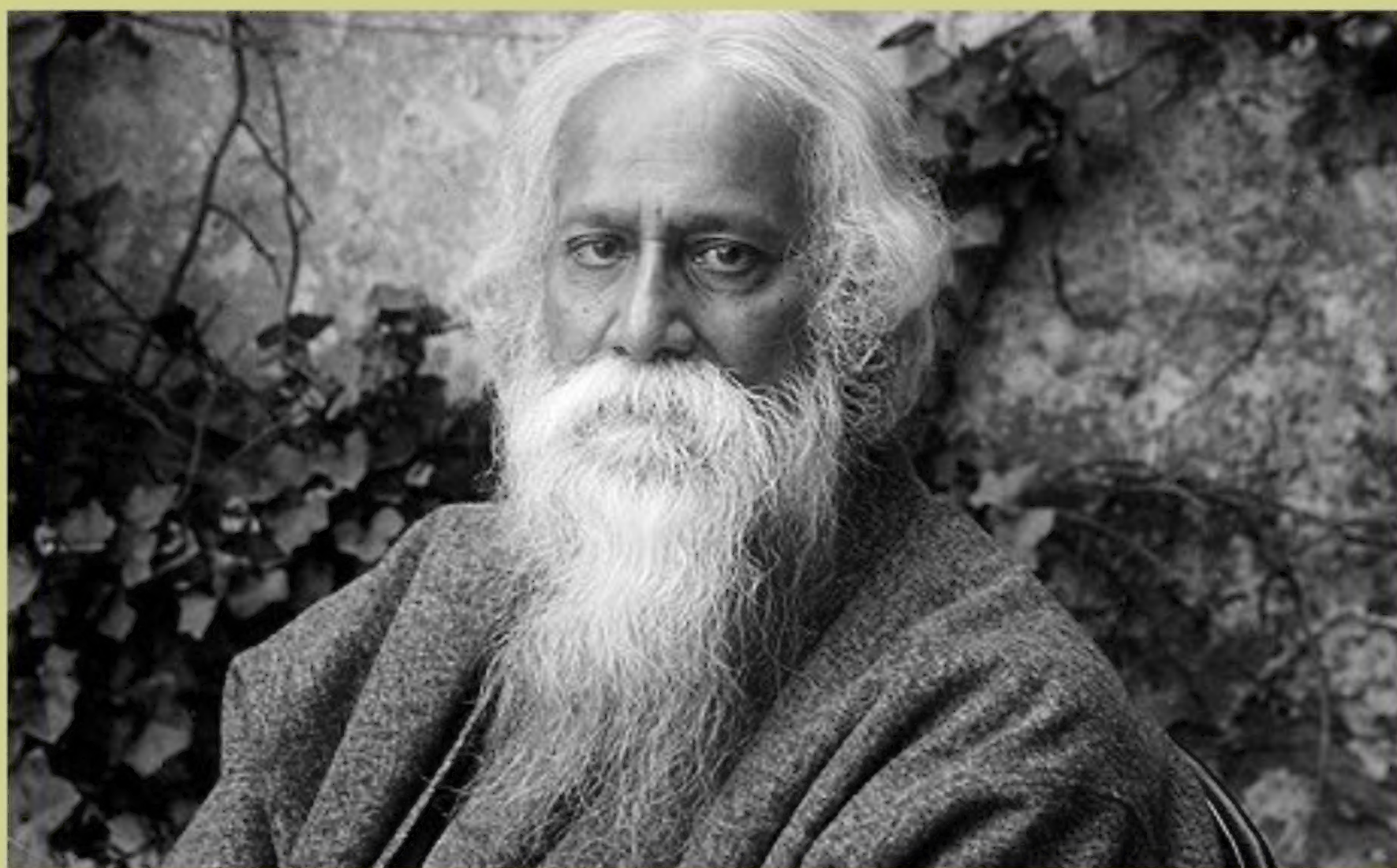


রবীন্দ্র রচনাবলী

ষড়বিংশ অঙ্ক

শ্রী ব্রজমোহন চট্টোপাধ্যায়

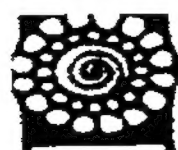


রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষড়্বিংশ খণ্ড

ঐচ্ছিক

বিভাগ ১৭



বঙ্গবন্ধু

১৬৩৭৩

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

প্রকাশ পৌষ ১৩৫৫
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ : ১৮৮০ শকাব্দ

মূল্য : কাগজের মলাট নয় টাকা
রেস্ট্রিনে বাঁধাই বারো টাকা

©

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী । ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরানন্দ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড । ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলিকাতা-৯

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁহার যত রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তাহার অধিকাংশের প্রকাশ সমাপ্ত হইল ; তবে ‘ছিন্নপত্র’, ‘ভানুসিংহের পত্রাবলী’ এবং ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর এক বা একাধিক খণ্ডে অন্যান্য চিঠিপত্রের সহিত মুদ্রিত হইবে এবং ‘গীতবিতান’ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ডান্তরে প্রকাশিত হইবে ।

রবীন্দ্রনাথের দেহাবসানের স্বল্পকাল পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘ছড়া’ ও ‘শেষ লেখা’ বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত হইল । ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সকল খণ্ড প্রকাশিত হইবে সেগুলিতে পূর্বোক্ত কয়েকখানি গ্রন্থ ব্যতীত এই-সকল রচনাও মুদ্রিত হইবে— রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পরে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ, সাময়িক পত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনা যেগুলি এ পর্যন্ত কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, এবং পাণ্ডুলিপি-নিবন্ধ রচনাবলী ।

শ্রীচাক্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচী

চিত্রসূচী	১০
কবিতা ও গান	
ছড়া	১
শেষ লেখা	৩৭
নাটক ও প্রহসন	
মুক্তির উপায়	৫৫
উপন্যাস ও গল্প	
লিপিকা	৯১
সে	১৮১
গল্পসল্প	২৯৭
প্রবন্ধ	
বাংলাভাষা-পরিচয়	৩৬৫
পথের সঞ্চয়	৪৫৭
ছেলেবেলা	৫৮৩
সভ্যতার সংকট	৬৩৩
গ্রন্থপরিচয়	৬৪৩
বর্ণানুক্রমিক সূচী	৬৬৫

চিত্রসূচী

প্রতিকৃতি

রবীন্দ্রনাথ	১
রবীন্দ্রনাথ ও দৌহিত্রী নন্দিতা	২৯৯
রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত	
রেখাকনের অতিরিক্ত চিত্রাবলী	
সে	২১০
পাল্লারাম	২১১
হৈ রে হৈ মারহাট্টা	২৭৬
মাস্টারমশায়	২৭৭

କବିତା ଓ ଗାନ

ছড়া

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে,
কর্মরথের ঘড়-ঘড়ানি
যে-মূর্ত্তে থাকে,
এলোমেলো ছিন্নচেতন
টুকরো কথার কাক
জানি নে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পাষ ভাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত—
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ—
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি,
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে ।
একটুখানি দীপের আলো
শিখা বধন কাঁপায়
চার দিকে তার হঠাৎ এসে
কথার ফড়িং কাঁপায় ।

পট্ট আলোর সৃষ্টি-পানে
বধন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয়
হঠাৎ মাস্তন এ কি ।

বাইরে থেকে দেখি একটা
নিম্ন-ঘেরা মানে,
ভিতরে তার রহস্য কী
কেউ তা নাহি জানে ।
খেয়াল-শ্রোতের ধারায় কী সব
ডুবছে এবং ভাগছে—
ওরা কী-যে দেয় না জবাব,
কোথা থেকে আসছে ।
আছে ওরা এই তো জানি,
বাকিটা সব আধার—
চলছে খেলা একের সঙ্গে
আর-একটাকে বাধার ।
বাধনটাকেই অর্থ বলি,
বাধন ছিঁড়লে তারা
কেবল পাগল বস্তুর দল
শূন্যেতে দিক্‌হারা ।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

৫ জানুয়ারি ১৯৪১

ছড়া

১

সুবলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাদরের নাচন সেখায় রামছাগলের ঘাড়ে ।
বাদরওয়ালা বাদরটাকে খাওয়ায় শালিধান্ত,
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না গান্ধ ।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগডুগি ।
কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি ।
রামছাগলের ভারি গলায় ভাভা রবের ডাকে
হুড়হুড়ি দেয় থেকে থেকে চৌকিদারের নাকে ।
ইঁচির পরে বারে বারে যতই ইঁচি ছাড়ে
বাতাসেতে ঘন ঘন কোদাল ঘেন পাড়ে ।
ইঁচির পরে সারি সারি ইঁচি নাথার চোটে
তৈঁতুলবনে ঝড়ের দমক ঘেন মাথা কোটে,
গাছের থেকে ইঁচড়গুলো খসে খসে পড়ে,
তালের পাতা ডাইনে বায়ে পাখার মতো নড়ে ।
দস্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেমনি ইঁচি পড়া,
আঁকে উঠে কাঁথের থেকে বউ ফেলে দেয় ঘড়া ।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকের ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন ।
টেবিলেতে তুফান ওঠে চা-পেয়ালার তলে,
বিষম লেগে শৌখিনদের চোখ ভেসে যায় জলে ।
বিজ্ঞানযের মঞ্চ-পরে টাক-পড়া শির টলে—
পিঠ পেতে দেয়, চ'ড়ে বসে টেরিকাটার দলে ।
সুঁতো মেয়ে চালায় তারে, সেলাম করে আদায়,
একটু এমিক-ওমিক হলে বিষম দ্বাক্ষা বাধায় ।

লোকে বলে, কলহদল সূর্যলোকের আলো
 দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো ।
 তাই তো সবই উলট-পালট, উপর-নামন নীচে—
 ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে ।
 ইঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথ্যে—
 এই নিয়ে সব কলেক্তপড়া বিজ্ঞানীদের চিন্তে
 অল্প কিছু লাগল ধোঁকা ; রাগল অপর পক্ষে—
 বললে, পড়াগুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে,
 অন্ত দেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
 সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর সে ।
 এর পরে দুই দলে মিলে ইঁট পাটকেল ছোড়া—
 চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোড়া ।
 পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
 সমুদ্রের এ পারেতে একেই বলে লড়াই ।
 সিন্ধুপারে যত্ননাটে চলছে নাচানাচি,
 বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের ইঁচি ।
 সত্য হোক বা মিথ্যে হোক তা, আদমদিবির পাড়ে
 বাদর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে ।
 রামছাগলের দাড়ি নড়ে, বাজে রে ডুগডুগি—
 কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগবুগি ।

কালিম্পং

১৫ মে ১৯৪০

২

কদমাগঞ্জ উজাড় করে
 আসছিল মাল মালদহে,
 চড়ায় পড়ে নৌকোডুবি
 হল যখন কালদহে,
 তলিয়ে গেল অগাধ জলে
 বস্তা বস্তা কদমা যে

পাঁচ মোহানার কংলু ঘাটে
 ব্রহ্মপুত্র নদ-মাঝে ।
 আসামেতে সন্দি জেলায়
 হাংলু-ফিড়াও পর্বতের
 তলায় তলায় ক'দিন ধরে
 বইল ধারা সর্বতের ।
 মাছ এল সব কাংলাপাড়া
 ধররাহাটি বেঁটিয়ে,
 মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে
 পাকের তলা ঘেঁটিয়ে ।
 চিনির পানা খেয়ে খুশি
 ডিগবাজি খায় কাংলা,
 চাঁদামাছের সরু ঝঠর
 বইল না আর পাতলা ।
 শেষে দেখি ইলিশমাছের
 জলপানে আর কুচি নাই,
 চিতলমাছের মুখটা দেখেই
 প্রশ্ন তারে পুছি নাই ।
 ননদকে ভাজ বললে, তুমি
 মিথো এ মাছ কোটো ভাই,
 রাখতে গিষে দেখি এ যে
 মিঠাই-গজার ছোটোভাই ।
 মেছোনিকে গিম্বি বলেন,
 ঝড়ির ঢাকা খুলো না,
 মাছের রাজ্যে কোথাও যে নেই
 এ মোরলার তুলনা ।
 বাগীশকে কাল শুধিয়েছিলেম,
 ব্রহ্মা কি কাজ ভুলল,
 বিধাতা কি শেষবয়সে
 ময়রাদোকান খুলল ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

যতীন ভায়ার মনে জাগে
 ক্রমবিকাশ থিয়োরি,
 গল্ফ্যাডারে ক্রমে ক্রমে
 চিনি অমছে কি ওরই ।
 খগেন বলে, মাছের মধ্যে
 মাধুৰ্য নম্র পথ্যাচার—
 চচ্চড়িতে মোরকাতে
 একাত্মবাদ অত্যাচার ।
 বেদাস্তী কম, রসনাতে
 রসের অভেদ গলতি,
 এমন হলে রাজ্যে হবে
 নিরামিষের চলতি ।
 ডাক পড়েছে অধ্যাপকের
 জামাইষষ্ঠী পার্বণে—
 খাওয়ায় তাকে যত্ন করে
 শাণ্ডি আর চার বোনে
 মাছের মুড়ো মুখে দিয়েই
 উঠল জেগে বকুনি,
 হাত নেড়ে সে তত্ত্বকথা
 করলে শুরু তখুনি—
 কলিযুগের নিমক খেয়ে
 আমরা মানুষ সকলেই,
 হঠাৎ বিষম সাধু হয়ে
 সত্যযুগের নকলেই
 সব জাতেরই নিমকি থেকে
 নিমক যদি হটিয়ে দেয়,
 সকল ভাঁড়েই চিনির পানার
 জয়ধ্বনি রটিয়ে দেয়,
 চিনির বলদ জোড়ে এসে
 সকল মিটিং-কমিটি,

চোখের জলেই নোন্তা হবে
 বাংলাদেশের জমিটি।
 নোনার স্থানে থাকবে নোনা,
 মিঠের স্থানে মিষ্টি—
 সাহিত্যে বা পাকশালাতে
 এরই বলে কুষ্টি।
 চিনি সে তো বার-মহলের,
 রসে বসন্ত নোন্তার—
 দোকানে প্রাণ মিষ্টি খোঁজে,
 খুন যে আপন ধন তার।
 সাগরবাসের আদম উৎস
 চোখের জলে খুলিয়ে দেয়,
 নির্বাসনের দুঃখটা তার
 আখের খেতে ভুলিয়ে দেয়
 অতএব এই—
 কী পাগলামি,
 কলম উঠল খেপে,
 মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে
 মিলের স্বপ্নে চেপে।
 কবির মাথা ঘুলিয়ে গেছে
 বৈশাখের এই রোদে,
 চোখের সামনে দেখছে কেবল
 মাছের ডিমের বোঁদে।
 ঠাণ্ডা মাথায় ঘুচুক এবার
 রসের অনাবৃষ্টি,
 উলটোপালটা না হয় যেন
 নোন্তা এবং মিষ্টি।

ঝিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা
 সে-বছর পুষেছিল একপাল পায়রা ।
 বড়োবাবু খাটিয়াতে বসে বসে পান খায়,
 পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়
 হাসগুলো জলে চলে আকাবাক রকমে,
 পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে ।

খবরের কাগজেতে shock দিল বক্ষে,
 প্যারাগ্রাফে ঠোক্তর লাগে তার চক্ষে ।
 তিন দিন ধ'রে নাকি দুই দলে পোড়াদয়
 ঘুড়ি-কাটাকাটি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি হয় ।
 কেউ বলে ঘুড়ি নয়, মনে হয় সন্ধ—
 পোলিটিকালের যেন পাওয়া যায় গন্ধ ।
 'রানাঘাট-সমাচারে' লিখেছে রিপোর্টার—
 আঠারোই অম্বানে শুরু হতে ভোরটার
 বেশি বই কম নয় ছয়-সাত হাজারে
 গুড়ার দল এল সবজির বাজারে ।
 এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
 গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার ।
 ভয় ছিল কোনোদিন প্রেমের ধাক্কা
 পার্লামেন্টের হাওয়া পাছে পাক খায় ।
 এডিটর বলে, এতে পুলিশের গাফেলি ।
 পুলিশ বলে যে, চলো বুঝেবুঝে পা ফেলি ;
 ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
 এসব ফসল ফলে কনগ্রেসি শস্তে ।
 সবজির বাজারেতে মুলো যোচা সস্তায়
 পাওয়া গেল বাসি মাল ঝাঁক ঝুড়ি বস্তায় ।

ঝড়ি থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মেরেছিল চালতা,
 বশোরের কাগজেতে বেরিয়েছে কাল তা ।
 ‘মহাকাল’ লিখেছিল, ভাষা তার পানানো—
 চালতা ছোঁড়ার কথা আগাগোড়া বানানো ;
 বড়ো বড়ো লাউ নাকি ছুঁড়েছে দু পক্ষে,
 শচীবাবু দেখেছে সে আপনার চক্ষে ।
 দাঙ্গায় দাঙ্গামে মিছে ক’রে লোক গোনা,
 সংবাদী সমাজের কখনো এ যোগ্য না ।
 আর-এক সাক্ষীর আর-এক ভবানি—
 বেল ছুঁড়ে মেরেছিল দেখেছে তা ভবানী ।
 যার নাকে লেগেছিল সে গিয়েছে ভেবড়ে,
 ভাগ্যেই নাক তার যায় নাই খেবড়ে ।
 শুনে এডিটর বলে, এ কি বিশ্বাস্ত—
 কে না জানে নাসাটা যে সহজেই নাস্ত ।
 জানি না কি ও পাড়ায় কোনোখানে নাই বেল ;
 ভবানী লিখল, এ যে আগাগোড়া লাইবেল ।
 মাঝে মাঝে গায়ে প’ড়ে চৈচায় আদিত্য—
 আমারে আরোপ করা মিথ্যাবাদিত্ব !
 কোন্ বংশে যে মোর জন্ম তা জান তো,
 আমার পায়ের কাছে করো মাথা আনত ।
 আমার বোনের যোগ বিবাহের সূত্রে
 ভজু গোস্বামীদের পুত্রের পুত্রে ।
 এডিটর লেখে, তব ভগ্নীর স্বামী যে
 গো বটে গোয়ালবাগী, জানি তাহা আমি যে ।
 ঠাট্টার অর্থটা ব্যাকরণে গুজতে
 দেয়ি হল, পরদিনে পারল সে বুঝতে ।
 মহা রেগে বলে, তব কলমের চালনা
 এখনি ঘুচাতে পারি, বাড়াবাড়ি ভালো না ।
 ফাঁস করে দিই যদি, হবে সে কি খোশনাম,
 কোথায় তলিয়ে যাবে সাতকড়ি ঘোষ নাম ।

জানি তব জামাইয়ের জ্যাঠাইয়ের যে বেহাই
 আদালতে কত ক'রে পেয়েছিল সে রেহাই ।
 ঠাণ্ডা মেজাজ মোর সহজে তো রাগি নে,
 নইলে তোমার সেই আদরের ভাগিনে
 তার কথা বলি যদি— এই ব'লে বলাটা
 শুরু ক'রে ঘেঁটে দিল পঙ্কের তলাটা ।
 তার পরে জানা গেল গাঁজাখুরি সবটাই,
 মাথা-ফাটাফাটি আদি মিছে জনরবটাই ।
 মাছ নিয়ে বকাবকি করেছিল ছেলেটা,
 পচা কলা ছুঁড়ে তারে মেরেছিল ছেলেটা ।
 আসল কথাটা এই অটলা ও পটলা
 বাধালো ধর্মঘটে জন ছয়ে জটলা ।
 শুধু কুলি চারজন করেছিল গোলমাল—
 লালপাগড়ি সে এসে বলেছিল, তোল্ মাল ।
 গুড়ের কলসিখানা মেতে উঠে ফেটেছিল,
 রাজ্যের খেঁকিগুলো শুঁকে শুঁকে চেটেছিল ।
 বক্তৃতা করেছিল হরিহর শিকদার—
 দোকানিরা বলেছিল, এ যে ভারি দিকদার ।
 সাদা এই প্রতিবাদ লিখেছিল তারিণী,
 গ্রামের নিন্দে সে-যে সহিতেই পারে নি ।
 নেহাত পারে না যারা পাবলিশ না ক'রে
 সব-শেষ পাতে দিল বর্জই আখরে ।
 প্রতিবাদটুকু কোনো রেখা নাহি রেখে যায়,
 বেল থেকে তাল হয়ে গুজবটা থেকে যায় ।
 ঠিকমতো সংবাদ লিখেছিল সঙ্গনী—
 সহ না হল সেটা, শুনেছে বা ক'জনই ।
 জ্যাঠাইয়ের বেহাইয়ের মামলাটা ছাড়াতে
 যা ঘটেছে হাসি তার থেকে গেল পাড়াতে ।
 আদরের ভাগনের কী কেলেকারি সে,
 বারাসতে বরিশালে হয়ে গেছে জারি সে ।

হিতসাধনীর সভার চাঁদাচুরি কাণ্ড
 ছড়িয়ে পড়েছে আজ সারা ব্রহ্মাণ্ড ।
 ছেলেরা দুভাগ হল মাণ্ডারার কলেজে—
 এরা যদি বলে বেল, ওরা লাউ বলে যে ।
 চালতার দল থাকে উভয়ের মাঝেতে,
 তারা লাগে দু দলের সভা-ভাড়া কাজেতে ।
 দলপতি পক্ষান্তরে রব তোলে বাহবার,
 তার পরে গোলেমাগে হয়ে পড়ে যা হবার ।
 ভয়ে ভয়ে ছি-ছি বলে কলেজের কর্তারা,
 তার পরে মাপ চেয়ে চলে যায় ঘর তারা ।

একদা দু এডিটরে দেখা হল গাড়িতে,
 পনেরো মিনিট শুধু ছিল ট্রেন ছাড়িতে ।
 ফৌস করে ওঠে ফের পুরাতন কথা সেই,
 ক্বাজ তার পুরো আছে আগে ছিল কথা সেই ।
 একজন বলে বেল, লাউ বলে অন্য,
 দুজনেই হয়ে ওঠে মারমুখো হস্তে ।
 দেখছি যা ব্যাপার সে নয় কম তর্কের,
 মুখে বুলি ওঠে আত্মীয় সম্পর্কের ।
 পয়লা দরের knave, idiot কি কেবল,
 liar সে, humbug, cad unspeakable—
 এই মতো বাছা বাছা ইংরেজি কটুতা
 প্রকাশ করিতে থাকে দুজনের পটুতা ।
 অদ্ভুতর যারা, তারা খেপে ওঠে কেউ কেউ—
 কুকুরটা কী ভেবে যে ডেকে ওঠে ডেউ-ডেউ ।
 হাওড়ায় ভিড় জমে, দেখে সব রকম—
 গার্ড এসে করে দিল যাত্রাই ভঙ্গ ।
 গার্ডকে সেলায় করি ; বলি, ভাই বাচালি,
 টার্মিনাসেতে এল বেলছোড়া পাঁচালি ।

ঝিনেদার জমিদার বসে বসে পান খায়,
 পায়রা আঙিনা জুড়ে খুঁটে খুঁটে ধান খায়।
 হেলেতুলে হাঁসগুলো চলে বীকা বকমে,
 পায়রা জমায় সভা বক্-বক্-বকমে।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

৯ মার্চ ১৯৪০

৪

বাসাখানি গায়ে-লাগা আর্ম্যানি গির্জার—
 দুই ভাই সাহেবালি জোনাবালি মির্জার।
 কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু দলের মোস্তার
 বেঁধেছে কোমর, কে যে সামলাবে রোখ তার।
 হানাহানি চলছেই একেবারে বেহৌশে,
 নালিশটা কী নিয়ে যে, জানে না তা কেহ সে।
 সে কি লেজ নিয়ে, সে কি গোঁফ নিয়ে তকরার,
 হিসেবে কি গোল আছে নখগুলো বখরার।
 কিংবা মিষ্টিও ব'লে খাবা তুলে ডেকেছিল—
 তখন সামনে তার দু ভাইয়ের কে কে ছিল।
 সাক্ষীর ভিড় হল দলে দলে তা নিয়ে,
 আওয়াজ যাচাই হল ওস্তাদ আনিয়ে।
 কেউ বলে ধা-পা-নি-মা, কেউ বলে ধা-মা-রে—
 চাই চাই বোল দেয়, তবলায় ঘা মারে।
 ওস্তাদ ঝেঁকে ওঠে, প্যাঁচ মারে কুস্তির—
 জঙ্গসাব কী ক'রে যে থাকে বলে স্থির।
 সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সর্দার
 চলে এল উটে চড়ে— পিছে ঝাড়ুবরদার।
 উটেতে কামড় দিল, হল তার পা টুটা—
 বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা।
 খেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের,
 ফড়ি পেরিয়ে এল পাঁচিলটা পামিরের।

বাজারে মেলে না আর আখরোট-খোবানি,
 কাউসিল ঘরে আজ কী নাকানিচোবানি ।
 ইরানে পড়েছে সাড়া গবেষণাবিভাগে—
 এ কাবুলি বিড়ালের নাড়িতে যে কী ভাগে
 বংশ রয়েছে চাপা, মেসোপোটেমিয়ারই
 মার্জারগুটির হবে সে কি ঝিয়ারি ।
 এর আদি মাতামহী সে কি ছিল মিশোরি—
 নাইল-ভটিনী-ভট-বিহারিণী কিশোরী ।
 রোয়াতে সে ইরানী যে নাহি তাহে সংশয়,
 দাঁতে তার এসৌরিয়া যখনি সে সংশয় ।
 কটা চোখ দেখে বলে পণ্ডিতগণেতে,
 এখনি পাঠানো চাই Wimবিল্ডনেতে ।
 বাঙালি থিসিসওলা পড়ে গেছে ভাবনা—
 ঠিকুজি মিলবে তার চাটগাঁ কি পাবনায় ।
 আর্ম্যানি গির্জার আশেপাশে পাড়াতে
 কোনোখানে এক তিল ঠাই নাই দাঁড়াতে ।
 কেম্‌ব্রিজ খালি হল, আসে সব স্কলারে—
 কী ভীষণ হাড়কাটা করাতেই ফলা রে ।
 বিজ্ঞানীদল এল বল্লিন ঝাটিয়ে,
 হাতপাকা ক্ষুদ্র-নাড়িহুঁড়ি-ঘাটিয়ে ।
 জজ বলে, বিড়ালটা কী রকম জানা চাই,
 আইডেন্টিটি তার আদালতে আনা চাই ।
 বিড়ালের দেখা নাই— ঘরেও না, বনে না ;
 মিথ্যাউ আওয়াজটুকু কেউ আর শোনে না ।
 জজ বলে, সাক্ষীরে কোন্‌খানে চুকোলো,
 অত বড়ো লেজের কি আগাগোড়া লুকোলো
 পেয়াদা বললে, লেজ গেছে মিউজিয়মে
 প্রিভিকৌসিলে-দেওয়া আইনের নিয়মে ।
 জজ বলে, গৌর পেলো যবে যোর সম্মান ;
 পেয়াদা বললে, তারো নয় বড়ো কম মান—

মিউনিকে নিয়ে গেছে ছাঁটা গৌফ ষড়্বেই,
 তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।
 বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগন্ধ ;
 জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।
 তখনি চৌকি ছেড়ে রেগে করে পাচারি,
 থেকে থেকে ছংকারে কঁপে ওঠে কাছারি।
 জজ বলে, গেল কোথা ফরিয়াদী আসামী !
 হুজুর, পেয়াদা বলে, বেটাদের চাষামি !
 শুনি নাকি দুই ভাই উকিলের তাকাদায়
 বলে গেছে, আমাদের বুঝি বেঁচে থাকা দায় !
 কঠে এমনি ফাঁস এঁটে দিল জড়িয়ে,
 নোক্তারে কী করিবে সাক্ষীরে পড়িয়ে।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

৫

ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে
 দেউলচূড়ার ত্রিশূলে ;
 কলুবুড়ি শাকসবজি
 তুলেছে পাঁচমিশূলে !
 চাষী খেতের সীমানা দেয়
 উঁচু ক'রে আল তুলে ;
 নদীতে জল কানায় কানায়,
 ডিঙি চলে পাল তুলে।
 কোমর-ঘেরা আঁচলখানা,
 হাতে পানের কৌটা—
 ঘোষপাড়াতে হনুহনিয়ে
 চলে নাপিতবউটা।
 গোকুল ছোঁড়া গুঁড়ি আঁকড়ে
 ওঠে গাছের উপুরি,

পেড়ে আনে খোলো খোলো
 কাঁচা কাঁচা সুপুঁরি ।
 বর্ষাকালের ঢল নেমেছে,
 ছাপিয়ে গেল বাঁধখানা,
 পাড়ির কাছে ডুবো ডিঙি
 বাচ্ছে দেখা আধখানা ।
 লখা চলে ছাতা মাথায়,
 গৌরী-কনের বর—
 ডাংডাডাডাং বাজি বাজে,
 চড়কডাঙায় ঘর ।

ভাঙমালী লাউভাঁটাতে
 ভরেছে তার কাঁকাটা,
 কামার পিটোয় হুম্‌হুমিয়ে
 গোকর গাড়ির চাকাটা ।
 মাঠের ধারে ধক্‌ধকিয়ে
 চলতি গাড়ির ঘোঁওয়াতে
 আকাশ ঘেন ছেয়ে চলে
 কালো বাঘের ঘোঁওয়াতে
 কাগারিটা বাজিয়ে কাগা
 জাগিয়ে দিল গলিটা,
 গিন্নিয়া দেয় ছেঁড়া কাপড়
 ভর্তি ক'রে থলিটা ।
 ভিক্ষে চুলের ঝুঁটি বেঁধে
 বসে আছেন সেজোবউ,
 মোচার ঘণ্ট বানাতে সে
 সবার চেয়ে কেজো বউ ।
 গায়লা চেটে পরখ করে
 দড়ি দিয়ে বাঁধা গাই,

উঠোনের এক কোণে জমা

রাশ্মিঘরের গাদা ছাই ।

ভালুকনাচের ডুগডুগি ওই

বাজছে পাইকপাড়াতে,

বেদের মেঘে বাদরছানার

লাগল উকুন ছাড়াতে ।

অশখতলায় পাটল গোক

আরামে চোখ বোজছে তার,

ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায়

কচি ঘাসের খোঁজে তার ।

ছকুমালী খেতের থেকে

তুলছে মূলো ভাদুরে,

পিঠ আঁকড়ে ছড়িয়ে থাকে

ছেলেটা তার আদরে ।

হঠাৎ কখন বাতুলে মেঘ

জুটল এসে দলে দল,

পসলা কয়েক বৃষ্টি হতেই

নাঠ হয়ে যায় জলে জল ।

কচুর পাতায় ঢেকে মাথা

সীতালী সব মেয়েরা

ঘোষের বাগান থেকে পাড়ে

কাঁচা কাঁচা পেয়ারা ।

মাথায় চাদর বেঁধে নিয়ে

হাট থেকে যায় হাটুরে ;

ভিক্ষে কাঠের আঁঠি বেঁধে

চলছে ছুটে কাঠুরে ।

নিমের ডালে পাখির ছানা

পাড়তে গেল ওরা কি—

পকেট ভরে নিয়ে গেল

কাঠবিড়ালির শোয়াকি ।

হালদারদের যেয়েটা ওই—

দেখি তারে যখনি

মাঠে মাঠে ভিজে বেড়ায়,

মা এসে দেয় বকুনি ।

গোলাকৃতি গড়নটা ওর,

সবাই ডাকে বাতাবি ;

খুঁ বসে, আমার সঙ্গে

সাঙাংনি কি পাতাবি ।

পুকুরপাড়ে ছড়িয়ে আছে

তেলের শিলির কাঁচভাঙা,

জেলের পোতা বাণের খোঁটার

বসে আছে মাছরাঙা ।

দক্ষিণে ওই উঠল হাওয়া,

বৃষ্টি এখন থামল কি ।

গাছের তলায় পা ছড়িয়ে

চিবোয় তুলু আমলকি ।

ময়লা কাপড় হিস্‌হিসিয়ে

আছাড় মারে ধোবাতে ;

পাড়ার মেয়ে মাছ ধরতে

আঁচল মেলে ধোবাতে ।

পা ডুবিয়ে ঘাটের ধারে

ঘোষপুকুরের কিনারায়

মাসিক-পত্র পড়ছে বসে

খার্ড ইয়ারের বীণা বাজ ।

বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে

লকলকি ।

বাণের পাতা চমকে ওঠে

ঝকঝকি ।

চড়কভাঙায় ঢাক বাজে ঐ

ড্যাড্যাংড্যাঙ ।

মাঠে মাঠে মকমকিয়ে

ডাকছে ব্যাঙ

উদীচী [শাস্তিনিকেতন]

২০ অগস্ট ১৯৪০

৬

খেঁদুবাবুর এঁধো পুকুর, মাছ উঠেছে ভেসে ;
 পল্লমণি চচ্চড়িতে লক্ষা দিল ঠেসে ।
 আপনি এল ব্যাকটরিয়া, তাকে ডাকা হয় নাই ।
 হাঁসপাতালের মাখন ঘোষাল বলেছিল, ভয় নাই ।
 সে বলে, সব বাজে কথা, খাবার জিনিস খাও—
 দশ দিনেতেই ঘটিয়ে দিল দশজনাই শ্রাদ্ধ ।
 শ্রাদ্ধের যে ভোজন হবে কাঁচাতেতুল দরকার,
 বেগুনমুলোর সন্ধানেতে ছুটল গাড়াসরকার ।
 বেগুনমুলো পাওয়া যাবে নিলফামারির বাজারে,
 নগদ দামে বিক্রি করে তিন টাকা দাম হাজারে ।
 দুমকাতে লোক পাঠিয়েছিল, বানিয়ে দেবে মুড়কি—
 সন্দেহ হয় ওজনমতো মিশল তাতে গুড় কি ।
 সর্ষে যে চাই মণ দু'তিনেক ঝোলে ঝালে বাটনায়,
 কালুবাবু তারই খোঁজে গেলেন ধৈর্যে পাটনায় ।
 বিষম খিদেয় করল চুরি রামছাগলের দুধ,
 তারই সঙ্গে মিশিয়ে নিলে গমভাঙানির খুদ ।

ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের ছমকি ;
 দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুম কী ।
 খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে ;
 সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে ।

বালুর চরে আলুহাটা— হাতে বেতের চুপড়ি,
 খেতের মধ্যে ঢুকে কালু মুলো নিল উপড়ি ।

নদীর পাড়ে কিচিরমিচির লাগালো গাঙলালিখ যে,
 অকারণে ঢোলক বাজায় মুলোখেতের মালিক যে ।
 কাঁকুড়খেতে মাচা বাঁধে পিলেওয়ালা ছোকরা,
 বাঁশের বনে কক্কি কাটে মুচিপাড়ার লোকরা ।
 পাটনাতে নীলকুঠির গঞ্জে খেয়া চালায় পাটনি,
 রোদে জলে নিভুই চলে চার পহরের খাটনি ।
 কড়াপড়া কঠিন হাতে মাজা কাঁসার কাঁকনটা,
 কপালে তার পত্রলেখা উদ্ভিদেওয়া আঁকনটা ।
 কুচোমাছের টুকরি থেকে চিলেতে নেয় ছোঁ মেরে,
 যেছনি তার সাত গুটি উদ্দেশে দেয় যমেরে ।
 ও পারেতে খড়্গপুরে কাঠি পড়ে বাজনায,
 মুল্লিবাবু হিসেব ভোলে জমিদারের খাজনায ।

রেভিরোতে খবর জানায়, বোমায় করলে ফুটো,
 সমুদ্রে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো ।
 খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে
 ছাত্তু ছড়ায়, মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে ।

হুইস্‌ল্‌ দিল প্যাসেঞ্জারে সাঁরাগাছির ড্রাইভার—
 মাথায় মোছে হাতের কালি, সময় না পায় নাইবার ।
 ননদ গেল ঘুঘুডাঙায়, সঙ্গে গেল চিন্তে—
 লিলুয়াতে নেমে গেল ঘুড়ির লাঠাই কিনতে ।
 লিলুয়াতে খইয়ের মোওয়া চার ধামা হয় বোঝাই,
 দাম দিতে ছায় টাকার খলি মিথ্যে হল খোঁজাই ।
 ননদ পরল রাঙা চেলি, পাঙ্কি চড়ে চলল—
 পাড়ায় পাড়ায় রব উঠেছে গায়ে-হলুদ কল্যা ।
 কাহারগুলো পাগড়ি বাঁধে, বাঁদি পরে ঘাগরা,
 জমিদারের মায়া পরে শুঁড়তোলা তার নাগরা ।
 পাঁড়েন্নি তাঁর খড়ম নিয়ে চলেন খটাং খটাং,
 কোথা থেকে খোবার গাধা চোঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ ।

খয়রাভাঙার ময়রা আসে, কিনে আনে ময়দা—
পচা ঘিয়ের গন্ধ ছড়ায়, যমালয়ের পয়দা ।

আকাশ থেকে নামল বোমা, রেডিয়ো তাই জানায়,
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায় ।
খাঁচার মধ্যে শ্রামা থাকে, ছিরকুটে খায় পোকা,
শিস দেয় সে মধুর স্বরে, হাততালি দেয় খোকা ।

হুইস্‌ল্ বাজে ইস্টিসনে, বরের জ্যাঠামশাই
চমকে ওঠে— গেলেন কোথায় অগ্রদূতের গোঁসাই ।
সাঁংরাগাছির নাচনমণি কাটতে গেল সাঁতার,
হায় রে কোথায় ভাসিয়ে দিল সোনার সিঁধি মাথার ।
মোষের শিঙে ব'সে কিঙে লেজ ছুলিয়ে নাচে—
শুধোয় নাচন, সিঁধি আমার নিয়েছে কোন্ মাছে ।
মাছের লেজের ঝাপটা লাগে, শালুক ওঠে ছলে ;
রোদ পড়েছে নাচনমণির ভিজে চিকন চুলে ।
কোথায় ঘাটের ফাটল থেকে ডাকল কোলাবাও,
খড়গপুরের ঢাকে ঢোলে বাজল ড্যাড্যাংড্যাও ।
কাঁপছে ছায়া আঁকাবাঁকা, কলমিপাড়ের পুকুর—
জল খেতে যায় এক-পা-কাটা তিনপেয়ে এক কুকুর ।
হুইস্‌ল্ বাজে, আছে সেজে পাইকপাড়ার পাত্রী,
শেয়ালকাঁটার বন পেরিয়ে চলে বিয়ের ঘাত্রী ।

গ্যাগোঁ করে রেডিয়োটো, কে জানে কার জ্বিত—
মেশিন্‌গানে গুঁড়িয়ে দিল সভাবিধির ভিত ।
টিয়ের মুখের বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে—
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে ।

দিন চলে যায় গুন্‌গুনিয়ে ঘুমপাড়ানির ছড়া,
শানবাঁধানো ঘাটের দারে নামছে কাঁথের ঘড়া ।
আতাগাছের তোতাপাখি, ডালিমগাছে মো,
হীরেদাদার মড়মড়ে থান, ঠাকুরদাদার বউ ।

পুকুরপাড়ে জলের ঢেউয়ে তুলছে ঝোপের কেয়া,
 পাটনি চালায় ভাঙা ঘাটে তালের ডোঙার খেয়া ।
 খোকা গেছে ঘোষ চরাতে, খেতে গেছে তুলে,
 কোথায় গেল গমের কটি শিকের 'পরে তুলে ।
 আমার ছড়া চলেছে আজ রূপকথাটা ঘেঁষে,
 কলম আমার বেরিয়ে এল বহুরূপীর বেশে ।
 আমরা আছি হাজার বছর ঘুগের ঘোরের গাঁয়ে,
 আমরা ভেসে বেড়াই স্রোতের শেওলা-ঘেরা নায়ে ।
 কচি কুমড়োর ঝোল বাঁধা হয়, জোড়পুতুলের বিষে,
 বাঁধা বুলি ফুকরে ওঠে কমলাপুলির টিমে ।
 ছাইয়ের গাদায় ঘুমিয়ে থাকে পাড়ার খেঁকি কুকুর,
 পাশ্চিহাটে বেতোঘোড়া চলে টুকুর-টুকুর ।
 তালগাছেতে হতোমধুমো পাকিয়ে আছে ভূক,
 তস্তিমালা হড়মবিবির গলাতে সাতপুরু ।
 আধেক জাগায় আধেক ঘুমে ঘুলিয়ে আছে হাওয়া,
 দিনের রাতের সীমানাটা পেঁচোয়-দানোয়-পাওয়া ।
 ভাগ্যলিখন ঝাপসা কালির, নর সে পরিষ্কার—
 দুঃখস্বপ্নের ভাঙা বেড়ায় সমান যে দুই ধার ।
 কামারহাটার কাঁকুড়গাছির ইতিহাসের টুকরো,
 ভেসে চলে ভাঁটার জলে উইয়ে-ঘুনে-ফুকরো ।
 অঘটন তো নিত্য ঘটে রাস্তাঘাটে চলতে,
 লোকে বলে, সত্যি নাকি !— ঘুমোয় বলতে বলতে ।

সিঁধুপারে চলেছে হোখায় উলটপালট কাণ্ড,
 হাড় গুঁড়িয়ে বানিয়ে দিলে নতুন কী ব্রহ্মাণ্ড ।
 সত্য সেখায় দাক্ষণ সত্য, মিথ্যে ভীষণ মিথ্যে,
 ভালোয় মন্দে সুরাসুরের ধাক্কা লাগায় চিন্তে ।
 পা ফেলতে না ফেলতে হতেছে কোশ পার ।
 দেখতে দেখতে কখন যে হয় এসপার-ওসপার ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি,
 লম্বা দাঁড়ার করতাল,
 পাকড়াশিদের কঁকড়াডোবায়
 মাকড়সাদের হরতাল ।
 পয়লা ভাদর, পাগলা বাদর,
 লেজখানা যায় ছিঁড়ে,
 পালতে মাদার, সেরেস্তাদার
 কুটছে নতুন চিঁড়ে ।
 কলেজপাড়ায় শেয়াল তাড়ায়
 অঙ্ক কলুর গিগি ।
 ফটকে ছোঁড়া চটকিয়ে ঝায়
 সত্যপিরের সিগি ।
 মুল্লুক জুড়ে উল্লুক ডাকে,
 ঢোলে কুল্লুক ভট্ট,
 ইলিশের ডিম ভাজে বন্ধিম,
 কঁাদে তিনকড়ি চট্ট ।
 গরানহাটায় সজনেভাটা
 কিনছে পুলিশ সার্জন,
 চিংপুরে ঐ নাগা সম্মাসী
 কাত হয়ে মরে চারজন ।
 পকায়েতের চুপড়ি বেতের,
 সর্ষেখেতের চাষী ;
 কাঁচালকার ফোড়ন লাগায়
 কুড়োনঠাদের মাসি ।
 পটলডাঙায় চক্ষু রাঙায়
 মূর্গিহাটার মিঞা ;
 শঙ্খ বাজায় তম্বুরাটায়
 কেঁয়াও-কেঁয়াও-কিঞা ।

ঠন্থনে আজ বেচে লঠন
 চার পয়সার আটটা ।
 মুখ ভেংচিয়ে হেড্‌মাস্টার
 মন্তরে করে ঠাট্টা ।
 চিন্তামণির কয়লাখনির
 কুলির ইন্সপেক্টর ;
 বিরিকিদের খাজাকি ঐ
 চণ্ডীচরণ সেন-জা ।
 শিলচরে হার কিলচড় খার
 হস্টেলে বস ছাত্র ;
 হাজি মোল্লার দাড়িমাল্লার
 বাকি একজন মাত্র ।
 দাওয়াইখানায় শিঙাড়া বানায়,
 উচ্চিৎড়েটা লাফ দেয় ;
 কনেস্টেবল পেতেছে টেবুল
 খুদিরে চাঘের কাপ দেয় ।
 গুবরেপোকায় লেগেছে মড়ক,
 তুবড়ি ছোটায় পঙ্কু ;
 স্কাইরস্ক্রের ঘাড়ের উপর
 কাকাতুম্বা হানে চঞ্চু ।
 সিরাজগঞ্জে বিরাট মিটিং,
 তুলো-বের-করা বালিশ ;
 বংশ ফকির ভাঙা চৌকির
 পায়াতে লাগায় পালিশ ।
 রাবণের দশ মুণ্ডে নেমেছে
 বকুনি ছাড়ারে মাজা ;
 নেড়ানেড়ি দলে হরি-হরি বলে,
 শেষ হল রামমাজা ।

পুনশ্চ [শাস্তিনিকেতন]

১৯ নভেম্বর ১৯৪০

রাস্তিরে কেন হল মজি,
 চুল কাটে চাঁদনির দজি ।
 চুমরিষে দিল তার জুলফি,
 নাপিত আদায় করে full fee ।
 চাঁদনির রাধনি সে আসে যায়,
 ঝড়শি-বেহালা থেকে বাসে যায় ।
 ভবুরাম ওর পাড়াপড়শী,
 বেচে সে লাঠাই আর ঝড়শি ।
 আর বেচে যাত্রার বেয়ালা,
 আর বেচে চা খাবার পেয়ালা ।
 চা খেয়ে সে দিল ঘুম তখুনি,
 সইল না গিল্লির বকুনি ।
 কটকের নেত মজুমদার,
 সে বটে সুবিখ্যাত ঘুমদার ।
 কালু সিং দেয় তারে পাঙ্কা
 তিন মণ ওজনের ধাক্কা ।
 হাই তুলে বলে, এ কী ঠাট্টা—
 ঘড়িতে যে সব সাড়ে-আটটা ।
 চৌকিদারের মেছো শালী সে
 পড়ে থাকে মুখ গুঁজে বালিশে ।
 তাই দেখে গলাভাঙা পালোয়ান
 বাজুখাই সুরে বলে, আলো আন ।
 নীচে থেকে বলে হৈকে রহমৎ,
 বাংলা জ্বানি তুমি কহো মৎ ।
 ও দিকে মাথায় বেঁধে তোয়ালে
 ভিখুরাম নাচে তার গোয়ালে ।
 তোয়ালেটা পাদরির ভাইঝির,
 মোজা-জোড়া খড়দার বাইজির ।

পিরানের পাড়ে দেয় চুম্বকি,
 ইরানেতে সেলাইয়ের ধুম কী ।
 বোগদাদে তাই বাবে আলমিন
 শান্তি বতই ঘরে তাল। দিন ।
 শান্তির মুখটাকা বুখায়,
 পাছে তারে ঠেলা মারে শূর্যায় ।
 চুরি গেছে শূর্যার ডেপুটি,
 একলাসে চিহ্নিত ডেপুটি ।
 ডেপুটির জুতো মোড়া সাটিনেই,
 কোনোখানে দাতনের কাঠি নেই ।
 দাতনের খোঁজে লাগে খটকা,
 পেয়াদা ঘি আনে তিন মটকা ।
 গাওয়া ঘি সে নয়, সে-ষে ভয়সা—
 সের-করা দাম পাঁচ পয়সা ।
 বাবু বলে, দাম খুব জেয়াদা,
 কাজে ইস্তফা দিল পেয়াদা ।
 উমেদার এল আজ পয়লা
 গোয়াড়ির বত গোড়ো গয়লা ।
 পয়লায় ঘরে হাড়ি চড়ে না,
 পয়সে ছেড়ে খাঁহু নড়ে না ।
 পয়সেদিন মহা বিব্রত,
 বুধবারে ছিল তার কী ব্রত ।
 ভাঙুর পড়ল এসে স্মৃখে,
 ছধ খেয়ে নিল এক চুমুকে ।
 চেপে এল লজ্জা শরমটা,
 টেনে দিল দেড়-হাত ঘোমটা ।
 চুঁচড়ায় বাড়ি হরিমোহনের,
 গজায় স্নানে গেছে গ্রহপের ।
 সন্ধ্যে নিয়েছে চায় গণ্ডা
 বেছে বেছে পালোয়ান বণ্ডা ।

তাল ঠোকে রামধন মুন্সি,
 কোমরেতে তিন পাক ঘুন্সি ।
 দিদি বলে, মুখ তোর ফ্যাকাশে,
 ভালো করে ডাক্তার দেখাসে ।
 বলে ওঠে তিনকড়ি পোকার,
 আগে ভুই উকিলের শোধ ধার ।
 ভিখু শুনে কৈদে চোখ রগড়ায়,
 একদম চলে গেল মগরায় ।
 মগরায় খুদি নিয়ে খুকে
 খেজুরের আঁটিগুলো গুনছে—
 যেই হল তিন-কুড়ি পাঁচটা,
 দেখে নিল উহুনের আঁচটা ।
 ননদের ঘরে ক'রে ঘি চুরি
 তখনি চড়িয়ে দিল থিচুড়ি ।
 হল না তো চালে ডালে মেলানো,
 মুশকিল হবে ওটা গেলানো ।
 মাড়া পায় মাছওয়াল মিলের ;
 বলে, পাকা কুই চাই তিন সের ।
 বনমালী মাছ আনে গামছায় ;
 বলে, ও যে একুনি দাম চায় ।
 আচ্ছা, সে দেখা যাবে কালকে—
 ব'লেই সে চলে গেল শালকে ।
 মুন্সি যখন লেখে তৌজি,
 জলে নামে শালকের বউ ঝি ।
 শালকের ঘাটে ভাড়া পাঙ্কি ;
 কালু যাবে বানিচঙে কাল কি ।
 বানিচঙে ঢেঁকি পাকা-গাঁথনি,
 ধান কাটে কালুদার নাথনি ।
 বানিচঙে কোন্ দেশে কোন্ গাঁয়,
 কে জানে সে যশোরে কি বনগাঁয় ।

ফুটবলে বনগাঁর যোক্তার
 যত হারে, তত বাড়ে রোধ তার ।
 তার ছেলে হরেরাম মিস্ত্রি,
 আঁক ক'রে ব্যামো হল পিস্ত্রি ।
 মুখ চোখ হয়ে গেল হলদে,
 ওরে ওকে পলতার খোল দে ।
 পলতা কিনতে গেল ধুবড়ি,
 কিনল শুগলি এক-চুবড়ি ।
 হুগলির শুগলি কী মাগলি,
 ভাড়া হাতে পাওয়া গেল ভাগি ।
 ধুবড়িতে মানকচু সস্তা,
 কাউ পেল কাগজ দু বস্তা ।
 দেখে বলে নীলমণি সরকার—
 কাগজে হক্কর খুব দরকার ;
 জ্যামিতি অতীত তার সাধার,
 যতই কক্কন তারে নারধোর ।
 কাগজে বসিয়ে রেখে নারকেল
 পেন্সিলে কাটে ব'সে সারকেল ।
 সারকেল কাটতে সে কী বুকে
 খামকাই ঠেকে গেল ত্রিভুজে ।
 সহিতে পারে না তার চাপুনি,
 পালাজরে দিল তারে কীপুনি ।
 প্রাঙ্কবাড়িতে লেগে ঠাণ্ডা
 হেঁচে মরে ত্রিবেণীর পাণ্ডা ।
 অবেলার খেতে বসে দারোগা,
 শির শির ক'রে ওঠে তারো গা ।
 টাট্টু ঘোড়ার এক গাড়িতে
 ডাক্তার এল তার বাড়িতে ।
 সে-ঘোড়াটা বেড়া ভাঙে নন্দর,
 চিহ্ন রাখে না খেত-খন্দর ।

নন্দ বিকেলে গেল ঘাবড়ায়,
 সারি সারি গাড়ি দেখে ঘাবড়ায় ।
 গৌনে ব'সে, তিন চার পাঁচ সাত,
 আউড়িয়ে যায় সারা ধারাপাত ।
 শুনে শুনে পারে না যে ধামতে,
 গল্গল্ ক'রে থাকে ঘামতে ।
 নয় দশ বারো তেরো চোদ্দ,
 মনে পড়ে পয়সারের পদ্ম ।
 কাশীরাম দাসে আনে পুণ্য,
 দশে আর বিশে লাগে শূন্য ।
 'কাশীরাম কাশীরাম' বোল দেয়,
 সারাদিন মনে তার দোল দেয় ।
 আঁকগুলো মাথা থাকে ঘোলাতে,
 নন্দ ছুটেছে হাটখোলাতে ।
 হাটখোলা শক্তরের গদি তার—
 সেইখানে বাসা মেলে যদি তার
 এক সংখ্যায় মন দেবে ঝাঁপ,
 তার চেয়ে বেশি হলে হবে পাপ ।
 আর নয়, আর নয়, আর নয়—
 কখনোই দুই তিন চার নয় ।

উদীচী [শাস্তিনিকেতন]

২০ জানুয়ারি ১৯৪০

৯

আজ হল রবিবার, খুব মোটা বছরের
 কাগজের এডিশন ; যত আছে শহরের
 কানাকানি, বত আছে আজগবি সংবাদ,
 যায় নিকে কোনোটোর একটুও রঙ বাদ ।
 'বার্তাকু' লিখে দিল, গুজরানগুয়ালায়
 দলে দলে জোট করে পাঞ্জাবি গোয়ালায়

বলে তারা, গোক পোষা গ্রাম্য এ কারবার
 প্রগতির যুগে আজ দিন এস ছাড়বার ।
 আজ থেকে প্রত্যহ রাস্তির পোষালেই
 বসবে প্রেপরিটির ক্লাস এই গোষালেই ।
 স্তূপ রচা দুই বেলা খড়-ভূষি-ঘাসটার
 ছেড়ে দিয়ে হবে ওরা ইস্কুলমাস্টার ।
 হৃদ্যধ্বনি বাহা গো-শিশু গো-বৃদ্ধের
 অন্তর্ভূত হবে বই-গেলা বিস্তার ।
 যত অভ্যাস আছে লেজ ম'লে পিটোনো
 ছেলের পিঠে হবে পেট ভ'রে মিটোনো

‘গদাধরে’ রেগে লেখে, এ কেমন ঠাট্টা—
 বার্তাকু পরে পরে সাতটা কি আটটা
 যা লিখেছে সব কটা সমাজের বিরোধী,
 মতগুলো প্রগতির দ্বার আছে নিরোধি ।
 সেদিন সে লিখেছিল, ঘুঁটে চাই চালানো,
 শহরের ঘরে ঘরে ঘুঁটে হোক জালানো ।
 কমলা ঘুঁটেতে যেন সাপে আর নেউলে,
 ঝড়িঘাকে করে দিক একদম দেউলে ।
 সেনেট হাউস আদি বড়ো বড়ো দেয়ালী
 শহরের বুক জুড়ে আছে যেন হেয়ালি ।
 ঘুঁটে দিয়ে ভরা হোক, এই এক কতোয়ায়
 এক দিনে শহরের বেড়ে যাবে কত আয় ।
 গোয়ালারা চোনা যদি জমা করে গায়লায়
 কত টাকা বাঁচে তবে জল-দেওয়া মামলায় ।
 বার্তাকু কাগজের ব্যঞ্জে যে গা জলে,
 হৃদয় মুখ পেলে লেপে ওরা কাজলে ।
 এ-সকল বিক্রমে বুদ্ধি যে খেলো হয়,
 এ দেশের আবহাওয়া ভারি এলোমেলো হয়

গদাধর কাগজের ধমকানি থামল,
 হেসে উঠে বার্তাকু যুদ্ধেতে নামল ।
 বলে, ভায়া, এ জগতে ঠাট্টা সে ঠাট্টাই—
 গদাধর, গদা রেখে লও সেই পাঠটাই ।
 মাস্টার না হয়ে যে হলে তুমি এডিটর
 এ লাগি তোমার কাছে দেশটাই ক্রেডিটর
 এডুকেশনের পথে হয় নি যে মতি তব,
 এই পুণ্যেই হবে গোকুলেই গতি তব ।

অবশেষে এ দুখানা কাগজের আসরে
 বচসার ঝাঁজ দেখে ভয়ে কথা না সরে ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

১৭ মার্চ ১৯৪০

১০

সিউড়িতে হরেরাম মৈস্তির
 পাঞ্জি দেখে সতেরোই চৈস্তির ।
 বলে, আজ যেতে হবে মথুরায় ।
 সেখা তার মামা আছে মডু রায় ।
 বেঙ্গতিবারে গাড়ি চড়ে তার,
 চাকা ভাঙে নরসিংগড়ে তার ।
 তাই তার যাত্রাটা ঘুরলে,
 ফিরে এসে চলে গেল স্কুলে ।
 ঠিক হল যেতে হবে পেশোয়ার,
 সেখা আছে সেজো মাসি যেসো আর
 এসে দেখে একা আছে বউ সে,
 যেসো গেছে পানিপথে পৌষে ।
 হাথুয়ার কাছাকাছি না যেতেই,
 বাঙালি সে ধরা পড়ে শাজ্জেতেই ।

চোখ রাঙা ক'রে বলে দারোগা,
 থানামে লে করু হয় যারো গা ।
 ছোটো ভাই বেঁধে চিঁড়ে মুড়কি
 সন্ন্যাসী হয়ে গেল রুড়কি ।
 ঠোঁকর পেয়ে পড়ে বোচকাই,
 কুক্ষণে পা ছুথানা মোচকাই ।
 শেষে গেল মুলতানপুরে সে,
 গান ধরে মুলতান সুরে সে ।
 বেলাশেষে এল ববে বামুড়ায়
 কী ভীষণ মশা তাকে কামুড়ায় ।
 বুঝলে সে শাস্ত যে হওয়া দায়,
 গোকর গাড়িতে চলে নওয়াদায় ।
 গোকুটা পড়ল মুখ খুবড়ি
 ক্রোশ দুই থাকতেই খুবড়ি ।
 কাটিহারে তুলে তাকে ধরল,
 তখন সে পেট ফুলে মরল ।
 শুনেছে তিসির খুব নামো দর,
 তাই পাড়ি দিতে গেল দামোদর
 দামোদরে বুধুরাম খেয়া দেয়,
 চেপে বসে ডেপুটির পেয়াদায় ।
 শংকর ভোরবেলা চুঁচড়ায়
 হাউ-হাউ শব্দে গা মুচড়ায় ।
 নাড়াছোলে বড়োবাবু তখনি
 শুক করে বংশুকে বকুনি ।
 বংশুর যত ছোক খাটো আয়,
 তবু তার বিয়ে হবে কাটোয়ায় ।
 শাখা হাঁকো বাধা নিয়ে খড়দার
 ধার নিলে মতিরাম সর্দার ।
 'শাখা চাই' বলতেই শাখারি
 বলে, শাখা আছে তিন টাকারই ।

দর-কষাকষি নিয়ে অবশেষ
 পুলিসথানায় হল সব শেষ ।
 সাসারামে চলে গেল লোক তার
 খুঁজে যদি পাওয়া যায় মোক্তার ।
 সাক্ষীর খোঁজে গেল চেউকি,
 গাঁজাখোর আছে সেখা কেউ কি ।
 সাথে নিয়ে ভুলুদা ও শশিদি
 অমুকুল চলে গেছে জসিদি ।
 পথে যেতে বহু দুখ ভুগে রে
 খোঁড়া ঘোড়া বেচে এল মুঙেরে ।
 মা ও দিকে বাতে তার পা খুঁড়ায়,
 পড়ে আছে সাত দিন বাঁকুড়ায় ।
 ডাক্তার তিনকড়ি সাঙুল
 বদলি করেছে বাসা বাঙুল ।
 তাই লোক পাঠায় কোদারুমায়,
 চিঠি লিখে দিল সে ভৌদার মায় ।
 সাতক্ষীরা এল চুপিচুপি সে,
 তার পরে গেল পাঁচখুপি সে ।
 সেখানেতে মাছি প'ল ভাতে তার,
 ঝগড়া হোটেলবাবু সাথে তার ।
 অতুল গিয়েছে কবে নাসিকে,
 সঙ্গে নিয়েছে তার মাসিকে ।
 রাঁধবার লোক আছে মাদ্রাজি
 সাত টাকা মাইনের আধ-রাজি ।
 লালচাঁদ যেতে যেতে পাকুড়ে
 খিদেটা মেটায় শশা কঁাকুড়ে ।
 পৌছিয়ে বাহাদুরগঞ্জে
 হাঁসকঁাস করে তার মন যে ।
 বাসা খুঁজে সাথে তার কাঙলা
 খুলনায় পেল এক বাঙলা ।

শুধু একখানা ভাড়া চৌকি,
 এখানেই থাকে মেজো বউ কি ।
 নেমে গেল যেথা কাশুজংশন,
 ভিমরুলে করে দিল দংশন ।
 ভাস্কারে বলে চুন লাগাতে
 জালাটাকে চায় যদি ভাগাতে ।
 চুন কিনতে সে গেল কাটনি,
 কিনে এল আমড়ার চাটনি ।
 বিকানিরে পড়ল সে নাকালে,
 উটে তাকে কী বিষম কাকালে ।
 বাড়িভাড়া করেছিল শ্বশুরই,
 তাই খুশি মনে গেল মশুরি ।
 শ্বশুর উধাও হল না ব'লে,
 জামাই কি ছাড়া পাবে তা ব'লে ।
 জায়গা পেয়েছে মালগাড়িতে,
 হাত সে বুলাতেছিল দাড়িতে,
 কঁাকা থেকে মূর্গিটা নাকে তার
 ঠোকর মেয়েছে কোন্ ফাঁকে তার
 নাকের গিয়েছে জাত রটে যায়,
 গাঁয়ের মোড়ল সব চটে যায় ।
 কানপুর হতে এল পণ্ডিত,
 বলে এর করা চাই দণ্ডিত ।
 লাশা হতে শ্বেত কাক খুজিয়া
 নাসাপথে পাখা দাও শুঁজিয়া ।
 ইচি তবে হবে শতশতবার,
 নাক তার শুচি হবে ততবার ।
 তার পরে হল মজা ভরপুর
 যখন সে গেল মজাফরপুর ।
 লাশা ছিল জমাদার খানাতে,
 ভোজ ছিল যোগলাই খানাতে ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

জোনপুরি কাবাবের গন্ধে
ভুরভুর করে সারা গন্ধে ।
দেহটা এমনি তার তাতালে
যেতে হল মেয়ো-হাঁসপাতালে
তার পরে কী যে হল শেষটা
খবর না পাই করে চেষ্টা ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

৭ মার্চ ১৯৪০

১১

মাঝরাতে ঘুম এল, লাউ কেটে দিতে
ছিঁড়ে গেল ভুলুয়ার ফতুয়ার ফিতে ।
খুহ বলে, মামা আসে, এই বেলা লুকে ।
কানাই কাঁদিয়া বলে, কোথা গেল হুঁকে ।
নাতি আসে হাতি চড়ে । খুড়ো বলে, আশা,
মারা বুঝি গেল আজ সনাতন সাহা ।
তাঁতিনীর নাতিনীর সাথিনী সে হাসে ;
বলে, আজ ইংরেজি মাসের আঠাশে ।
তাড়া খেয়ে গাড়া বলে, চলে যাব রাচি ।
ঠাণ্ডায় বেড়ে গেল বাদরের হাচি ।
কুকুরের লেজে দেয় ইন্ডেক্সশান,
মাসুলি টিকিট কেনে জলধর সেন ।
পাঁজি লেখে, এ বছরে বাক্য এ কালটা,
ত্যাড়াবাক্য বুলি তার উলটা-পালটা—
বুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর—
জানি নে তো কে যে পারে দিচ্ছে কবর ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

৫ ডিসেম্বর ১৯৪০ । বিকাল

শেষ লেখা

শেষ লেখা

১

সমুখে শাস্তিপান্নাবার,
ভাসাও তরলী হে কর্ণধার ।
তুমি হবে চিরসাধি,
লও লও হে ক্রোড় পাতি,
অসীমের পথে জলিবে জ্যোতি
ক্রবতারকার ।

যুক্তিদাতা, তোমার কমা, তোমার দয়া
হবে চিরপাথের চিরদাজ্ঞার ।

হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু যেলি লয়,
পায় অস্তরে নির্ভয় পরিচয়
মহা-অজ্ঞানার ।

পুনশ্চ [শাস্তিনিকেতন]

৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯ । বেলা একটা

২

রাহুর মতন যত্ন
ওধু ফেলে ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জীবনের স্বর্গীয় অমৃত
জড়ের কবলে
এ কথা নিশ্চিত মনে আনি ।
প্রেমের অসীম মূল্য

সম্পূর্ণ বকনা করি লবে
 হেন দম্ব্য নাই গুপ্ত
 নিখিলের গুহাগহ্বরেতে
 এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।
 সবচেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিছু যারে
 সবচেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি,
 অস্তিত্বের এ কলঙ্ক কত
 সহিত না বিশ্বের বিধান
 এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।
 সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্তবেগে
 সেই তো কালের ধর্ম ।
 মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
 এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে
 এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।
 বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
 সেই তার আমি
 অস্তিত্বের সাক্ষী সেই,
 পরম-আমির সত্যে সত্য তার
 এ কথা নিশ্চিত মনে জানি ।

৭ মে ১৯৪০

৩

ওরে পাখি,
 থেকে থেকে ভুলিস কেন স্বর,
 যাস নে কেন ডাকি—
 বাণীহারা প্রভাত হয় যে বৃথা
 জানিস নে তুই কি তা ।
 অরুণ-আলোর প্রথম পরশ
 গাছে গাছে লাগে,
 কাঁপনে তার তোরই যে স্বর

পাতায় পাতায় আগ্নে—
 তুই যে ভোরের আলোর মিতা
 জানিস নে তুই কি তা ।
 আগরণের লক্ষী যে শুই
 আমার শিয়রেতে
 আছে আঁচল পেতে,
 জানিস নে তুই কি তা ।
 গানের দানে উহারে তুই
 করিস নে বকিতা ।
 দুঃখরাতির স্বপনতলে
 প্রভাতী তোর কী যে বলে
 নবীন প্রাণের গীতা,
 জানিস নে তুই কি তা ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ । বিকাল

৪

রৌদ্রতাপ কাঁকা করে
 জনহীন বেলা দুপহরে ।
 শূন্য চৌকির পানে চাহি,
 সেখায় সান্নায়েন নাহি ।
 বুক ভরা তার
 হতাশের ভাষা বেন করে হাহাকার ।
 শূন্যতার বাণী শুঁটে ককশায় ভরা,
 মর্ম তার নাহি যায় ধরা ।
 কুকুর মনিবছারা যেমন ককশ চোখে চায়,
 অবুক মনের ব্যথা করে হার-হার ;
 কী হল যে, কেন হল, কিছু নাহি বোঝে—
 দিনরাত ব্যর্থ চোখে চারি দিকে খোজে ।

চৌকির ভাষা যেন আরো বেশি কল্প কাভর,
শূন্যতার মুক ব্যথা ব্যাপ্ত করে প্রিয়হীন ঘর ।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

২৬ মার্চ ১৯৪১ । বিকাল

৫

আরো একবার যদি পারি
খুঁজে দেব সে আসনখানি
যার কোলে রয়েছে বিছানো
বিদেশের আদরের বাণী ।

অতীতের পালানো স্বপন
আবার করিবে সেথা ভিড়,
অশ্রুট গুঞ্জনস্বরে
আরবার রচি দিবে নীড় ।

স্বপ্নস্বপ্তি ডেকে ডেকে এনে
জাগরণ করিবে মধুর,
যে বাণি নীরব হয়ে গেছে
ফিরায়ে আনিবে তার সুর ।

বাতায়নে রবে বাহু মেলি
বসন্তের সৌরভের পথে,
মহানিঃশব্দের পদধ্বনি
শোনা যাবে নিশীথজগতে ।

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেমসী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ ।

ভাষা বার জানা ছিল নাকো,
আঁখি বার করেছিল কথা,
আগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকল তাহারি বারতা ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

৬ এপ্রিল ১৯৪১ । দুপুর

৬

ঐ মহামানব আসে ;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
যত্নগুলির ঘাসে ঘাসে ।
স্বরলোকে বেজে উঠে নখ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজয়ের লয় ।
আজি অমরাত্রির দুর্গতোষণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভয় ।
উদয়নিধরে আগে মাঠে: মাঠে: রব
নব জীবনের আশ্বাসে ।
জয় জয় জয় রে মানব-অত্মদয়,
যজ্ঞি উঠিল মহাকাশে ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

১ বৈশাখ ১৩৪৮

৭

জীবন পবিত্র জানি,
অভায়া স্বরূপ তার
অজের রহস্য-উৎস হতে
পেয়েছে প্রকাশ
কোন্ অলঙ্কিত পথ দিয়ে
সন্ধান যেনে না তার ।

প্রত্যহ নূতন নির্মলতা
 দিল তারে সূর্যোদয়
 লক্ষ কোশ হতে
 স্বর্ণঘটে পূর্ণ করি আলোকের অভিষেকধারা ।
 সে জীবন বাণী দিল দিবসরাত্রিরে,
 রচিল অরণ্যফুলে অদৃশ্যের পূজা-আয়োজন,
 আরতির দীপ দিল জালি
 নিঃশব্দ প্রহরে ।
 চিত্ত তারে নিবেদিল
 জন্মের প্রথম ভালোবাসা ।
 প্রত্যাহের সব ভালোবাসা
 তারি আদি সোনার কাঠিতে
 উঠেছে জাগিয়া ;
 প্রিয়ারে বেসেছি ভালো,
 বেসেছি ফুলের মঞ্জরিকে ;
 করেছে সে অন্তরতম
 পরণ করেছে যারে ।
 জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিপিত পাতা,
 দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে ।
 আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
 দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
 নিজেই চিনিতে পারে
 রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
 তার পরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
 উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
 কিছু বা যায় না মোছা স্বর্ণের লিপি,
 ধ্রুবতারকার পাশে আগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

২৫ এপ্রিল ১৯৪১

৮

বিবাহের পঞ্চম বরষে
 যৌবনের নিবিড় পরশে
 গোপন রহস্য ভরে
 পরিণত রসপুঞ্জ অস্তরে অস্তরে
 পুষ্পের মঞ্জরি হতে ফলের স্তবকে
 বৃন্ত হতে স্বকে
 স্বর্ণবিভায় ব্যাপ্ত করে ।
 সংবৃত্ত স্মন্দ গন্ধ অতিপিরে ডেকে আনে ঘরে ।
 সংবৃত্ত শোভায়
 পথিকের নয়ন লোভায় ।
 পাঁচ বংশরের ফুল বসন্তের নাদবীজগুলি
 মিলনের স্বর্ণপাত্রে সুধা দিল ভরি ;
 মদুসকয়ের পর
 মধুপেয়ে করিল মুখর ।
 শাস্ত আনন্দের আয়তনে
 আসন পাতিয়া দিল স্বাহুত অনাহুত জনে ।
 বিবাহের প্রথম বংশরে
 দিকে দিগন্তরে
 শাহানায় বেজেছিল বাঁশি,
 উঠেছিল কল্লোলিত হাসি—
 আঁহু শ্রিতহাস্য ফুটে প্রভাতের মুখে
 নিঃশব্দ কোতুকে ।
 বাঁশি বাজে কানাড়ায় সুগভীর ভানে
 সপ্তমির ধ্যানের আশ্বানে ।
 পাঁচ বংশরের ফুল বিকশিত সুগন্ধপ্রধানি
 সংসারের মাঝখানে পূর্ণতার স্বর্গ দিল আনি ।
 বসন্তপঞ্চম রাগ আরম্ভেতে উঠেছিল বাঁজি,
 সুরে সুরে তালে তালে পূর্ণ হয়ে উঠিয়াছে আজি ;

পুষ্টিত অরণ্যতলে প্রতি পদক্ষেপে
মঞ্জীরে বসন্তরাগ উঠিতেছে কেঁপে ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

২৫ এপ্রিল ১৯৪১ । সকাল

৯

বাণীর মুরতি গড়ি

একমনে

নির্জন প্রাঙ্গণে

পিও পিও মাটি তার

ষায় ছড়াছড়ি—

অসমাপ্ত মূক

শূন্যে চেয়ে থাকে

নিরুৎসুক ।

গবিত মূর্তির পদানত

নাথা ক'রে থাকে নিচু,

কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু ।

বহুপুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে

এক কালে যাঁহা রূপ পেয়ে

কালে কালে অর্থহীনতায়

ক্রমণ মিলায় ।

নিমন্ত্রণ ছিল কোথা, শুধাইলে তাই

উত্তর কিছু না দিতে পারে—

কোন্ স্বপ্ন বাদিবারে

বহিরা দুলির স্বপ্ন

দেখা দিল

মানবের দ্বারে ।

নিম্বত অর্গের কোন্

উর্বশীর ছবি

ধরণীর চিস্তপটে

বাধিতে চাহিয়াছিল

কবি—

তোমারে বাহনরূপে

ডেকেছিল,

চিত্রশালে যন্তে রেখেছিল,

কখন সে অশ্রুমনে গেছে তুলি—

আদ্রিম আশ্রয় তব ধূলি,

অসীম বৈরাগ্যে তার দিক্‌বিহীন পথে

তুলি নিল বাণীহীন রথে ।

এই ভালো,

বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে

আত্ম পঙ্কু আবর্জনা

নিষৃত গল্পনা

কালের চরণক্ষেপে পদে পদে

বাধা দিতে জানে,

পদাঘাতে পদাঘাতে জীর্ণ অপমানে

শাস্তি পায় শেষে

আবার ধূলিতে যবে যেনে ।

উদয়ন [শাস্তিনিকেতন]

৩ মে ১৯৪১ । সকাল

১০

আবার এ কল্পদিন-মাত্রে আমি হারা

আমি চাহি বন্ধুজন বান্ধা

তাহাদের হাতের পরশে

যর্ভোগ অস্তিত্ব স্রীতিরসে

নিরে বাব জীবনের চরম প্রসাদ,

নিরে বাব মাহুয়ের শেষ আশীর্বাদ ।

পুঙ্ক তুলি আজিকে আমার ;

দিয়েছি উজাড় করি
 যাহা কিছু আছিল দিবার,
 প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
 কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—
 তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
 পারের খেয়ায় যাব যবে
 ভাষাহীন শেষের উৎসবে ।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

৬ মে ১৯৩১ । সকাল

১১

রূপনারানের কূলে
 ভেগে উঠিলাম,
 জানিলাম এ ক্ষণে
 স্বপ্ন নয় ।
 রক্তের অক্ষরে লেখিলাম
 আপনার রূপ,
 চিনিলাম আপনারে
 আঘাতে আঘাতে
 বেদনার বেদনায়,
 সত্য যে কঠিন,
 কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
 সে কখনো করে না বকনা ।
 আশুতার দুঃসের তপস্তা এ জীবন,
 সত্যের দাক্ষণ মূল্য লাভ করিবারে,
 মৃত্যুতে বাকস দেনা শোধ করে দিতে ।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

১৩ মে ১৯৩১ । রাত্রি ৩-১৫ মিনিট

১২

তব জন্মদিবসের দানের উৎসবে
 বিচিত্র সম্ভ্রান্ত আঙ্গি এই
 প্রভাতের উদয়প্রাঙ্গণ।
 নবীনের দানসজ্জ কুহুমে পল্লবে
 অজস্র প্রচুর।
 প্রকৃতি পরীক্ষা করি মেখে
 ক্ষণে ক্ষণে আপন ভাণ্ডার,
 তোমারে সম্মুখে রাবি পেল সে স্বযোগ।
 দাতা আর গ্রহীতার যে সংগম লাগি
 বিধাতার নিতাই আগ্রহ
 আঙ্গি তা সার্থক হল,
 বিশ্বকবি তাহারি বিশ্বয়ে
 তোমারে করেন আশীর্বাদ—
 তাঁর কবিত্বের তুমি সাক্ষীরূপে দিবেছ দর্শন
 বৃষ্টিধোত প্রাবণের
 নির্মল আকাশে।

উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

১৩ জুলাই ১৯৪১। সকাল

১৩

প্রথম দিনের সূর্য
 প্রসন্ন করেছিল
 সস্তার নূতন আবির্ভাবে—
 কে তুমি।
 যেলে নি উত্তর।
 বৎসর বৎসর চলে গেল,
 দিবসের শেষ সূর্য
 শেষ প্রসন্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,

নিস্তরু সঙ্ঘায়—
কে তুমি ।
পেল না উত্তর ।

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা
২৭ জুলাই ১৯৪১ । সকাল

১৪

দুঃখের আধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার ঘারে ;
একমাত্র অন্ধ তার দেখেছিহু
কষ্টের বিকৃত ভান, জ্বালের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার ।

যতবার ভয়ের মুগ্ধতা তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয় ।
এই হার-ভিত খেলা, জীবনের মিথ্যা এ কৃৎক,
শিশুকাল হতে বিকৃত পদে পদে এই বিভীষিকা,
দুঃখের পরিহাসে ভরা ।
ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীরণ আদারে ।

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা
২৯ জুলাই ১৯৪১ । বিকাল

১৫

তোমার সৃষ্টির পথ যেনেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী ।

বিশ্বা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
 সরল জীবনে ।
 এই প্রবক্তা দিয়ে মহেশ্বরে করেছ চিহ্নিত ;
 তার তরে রাখ নি গোপন রাজি ।
 তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
 যে-পথ দেখায়
 সে যে তার অন্তরের পথ,
 সে যে চিরস্বচ্ছ,
 সহজ বিশ্বাসে সে যে
 করে তারে চিরসমুজ্জল ।
 বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে স্বচ্ছ,
 এই নিয়ে তাহার গৌরব ।
 লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত ।
 সত্যেরে সে পায়
 আপন আলোকে খোঁজ অন্তরে অন্তরে ।
 কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
 শেষ পুরস্কার নিয়ে যার সে যে
 আপন ভাগ্যে ।
 অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
 সে পায় তোমার হাতে
 শাস্তির অক্ষর অধিকার ।

জোড়াসাঁকো । কলিকাতা

৩০ জুলাই ১৯৪১ । সকাল সাড়ে নয়টা

নাটক ও প্রহসন

মুক্তির উপায়

ভূমিকা

ফকির, স্বামী অচ্যুতানন্দের চেলা। গৌকদাড়িতে মুখের বারো আনা অনাবিকৃত। ফকিরের স্ত্রী হৈমবতী। বাপের আদরের মেয়ে। তিনি টাকা রেখে গেছেন ওর জন্তে। ফকিরের বাপ বিশ্বেশ্বর পুত্রবধূকে স্নেহ করেন, পুত্রের অপরিমিত গুরুভক্তিতে তিনি উৎকণ্ঠিত।

পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূরসম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়ারগায়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কোতূহলের সীমা নেই। কোতূকের জিনিসকে নানা রকমে পরখ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ার তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।

পুষ্পমালার একজন গুরু আছেন, তিনি খাঁচি বনম্পতি জাতের। অগুরু-জঙ্গলে দেশ গেছে ছেয়ে। পুষ্পর ইচ্ছে সেইগুলোতে হাসির আগুন লাগিয়ে খাণ্ডবদাহন করে। কাজ শুরু করেছিল এই নবগ্রামে। শুনেছি, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পুণ্যকর্মে ব্যাঘাত ঘটেছে। তার পর থেকে পক্ষ্মরের সঙ্গে হাসির শর যোগ করে ঘরের মধ্যেই সুমধুর অশান্তি আলোড়িত করেছে। সেই প্রহসনটা এই প্রহসনের বাইরে।

পাশের পাড়ার মোড়ল বগীচরণ। তার নাতি মাখন ছই.স্বীর তাড়ায় সাত বছর দেশছাড়া। বগীচরণের বিশ্বাস পুষ্পর অসামান্য বশীকরণ-শক্তি। সেই পারবে মাখনকে ফিরিয়ে আনতে। পুষ্প শুনে হাসে আর ভাবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রহসনটাকে সে সম্পূর্ণ করে দেবে। এই নিয়ে রবি ঠাকুর নামে একজন গ্রন্থকারের সঙ্গে মাঝে মাঝে সে পত্রব্যবহার করেছে।

যুক্তির উপায়

প্রথম দৃশ্য

ফকির। পুষ্পমালা। হৈমবতী

ফকির। সোহং সোহং সোহং।

পুষ্প। ব'সে ব'সে আওড়াচ্ছ কী।

ফকির। গুরুমন্ত্র।

পুষ্প। কতদূর এগোল।

ফকির। এই, ইড়া নাড়িটার কাছ পর্যন্ত এসে গেল খেমে।

পুষ্প। হঠাৎ থামে কেন।

ফকির। ঐ আমার ছিঁচকাহুনি খুকিটার কীতি। মস্তুরটা গুরুগুরু গুরুগুরু করতে করতে দ্বিবি উঠছিল উপরের দিকে ঠেলে। বোধ হয় আর সিকি ইকি হলেই পিঙ্গলার মধ্যে ঢুকে পড়ত, এমন সময় যেহেঁটা নাকিস্বরে চীৎকার করে উঠল— বাবা, নচকুম্। দিলুম ঠাস করে গালে এক চড়, ড্যা করে উঠল কেঁদে, অমনি এক চমকে মস্তুরটা নেমে পড়ল পিঙ্গলার মুখ থেকে একেবারে নাভীগহ্বর পর্যন্ত। সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম।

পুষ্প। তোমার গুরু মস্তুরটা কি অজীর্ণরোগের মতো। নাড়ির মধ্যে গিয়ে—

ফকির। হাঁ দ্বিবি, নাড়ির মধ্যে ঘুটঘাট ঘুটঘাট করছেই— ওটা বায়ু কিনা।

পুষ্প। বায়ু নাকি।

ফকির। তা না তো কী। শব্দব্রহ্ম— ওতে বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই।

দ্বিবি। যখন কেবলই বায়ু খেতেন তখন কেবলই বানাতেন মস্তুর।

পুষ্প। বল কী।

ফকির। নইলে অতটা বায়ু জমতে দিলে পেট যেত ফেটে। নাড়ি যেত পটপট করে ছিঁড়ে বিশধানা হয়ে।

পুষ্প। উঃ, তাই তো বটে— একেবারে চার-বেদ-ভরা মন্ত্র— কম ছাওয়া তো লাগে নি।

ফকির। শুনলেই তো বুঝতে পার, ঐ-যে ও—ম্, ওটা তো নিছক বায়ু-উস্কার।
পুণ্যবায়ু, জগৎ পবিত্র করে।

পুন্স। এত সব জ্ঞানের কথা পেলে কোথা থেকে। আমরা হলে তো পাগল
হয়ে যেতুম।

ফকির। সবই গুরুর মুখ থেকে। তিনি বলেন, কলিতে গুরুর মুখই গোমুখী—
মঙ্গলকা বেরচ্ছে কল্কল করে।

পুন্স। বি. এ.তে সংস্কৃতে অনাস্ নিয়ে খেটে মরেছি মিথ্যে। অজীর্ণ রোগেও
ভুগেছি, সেটা কিন্তু পাকষত্বের, ইড়াপিঙ্গলার নয়।

ফকির। এতেই বুঝে নাও— গুরুর কৃপা। তাই তো আমার নাড়ির মধ্যে
মস্তুরটা প্রায়ই ডাক ছাড়ে গুরু গুরু গুরু শব্দে।

পুন্স। আচ্ছা, ডাকটা কি আহারের পরে বাড়ে।

ফকির। তা বাড়ে বটে।

পুন্স। গুরু কী বলেন।

ফকির। তিনি বলেন, পেটের মধ্যে স্থূলে স্থূলে লড়াই, যেন দেবে দৈত্যো।
খাওয়ার সঙ্গে মস্তুর বেধে যায় যেন গোলাগুলি-বর্ষণ, নাড়িগুলো উচ্চস্বরে গুরুকে
স্বরণ করতে থাকে।

হৈম। দুঃখের কথা আর কী বলব দিদি, পেটের মধ্যে গুরুর স্বরণ চলছে, বাইরেও
বিরাম নেই। চরণদাস বাবাজি আছেন ঠর গুরুভাই, সে লোকটার দয়ামায়া নেই,
ওঁকে গান শেখাচ্ছেন। পাড়ার লোকেরা—

পুন্স। চূপ চূপ চূপ, পতিব্রতা ভূমি। স্বামীর কণ্ঠ যখন চলে, সাধুরা প্রাণপণে
থাকেন নীরবে। ফকিরদা, গলার গান শানাচ্ছ কেন, গাছিকির অহিংসানীতির
কথা শোন নি।

হৈম। তোমরা দুজনে তব্বকথা নিয়ে থাকো। আমাকে যেতে হবে বাছ
কুটতে। আমি চললুম। [প্রস্থান]

ফকির। আমার কথাটা বুঝিয়ে বলি। গুরুর মন্ত্র, যাকে বলে গুরুপাক। খুব
বেশি যখন ভবে ওঠে অসুখে, তখন সমস্ত শরীরটা ওঠে পাক দিয়ে; নাচের ঘূর্ণি
উঠতে থাকে পায়ের তলা থেকে উপরের দিকে; আর, ঘানি ঘুরলে ঘেরকম আওয়াজ
দিতে চায়, ভক্তির ঘোরে সেইরকম গানের আওয়াজ ওঠে গলার ভিতর দিয়ে। এই
দেখো-না এখনি সাধনার নাড়া লেগেছে একেবারে মূল্যধার থেকে— উঃ!

পুন্স। কী সর্বনাশ! ডাক্তার ডাকব নাকি।

ফকির। কিছু করতে হবে না। একবার পেট ভরে নেচে নিতে হবে। গুরু বলেছেন, গুরু মন্ত্রটা হল ধারক, আর নৃত্যটা হল সারক, ছোটোরই খুব দরকার।
(উঠে পাড়িয়ে নৃত্য)

গুরুচরণ করো অরণ-অ
ভবভরণ হবে ভরণ-অ
সুখাশ্রয়ণ প্রাণভরণ-অ
মরণভয় হবে হরণ-অ।

পুন্স। শুধু মরণভয়-হরণ নয়, দাদা। গুরুদক্ষিণার চোটে স্বীয় পয়সা, বাপের তহবিল -হরণও চলছে পুরো দমে।

ফকির। ঐ দেখো, বাবা আসছেন বৌকে নিয়ে। বড়ো ব্যাঘাত, বড়ো ব্যাঘাত।
গুরো।

পুন্স। ব্যাঘাতটা কিসের।

ফকির। মূলরূপে ঐরা আমাদের ফকির বলেই জানেন।

পুন্স। আরো একটা রূপ আছে নাকি।

ফকির। কম্বু হয়ে গেছে আমার ফকির-দেহটা ভিতরে ভিতরে। কেবলই মিলে যাচ্ছে গুরুদেহের মূর্ত্যরূপে। বাইরে পড়ে আছে খোলসটা মাত্র। ঐরা আসলটাকে কিছুতেই দেখবেন না।

পুন্স। খোলসটা যে অভ্যস্ত বেশি দেখা যাচ্ছে। একেবারেই স্বচ্ছ নয়।

ফকির। দৃষ্টিগুহি হতে ঘেরি হয়। কিন্তু সব আগে চাই বিশ্বাসটা। ভগবৎ-রূপায় ঐদের মনে যদি কখনো বিশ্বাস জাগে, তা হলে গুরুদেহে আর ফকিরের দেহে একেবারে অভিন্ন রূপ দেখতে পাবেন— তখন বাবা—

পুন্স। তখন বাবা গরায় পিণ্ডি দিতে বেরবেন।

[ফকিরের প্রস্থান]

বিশেষ্বর ও হৈমবতীর প্রবেশ

বিশেষ্বর। (হৈমবতী) বোম্বাই যাচ্ছে তোমার নামে কিছু টাকা রেখে গেছেন। ফকির সেটা জানে, তাই তো গুরু কিছু হল না।

পুন্স। আর কী হলে আর কী হত, সে ভাবতে গেলে মাথা ধরে যায়।

বিশেষ্বর। ম্যাকিননের হেডবাবু আমার বন্ধুর জালীপতি, সে বলেছিল, ফকির যা-হয় একটা কিছু পাস করলেই তাকে এসিস্টেন্ট স্টোম্বুকীপার করে দেবে। বাঘরটা কেবল জেদ করেই বারে বারে ফেল করতে লাগল।

পুষ্প। ফেল করবার বিক্রী জেদ আরো অনেক ছেলের দেখেছি। মিস্ত্রিরদের বাড়ির মোতিলাল আমার সঙ্গে একসঙ্গেই পড়া আরম্ভ করেছিল। ম্যাট্রিকের এ পারের খোঁটা এমনি বিষম জেদ করে আঁকড়িয়ে রইল, ওর পিসেমশায় ওর কানে ধরে ঝাঁকে মারতে মারতে কান প্রায় ছিঁড়ে দিলেন কিন্তু পার করতে পারলেন না। চল্ ভাই হৈমি, পড়া করবি আর— স্বামীর হয়ে পাস করার কাজটা তুই সেয়ে রাখবি চল্।

বিশ্বেশ্বর। যাও পড়তে, কিছু পোনো মা,— ফকির টাকা চাইলেই তুমি গুকে দাও কেন।

হৈম। কী করব বাবা, টাকা টাকা করে উনি বড়ো অশাস্তি বাধান।

বিশ্বেশ্বর। ঐ দেখো-না, একটা রৌওয়া-ওঠা বাঘের চামড়ার উপর বসে বিড়বিড় করে বকছে। এই ফকির, শুনে যা, বাঁদর। শুনে যা বলছি।

পুষ্প। মেসোমশায়, তোমার বুঝি সাহস হয় না গুকে ওর গণ্ডিটা থেকে টেনে আনতে!

বিশ্বেশ্বর। সত্যি কথা বলি, মা, ভয়-ভয় করে। ওর সব মস্তুর-তন্তুর ঠিক যে মানি তাও নয়, আবার না মানবার মতো বুকের পাটাও নেই। দেখো-না, ওখানটার কিরকম খুদে পাগলা-গারদ সাজিয়েছে। গুরু কবে পাঠা খেয়েছিল, তার মুড়োর খুলিটা রেখেছে পশমের আসনে।

পুষ্প। ঐ জায়গাটাকে ও নাম দিয়েছে মোক্ষধাম। গুরুর সিগারেট-খাওয়া দেশলাই-কাঠিগুলো কাটা কাঁচকলার টুকরোর উপর পুঁতে পুঁতে গণ্ডি বানিয়েছে। ও বলে, কাঠিগুলোর আলো কিছুতেই নেবে না, যার দিবাদৃষ্টি আছে সে চোখ বুজলেই দেখতে পায়। গুরুর একটা চা-সেটের ভাঙা পিরিচ এনেছে, সেটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে গুরুর বর্ষা চুরুটের প্যাকবাক্সে। গুরু ভালোবাসেন সাড়ে আঠারো ডাঙ্গা, কিনে এনে নৈবেদ্য দেয় ঐ পিরিচ ভরে। বলে, ঐ পিরিচে যে পেয়লা ছিল এক কালে, তার অদৃশ্যরূপ গুরুর অদৃশ্য প্রসাদ ঢালতে পাকে। মোক্ষধাম ভরে যায় দ্বাজিলিং চাঘের গন্ধে।

বিশ্বেশ্বর। আচ্ছা মা, ঐ বড়ো বড়ো বোতলগুলো কী করতে সাজিয়ে রেখেছে! ওর মধ্যে গুরুর ফীভার-মিক্সচারের অদৃশ্যরূপ ভরে রেখেছে না কি!

পুষ্প। বল্-না হৈমি, গুগুলো কিসের জন্তে।

হৈম। দক্ষিণা পেলেই গুরু তালপাতার উপর গীতার শ্লোক লিখে সেগুলো জল দিয়ে ধুয়ে দেন। গীতা-ধোওয়া জলে ঐ বোতলগুলো ভরা। তিন সঙ্গে রান করে

তিন চুমুক করে খান। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর রক্তে গীতার বক্তা বয়ে বাজে। আমার সংসার-ধরচের দশ টাকার পাঁচখানা নোট ঐ বক্তায় গেছে ভেসে। বাই, আমার কাজ আছে। [প্রস্থান

বিশ্বেশ্বর। ওরে ও ফকিরে!

পুন্স। আচ্ছা, আমি শুকে নিয়ে আসছি। (কাছের দিকে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে)
ও ফকিরদা, করেছে কী!

ফকির। কেন, কী হয়েছে।

পুন্স। শুক হাঁসের ডিমের বড়া খেয়েছিলেন, তার খোলাটা পড়ে গেছে তোমার চাদর থেকে বারান্দার কোণে।

ফকির। (লাফ দিয়ে উঠে) ঐ, ছি ছি, করেছে কী!

পুন্স। হতভাগা হাঁসটাকে পর্যন্ত বঞ্চিত করলে তুমি! সে তোমার পিছনে পিছনে পঁয়াক পঁয়াক করতে করতে যেত বৈকুণ্ঠধামে— সেখানে পাড়ত স্বর্গীয় ডিম।

ফকির। (বেগিয়ে এসে খোলাটা নিয়ে বারবার মাথায় ঠেকালে) কমা কোরো শুক, কমা কোরো— এ অণু জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের বিগ্রহ; এর মধ্যে আছে চন্দ্র সূর্য, আছে লোকপাল নিকপালরা সবাই। গম্বাকুল দিয়ে ধুয়ে আনিগে।

পুন্স। (চাদর চেপে ধরে) এনো, এখন তোমার বাবার কথাটা শুনে নাও।

[চাদরের খুঁটে ডিম বেঁধে ফকির বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করলে

বিশ্বেশ্বর। বাপু, ভক্তিটা খাটো করে আমার উক্তিটা মানো।

ফকির। কী আদেশ করেন।

বিশ্বেশ্বর। আর-একবার পাগ করবার চেষ্টা করে দেখো।

ফকির। পারব না, বাবা।

বিশ্বেশ্বর। কী পারবি নে। পাগ করতে না পাগ করবার চেষ্টা করতে?

ফকির। চেষ্টা আমার দ্বারা হবে না।

বিশ্বেশ্বর। কেন হবে না।

ফকির। শুকজি বলেন, পাগ পক্ষের অর্থ বহন। প্রথমে পাগ, তার পরেই চাকরি।

বিশ্বেশ্বর। লম্বীছাড়া! কী করে চলবে তোমার। আমার পেন্সনের উপর? আমি কি তোমাকে খাওয়ার জন্যে অমর হয়ে থাকব। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি— তোমার কাছে টাকা চাইতে তোমার লজ্জা করে না? পুরুষমানুষ হয়ে স্ত্রীর কাছে কাঙালপনা!

ফকির। আমি নিজের জন্তে এক পয়সা নিই নে।

বিশ্বেশ্বর। তবে নিম্‌ কার জন্তে।

ফকির। ঠরই সদগতির জন্তে।

বিশ্বেশ্বর। বটে? তার মানে?

ফকির। আমি তো সবই নিবেদন করি গুরুজির ভোগে। তার ফলের অংশ উনিও পাবেন।

বিশ্বেশ্বর। অংশ পাবেন বটে! উনিই ফল পাবেন আঠিসুদ্ধ। ছেলেপুলেরা মরবে শুকিয়ে।

ফকির। আমি কিছুই জানি নে। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে) বা করেন গুরু।

বিশ্বেশ্বর। বেরো, বেরো আমার সামনে থেকে লক্ষীছাড়া বাদর। তোর মুখ দেখতে চাই নে। [প্রস্থান

হৈমবতীর প্রবেশ

ফকির। কা তব কাস্তা—

হৈমবতী। কী বকছ।

ফকির। কা তব কাস্তা। কোন্‌ কান্‌তা ছায়।

হৈমবতী। হিন্দুস্থানী ধরেছ? বাংলায় বলো।

ফকির। বলি, কান্‌দছে কে।

হৈমবতী। তোমারই মেয়ে যিস্ত।

ফকির। হায় রে, একেই বলে সংসার। কান্‌দিয়ে ডাসিয়ে দিলে।

হৈমবতী। কাকে বলে সংসার।

ফকির। তোমাকে।

হৈমবতী। আর, তুমি কী! মুক্তির জাহাজ আমার! তোমরা বাঁধ না, আমরাই বাঁধি!

ফকির। গুরু বলেছেন, বাঁধন তোমাদেরই হাতে।

হৈমবতী। আমি তোমাকে যদি বেঁধে থাকি সাত পাকে, তোমার গুরু বেঁধেছেন সাতার পাকে।

ফকির। মেয়েমানুষ— কী বুঝবে তুমি তত্ত্বকথা! কামিনী কাকন—

হৈম। দেখো, ভণ্ডামি কোরো না। কাকনের দাম তোমার গুরুজি কতখানি বোঝেন সে আমাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আর, কামিনীর কথা বলছ!

ঐ মূৰ্খ কামিনীগুলোই পায়ে ধুলো নিয়ে পায়ে কাঞ্চন যদি না চালিত তা হলে তোমার গুরুজির পেট অত মোটা হত না। একটা ধবর তোমাকে দিয়ে রাখি। এ বাড়ি থেকে একটা মায়া তোমায় কাটবে। কাঞ্চনের বীধন ধসল তোমায়। স্বপুরুষশায় আমাকে দিয়া গালিয়ে নিয়েছেন, আমার মাসহারা থেকে তোমাকে এক পয়সাও আর দিতে পারব না।

পুষ্পর প্রবেশ

পুষ্প। ফকিরদা! মানে কী। তোমার শোবার ঘর থেকে পাওয়া গেল মাণ্ডুক্যোপনিষৎ! অনিবার্য পাচন না কি!

ফকির। (ঈষৎ হেসে) তোমরা কী বুঝবে— মেয়েমানুষ!

পুষ্প। কৃপা করে বুঝিয়ে দিতে ঘোষ কী!

[ফকির হাস্তমুখে নীরব]

হৈম। কী জানি ভাই, ওখানা উনি বালিশের নীচে রেখে রাস্তিরে ঘুমান।

পুষ্প। বেদমন্ত্রগুলোকে তলিয়ে দেন ঘুমের তলায়। এ বই পড়তে গেলে যে তোমাকে ফিরে যেতে হবে সাতজন্য পূর্বে।

ফকির। গুরুকৃপায় আমাকে পড়তে হয় না।

পুষ্প। ঘুমিয়ে পড়তে হয়।

ফকির। এই পুঁথি হাতে তুলে নিয়ে তিনি এর পাতায় পাতায় ফুঁ দিয়ে দিয়েছেন, জলে উঠেছে এর আলো, মলাট ফুঁড়ে জ্যোতি বেরতে থাকে অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে, ঢুকতে থাকে স্রষ্টা নাড়ির পাকে পাকে।

পুষ্প। সেজন্তে ঘুমের দরকার?

ফকির। খুবই। আমি স্বয়ং দেখেছি গুরুজিকে, ছপুরবেলা আহারের পর ভগবদ্গীতা পেটের উপর নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়— গভীর নিদ্রা। স্বাধীন করে দিয়েছেন সাধনায় ব্যাঘাত করতে। তিনি বলেন, ইডাপিজলার মধ্য দিয়ে শ্লোকগুলো অস্তরায়্যায় প্রবেশ করতে থাকে, তার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। অবিশ্বাসীরা বলে, নাক ডাকে। তিনি হাসেন; বলেন, মুচদের নাক ডাকে, ইডাপিজলা ডাকে জানীদের— নাগারজু আর ব্রহ্মরজু ঠিক এক রাস্তায়, যেন চিৎপুর আর চৌরঙ্গী।

পুষ্প। ভাই হৈমি, ফকিরদার ইডাপিজলা আজকাল কী রকম আওয়াজ দিচ্ছে।

হৈম। খুব জোরে। মনে হয়, পেটের মধ্যে তিনটে চারটে ব্যাঙ মরীচা হয়ে উঠেছে।

ফকির। ঐ দেখো, শুনলে পুষ্পদিনি! আশ্চর্য ব্যাপার! সত্যি কথা না কেনেই

মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গুরুজি বলে দিয়েছেন, মাণ্ডুকা উপনিষদের ডাকটাই হচ্ছে ব্যাঙের ডাক। অস্তুরাত্মা চরম অবস্থায় নানীগহ্বরে প্রবেশ করে হয়ে পড়েন কৃপমণ্ডুক, চার দিকের কিছুতেই আর নজর পড়ে না। তখন পেটের মধ্যে কেবলই শিবোহঃ শিবোহঃ শিবোহঃ করে নাড়িগুলো ডাক ছাড়তে থাকে। সেই ঘুমোতে কী গভীর আনন্দ সে আমিই জানি— যোগনিদ্রা একেই বলে।

হৈম। একদিন যিহ্ন কেঁদে উঠে ওর সেই ব্যাঙডাকা ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই তাকে ঘেরে ধুন করেন আর কি।

পুষ্প। ফকিরদা, সংস্কৃতে অনার্স নিয়েছিলুম, আমাকে পড়তে হয়েছিল মাণ্ডুক্যের কিছু কিছু। নাকের মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে হেঁচে হেঁচে ঘুম ভাঙিয়ে রাখতে হত। ইচ্ছির চোটে নিরেট ব্রহ্মজ্ঞানের বারো আনা তরল হয়ে নাক দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। ইড়াপিঙ্গলা রইল বেকার হয়ে। অভাগিনী আমি, গুরুর হুঁয়ের জোরে অজ্ঞানসমুদ্র পার হতে পারলেম না।

ফকির। (ঈষৎ হেসে) অধিকারভেদ আছে।

পুষ্প। আছে বই-কি। দেখো-না, ঐ শাস্ত্রেই ঋষি কোন্-এক শিষ্যকে দেখিয়ে বলেছেন, সোমরাত্মা চতুষ্পাং—এর আত্মাটা চার-পা-ওয়ালা। অধিকারভেদকেই তো বলে দু-পা চার-পায়ের ভেদ। হৈম, রাত্রে তো ব্যাঙের ডাক শুনে জেগে থাকিস, আর কোনো জাতের ডাক শুনিস কি দিনের বেলায়।

হৈম। কী জানি ভাই, যিহ্ন দৈবাৎ ওর মস্তপড়া জলের ঘটি উলটিয়ে দিতেই উনি যে ইঁাক দিয়ে উঠেছিলেন সেটা—

পুষ্প। ইঁ, সেটা চারপেয়ে ডাক। মিলছে এই শাস্ত্রের সঙ্গে।

ফকির। সোহঃ ব্রহ্ম, সোহঃ ব্রহ্ম, সোহঃ ব্রহ্ম।

পুষ্প। ফকিরদা, তপস্তা যখন ভেঙেছিল শিব এসেছিলেন তাঁর বরদাতীর কাছে—তোমার তপস্তা এবার গুটিয়ে নাও; এই দেখো, বরদাতী অপেক্ষা করে আছেন লালপেড়ে শাড়িখানি পরে।

হৈমবতী। পুষ্পদিদি, বরদাতীর জন্তে ভাবনা নেই; পাড় দেখা দিচ্ছে রঙ-বেরঙের।

পুষ্প। বুঝেছি, গেক্ষা রঙের ছটা বুদ্ধি ঘরের দেয়াল পেরিয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে?

হৈমবতী। এরই মধ্যে আসতে আরম্ভ করেছেন দুটি একটি করে বরদাতী। গেক্ষা রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পারে না। পোড়াকপালীদের মরণদণ্ড আর-

কি ! সেদিন এসেছিল একজন বেহারী যেয়ে ঠর কাছে মুক্তিযন্ত্র নেবে ব'লে । হবি তো হ, আমারই ঘরে এসে পড়েছিল— ছুটো-একটা খাটি কথা শুনিরেছিলুম, মুক্তিযন্ত্রেরই কাজ করেছিল, গেল মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে ।

ফকির । দেখো, আমার মাগুকাটা দাও ।

পুন্স । কী করবে ।

ফকির । নারীর হাত লেগেছে, গজাজল দিয়ে ধুয়ে আনিগে ।

পুন্স । সেই ভালো, বুদ্ধি দিয়ে ধোওয়াটা তো হল না এ অয়ে ।

ফকির । শুনে যাও, হৈম । আজকে গুরুগৃহে নবরত্নদান ব্রত । আমি তাঁকে দেব সোনা, একটা গিনি চাই ।

হৈমবতী । দিতে পারব না, স্বপ্নরমণায় পা ছুঁইয়ে বারণ করেছেন ।

পুন্স । তোমার গুরুজির বুকি কাকনে অকচি নেই !

ফকির । তাঁর মহিমা কী বুঝবে তোমরা ! কাকন পড়তে থাকে তাঁর ঝুলির যথো আর তিনি চোখ বুজে বলেন— হং ফট । বাস, একেবারে ছাই হয়ে যায় । যারা তাঁর ভক্ত তাদের এ স্বচক্ষে দেখা ।

পুন্স । ঝুলিতে যদি ছাই ভরবারই ধরকার থাকে, কাঠের ছাই আছে, কয়লার ছাই আছে, সোনার ছাই দিয়ে বোকাষি কর কেন ।

ফকির । হায় রে, এইটেই বুঝলে না ! গুরুজি বলেছেন, মহাদেবের তৃতীয় নেত্রে দৃষ্টি হয়েছিলেন কন্দর্প, সোনার আসক্তি ছাই করতেই গুরুজির আবির্ভাব ধরাধামে । ঝুল সোনার কামনা ভস্ম করে কানে দেবেন স্তম্ভ শোনা, গুরুমন্ত্র ।

পুন্স । আর সঙ্ক হচ্ছে না, চল্ ভাই হৈমি, তোর পড়া বাকি আছে ।

ফকির । সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম ।

পুন্স । (খানিক দূরে গিয়ে ফিরে এসে) রোসো ভাই, একটা কথা আছে, বলে যাই । ফকিরদা, শুনেছি তোমার গুরু আমার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন ।

ফকির । হাঁ, তিনি শুনেছেন, তুমি বেদান্ত পাস করেছ । তিনি আমাকে বলে রেখেছেন, নিশ্চয় তোমাকে তাঁর পায়ে এসে পড়তে হবে, বেদান্ত যাবে কোথায় ভেসে ! সময় প্রায় হয়ে এল ।

পুন্স । বুঝতে পারছি । ক'দিন ধরে কেবলই বী চোখ নাচছে ।

ফকির । নাচছে ? বটে ! ঐ দেখো, অব্যর্থ তাঁর বাক্য । টান ধরেছে ।

পুন্স । কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, ছাই করে দেবার যতো যালমসলা

আমার মধ্যে বেশি পাবেন না। যা ছিল সব পাগ করতে করতে ঘুনিভাসিটির আঁস্তাকুড়ে ভর্তি করে দিয়েছি।

হৈমবতী। কী বলছ ভাই, পুষ্পদ্বিদি! কোন্ ভূতে আবার তোমাকে পেল।

পুষ্প। কী জানি ভাই, দেশের হাওয়ায় এটা ঘটার। বুদ্ধিতে কাপন দিয়ে হঠাৎ আসে যেন ম্যালেরিয়ার গুরুগুরুনি। মনে হচ্ছে, রবি ঠাকুরের একটা গান শুনেছিলুম—

গেক্ষা ফাঁদ পাতা ভুবনে,

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!

ফকির। পুষ্পদি, তুমি যে এতদূর এগিয়েছ তা আমি জানতুম না। পূর্বজন্মের কর্মফল আর কি!

পুষ্প। নিশ্চয়ই, অনেক জন্মের অবুদ্ধিকে দম দিতে দিতে এমন অদ্ভুত বুদ্ধি হঠাৎ পাক ধরে ওঠে— তার পরে আর রক্ষে নেই।

ফকির। উঃ, আশ্চর্য! ধন্য তুমি! সংসারে কেউ কেউ থাকে যারা একেবারেই— কী বলব!

পুষ্প। একেবারে শেষের দিক থেকেই শুরু করে। রবি ঠাকুর বলেছেন—

যখনি জাগিলে বিশ্বে পূর্ণপ্রসূতিত।

ফকির। বা বা, বেশ বলেছেন রবি ঠাকুর— আমি তো কখনো পড়ি নি!

পুষ্প। ভালো করেছ, পড়লে বিপদেই পড়তে। ভাই হৈমি, তোমার সেই মটরদানার ছুনলী হারটা আমাকে দে দেখি। মহাপুরুষদের দর্শনে খালি হাতে যেতে নেই।

হৈম। কী বল, দ্বিদি! ও যে আমার শান্তিতির দেওয়া!

পুষ্প। এ মাহুটিও তো তোমার শান্তিতির দেওয়া, এও সেখানে তুলিয়েছে ওটাও সেখানে যাবে নাহয়।

ফকির। অবোধ নারী, আসক্তি ত্যাগ করো, গুরুচরণে নিবেদন করো যা কিছু আছে তোমার।

পুষ্প। হৈমি, বিশ্বাস করে দাও আমার হাতে, লোকসান হবে না।

ফকির। আহা, বিশ্বাস— বিশ্বাসই সব! আমার ছোটো ছেলের নাম দেব— অমূল্যধন বিশ্বাস।

পুষ্প। হৈমি, ভয় নেই, আমার সাধনা হারাধন ফেরানো। গুরুকৃপায় সিদ্ধিলাভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুরুদ্বার

শিখাশিখাপরিবৃত্ত গুরু। অটাকাল বিলম্বিত পিঠের উপরে। গেকরা চাদরখানা
দুল উদরের উপর দিয়ে বেকে পড়েছে, ঘোলা জলের ঝরনার মতো। ধূপধূনা।
গদির এক পাশে খড়ম, বারা আসছে খড়মকে প্রণাম করছে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে
বলছে— সুরো। গুরু চক্ষু মুদ্রিত, বুকের কাছে দুই হাত জোড়া। মেয়েরা থেকে
থেকে আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছে। দুজন দু পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করছে। অনেকক্ষণ
সব নিস্তব্ধ।

গুরু। (হঠাৎ চোখ খুলে) এই-যে, তোমরা সবাই এসেছ, জানতেই পারি নি।
সিদ্ধিরস্ত সিদ্ধিরস্ত। এখন মন দিয়ে শোনো আমার কথা।

সেবক। মন তো পড়েই আছে গুরুর চরণে।

[শিখাদের হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কান্না

গুরু। আর তোমাদের বড়ো কঠিন পরীক্ষা। মুক্তির সাতটা দরজার মধ্যে
এইটে হল তিনের দরজা। শিবোহং শিবোহং শিবোহং। এইটে কোনোমতে পেরলে
হয়। বাদের ধনের খলি ফেঁপে উঠেছে উহুরি-কপির পেটের মতো, তারা এই সৰু
দরজার দ্বার আটকে, জাঁতাকলের মতো।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এইখানে এসে মুক্তির ইচ্ছেতেই ঘটে বাধা। কেউ বসে পড়ে, কেউ
ফিরে যায়। তার পরে এক দুই তিন, বঁটা পড়ল, বাস্— হয়ে গেল, ডুবল নৌকো,
আর টিকি দেখবার জো থাকে না। ক্রিং ছিং ক্রম্।

সকলে। হায় হায় হায়, হায় হায় হায়!

গুরু। এতকাল আমার সংসর্গে থেকে তোমাদের ধনের লোভ কিছু হান্ধা
হয়েছে যদি দেখি, তা হলে আর যায় নেই। এইবার তবে গুরু হোক। ওহে
চরণদাস, গানটা ধরো।

গুরুপদে মন করো অর্পণ,

চালো ধন তাঁর মূলিতে—

লবু হবে তার, রবে নাকো আর

জবের দোলায় ছলিতে।

হিসাবের খাতা নাড় ব'সে ব'সে,

মহাজনে নের স্বপ্ন কবে কবে—

খাটি যেই জন সেই মহাজনে

কেন থাক হায় ভুলিতে,

দিন চলে যায় টা'কে টাকা হায়

কেবলি খুলিতে ভুলিতে ।

গুরু । কী নিতাই, চূপ করে বসে বসে মাথা চুলকোচ্ছ বে ? মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি ! আচ্ছা, এই নে, পায়ের ধুলো নে ।

নিতাই । তা, গুরু কাছে মিথো কথা বলব না । খুবই ভাবনা আছে মনে । কাল সারারাত ধস্তাধস্তি করে স্বীর বাক্স ভেঙে বাজুবন্দজোড়া এনেছি ।

গুরু । এনেছ, তবে আর ভাবনা কী ।

নিতাই । প্রভো, ভাবনা তো এখন থেকেই । বউ বলেছে, ঘরে যদি ফিরি তবে কাঁটাপেটা করে দূর করে দেবে ।

গুরু । সেজন্তে এত ভয় কেন ।

নিতাই । এ মারটা প্রভুর জানা নেই, তাই বলছেন ।

গুরু । নারদসংহিতায় বলে, দাম্পত্যকলহে চৈব— ঝগড়া হুদিনে যাবে মিটে ।

নিতাই । ঐ নারীটিকে চেনেন না । সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে মেলেন না । নাম দিয়েছি হিড়িম্বা । তা, বরঞ্চ যদি অহুমতি পাই তা হলে দ্বিতীয় সংসার করে শাস্তিপুরে বাসা বঁধব ।

গুরু । দোষ কী ! বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিরা বলেছেন, অধিকন্তু ন দোষায় । সেইরকম দৃষ্টান্তও দেখিয়েছেন । পুরুষের পক্ষে স্বী গৌরবে বহুবচন ।

মাধব । তার মানে একাই এক সহস্র ।

গুরু । উণ্টো । আধ্যাত্মিক অর্থে পুরুষের পক্ষে এক সহস্রই একা । বড়ো বড়ো সজ্জন কুলীন বহু কণ্ঠে তার প্রমাণ দিয়েছেন । সেই জন্তেই এ দেশকে বলে পুণ্যভূমি— পুণ্যবিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্রান্তি নেই ।

মাধব । আহা, এ দেশের আধ্যাত্মিক বিবাহের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আর কখনো শুনি নি ।

গুরু । কী গো বিপিন, প্রস্তুত তো ? যেমন বলেছিলুম, কাল তো সারারাত জপ করেছিলে— সোনা মিথো, সোনা মিথো, সব ছাই, সব ছাই ?

বিপিন । অপেছি । মোহরটা আরো যেন তারার মতো জল জল করতে লাগল

যনের মতো। (গুরু পা জড়িয়ে ধরে) প্রহু, আমি পাপিষ্ঠ, এবারকার মতো মাপ করো, আরো কিছুদিন সময় দাও।

গুরু। এই যে! যোলো, যোলো দেখছি। সর্বনাশ হল। দিতে এসে কিরিয়ে নেওয়া, এ যে গুরুর ধন চুরি করা! (ঝুলি এগিয়ে দিয়ে) ফেল, ফেল বলছি, এখন ফেল।

[বিপিন বহু কষ্টে কম্পিত হস্তে ক্রমাল থেকে মোহর খুলে নিয়ে ঝুলিতে ফেলল এইবার সবাই মিলে বলো দেখি,—

সোনা ছাই, সোনা ছাই, সোনা ছাই।

নাহি চাই, নাহি চাই, নাহি চাই।

নয়ন মুদিলে পরে কিছু নাই, কিছু নাই, কিছু নাই।

[সকলের চীৎকার করে আবৃত্তি

এই-যে, মা তারিণী! এস এস, এই নাও আশীর্বাদ। তোমার ভাবনা নেই, তুমি অনেক দূরে এগিয়েছ। তোমরা মেয়েমানুষ, তোমাদের সরল ভক্তি, দেখে পুরুষদের শিকার হোক।

[তারিণী পায়ের কাছে এক জোড়া বালা রেখে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে রাখল (গুরু হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে) গুরুভার বটে—বন্ধনটা বেশ একটু চাপ দিয়েছিল বনটাকে। থাকগে, এত দিনে হাতের বেড়ি তোমার খসল। লোহার বেড়ির চেয়ে অনেক কঠিন—ঠিক কিনা, মা?

তারিণী। খুব ঠিক, বাবা। মনে হচ্ছে, ঝানিকটা মাংস কেটে নিলে।

গুরু। মাংস নয়, মাংস নয়, মোহপাশ। গ্রহি এই সব আশ্রয় হতে গুরু করল, তার পরে ক্রমে ক্রমে—

তারিণী। না বাবা, আর পারব না। মেয়ের বিয়ের অন্তে পাণ্ডির আমলের গমনাগুলি বন্ধ করে রেখে দিয়েছি।

গুরু। (থলির মধ্যে বালাজোড়া ফেলে দিয়ে) আচ্ছা আচ্ছা, এখনকার মতো এই পর্যন্তই থাক। তোমরা বলো সবাই—সোনা ছাই ইত্যাদি।

[সকলের আবৃত্তি

আরে বলদেও, ক্যা খবর?

বলদেও। (পায়ের কাছে হাজার টাকার নোট রেখে) খবর আধমে দেখে, লিখিয়ে হজরৎ।

গুরু। ভাল ভাল, মিল তো খুশ হার?

বলদেও। পহেলা তো বহুৎ ঘবড়া গিয়া থা। রাত ভর মেরে জীবাখানেসে হাজারো দফে বাতায় লিয়া কি, কুছ্ নেই, কুছ্ নেই, ইয়ে তো প্রেফ কাগজ ছায়, হাওয়াসে চলা জাতা, আগসে জল্ জাতা, পানীমেসে গল্ জাতা, ইস্কো কিম্বৎ কোড়িসে ভি কমতি ছায়। লিকেন আখারাম সারা বধৎ ঘড়বড় করুতে থে। মেরে ঐগি বুদ্ধি লগি যে ইয়ে কাগজ তো গুরুজিকে পাও পর ডারনেকে লায়েক একদম নেই ছায়—ইস্কে দো এক রূপৈয়া ভি অচ্ছি ছায়। পিছে ফকিরমে দো লোটো ভর ডাঙ ঘব পী লিয়া, তব সব ছরন্ত হো গয়া। মেরে দিল হাজা হো গয়া ইয়ে কাগজকা মাকিক।

গুরু। জীতা রহো বাবা, পরমাত্মা তুঝকো ভালা করে। বলো সবাই—

নোটগুলো সব বুটো, সব বুটো, সব বুটো—

ওরা সব খড়কুটো, খড়কুটো, খড়কুটো—

ছাই হয়ে উড়ে যাবে মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো, মুঠো মুঠো।

[সকলের আবৃত্তি]

গুরু। আজ ফকিরকে দেখছি নে যে বড়ো।

বলদেও। এক ঔরৎ ফকিরচাঁদজিকে আপনি সাথ লেকে আয়ি ছায়। নয়া আদমি, হযারা মালুম দিয়া কি ভিতর আকে চিন্নায়েগি—ইস্বাস্তে দোনোকো বাহার খাড়া রখা ছায়। হকুম মিন্‌নেসে লে আয়গা।

গুরু। কী সর্বনাশ! ঔরৎ! আরে নিয়ে আয়, নিয়ে আয়, এখনি নিয়ে আয়। এইখানে একটা ভালো আসন পেতে দে, মেয়েটা হাতছাড়া না হয়!

ফকিরের সঙ্গে পুস্পর প্রবেশ

গুরু। এস এস, মা, এস। মুখ দেখেই বুঝছি, দৈববাণীর বাহন হয়ে এসেছ।

পুস্প। ভুল বুঝছেন। আমি ছাই ফেলবার ভাড়া কুলো হয়েই এসেছি। এই আমার সঙ্গে যাকে দেখছেন, এত বড়ো বিপুল ছাইয়ের গাদা কোম্পানির মুহুরে আর পাবেন না। কোনোদিন ঔর মধ্যে পৈত্রিক সোনার আভাস হয়তো কিছু ছিল— গুরুয় আশীর্বাদে চিরুয়াত্রই নেই।

গুরু। এসব কথার অর্থ কী।

পুস্প। অর্থ এই যে, ঐর বাপ ঐকে ত্যাগ করেছেন, ইনি ত্যাগ করতে যাচ্ছেন ঐর স্ত্রীকে। এক পরসার সম্বল ঐর নেই। শুনেছি, আপনার এখানে সকলরকম আবর্জনারই স্থান আছে, তাই রইলেন ইনি আপনার ত্রিপাদপদ্মে।

ফকির। ঠ্যা, এসব কথা কী বলছ, পুন্সদি। ঐ তো, সোনার হারগাছা নিয়ে আসা গেল— গুরুচরণে রাখবে না ?

পুন্স। রাখব বৈকি। (গুরু হাতে দিয়ে) তৃপ্ত হলেন তো ?

গুরু। (হারখানা হাতে নিয়ে ওজন আন্দাজ করে) আমার অতি যৎসামান্তেই তৃপ্তি। পত্রং পুন্সং ফলং তোয়ং।

ফকির। তুল করবেন না প্রভু, ওটা আমারই দান।

পুন্স। তুল ভাঙানো জরুরি দরকার, নইলে আসন্ন বিপদ। ওর বাবা বিশ্বেশ্বরবাবু পুলিশে খবর দিয়েছেন, তাঁর হার চুরি গেছে। খানাতল্লাসি করতে এখনি আসছে যথলুগৎয়ের বড়ো দারোগা দ্বিকুদ্দিন সাহেব।

গুরু। (দাঁড়িয়ে উঠে) কী সর্বনাশ !

পুন্স। কোনো ভয় নেই, এখনি সোনাগুলোকে ভস্ম করে ফেলুন, পুলিশের উপর সেটা প্রকাণ্ড একটা কানমলা হবে।

গুরু। (কাতরস্বরে) বলদেও !

বলদেও। (লাঠি বাগিয়ে) কুছ পরোয়া নেই, ভগবান। আপ তো পরমাত্মা হো, আপকো হকুমসে হয় লড়াই করেছে।

মধুর। গুরুজি, ওর ভরসায় থাকবেন না। ওর ভাঙের নেশা এখনো ভাঙে নি। লালপাগড়ি দেখলেই যাবে ছুটে। আপাতত আপনি দৌড় দিন। কী জানি, এই নোটখানা পরমাংমার ভরসায় ওর কোন্ মনিবের বাক্স ভেঙে নিয়ে এসেছে !

গুরু। ঠ্যা, বল কি মধুর। পালাব কোথায়। ওরা যে আমার বাসায় ঠিকানা জানে। এখন এই কুলিটা তোমরা কে রাখবে।

সকলে। কেউ না, কেউ না।

তারিণী। আমার বাল। জোড়া ফিরিয়ে দাও।

গুরু। এখনি, এখনি। আর বলদেও, তোমার নোটখানা ভূষি নাও, বাবা।

বলদেও। অহুতি তো নেই সকেছে। পুলিশ চলা জানেসে পিছে লেউকা।

পুন্স। আচ্ছা, আমারই হাতে কুলিটা দিন। পুলিশের কর্তার সঙ্গে পরিচয় আছে। যার যার জিনিস সবাইকে ফিরিয়ে দেব।

মধুর। ওরে বাস্ রে, স্পাই রে স্পাই। কারও রক্স নেই আজ।

গুরু। স্পাই ! সর্বনাশ ! (উর্ধ্বশ্বাসে) চললুম আমি। মোটরটা আছে ?

একজন। আছে।

ফকির। (পারে ধ'রে) প্রভো, আমি কিন্তু ছাড়ছি নে তোমার মথ।

শুক্র। দূর দূর দূর। ছাড়, ছাড় বলছি। লক্ষীছাড়া! হতভাগা!
ফকির। তা, আমার কী দশা হবে! আমার কোথায় গতি!
শুক্র। তোমার গতি গো-ভাগাড়ে।

[দ্রুত প্রস্থান]

বিপিন। মা গো, ঐ ঝুলির মধ্যে আমার আছে মোহরটা।

নিতাই। আর, আমার আছে বাজুবন্দ।

পুষ্প। এই নাও তোমরা।

সকলে। তুমিই রক্ষা করলে মা, ধড়ে প্রাণ এল।

বলদেও। মাইজি, উয়ো নোট হমকো দে দীজিয়ে। আফিস্কে বধৎমে খোড়ি
দেয় হায়।

পুষ্প। এই নাও, ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেবে তো?

বলদেও। শুক্র। পরমাত্মাজি তো ফেরার হো গয়া, ছুস্কা লেনেওয়ানো কোই
হায় নেই সওয়ায় মনিব ঔর ডাকু। মালুম থা কি নোট ভস্ম হো জায়গা, উস্কা পস্তা
নহি মিলেগা, যেরা পুণ্য ঔর পুলিশকী ডাণ্ডা কদক্ রহেগা। অতি দেখ্তা হঁ কি
হিসাবকি খোড়ি গলতি থী। হর হর, বোম্ বোম্।

[প্রস্থান]

পুষ্প। ফকিরদা, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছ কী। শুক্র পদধূলি তো আঠারো
আনা মিলেছে। এখন ঘরে চলো।

ফকির। ধাব না।

পুষ্প। কোথায় যাবে।

ফকির। রাস্তায়।

পুষ্প। আচ্ছা বেশ, ছান্দোগাটা তো নিয়ে আসতে হবে!

ফকির। সে আমার সঙ্গে আছে।

পুষ্প। কিন্তু, তোমার শুক্র?

ফকির। রইলেন আমার অন্তরে।

পুষ্প। আর, ডিমের খোলাটা?

ফকির। সে ঝুলছে গামছায় বীণা বুকের কাছে।

[প্রস্থান]

পুষ্প। (পিছন থেকে) সোয়মাত্মা চতুশ্চাং।

হৈমর প্রবেশ

পুন্স । বিশ্বাস করতে পারিস নে বুঝি ? এই নে তোরা হার ।

হৈম । আর, অণ্ডি ?

পুন্স । এখনকার মতো চার পা ভুলে সে বেড়া ভিড়িয়েছে ।

হৈম । তার পর ?

পুন্স । লম্বা দড়ি আছে ।

হৈম । আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে ।

পুন্স । তুই হাঁটমাউ করিস নে তো । চতুর্দশ একটু চরে বেড়াক-না !

হৈম । উনি ছানোগা নিয়ে যখন বেরলেন তখনি বুকলুম, কিরবেন না । মণ্ডুক
মানে ব্যাঙ বুঝি, তাই ?

পুন্স । হা ।

হৈম । উনি আজকাল বলতে আরম্ভ করেছেন, মানুষের আত্মা হচ্ছে ব্যাঙ ।
সেই পরম ব্যাঙ যখন অন্তরে কুড়ুর কুড়ুর করে ডাকে তখনি বোঝা যায়, সে
পরমানন্দে আছে ।

পুন্স । তাই হোক-না, ওর আত্মা দেশে বিদেশে ভেঁকে বেড়াক, তোরা আত্মা-
ব্যাঙ এখন কিছুদিনের মতো ঘুমিয়ে নিক ।

হৈম । মনটা যে হ হ করবে, তার চেয়ে ব্যাঙের ডাক যে ভালো ।

পুন্স । ভয় নেই, আনব তোরা মাণ্ডুককে ফিরিয়ে ।

তৃতীয় দৃশ্য

বগ্নীচরণ । পুন্স

বগ্নী । যা, শরণ নিলুম তোমার ।

পুন্স । খবর নিয়েছি পাড়ায়, তোমার নাতি মাখন পলাতক সাত বছর থেকে—
সংসারের ছনলা বন্ধুক লেগেছে তার বুক, দুঃখ এখনো ভুলতে পারে নি । একটা বিয়ে
করলে পুন্সের পা পড়ে না মাটিতে, তোলা থাকে স্বীর মাথার উপরে ; আর, দুটো
বিয়ে করলেই ছুজোড়া মল বাজতে থাকে ওদের পিঠে, শিরদাঁড়া যায় বেকে ।

বগ্নী । কী না জান তুমি, যা । নবগ্রাম থেকে আরম্ভ করে মন্সুগঞ্জ পর্যন্ত সব

কটা গা যে তুমি জিতে নিয়েছ। বিধাতাপুত্র নিষ্ঠুর, তাই তোমায় মোল্যাম করতে হয় তাঁর শাসন।

পুষ্প। না জ্যাঠামশায়, বাড়িয়ে বোলো না। আমি যজ্ঞ দেখতে বেরিয়েছি— ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারম থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিম্পিস করতে থাকে মানুষের হাত দুটো। এ না হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।

ষষ্ঠী। না মা, সবই অদৃষ্ট। হাতে হাতে দেখো-না! বড়ো বৌয়ের ছেলেপুলের দেখা নেই। ভাবলেম, পিতৃপুত্র পিতৃ না পেয়ে শুকিয়ে মরবেন বৈতরণীতীরে। ধ'রে বেঁধে দিলেম মাখনের দ্বিতীয় বিয়ে, আর সবুর সইল না, দেখতে দেখতে পরে পরে দুই পক্ষেরই কল্যাণে চারটি মেয়ে তিনটি ছেলে দেখা দিল আমার ঘরে।

পুষ্প। এবারে পিতৃপুত্রের অজীর্ণ রোগের আশঙ্কা দেখছি।

ষষ্ঠী। মা, তোমার সব ভালো, কেবল একটা বড়ো খটকা লাগে— মনে হয়, তুমি দেবতা ব্রাহ্মণ মানই না।

পুষ্প। কথাটা সত্য।

ষষ্ঠী। কেন মা, ঐ খুঁটুকু কেন থেকে যায়।

পুষ্প। সংসারে দেবতাব্রাহ্মণের অবিচারের বিকল্পেই যে লড়াই করতে হয়, ওদের মানলে জোর পেতুম না। সে কথা পরে হবে, আমি মাখনের খোঁজেই আছি।

ষষ্ঠী। জান তো মা, ও কিরকম হো হো করে বেড়াতে— কেবল খেলাধুলো, কেবল ঠাট্টাতামাসা। ভয় হত, কোথায় কী করে বসে! তাই তো ওর গলায় একটা নোঙরের পর আর-একটা নোঙর ঝুলিয়ে দিলুম।

পুষ্প। নোঙর বেড়েই চলল, ভায়ে নৌকো ভলিয়ে যাবার জো। আমি তোমাদের পাড়ায় এসেছি হৈমির খবর নেয়ার জন্যে। শুনলুম, সে তোমার এখানেই আছে।

ষষ্ঠী। হাঁ মা, এতদিন আমি ছিলাম নামেই বামা। তার বিয়ের পর থেকে এই তাকে দেখলুম। বুক জুড়িয়ে গেল তার মধুর স্বভাবে। তারও স্বামী পালিয়েছে। হল কি বলো তো! কন্‌গ্রেসওয়ালারা এর কিছু করে উঠতে পারলে না?

পুষ্প। মহাত্ম্যটিকে বললে এখনি তিনি ঘেরেদের লাগিয়ে দেবেন অসহযোগ আন্দোলনে। দেশে হাতাবেড়ির আওরাজ একেবারে হবে বন্ধ। গলির ঘোড়ে গুলু ময়রার দোকানে তেলে-ভাজা ফুলুরি পেয়ে বাবুদের আপিসে ছুটতে হবে— ছদ্ম বাদেই সিক্‌লীভের দরখাস্ত।

ষষ্ঠী। ও সর্বনাশ!

পুষ্প। ভয় নেই, যেয়েদের হয়ে আমি মহাশয়জিকে দরবার জানাব না। বরঞ্চ স্রবি ঠাকুরকে ধরব, যদি তিনি একটা প্রহসন লিখে দেন।

বটী। কিন্তু, স্রবি ঠাকুর কি আজকাল লিখতে পারে। আমার জ্ঞানার কাছে—

পুষ্প। আর বলতে হবে না। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু ভাবনা নেই, লেখকাজ ঢের জুটে গেছে। ষাটশ আদিত্য বললেই হয়।

বটী। বরঞ্চ লিখতেই যদি হয়, আমি তো মনে করি, আজকাল মেয়েরা ঘেরকম—

পুষ্প। অসহ, অসহ। জামা শেমিজ পরার পর থেকে ওদের লজ্জা পরম সব গেছে।

বটী। সেদিন কলকাতায় গিয়েছিলুম; দেখি, মেয়েরা ট্রামে বাসে এমনি ভিড় করেছে—

পুষ্প। যে পুরুষ বেচারারা খালি গাড়ি পেলেও নড়তে চায় না। ও কথা থাক্কে—মাথনের জন্তে ভেবো না।

বটী। সেই ভালো, তোমার উপরেই ভাব রইল।

[বটীর প্রস্থান]

হৈমর প্রবেশ

হৈম। শুনলুম তুমি এসেছ, তাই তাড়াতাড়ি এসুম।

পুষ্প। খুতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, তাই গাড়ারী চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ সাজলেন। তোমারও সেই মন। স্বামী এস বেরিয়ে রাস্তায়, স্বী এস বেরিয়ে স্বামীর বাড়িতে।

হৈম। মন টেকে না তাই, কী করি! তুমি বলেছিলে, হারাধন কিরিয়ে আনবে।

পুষ্প। একটু সবুর করো— ছিপ ফেলতে হয় সাবধানে; একটা ধরতে বাই, দুটো এসে পড়ে টোপ গিলতে।

হৈম। আমার তো দুটোতে দরকার নেই।

পুষ্প। ঘেরকম দিন কাল পড়েছে, দুটো একটা বাড়তি হাতে রাখা ভালো। কে জানে কোন্টা কখন কস্কে যাব।

হৈম। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। দেখলুম কাগজে তোমার নাম দিয়ে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে—

পুষ্প। হ্যাঁ, সেটা আমারই কীর্তি।

হৈম। তাতে লিখেছ, প্রাইভেট সিনেমায় সেতুবন্ধ নাটকের সঙ্গে লোক চাই, হুমানের পার্ট অভিনয় করবে। তোমার আবার সিনেমা কোথায়।

পুষ্প। এই তো চার দিকেই চলচ্ছবির নাট্যশালা, তোমাদের সবাইকে নিয়েই।

হৈম। তা যেন বুঝলুম, এর মধ্যে হুমানের অভাব ঘটল কবে থেকে।

পুষ্প। মল পুত্র আছে ঘরে ঘরে। একটা পাগলা পালিয়েছে লেজ তুলে, ডাক দিচ্ছি তাকে।

হৈম। সাড়া মিলেছে?

পুষ্প। মিলেছে।

হৈম। তার পরে?

পুষ্প। রহস্য এখন ভেদ করব না।

হৈম। যা খুলি কোরো, আমার প্রাণীটিকে বেশি দিন ছাড়া রেখো না। ঐ কে আসছে ভাই, দাড়িগোঁফঝোলা চেহারা—ওকে তাড়িয়ে দিতে বলে দিই।

পুষ্প। না না, তুমি বরঞ্চ যাও, আমি ওর সঙ্গে কাজ সেরে নিই।

[হৈমের প্রস্থান]

সেই লোকের প্রবেশ

পুষ্প। তুমি কে?

সেই লোক। সেটা প্রকাশের যোগ্য নয় গোড়া থেকেই, জন্মকাল থেকেই। আমি বিধাতার কুকীৰ্তি, হাতের কাজের যে নমুনা দেখিয়েছেন তাতে তাঁর সুনাম হয় নি।

পুষ্প। মন্দ তো লাগছে না!

সেই লোক। অর্থাৎ মজা লাগছে। ঐ স্তূপেই বেঁচে গেছি। প্রথম খাড়াটা সামলে নিলেই লোকের মজা লাগে। লোক হাসিয়েছি বিস্তর।

পুষ্প। কিন্তু, সব জায়গায় মজা লাগে নি।

সেই লোক। খবর পেয়েছ দেখছি। তা হলে আর লুকিয়ে কী হবে। নাম আমার শ্রীমাখনচন্দ্র। বুঝতেই পারছ, রাজ্যের দলের সরকারি গৌরবদাড়ি পরে এসেছি কেন। এ পাড়ায় মুখ দেখাবার সাহস নেই, পিঠ দেখানোই অভ্যাস হয়ে গেছে।

পুষ্প। এলে যে বড়ো?

মাখন। চলেছিলুম নাজিরপুরে ইলিশ মাছ ধরার দলে। ইস্টেবনে দেখি বিজ্ঞাপন,

হুজুমানের দরকার। রইল পড়ে জেলগিরি। জেলেরা ছাড়তে চায় না, আমাকে ভালোবাসে। আমি বললুম, ভাই, এদের বিজ্ঞাপনের পরসা যেবাক লোকসান হবে আমি যদি না যাই— আর দ্বিতীয় মাহুদ নেই বার এত বড়ো যোগ্যতা। এ তো আর জেতাযুগ নয়।

পুন্স। খাওয়াপরা কিছু টানাটানি পড়েছে বুঝি ?

মাখন। নিতান্ত অসহ্য হয় নি। কেবল যখন ধনেশাক দিয়ে ডিমগুয়াল কই যাচ্ছের ঝোলের গন্ধবুত্তি অস্তরাত্মার মধ্যে পাক খেয়ে ওঠে, তখন আমার শ্রীমতী বায়া আর শ্রীমতী ভবলার তেরেকেকেটে মেরেকেকেটে ভিড়কুটি মিড়কুটির তালে তালে দূর থেকে মন কেমন ধড়্‌ ধড়্‌ করতে থাকে।

পুন্স। ভাই বুঝি ধরা দিতে এসেছ ?

মাখন। না না, মনটা এখনো তত দূর পর্যন্ত শক্ত হয় নি। শেষে বিজ্ঞাপনদাতার ধবর নিতে এসে যখন দেখলুম, ঠিকানাটা এই আড়িনারই সীমানার মধ্যে তখন প্রথমটা ভাবলুম বিজ্ঞাপনের মান রক্ষা করব, দেব এক লক্ষ। কিন্তু, রইলুম কেবল মজার লোভে। পণ করলুম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। দ্বিধি আমার, কেমন সন্দেহ হচ্ছে, কোনো সূত্রে বুঝি আমাকে চিনতে, নইলে এমন বিজ্ঞাপন তোমার মাথায় আসত না।

পুন্স। তোমার আঁচিলগুয়াল নাকের খ্যাতি পাড়ার লোকের মুখে মুখে। তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক ছবার তৈরি হতে পারে না— ছাঁচ তিনি মনের কোন্ডে ভেঙে কেলেকেন।

মাখন। এই নাকের জোরে একবার বেঁচে গিয়েছি, দ্বিধি। মটকগঞ্জে চুরি হল, সন্দেহ করে আমাকে ধরলে চৌকিদার। দারোগা বুদ্ধিমান ; সে বললে, এ লোকটা চুরি করবে কোন্ সাহসে— নাক লুকোবে কোথায়। বুকেছ দ্বিধি ? আমার এ নাকটাতে ঠাড়াবির ব্যাবসা চলে, চোবের ব্যাবসা একেবারে চলে না।

পুন্স। কিন্তু, তোমার হাতে যে কলার ছড়াটা দেখছি ওটা তো আমার চেনা, কোনো ফিকিরে তোমার জুড়ি-অন্নপূর্ণার ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছ।

মাখন। অনেক দিনের পেটের জালায় ওদের ঠাড়ারে চুরি পূর্বে থেকেই অভ্যাস আছে।

পুন্স। এত বড়ো কাঁদি নিয়ে করবে কী। হুজুমানের পালার তালির দেবে ?

মাখন। সে তো ছেলেবেলা থেকেই দিচ্ছি। পথের মধ্যে দেখলুম এক ব্রহ্মচারী বসে আছেন পাকুড়লার। আমার বদ অভ্যাস, হাসাতে চেষ্টা করলুম— ঠোঁটের

এক কোণও নড়াতে পারলুম না, মস্তুর আউড়েই চলল। ভয় হল, বুঝি ব্রহ্মদত্তি হবে। কিন্তু, মুখ দেখে বুঝলুম উপোষ করতে হতভাগা তিথিবিচার করেছে না। ওর পাঞ্জিতে তিনটে চারটে একাদশী একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বাবাজি, থাকে কিছু? কপালে চোখ তুলে বললে, গুরুর কৃপা যদি হয়। মাঝে মাঝে দেখি মাথার নীচে পুঁথি রেখে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছেন, ডাকের শব্দে ও গাছের পাখি একটাও বাকি নেই। নাকের সামনে রেখে আসব কলার ছড়াটা।

পুন্প। লোকটার পরিচয় নিতে হবে তো।

মাখন। নিশ্চয় নিশ্চয়। হাসতে হাসতে পেট ফেটে যাবে, আমার চেয়ে মজা।

পুন্প। ভালো হল। হুমানের সঙ্গে অঙ্গদ চাই। ওকে তোমারই হাতে তৈরি করে নিতে হবে। শেওড়াফুলির হাট উজাড় করে কলার কাঁদি আনিবে নেব।

মাখন। শুধু কলার কাঁদির কর্ম নয়।

পুন্প। তা নয় বটে। যে কারখানায় তুমি নিজে তৈরি সেখানকার ছই-চাকা-ওয়াল যন্ত্রের তলায় ওকে ফেলা চাই।

মাখন। দয়াময়ী, জীবের প্রতি এত হিংসা ভালো নয়।

পুন্প। ভয় নেই, আমি আছি, হঠাৎ অপঘাত ঘটতে দেব না। আপাতত কলার ছড়াটা ওকে দিয়ে এস।

মাখন। আমাদের দেশে মেঘেরা থাকতে সন্ধ্যাসী না খেয়ে মরে না। কিন্তু, ও লোকটা ভুল করেছে— বৈরাগির ব্যবসা ওর নয়, ওর চেহারাও জলুম নেই। নিতান্ত নিজের স্ত্রী ছাড়া ওর খবরদারি করবার মানুষ মিলবে না।

পুন্প। তোমার অমন চেহারা নিয়ে তুমি ছ বছর চালালে কী করে।

মাখন। ময়রার দোকানে মাছি তাড়িয়েছি, পেয়েছি বাসি লুচি তেলে-ভাজা, যার খন্দের জোটে না। যাত্রার দলে ভিড়ি সেজেছি, ভাল খেতে দিয়েছেন অধিকারী মুড়কি আর পচা কলা। সুবিধে পেলেই মা বাসি পাতিয়ে মেয়েদের পাচালি গুনিয়ে দিয়েছি যখন পুষ্করী কাছে চলে গেছে—

ওরে ভাই, জানকীরে দিয়ে এস বন—

ওরে রে লক্ষণ এ কী কুলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।

মা-জননীদেব ছই চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা করেছে— ছ-চার দিনের সঞ্চয় নিয়ে এসেছি। আমাকে ভালোবাসে সবাই। জ্যাঠাইমা আমার যদি দুটো বিয়ে না দিত তা হলে চাই কি আমার নিজের স্ত্রীও হয়তো আমাকে ভালোবাসতে পারত। বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমারও কেমন অল্পেতেই মন গলে যায়। এই দেখো-না,

এখন তোমাকে মা-অজ্ঞনা বলতে ইচ্ছে করছে।

পুন্স। সেই ভালো, আমার নাতির সংখ্যা বেড়ে চলেছে, দিদির পদটা বড় বেশি ভারী হয়ে উঠল। আচ্ছা, জিগেস করি, তোমার মনটা কী বলছে।

মাখন। তবে মা, কথাটা খুলে বলি। অনেক দিন পরে এ পাড়ার কাছাকাছি আসতেই প্রথম দিনেই আমার বিপদ বাধল ফোড়নের গছে। সেদিন আমাদের রান্নাঘরে পাঠা চড়েছিল— সত্যি বলি, বড়ো বোয়ের মুখ খারাপ, কিন্তু রান্নার গুন্ন হাত ভালো। সেদিন বাতাস শুঁকে শুঁকে বাড়ির আনীচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছি সারাদিন। তার পর থেকে অর্ধভোজনের টানে এ পাড়া ছাড়া আমার অসাধ্য হল। বারবার মনে পড়ছে, কত দিনের কত গালমন্দ আর কত কাঁটাচকড়ি। একদিন দিবি গেলেনি, এ বাড়িতে কোনোদিন আর ঢুকব না। প্রতিজ্ঞা ভেঙেছি কাল।

পুন্স। কিসে ভাঙালো।

মাখন। ভালের বড়ার গছে। দিনটা ছটকট করে কাটানুম। রাত্তিরে যখন সব নিশুতি, বাইরে থেকে ছিটকিনি খুলে ঢুকলুম ঘরে। খুঁট করে শব্দ হতেই আমার ছোটোটি এক হাতে পিদিম এক হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। মুখে মেখে এসেছিলুম কালি, আমি হা করে দাঁত দাঁচিয়ে হাউমাউখাউ করে উঠতেই পতন ও মূর্ছা। বড়ো বো একবার উকি মেয়েই দিল দোড়। আমি রয়ে বসে পেট ভরে আহা করি ধামাসুদ্ধ বড়া নিয়ে এলুম বেরিয়ে।

পুন্স। কিছু প্রসাদ রেখে এলে না পতিব্রতাদের জন্যে?

মাখন। অনেকখানি পায়ের ধুলো রেখে এসেছি, আর বড়াগুলো নিয়ে এসেছি মলবলকে ধাইয়ে দিতে।

পুন্স। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি বলবে?

মাখন। দেখো মা, বিপদে না পড়লে আমি কখনো মিথ্যে কথা কই নে।

পুন্স। লোকে বলে, তুমি কাশীতে গিয়ে আরও একটা বিয়ে করেছ।

মাখন। তা করেছি।

পুন্স। পিঠ ফুড় ফুড় করছিল?

মাখন। না মা, দুটো বিয়ে কাকে বলে হাড়ে হাড়ে জেনেছি। তারি ইচ্ছা হল, একটা বিয়ে কী রকম বরবার আগে জেনে নেব।

পুন্স। জেনে নিয়েছ সেটা?

মাখন। বেশি দিন নয়। ভাগ্যবতী কিনা, পুণ্যকলে যারা মেল সকাল-সকাল, যারী বর্তমানেই। ঘোষটা সব খুলেছে যাত্র। কিন্তু ভালো কীরে মুখ ফোটবার

তখনো সময় হয় নি। বেঁচে থাকলে কপালে কী ছিল বলা যায় না।

পুন্স। কার কপালে ?

মাখন। শকু কথ।

চতুর্থ দৃশ্য

নিজাময় ফকির। মুখের কাছে একছড়া কলা। আগে উঠে কলার ছড়া

তুলে নেড়েচেড়ে দেখল

ফকির। আহা, গুরুদেবের কৃপা। (ছড়াটা মাথার ঠেকিয়ে চোখ বুজে)
শিবোহং শিবোহং শিবোহং। (একটা একটা করে গোটা দশেক খেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস
ছেড়ে) আঃ!

মাখনের প্রবেশ

মাখন। কী দাদা, ভালো তো! আমার নাম শ্রীমাখনানন্দ।

ফকির। গুরু চরণ ভরসা।

মাখন। গুরুই খুঁজে মরছি। সঙ্গুরু মেলে না তো। দয়া হবে কি। নেবে
কি অভাজনকে।

ফকির। ভয় নেই, সময় হোক আগে।

মাখন। (কারার স্বরে) সময় আমার হবে না প্রভু, হবে না। দিন যে গেল!
বড়ো পাপী আমি। আমার কী গতি হবে।

ফকির। গুরুপদে মন স্থির করো— শিবোহং।

মাখন। এই পদেই ঠেকল আমার ভরী; যম তা হলে ভরে কাছে ঘেঁষবে না।

ফকির। তোমার নিষ্ঠা দেখে বড়ো সন্তুষ্ট হলাম।

মাখন। শুধু নিষ্ঠা নয় গুরু, এনেছি কিছু ভালের বড়া। তালগাছটা স্বস্তি উদ্ধার
পাক।

ফকির। (ব্যগ্রভাবে আহ্বার) আহা, স্বস্তি বটে। ভক্তির দান কিনা।

মাখন। সার্থক হল আমার নিবেদন। বাড়ির ঐয়ারা খবর পেলেন কী খুশিই
হবেন! বাই, ওদের সংবার পাঠিয়ে দিইগে, ওরা আরও কিছু হাতে নিয়ে
আসবেন।— প্রভু, গৃহার্জনে আর কি করবেন না।

ফকির। আর কেন। গুরু বলেন, বৈরাগ্যং এবং ভয়ং।

মাখন। গৃহী আমি, তাইনে বায়ে মায়া-মাকড়সানি জড়িয়েছে আপাদমস্তক।
ধনদৌলতের সোনার কেলাটা কত বড়ো ফাঁকি সেটা খুব করেই বুকে নিয়েছি। বুকেছি
সেটা নিছক স্বপ্ন। ভগবান আমাকে অকিঞ্চন করে পথে পথে ঘোরাবেন এই তো
আমার দিনরাত্রির সাধনা, কিছু আর তো পারি নে, একটা উপায় বাৎলিয়ে দাও।

ফকির। আছে উপায়।

মাখন। (পা জড়িয়ে) বলে দাও, বলে দাও, বকিস্ত কোরো না।

ফকির। দিন-ভোর উপোষ ক'রে থেকে—

মাখন। উপোষ! সর্বনাশ! সেটা অভ্যাস নেই একেবারেই। আমার দুই
এক দিনে চারবার করে আহার জুটিয়ে দিয়ে অস্তরটা একেবারে নিরেট করে দিয়েছেন।
আর কোনো রাস্তা যদি—

ফকির। আচ্ছা, দুখানা রুটি—

মাখন। আরও একটু দয়া করেন যদি, দু'বাটি কীর!

ফকির। ভালো, তাই হবে।

মাখন। আহা, কী কল্পনা প্রভুর! ভেমন করে পা যদি চেপে থাকতে পারি
তা হলে পাঠাটাও—

ফকির। না না, ওটা থাক।

মাখন। আচ্ছা, তবে থাক, একটা দিন বই তো নয়। তা, কী করতে হবে বলুন।
দেখুন, আমি মুখ-খু মাছুষ, অজুয়ার-বিসর্গওয়াল। বস্তুর মুখ দিয়ে বেরবে না, কী বলতে
কী বলব, শেষকালে অপরাধ হবে।

ফকির। ভয় নেই, তোমার অস্ত্রে সহজ করেই দিচ্ছি। গুরুর মূর্তি স্মরণ করে
সারারাত্ত জপ করবে, সোনা তোমাকেই দিলুম, তোমাকেই দিলুম, যতক্ষণ না ধ্যানের
মধ্যে দেখবে, সোনা আর নেই— কোথাও নেই।

মাখন। হবে হবে প্রভু, এই অধর্মেরও হবে। বলব, সোনা নেই, সোনা নেই;
এ হাতে নেই, ও হাতে নেই; ট'য়াকে নেই, থলিতে নেই; ব্যাঙে নেই, বাস্তোয় নেই।
ঠিক হুয়ে বাজবে যন্ত্র। আচ্ছা, গুরুজি, গুরু সবে একটা অজুয়ার জুড়ে দিলে হয় না?
নইলে নিতান্ত বাংলায় যতো পোনাচ্ছে। অজুয়ার দিলে জোর পাওয়া যায়—
সোনাং নেই, সোনাং নেই, কিছুং নেই, কিছুং নেই।

ফকির। যত পোনাচ্ছে না।

মাখন। আচ্ছা, তবে অজুযতি হোক, পোলাওটা ঠাণ্ডা হয়ে এস!

ফকিরের গান

শোনু রে শোনু অবোধ মন,—

শোনু সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি

সেই স্মৃতি কর গ্রহণ ।

ভবের স্তম্ভ ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর অবেষণ

ওরে ও ভোলা মন !

যষ্ঠীচরণ ছুটে এসে

যষ্ঠী । দেখি দেখি, এই তো দাদু আমার— আমার মাখন । (মুখে হাত বুলিয়ে)
অমন চাঁদ মুখখানা দাড়ি গোঁফ দিয়ে একেবারে চাপা দিয়েছে । একে ভগবান
আমার চোখে পরিয়েছে বুড়ো বয়সের ঠুলি, ভালো দেখতেই পাই নে, তার উপর
এ কী কাণ্ড করেছিস মাখন !

ফকির । সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম, সোহং ব্রহ্ম ।

যষ্ঠী । করেছিস কী দাদু, মস্তুর প'ড়ে প'ড়ে অমন মিষ্টি গলায় কড়া পাড়িয়ে
দিয়েছিস ! সুর মোটা হয়ে গেছে !

ফকির । শিবোহং শিবোহং শিবোহং ।

বামনদাস বাবুর প্রবেশ

বামনদাস । আরে আরে, আমাদের মাখন নাকি ? খাঁটি তো ? ও যষ্ঠীদা,
মানতেই হবে যোগবল— নাকের উপর থেকে আঁচিলটা একেবারে সাফ দিয়েছে
উড়িয়ে । ভট্টাচার্য, দেখে যাও হে, নাকের উপর কী মস্তুর দেগেছিল গো ! একটু
চিহ্ন রেখে যায় নি । যষ্ঠীদা, ঐ নাক নিয়ে কত ঝাড়ফুক করেছিলে, একটু টলাতে
পায় নি । ভপিস্তের মাহাত্মি বটে—

যষ্ঠী । না ভাই, মাহাত্মি ভালো লাগছে না । ভোঁরা বাক্য বলতিস গণ্ডারী
নাক, সে ছিল ভালো ।

নিশিঠাকুর । ওর মুখমণ্ডল যে নিজেকে বেকবুল করছে, তার উপরে আবার
মুখে কথা নেই । অমন সব বোলচাল, মূনি হয়ে সব কুলেছে বুঝি !

ভজহারি । দেখি দেখি মাখনা, মুখটা দেখি । (চিমটি কেটে, চামড়া টেনে)
না হে, এ মুখোষ নয়, খাঁদা লাগিয়ে দিলে ।

নিভাই । কিছু, দেখ, তো টেনে ওর দাড়িগোঁফ সত্যি কি না ।

ককির। উঃ উঃ !

চণ্ডী। (পিঠে কিল ঘেঁরে) কেমন লাগল।

ককির। উঃ !

চণ্ডী। ঐ তো, সন্ন্যাসীর সুখদুঃখবোধ আছে তো ! মাথায় হাঁকোর জল ঢালি তবে, মাথা ঠাণ্ডা হোক।

ষষ্ঠী। আহা, কেন শুকে বিরক্ত করছ তাই ? সাত বছর পরে কিরে এস, সবাই মিলে আবার শুকে তাড়াবে দেখছি। মাখন, ও তাই মাখন, আর দুখ্‌খু মিস্ নে— একটা কথা ক, নাহয় ছুটো গাল মিলিই বা !

ককির। আপনারা আমাকে মাখন বলে ডাকছেন কেন। পূর্ব-আশ্রমে আমার যে নাম থাক্, আমার গুরুদত্ত নাম চন্দ্রানন্দ স্বামী। [সকলের উচ্চহাস্য

চিহ্ন। ওরে বাবা, আশকর্তা এলেন আমাদের। ডাখ্‌ মাখ্‌না, শ্রাকামি করিস নে। ভাবছিল, এমনি করে আবার ফাঁকি দিয়ে পালাবি ! সেটি হচ্ছে না ; তোর দুই বোয়ের হাতে দুই কান জিন্মে করে দেব, থাকবি কড়া পাহারায়।

ককির। জরো, হায় জরো !

দুই স্ত্রীর প্রবেশ

১। ঐ যে গো, মুখ চোখ বদলিয়ে এসেছেন আমাদের কলির নারদ।

ককির। মা, আমি তোমাদের অখম সম্ভান, দয়া করো আমাকে।

সকলে। এই এই, করলে কী ! প্রাণের ভয়ে মা বলে ফেললে ?

১। ও পোড়াকপালে মিন্‌সে, তুই মা বলিস কাকে !

২। চোখের মাথা খেয়ে বসেছিল, তোর মরণ হয় না !

ককির। একটু ভালো করে আমাকে দেখে নিব।

১। তোমাকে দেখে দেখে চোখ ফেঁদে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, নতুন জন্মাও নি। তোমার দুখের দাঁত অনেক দিন পড়েছে, তোমার বয়সের কি পাছ পাখর আছে। তোমার বয় তুলেছে ব'লে কি আমরাও তুলব।

২। (নাক মুচ্‌ড়িয়ে দিয়ে) মাফীকে বিদায় করেছে নাকের ডগা থেকে। তাই ব'লে আমাদের ভোলাতে পারবে না— তোমার বিহঁলেখি চের জানা আছে। ওমা, ওমা, ঐ দেখ্‌লো দুইকি— সেই তালের বড়ার ধামাটা।

১। তাই রাস্তিরে গিয়েছিলেন তুত সেজে বড়া খেতে !

২। চকোত্তিরপায়, এই দেখে নাও— মিন্‌সে রান্নাঘরে ঢুকে এনেছে বড়ানুজ আমাদের ধামা চুরি করে। [সকলের হাস্য

কাহ্ন মণ্ডল । সে কি হয় । যোগবল, ভাঁড়ার থেকে উড়িয়ে এনেছে ।

যষ্টি । ওগো বৌদিদিরা, কেন ওকে খোঁটা দিচ্ছ । ঘরের বড়া ঘরের মাহ্নমই যদি নিয়ে এসে থাকে তাকে কি চুরি বলে ।

১ । ভালোমানুষের মতো যদি নিত তবে দোষ ছিল না— যা গো, সে কী দাঁড়-খিঁচুনি । আমার তো দাঁতকপাটি লেগে গেল ।

যষ্টি । ভাই মাখন, এটা তো ভালো কর নি— গোপনে আমাকে জানালে না কেন । তালের বড়ার অভাব কী ।

ফকির । গুরো !

২ । (কলার ছড়ার বাকি অংশ তুলে ধরে) এই দেখো তোমরা । ভাঁড়ারে রেখেছিলুম ব্রাহ্মণভোজন করাব ব'লে । সকালে উঠে আর দেখতে পাই নে । ঘরজাও খোলা নেই, ভয়ে মরি । আমাদের এই মহাপুরুষের কীতি । কলা চুরি করে ধর্মকর্ম করেন !

যষ্টিচরণ । (মহাক্রোধে) দেখো, এ আমি কিছুতেই সহিব না । এই ভাইনি দুটোকে ঘর থেকে বিনাশ করতে হবে, নইলে আমার মাখনকে টেঁকাতে পারব না । দেখছ তো মাখন ? কেবল ভালোমানুষি করে দুই বোকে কী রকম করে বিগড়িয়ে দিয়েছ !

ফকির । সর্বনাশ ! আপনারা সাংঘাতিক ভুল করছেন । আপনাদের সকলের পারে ধরি— আমাকে বাঁচান ! হে গুরো, কী করলে তুমি ।

যষ্টি । না ভাই, বেকবুল ঘেঁষো না । ধামাটা তুমি ওদের ঘর থেকে এনেছিলে, কলার ছড়াটাও প্রায় নিক্ষেপ করেছ । সেটাতে তোমার অপরাধ হয় নি— তবে লজ্জা পাচ্ছ কেন ।

ফকির । দোহাই ধর্মের, দোহাই আপনাদের— আমি ধামাও আনি নি, কলার কাঁদিও আনি নি ।

যষ্টি । পষ্টই দেখা যাচ্ছে যেয়েছ তুমি । কেন এত জিদ করছ ।

ফকির । যেয়েছি, কিন্তু—

বামনদাস । আবার কিন্তু কিসের !

ফকির । আমি আনি নি ।

[সকলের হাত

পাঁচ । তুমি যাও তালের বড়া, দেয় এনে আর-এক মহাশয়, এও তো বজা কম নয় । তাকে চেন না ?

ফকির। আজ্ঞে না।

সিধু। সে চেনে না তোমাকে ?

ফকির। আজ্ঞে না।

নকুল। এ যে আরব্য উপভাস।

[সকলের হাস্য]

ষষ্ঠী। যা হবার তা তো হয়ে গেছে, এখন ঘরে চলো।

ফকির। কার ঘরে বাব ?

১। মরি মরি, ঘর চেন না পোড়ারমুখো ! বলি, আমাদের দুটিকে চেন তো ?

ফকির। সত্যি কথা বলি, রাগ করবেন না, চিনি নে।

সকলে। ঐ লোকটার ভাষামি তো সহিবে না। জোর করে নিয়ে যাও ওকে ধ'রে, তালি বন্ধ করে রাখো।

ফকির। গুরো !

সকলে মিলে ঠেলাঠেলি। ওঠো, ওঠো বলছি।

স্বধীর। বৌ দুটোকে এড়াতে চাও তার মানে বুঝি ; কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে-গুলিকে ? তোমার চারটি মেয়ে, তিনটি ছেলে, তাও ভুলেছ না কি।

ফকির। ও সর্বনাশ ! আমাকে যেহে ফেললেও এখান থেকে নড়ব না। (পাছের ওঁড়ি আঁকড়িয়ে ধ'রে) কিছুতেই না।

হরিশ উকিল। জান আমি কে ? পূর্ব-সাক্ষ্যে জানতে। অনেক সাধুকে জেলে পাঠিয়েছি। আমি হরিশ উকিল। জান ? তোমার দুই স্ত্রী !

ফকির। এখানে এসে প্রথম জানলুম।

হরিশ। আর, তোমার চার মেয়ে তিন ছেলে।

ফকির। আপনারা জানেন, আমি কিছুই জানি নে।

হরিশ। এদের ভরণপোষণের ভার তুমি যদি না নাও, তা হলে মকদ্দমা চলবে বলে রাখলুম।

ফকির। বাপ রে ! মকদ্দমা ! পায়ে ধরি, একটু রাত্তা ছাড়ুন।

দুই স্ত্রী। বাবে কোথায়, কোন্ হুলোয়, যবের কোন্ দুয়োরে ?

ফকির। গুরো ! (হতবুদ্ধি হয়ে বসে পড়ল)

হৈমবতীর প্রবেশ ও ফকিরকে প্রণাম

ফকির। (লাকিয়ে উঠে) এ কী, এ যে হৈমবতী ! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

১। ওলো, ওর সেই কানীর বৌ, এখনো মরে নি বুঝি।

মাখনকে নিয়ে পুষ্পর প্রবেশ

মাখন। ধরা দিলেম—বেঙের। লাগাও হাতকড়ি। প্রমাণের দরকার নেই। একেবারে গিধে নাকের দিকে তাকান। আমি মাখনচন্দ্র। এই আমার দড়ি আর এই আমার কলসি। মা অজানা, কিঙ্কিয়ার তো ঢোকালে। মাঝে মাঝে খবর নিয়ো। নইলে বিপদে পড়লে আবার লাক মারব।

পুষ্প। ফকিরদা, তোমার মুক্তি কোথায় সে তো এখন বুঝেছ?

ফকির। খুব বুঝেছি—এ রাস্তা আর ছাড়ছি নে।

পুষ্প। বাছা মাখন, তোমার মন্ত হুবিধে আছে—তোমার কৃতি কেউ মারতে পারবে না। এ দুটিও নয়।

দুই স্ত্রী। ছি ছি, আর একটু হলে তো সর্বনাশ হয়েছিল! (গড় হয়ে প্রণাম করে) বাঁচালে এসে।

উপন্যাস ও গল্প

লিপিৱা

লিপিকা

পায়ে চলার পথ

এই তো পায়ে চলার পথ ।

এসেছে বনের মধ্যে দিয়ে ঘাঠে, ঘাঠের মধ্যে দিয়ে নদীর ধারে, খেয়াঘাটের পাশে বটগাছতলায় । তার পরে ও পারের ভাঙা ঘাট থেকে বেকে বেকে চলে গেছে গ্রামের মধ্যে ; তার পরে ভিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, পদ্মদিঘির পাড় দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেছে জানি নে ।

এই পথে কত মানুষ কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা স্তব্ধ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল ; কীরো বা ঘোষটা আছে, কারো বা নেই ; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল ।

২

এখন দিন গিয়েছে, অন্ধকার হয়ে আসে ।

একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একাডুই আমার ; এখন দেখছি, কেবল একটিবার যাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয় ।

নেবুতলা উজিয়ে সেই পুকুরপাড়, স্বামশ দেউলের ঘাট, নদীর চর, গোয়ালবাড়ি, ধানের গোলা পেরিয়ে—সেই চেনা চাউনি, চেনা কথা, চেনা মুখের মহলে আর একটিবারও ফিরে গিয়ে বলা হবে না, “এই যে !” এ পথ যে চলার পথ, ফেরার পথ নয় ।

আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকানুব ; দেখলুম, এই পথটি বহুবিশ্বস্ত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর স্তরে বাঁধা ।

যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিবার ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত করে এঁকেছে ; সেই একটি রেখা চলেছে পূর্বোদয়ের দিক থেকে পূর্বাশ্বের দিকে, এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর-এক সোনার সিংহদ্বারে ।

৩

“ওগো পায়ে চলার পথ, অনেক কালের অনেক কথাকে তোমার ধূলিবন্ধনে বেঁধে নীরব করে রেখো না। আমি তোমার ধুলোর কান পেতে আছি, আমাকে কানে কানে বলো।”

পথ নিশীথের কালো পর্দার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে চূপ ক’রে থাকে।

“ওগো পায়ে চলার পথ, এত পথিকের এত ডাবনা, এত ইচ্ছা, সে-সব গেল কোথায়।”

বোবা পথ কথা কয় না। কেবল সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্ত অবধি ইশারা মেলে রাখে।

“ওগো পায়ে চলার পথ, তোমার বৃকের উপর যে-সমস্ত চরণপাত একদিন পুষ্পবৃষ্টির মতো পড়েছিল আজ তারা কি কোথাও নেই।”

পথ কি নিজের শেষকে জানে, যেখানে লুপ্ত ফুল আর শুষ্ক গান পৌঁছল, যেখানে তারার আলোর অনিবার্ণ বেদনার মেঘালি-উৎসব!

মেঘলা দিনে

রোজই থাকে সমস্তদিন কাজ, আর চার দিকে লোকজন। রোজই মনে হয়, সেদিনকার কাজে, সেদিনকার আলাপে সেদিনকার সব কথা দিনের শেষে বুঝি একেবারে শেষ করে দেওয়া হয়। ভিতরে কোন্ কথটি যে বাকি রয়ে গেল তা বৃক্ষে নেবার সময় পাওয়া যায় না।

আজ সকালবেলা মেঘের স্তবকে স্তবকে আকাশের বুক ভেরে উঠেছে। আজও সমস্ত দিনের কাজ আছে সামনে, আর লোক আছে চার দিকে। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, ভিতরে যা-কিছু আছে বাইরে তা সমস্ত শেষ করে দেওয়া যায় না।

মাহুষ সমূহ পার হল, পর্বত ভিড়িয়ে গেল, পাতালপুরীতে সিংহ কেটে মণিমানিক চুরি করে আনলে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আর-একজনকে চুকিয়ে দিয়ে ফেলা, এ কিছুতেই পারলে না।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপটে মরছে। ভিতরের মাহুষ বলছে, “আমার চিরদিনের সেই আর-একজনটি কোথায়, যে আমার হৃদয়ের আবণমেঘকে ফতুর ক’রে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে।”

আজ মেঘলা দিনের সকালে শুনে পাচ্ছি, সেই ভিতরের কথাটা কেবলই বন্ধ দরজার শিকল নাড়ছে। ভাবছি, “কী করি। কে আছে বার ডাকে কান্নার বেড়া ডিঙিয়ে এগনি আমার বাণী স্বরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে। কে আছে বার চোখের একটি ইশারায় আমার সব ছড়ানো ব্যথা এক মুহূর্তে এক আনন্দে গাঁথা হবে, এক আলোতে জলে উঠবে। আমার কাছে ঠিক স্বরটি লাগিয়ে চাইতে পারে যে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্বশেষ ভিয়ারি রাস্তার কোন্ মোড়ে।”

আমার ভিতরমহলের ব্যথা আজ গেক্সাবসন পরেছে। পথে বাহির হতে চায়, সকল কান্নার বাহিরের পথে, যে পথ একটিমাত্র সরল তারের একতারায় মতো, কোন্ মনের মাহুঘের চলার চলায় বাজছে।

বাণী

কোঁটা কোঁটা কুঁড়ি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে ব'লে। হেননি কোথা থেকে মেঘেরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।

তাদের ভক্ত অন্ন জায়গার জগৎ, অন্ন মাহুঘের। ঐটুকুর মধ্যে আপনার সবটাকে ধরানো চাই—আপনার সব কথা, সব ব্যথা, সব ভাবনা। তাই তাদের মাথায় কাপড়, হাতে কঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেঘেরা হল সীমান্বর্গের ইন্দ্রাণী।

কিন্তু, কোন্ দেবতার কোতুকহাস্তের মতো অপরিমিত চঞ্চলতা নিয়ে আমাদের পাড়ায় ঐ ছোটো মেঘটির জন্ম। বা তাকে রেগে বলে “বশ্টি”, বাপ তাকে হেসে বলে “পাপলি”।

সে পলাতকা বরনার জল, শাসনের পাখর ডিঙিয়ে চলে। তার মনটি যেন বেগুনের উপরডালের পাতা, কেবলই কিব্ব কিব্ব করে কাঁপছে।

২

আজ দেখি, সেই ছরস্ব মেঘটি বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে চূপ করে দাঁড়িয়ে, বায়লশেষের ইন্দ্রধনুটি বললেই হয়। তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালের ডালে কুঁড়ির মনে ডানাভেজা পাখির মতো।

ওকে এমন শুদ্ধ কখনো দেখি নি। মনে হল, নদী যেন চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থমকে সরোবর হয়েছে।

৩

কিছুদিন আগে রৌদ্রের শাসন ছিল প্রখর ; দিগন্তের মুখ বিবর্ণ ; গাছের পাতাগুলো শুকনো, হলদে, হতাস্থ।

এমন সময় হঠাৎ কালো আলুখালু পাগলা মেঘ আকাশের কোণে কোণে তাঁবু ফেললে। সূর্যাস্তের একটা রক্তরশ্মি ধাপের ভিতর থেকে তলোয়ারের মতো বেরিয়ে এল।

অর্ধেক রাত্রে দেখি, দরজাগুলো খড়্‌খড়্‌ শব্দে কাঁপছে। সমস্ত শহরের ঘুমটাকে কড়ের হাওয়া ঝুঁটি ধরে কাঁকিয়ে দিলে।

উঠে দেখি, গলির আলোটা ঘন বৃষ্টির মধ্যে মাতালের ঘোলা চোখের মতো দেখতে। আর, গির্জের ঘড়ির শব্দ এসে ঘন বৃষ্টির শব্দের চাদর মুড়ি দিয়ে।

সকালবেলায় জলের ধারা আরও ঘনিষে এল, রৌদ্র আর উঠল না।

৪

এই বাদলায় আমাদের পাড়ার মেয়েটি বারান্দার রেলিঙ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তার বোন এসে তাকে বললে, “মা ডাকছে।” সে কেবল সবেগে মাথা নাড়ল, তার বোনী উঠল ছলে ; কাগজের নৌকো নিয়ে তার ভাই তার হাত ধরে টানলে। সে হাত ছিনিয়ে নিলে। তবু তার ভাই খেলার জন্তে টানাটানি করতে লাগল। তাকে এক থাপড় বসিয়ে দিলে।

৫

বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার আরও ঘন হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে।

আদ্যুগে সৃষ্টির মুখে প্রথম কথা জেগেছিল জলের ভাষায়, হাওয়ার কণ্ঠে। লক্ষকোটি বছর পার হয়ে সেই স্বরণবিস্মরণের অতীত কথা আজ বাদলার কলশব্দে ঐ মেয়েটিকে এসে ডাক দিলে। ও তাই সকল বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে হারিয়ে গেল।

কত বড়ো কাল, কত বড়ো জগৎ, পৃথিবীতে কত যুগের কত জীবনীলা! সেই সুদূর, সেই বিরাট, আজ এই ছরস্ক মেয়েটির মুখের দিকে তাকালো মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির কলশব্দে।

ও তাই বড়ো বড়ো ‘চোখ মেলে নিশ্চর দাঁড়িয়ে রইল, ঘন অনন্তকালেরই প্রতিমা।

মেঘদূত

মিলনের প্রথম দিনে বাণি কী বলেছিল।

সে বলেছিল, “সেই মানুষ আমার কাছে এল যে মানুষ আমার দূরের।”

আর, বাণি বলেছিল, “ধরলেও থাকে ধরা যায় না তাকে ধরেছি, পেলেও সকল পাওয়াকে যে ছাড়িয়ে যায় তাকে পাওয়া গেল।”

তার পরে রোজ বাণি বাজে না কেন।

কেননা, আখ্যানা কথা ভুলেছি। শুধু মনে রইল, সে কাছে ; কিন্তু সে যে দূরেও তা খেয়াল রইল না। প্রেমের যে আখ্যানার মিলন সেইটেই দেখি, যে আখ্যানার বিরহ সে চোখে পড়ে না, তাই দূরের চিরতৃপ্তিহীন দেখাটা আর দেখা যায় না ; কাছের পর্দা আড়াল করেছে।

তুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চূপ, সেখানে কথা চলে না। সেই মস্ত চূপকে বাণির স্বর দিয়ে ভরিয়ে দিতে হয়। অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাণি বাজে না।

সেই আমাদের মাঝের আকাশটি আঁধিতে ঢেকেছে, প্রতি দিনের কাজে কর্মে কথার ভরে গিয়েছে, প্রতি দিনের ভয়ভাবনা-ক্লপণতায়।

২

এক-একদিন জ্যোৎস্নারাজে হাওয়া দেয় ; বিছানার 'পরে জেগে ব'সে বুক ব্যথিয়ে ওঠে ; মনে পড়ে, এই পাশের লোকটিকে তো হারিয়েছি।

এই বিরহ মিটবে কেমন করে, আমার অনন্তের সঙ্গে তার অনন্তের বিরহ।

দিনের শেষে কাজের থেকে ফিরে এসে যার সঙ্গে কথা বলি সে কে। সে তো সংসারের হাজার লোকের মধ্যে একজন ; তাকে তো জানা হয়েছে, চেনা হয়েছে, সে তো ফুরিয়ে গেছে।

কিন্তু, ওর মধ্যে কোথায় সেই আমার অফুরান একজন, সেই আমার একটিমাত্র। ওকে আবার নুতন করে খুঁজে পাই কোন্ কুলহারা কামনার ধারে।

ওর সঙ্গে আবার একবার কথা বলি সময়ের কোন্ ফাঁকে, বনমল্লিকার গন্ধে নিবিড় কোন্ কর্মহীন সন্ধ্যার অন্ধকারে।

৩

এমন সময়ে নববর্ষা ছায়া-উত্তরীর উড়িয়ে পূর্বদিগন্তে এসে উপস্থিত। উজ্জয়িনীর কবির কথা মনে পড়ে গেল। মনে হল, প্রিয়ার কাছে দূত পাঠাই।

আমার গান চলুক উড়ে, পাশে থাকার স্বপ্ন হৃদয় নির্বাসন পার হয়ে যাক।

কিন্তু, তা হলে তাকে যেতে হবে কালের উজ্জান-পথ বেয়ে বাণির ব্যথায় ভরা আমাদের প্রথম মিলনের দিনে, সেই আমাদের যে দিনটি বিশ্বের চিরবর্ষা ও চিরবসন্তের সকল গন্ধে সকল ক্রন্দনে জড়িয়ে রয়ে গেল, কেতকীবনের দীর্ঘশ্বাসে আর শালমঞ্জরীর উতলা আত্মনিবেদনে।

নির্জন দিঘির ধারে নারিকেলবনের মর্মরমুখরিত বর্ষার আপন কথাটিকেই আমার কথা করে নিয়ে প্রিয়ার কানে পৌছিয়ে দিক, যেখানে সে তার এলোচূলে গ্রন্থি দিয়ে, আঁচল কোমরে বেঁধে সংসারের কাছে ব্যস্ত।

৪

বহু দূরের অসীম আকাশ আজ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়ল। কানে কানে বললে, “আমি তোমারই।”

পৃথিবী বললে, “সে কেমন করে হবে। তুমি যে অসীম, আমি যে ছোটো।”

আকাশ বললে, “আমি তো চার দিকে আমার মেঘের সীমা টেনে দিয়েছি।”

পৃথিবী বললে, “তোমার যে কত জ্যোতিষ্কের সম্পদ, আমার তো আলোর সম্পদ নেই।”

আকাশ বললে, “আজ আমি আমার চন্দ্র সূর্য তারা সব হারিয়ে ফেলে এসেছি, আজ আমার একমাত্র তুমি আছ।”

পৃথিবী বললে, “আমার অশ্রুভরা হৃদয় হাওয়ায় হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে কাঁপে, তুমি যে অবিচলিত।”

আকাশ বললে, “আমার অশ্রুও আজ চঞ্চল হয়েছে, দেখতে কি পাও নি। আমার বক্ষ আজ স্তম্ভিত হল তোমার ঐ স্তম্ভিত হৃদয়টির মতো।”

সে এই ব’লে আকাশ-পৃথিবীর মাঝখানকার চিরবিরহটাকে চোখের জলের গান দিয়ে ভরিয়ে দিলে।

৫

সেই আকাশ-পৃথিবীর বিবাহমন্ত্রগুণন নিয়ে নববর্ষা নামুক আমাদের বিচ্ছেদের পরে। প্রিয়ার মধ্যে বা অনির্বচনীয় তাই হঠাৎ-বেজ্ঞে-ওঠা বীণার তারের মতো

চকিত হয়ে উঠুক। সে আপন সিঁথির 'পরে তুলে দিক দূর বনাস্থের রঙটির মতো তার নীলাকল। তার কালো চোখের চাহনিতে মেঘমল্লারের সব মিড়গুলি আঁত হয়ে উঠুক। সার্থক হোক বকুলমালা তার বেনীর বাক্যে বাক্যে জড়িয়ে উঠে।

যখন ঝিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অঙ্ককার ধবধব করছে, যখন বাদল-হাওয়ায় দীপশিখা কঁপে কঁপে নিবে গেল, তখন সে তার অতি কাছের ঐ সংসারটাকে ছেড়ে দিয়ে আশুক, ভিক্ষে ঘাসের গন্ধে ভরা বনপথ দিয়ে, আমার নিভৃত হৃদয়ের নিশীথরাত্রে।

বাঁশি

বাঁশির বাণী চিরদিনের বাণী— শিবের জটা থেকে গঙ্গার ধারা, প্রতি দিনের মাটির বুক বেয়ে চলেছে; অমরাবতীর শিশু নৈবে এল মর্ত্যের ধূলি নিয়ে স্বর্গ-স্বর্গ খেলতে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারি নে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে সে উজ্জল, চেনা চোখের জলের চেয়ে সে গভীর।

আর, মনে হতে থাকে, চেনাটা সত্য নয়, অচেনাই সত্য। মন এমন সৃষ্টিছাড়া ভাব ভাবে কী করে। কথায় তার কোনো জবাব নেই।

আজ ভোরবেলাতেই উঠে শুনি, বিয়েবাড়িতে বাঁশি বাজছে।

বিয়ের এই প্রথম দিনের সুরের সঙ্গে প্রতি দিনের সুরের মিল কোথায়। গোপন অকৃত্তি, গভীর নৈরাশ্র; অবহেলা, অপমান, অবসাদ; ভুচ্ছ কামনার কার্পণ্য, কুত্ৰী নীরসতার কলহ, কমাশীন ক্ষুদ্রতার সংঘাত, অভ্যস্ত জীবনযাত্রার ধূলিলিপ্ত দারিদ্র্য— বাঁশির দৈববাণীতে এসব বার্তার আভাস কোথায়।

গানের সুর সংসারের উপর থেকে এই-সমস্ত চেনা কথার পর্দা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। চিরদিনকার বর-কনের শুভদৃষ্টি হচ্ছে কোন্ রক্তাংগকের সলজ্জ অবগুণ্ঠনভলে, তাই তার তানে তানে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

যখন সেখানকার মালাবদলের গান বাঁশিতে বেজে উঠল তখন এখানকার এই কনেটির দিকে চেয়ে দেখলেন; তার গলায় সোনার হার, তার পায়ে হুগাছি মল, সে যেন কারার সরোবরে আনন্দের পল্লটির উপরে দাঁড়িয়ে।

সুরের তিতর দিয়ে তাকে সংসারের মাছুষ ব'লে আর চেনা গেল না। সেই চেনা ঘরের মেয়ে অচিন ঘরের বউ হয়ে দেখা দিলে।

বাঁশি বলে, এই কথাই সত্য।

সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্রপারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুষ্ঠিতা নববধূর মতো ; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

আগল কে। নিবিরে দিল সন্ধ্যার-জালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সঁউতিকুলের মালা।

এখানে একে একে দরজার আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে ; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পাশুশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পুবের দিকে মুখ করে চলেছে ; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি ; ওদের জন্তে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের ককণ কামনা অনিবেশ চেয়ে আছে ; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, “তোমাদের জন্তে সব প্রস্তুত।”

ওদের স্বপ্নপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পাশুশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে ; বেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লাস্ত ; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে ; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চূপ করে থাকে ; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুপন ককক, এর পুরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক।

পুরোনো বাড়ি

অনেক কালের ধনী গরিব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি ।

দিনে দিনে ওর উপরে দুঃসময়ের আঁচড় পড়ছে ।

দেয়াল থেকে বালি খসে পড়ে, ভাঙা মেঝে নখ দিয়ে খুঁড়ে চড়ুইপাখি ধুলোর পাখা ঝাপট দেয়, চণ্ডীমণ্ডপে পায়রাগুলো বাদলের ছিন্ন মেঘের মতো দল বাঁধল ।

উত্তর দিকের এক পালা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না । বাকি দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো, বাতাসে কণে কণে আছাড় খেয়ে পড়ে— কেউ তাকিয়ে দেখে না ।

তিন মহল বাড়ি । কেবল পাঁচটি ঘরে মানুষের বাস, বাকি সব বন্ধ । যেন পাঁচশি বছরের বুড়ো, তার জীবনের সবখানি জুড়ে সেকালের কুলুপ-লাগানো স্মৃতি, কেবল একখানিতে একালের চলাচল ।

বালি-ধসা ইট-বের-করা বাড়িটা তালি-দেওয়া-কাঁথা-পরা উদাসীন পাগলার মতো রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ; আপনাকেও দেখে না, অন্ধকেও না ।

২

একদিন ভোররাত্রে ঐ দিকে মেঘের গলায় কান্না উঠল । শুনি, বাড়ির যেটি শেষ ছেলে, শব্দের ব্যাক্য রাখিকা সেজে যার দিন চলত, সে আজ আঠারো বছরে যারা গেল ।

কদিন মেঘেরা কাঁদল, তার পরে তাদের আর খবর নেই ।

তার পরে সকল দরজাতেই তালা পড়ল ।

কেবল উত্তর দিকের সেই একখানা অনাথা দরজা ভাঙেও না, বন্ধও হয় না ; ব্যথিত স্থম্পিণ্ডের মতো বাতাসে খড়াস খড়াস করে আছাড় খায় ।

৩

একদিন সেই বাড়িতে বিকেলে ছেলেদের গোলমাল শোনা গেল ।

ঘেঁষি, বারান্দা থেকে লালাপেড়ে খাড়ি কুলছে ।

অনেক দিন পরে বাড়ির এক অংশে ভাড়াটে এসেছে । তার মাইনে অল্প, ছেলে-মেয়ে বিস্তর । প্রাক্তন বা বিরক্ত হয়ে তাদের মায়ে, তারা মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে ।

একটা আধাবয়সী দাসী সবসময় দিন খাটে, আর গৃহিণীর সঙ্গে ঝগড়া করে ; বলে 'চললুম', কিন্তু যায় না ।

বাড়ির এই ভাগটার রোজ একটু-আধটু মেরামত চলছে।

ফাটা সাসির উপর কাগজ আঁটা হল ; বারান্দায় রেলিঙের ফাঁকগুলোতে বাঁধারি বেঁধে দিলে ; শোবার ঘরে ভাঙা জানলা ইট দিয়ে ঠেকিয়ে রাখলে ; দেয়ালে চুনকাম হল, কিন্তু কালো ছাপগুলোর আভাস ঢাকা পড়ল না।

ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিঁথে দাঁড়িয়ে ; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন খিলখিল করে হাসতে লাগল।

মস্ত ধনের মস্ত দারিদ্র্য। তাকে ছোটো হাতের ছোটো কোণে ঢাকা দিতে গিয়ে তার আবরু গেল।

কেবল উত্তর দিকের উজাড় ঘরটির দিকে কেউ তাকায় নি। তার সেই ছোড়ভাঙা দরজা আজও কেবল বাতাসে আছড়ে পড়ছে, হতভাগার বুক-চাপড়ানির মতো।

গলি

আমাদের এই শানবাঁধানো গলি, বারে বারে ডাইনে বাঁয়ে একে বেকে একদিন কী যেন খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু, সে যে দিকেই যায় ঠেকে যায়। এ দিকে বাড়ি, ও দিকে বাড়ি, সামনে বাড়ি।

উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে একখানি আকাশের রেখা দেখতে পায়— ঠিক তার নিজেরই মতো সরু, তার নিজেরই মতো বাকা।

সেই ছাঁটা আকাশটাকে ভিজ্ঞাসা করে, “বলো তো দিদি, তুমি কোন্ নীল শহরের গলি।”

দুপুরবেলায় কেবল একটুখনের জন্তে সে সূর্যকে দেখে আর মনে মনে বলে, “কিছুই বোঝা গেল না।”

বর্ষামেঘের ছায়া দুইসার বাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে ওঠে, কে যেন গলির খাতা থেকে তার আলোটাকে পেন্সিলের আঁচড় দিয়ে কেটে দিয়েছে। বৃষ্টির ধারা শানের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলে, বর্ষা ডমক বাজিয়ে যেন সাপ খেলাতে থাকে। পিছল হয়, পথিকদের ছাতায় ছাতায় বেধে যায়, ছাদের উপর থেকে ছাতার উপরে হঠাৎ নালার জল লাফিয়ে পড়ে চমকিয়ে দিতে থাকে।

গলিটা অভিকৃত হয়ে বলে, “ছিল খটখটে শুকনো, কোনো বালাই ছিল না। কিন্তু, কেন অকারণে এই ধারাবাহী উৎপাত।”

ফাস্তনে দক্ষিণের হাওয়াকে গলির মধ্যে লম্বীছাড়ার মতো দেখতে হয় ; ধুলো আর ছেঁড়া কাগজগুলো এলোমেলো উড়তে থাকে। গলি হতবুদ্ধি হয়ে বলে, “এ কোন্ পাগলা দেবতার মাংলামি।”

তার ধারে ধারে প্রতিদিন যে-সব আবর্জনা এসে জমে—মাছের আঁশ, চুলোর ছাই, তরকারির খোসা, মরা ইঁহর, সে জানে এই-সব হচ্ছে বাস্তব। কোনোদিন তুলেও ভাবে না, “এ সমস্ত কেন।”

অথচ, শরতের রোদ্দুর যখন উপরের বারান্দায় আড় হয়ে পড়ে, যখন পুজোর নহবত ভৈরবীতে বাজে, তখন ক্ষণকালের জন্যে তার মনে হয়, “এই শানবীধা লাইনের বাইরে মস্ত একটা কিছু আছে বা!”

এ দিকে বেলা বেড়ে যায় ; ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে ; ঘড়িতে ন'টা বাজে ; কি কোমরে ঝুড়ি করে বাজার নিয়ে আসে ; রাস্তার গাছে আর পোড়ায় গলি ভরে যায় ; যারা আপিসে যায় তারা ব্যস্ত হতে থাকে।

গলি তখন আবার ভাবে, “এই শানবীধা লাইনের মধ্যেই সব সত্য। আর, যাকে মনে ভাবছি মস্ত একটা কিছু সে মস্ত একটা স্বপ্ন।”

একটি চাউনি

গাড়িতে শুষ্ঠবার সময় একটুখানি যুগ ফিরিয়ে সে আমাকে তার শেষ চাউনিটি দিয়ে গেছে।

এই মস্ত সংসারে ঐটুকুকে আমি রাখি কোন্‌খানে।

দণ্ড পল মুহূর্ত অহরহ পা ফেলবে না, এমন একটু জায়গা আমি পাই কোথায়।

যেখের সকল সোনার রঙ যে সজ্জায় মিলিয়ে 'যায় এই চাউনি কি সেই সজ্জায় মিলিয়ে যাবে। নাগকেশরের সকল সোনালি রেণু যে বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় এও কি সেই বৃষ্টিতেই ধুয়ে যাবে।

সংসারের হাজার জিনিসের মাঝখানে ছড়িয়ে থাকলে এ থাকবে কেন—হাজার কথার আবর্জনার, হাজার বেদনার স্রুপে।

তার ঐ এক চকিতের দান সংসারের আর-সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁচেছে। একে আমি রাখব গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে; আমি একে রাখব সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।

পৃথিবীতে রাজার প্রতাপ, ধনীর ঐশ্বর্য হয়েছে মরবারই জন্তে। কিন্তু, চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

গানের সুর বললে, “আচ্ছা, আমাকে দাও। আমি রাজার প্রতাপকে স্পর্শ করি নে, ধনীর ঐশ্বর্যকেও না, কিন্তু ঐ ছোটো জিনিসগুলিই আমার চিরদিনের ধন; ঐগুলি দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।”

একটি দিন

মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্রান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অঙ্ককার, কাজে মন যায় না। বহুটো হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক’রে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু, একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রক্তের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

কৃতঘ্ন শোক

ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে ।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, “সবই মায়া ।”

আমি রাগ করে বললেম, “এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাখানি— সবই তো সত্য ।”

মন বললে, “তবু ভেবে দেখো—”

আমি বললেম, “খামো তুমি । ঐ দেখো-না গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয় নি ; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া হল কেন ।”

মন চুপ করলে । বন্ধু এসে বললেন, “বা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না ; সমস্ত জগৎ তাকে রক্তের মতো বুকের হারে গেঁথে রাখে ।”

আমি রাগ করে বললেম, “কী করে জানলে । দেখ কি ভালো নয় । সে দেখ গেল কোন্‌খানে ।”

ছোটো ছেলে যেমন রাগ ক’রে মাকে যারে তেমনি করেই বিশে আমার বা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম । বললেম, “সংসার বিশ্বাসঘাতক ।”

হঠাৎ চমকে উঠলেম । মনে হল কে বললে, “অকৃতঘ্ন !”

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি । তারা-ছিটিয়ে-মেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভৎসনা এল, “ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ঠাকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস ?”

সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা ।

কত আসাযাওয়া, কত দেখাযেখি, কত বলাবলি ; তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অশ্রুমান, কত ইশারা ; তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ডাঙা ঘুমে ককতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের তরঙ্গদ্বার চানেলিফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ গ্রহণে ক্রান্ত নহবন্তের পিলুবারোয়ানি ; সতেরো বছর ধরে এই-সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে ।

আর, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে আরও সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি, এর রাতগুলি, সেই নামের রাশিবন্ধনে আর তো এক হয়ে মেলে না, এরা ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, “আমরা থাকব কোথায়। আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখবে কে।”

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারি নে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর, ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, “আমরা খুঁজতে বেরোলেম।”

“কাকে।”

কাকে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এ দিকে, কখনো যায় ও দিকে; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মতো অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখতে পাই নে।

প্রথম শোক

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, “আমাকে চিনতে পার না?”

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, “মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নে।”

সে বললে, “আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।”

তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, “সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার সব চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।”

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, “আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আমায় তোমার কাছে রেখে দিয়েছ।”

সে বললে, “এই দেখো-না আমার গলার হার।”

দেখলেম, সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও বসে নি।

আমি বললেম, “আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো রান হয় নি।”

আন্তে আন্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, “মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সাধনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।”

লজ্জিত হয়ে বললেম, “বলেছিলেম। কিন্তু, তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন তুলে গেলেম।”

সে বললে, “যে অমৃত্যুমোর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়া-তলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।”

আমি তার হাতপানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, “এ কী তোমার অপক্লপ মৃতি।”

সে বললে, “যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শাস্তি।”

প্রশ্ন

শ্রাবণ হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি— গা ধোলা, গলায় সোনার তাবিজ— একলা গলির উপরকার জানলার ধারে।

কী ভাবছে তা সে আপনি জানে না।

সকালের যৌত্র সামনের বাড়ির নিম্ন গাছটির আগভালে দেখা দিয়েছে; কাঁচা-আম-ওয়ারা গলির মধ্যে এসে হাক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে ধোকাকে কোলে নিলে; ধোকা জিজ্ঞাসা করলে, “মা কোথায়।”

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বললে, “বর্গে।”

২

সে মাঝে শোকে জ্বলন্ত বাপ, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কণে কণে গুমরে উঠছে।

হুয়ারে লঠনের মিটমিটে আলো, ঘোড়ালের গায়ে একছোড়া টিকটিকি।

সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল ।

চারি দিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়ালার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে ।

উলঙ্গ গায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে ।

তার দিশাহারা মন ঝাকে জিজ্ঞাসা করছে, “কোথায় স্বর্গের রাস্তা ।”

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই ; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল ।

২

গল্প

ছেলেটির যেমনি কথা ফুটল অমনি সে বললে, “গল্প বলো।”

দিদিমা বলতে শুরু করলেন, “এক রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, সঙ্গারের পুত্র—”

শুরুমশায় হেঁকে বললেন, “তিন-চারে বারো।”

কিন্তু তখন তার চেয়ে বড়ো হাক দিয়েছে রাক্ষসটা। “হাউ বাউ খাউ”— নামতার হংকার ছেলেটার কানে পৌঁছয় না।

যারা হিঁতৈষী তারা ছেলেকে ঘরে বদ্ধ ক’রে গভীর স্বরে বললে, “তিন-চারে বারো এটা হল সত্য ; আর রাজপুত্র, কোটালের পুত্র, সঙ্গারের পুত্র, ওটা হল মিথ্যা, অতএব—”

ছেলেটির মন তখন সেই মানসচিত্রের সমুদ্র পেরিয়ে গেছে মানচিত্রে যার ঠিকানা মেলে না ; তিন-চারে বারো তার পিছে পিছে পাড়ি দিতে যায়, কিন্তু সেখানে ধারাপাতের হালে পানি পায় না।

হিঁতৈষী মনে করে, নিছক দুইষি, বেতের চোটে শোধন করা চাই।

দিদিমা শুরুমশায়ের গতিক দেখে চূপ। কিন্তু আপদ বিদায় হতে চায় না, এক যায় তো আর আসে। কথক এসে আসন জুড়ে বসলেন। তিনি শুরু করে দিলেন এক রাজপুত্রের বনবাসের কথা।

যখন রাক্ষসীর নাক কাটা চলছে তখন হিঁতৈষী বললেন, “ইতিহাসে এর কোনো প্রমাণ নেই ; যার প্রমাণ পথে ঘাটে সে হচ্ছে, তিন-চারে বারো।”

ভক্তকণে হুমান লাক দিয়েছে আকাশে, অত উর্ধ্বে ইতিহাস তার সঙ্গে কিছুতেই পাঞ্জা দিতে পারে না। পাঠশালা থেকে ইন্সুলে, ইন্সুল থেকে কলেজে ছেলের মনকে পুটপাকে শোধন করা চলতে লাগল। কিন্তু যতই চোলাই করা যাক, ঐ কথাটুকু কিছুতেই মরতে চায় না “গল্প বলো”।

২

এর থেকে দেখা যায়, শুধু শিশুবয়সে নয়, সকল বয়সেই মানুষ গল্পপোষ জীব। তাই পৃথিবী জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে, যুগে যুগে, যুগে যুগে, লেখায় লেখায়, গল্প বা কমে উঠেছে তা মানুষের সকল সন্ধকেই ছাড়িয়ে গেছে।

হিতৈষী একটা কথা ভালো করে ভেবে দেখে না, গল্পরচনার মেশাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার সবশেষের নেশা : তাঁকে শোধন করতে না পারলে মানুষকে শোধন করার আশা করা যায় না।

একদিন তিনি তাঁর কারখানাঘরে আগুন থেকে জল, জল থেকে মাটি গড়তে লেগে গিয়েছিলেন। সৃষ্টি তখন গজদ্বর্ষ, বাষ্পভারাকুল। ধাতুপাথরের পিণ্ডগুলো তখন থাকে থাকে গাঁথা হচ্ছে ; চার দিকে মাল মসলা ছড়ানো আর দমাদম পিটনি। সেদিন বিধাতাকে দেখলে কোনোমতে মনে করা যেতে পারত না যে, তাঁর মধ্যে কোথাও কিছু ছেলেমানুষি আছে। তখনকার কাণ্ডকারখানা যাকে বলে 'সারবান'।

তার পরে কখন শুরু হল প্রাণের পত্তন। জাগল ঘাস, উঠল গাছ, ছুটল পত্ৰ, উড়ল পাখি। কেউ বা মাটিতে বাঁধা থেকে আকাশে অঙ্কলি পেতে দাঁড়াল, কেউ বা ছাড়া পেয়ে পৃথিবীময় আপনাকে বহুধা বিস্তার করে চলল, কেউ বা জলের যবনিকাতলে নিঃশব্দ নৃত্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে বাস্তু, কেউ বা আকাশে ডানা মেলে সূর্যালোকের বেদীতলে গানের অর্ঘ্যরচনায় উৎসুক। এখন থেকেই ধরা পড়তে লাগল বিধাতার মনের চাকল্য।

এমন করে বহু যুগ কেটে যায়। হঠাৎ এক সময়ে কোন্‌ খেয়ালে সৃষ্টিকর্তার কারখানায় উনপঞ্চাশ পবনের তলব পড়ল। তাদের সবক'টাকে নিয়ে তিনি মানুষ গড়লেন। এত দিন পরে আরম্ভ হল তাঁর গল্পের পালা। বহুকাল কেটেছে তাঁর বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে ; এইবার তাঁর শুরু হল সাহিত্য।

মানুষকে তিনি গল্পে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। পশুপাখির জীবন হল আহাৰ নিদ্রা সম্ভানপালন ; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা ; সুখদুঃখ রাগবিরাগ ভালোমন্দের কত দাতপ্রতিদাত। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন। নদী যেমন জলস্রোতের দ্বারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পদম্পন্ন দেখা হতেই প্রসঙ্গ এই, "কী হল হে, কী খবর, তার পরে?" এই 'তার পরে'র সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

বিধাতার-রচা ইতিহাস আর মানুষের-রচা কাহিনী, এই দুইয়ের মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল-যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয় ; যে রাজপুত্র সাত-সমুদ্র-পারে সাত-রাজ্য-ধন মানিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য ; আর সেই ভক্তিবিশুদ্ধ হুয়ামানের সরল বীরত্বের কথাও সত্য যে হুয়ামান গজদ্বর্ষকে

উৎপাটিত করে আনতে সংশয় বোধ করে না। এই মানুষের পক্ষে আরজ্জের যেমন সত্য দুর্বোধনও তেমনি সত্য। কোন্টার প্রমাণ বেশি, কোন্টার প্রমাণ কম, সে হিসাবে নয় ; কেবল গল্প হিসাবে কোন্টা খাঁটি, সেইটেই তার পক্ষে সবচেয়ে সত্য।

মানুষ বিধাতার সাহিত্যালোকেই মানুষ ; সুতরাং না সে বস্তুর গড়া, না তাকে—অনেক চেষ্টা করে হিঁড়িষী কোনোমতেই এই কথা মানুষকে ভোলাতে পারলে না। অবশেষে হয়রান হয়ে হিতকথার সঙ্গে গল্পের সন্ধিস্থাপন করতে সে চেষ্টা করে, কিন্তু চিরকালের স্বভাবদোষে কিছুতে জোড়া বেলাতে পারে না। তখন গল্পও যায় কেটে, হিতকথাও পড়ে থ'লে, আবর্জনা জমে ওঠে।

মীনু

মীনু পশ্চিমে মানুষ হয়েছে। ছেলেবেলায় ইনারার ধারে ভূঁতের গাছে লুকিয়ে ফল পাড়তে যেত ; আর অড়রপেতে যে বড়ো মালী ঘাস নিড়োত তার সঙ্গে ওর ছিল ভাব।

বড়ো হয়ে ভৌনপুরে হল গর বিয়ে। একটি ছেলে হয়ে মারা গেল, তার পরে ডাক্তার বললে, “এও বাঁচে কি না-বাঁচে।”

তখন তাকে কলকাতায় নিয়ে এল।

ওর অল্প বয়েস। কাঁচা ফলটির মতো ওর কাঁচা প্রাণ পৃথিবীর বোটা শক্ত করে আঁকড়ে ছিল। যা-কিছু কচি, যা-কিছু সবুজ, যা-কিছু সজীব, তার 'পরেই ওর বড়ো টান।

আঙিনায় তার আট-দশ হাত জমি, সেইটুকুতে তার বাগান।

এই বাগানটি ছিল যেন তার কোলের ছেলে। তারই বেড়ার 'পরে যে কুমকোলতা লাগিয়েছিল। এইবার সেই লতার কুঁড়ির আভাস দিতেই সে চলে এসেছে।

পাড়ার সমস্ত পোষা এবং না-পোষা কুকুরের অল্প আর আদর ওরই বাড়িতে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে যেটিকে সে ভালোবাসত তার নাক ছিল খাদা, তার নাম ছিল ভোঁতা।

তারই গলার পরাবে বলে মীনু রঙিন পুঁতির মালা গাঁথতে বসেছিল। সেটা শেষ হল না। যার কুকুর সে বললে, “বউদিদি, এটিকে ভূমি নিয়ে যাও।”

মীনুর স্বামী বললে, “বড়ো হাক্কাব, কাজ নেই।”

কলকাতার বাগান দোতলার ঘরে মীস্থ শুয়ে থাকে। হিন্দুস্থানি দাই কাছে-বসে কণ্ঠ কী বকে ; সে খানিক শোনে, খানিক শোনে না।

একদিন সারারাত মীস্থর ঘুম ছিল না। ভোরের আধার একটু যেই ফিকে হল সে দেখতে পেল, তার জানলার নিচেকার গোলকচাপার গাছটি ফুলে ভরে উঠেছে। তার একটু মৃদুগন্ধ মীস্থর জানলার কাছটিতে এসে যেন জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কেমন আছ।”

ওদের বাসা আর পাশের বাড়িটার অল্প একটুখানি ফাঁকের মধ্যে ঐ রৌদ্রের কাঙাল গাছটি, বিশ্বপ্রকৃতির এই হাবা ছেলে, কেমন করে এসে পড়ে যেন বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্লান্ত মীস্থ বেলায় উঠত। উঠেই সেই গাছটির দিকে চেয়ে দেখত, সেদিনের মতো আর তো তেমন ফুল দেখা যায় না। দাইকে বলত, “আহা দাই, মাথা খা, এই গাছের তলাটি খুঁড়ে দিয়ে রোজ একটু জল দিস।”

এই গাছে কেন-যে কদিন ফুল দেখা যায় নি, একটু পরেই বোঝা গেল।

সকালের আলো তখন আধফোটা পনের মতো সবে জাগছে, এমন সময় সান্নিহাতে পূজারি ব্রাহ্মণ গাছটাকে ঝাঁকানি দিতে লাগল, যেন খাজনা আদায়ের জন্তে বর্গির পেয়াদা।

মীস্থ দাইকে বললে, “শীঘ্র ঐ ঠাকুরকে একবার ডেকে আন।”

ব্রাহ্মণ আসতেই মীস্থ তাকে প্রণাম করে বললে, “ঠাকুর, ফুল নিচ্ছ কার জন্তে।”

ব্রাহ্মণ বললে, “দেবতার জন্তে।”

মীস্থ বললে, “দেবতা তো ঐ ফুল স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন।”

“তোমাকে !”

“হাঁ, আমাকে। তিনি যা দিয়েছেন সে তো ফিরিয়ে নেবেন ব’লে দেন নি।”

ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে চলে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার সে যখন গাছ নাড়া দিতে শুরু করলে তখন মীস্থ তার দাইকে বললে, “ও দাই, এ তো আমি চোখে দেখতে পারি নে। পাশের ঘরের জানলার কাছে আমার বিছানা করে দে।”

৩

শাশের ঘরের জানলার সামনে রায়চৌধুরীদের চৌতলা বাড়ি। মীস্থ তার স্বামীকে ডাকিয়ে এনে বললে, “ঐ দেখো, দেখো, ওদের কী সুন্দর ছেলেটি। ওকে একজিবার আমার কোলে এনে দাও-না।”

স্বামী বললে, “গরিবের ঘরে ছেলে পাঠাবে কেন।”

মীস্থ বললে, “শোনো একবার! ছোটো ছেলের বেলায় কি ধনী-গরিবের ভেদ আছে। সবায় কোলেই ওদের রাজসিংহাসন।”

স্বামী ফিরে এসে খবর দিলে, “দরোয়ান বললে, বাবুর সঙ্গে দেখা হবে না।”

পরের দিন বিকেলে মীস্থ দাইকে ডেকে বললে, “ঐ চেয়ে দেখ, বাগানে একলা বসে খেলছে। দৌড়ে যা, ওর হাতে এই সন্দেশটি দিয়ে আয়।”

সন্ধ্যাবেলায় স্বামী এসে বললে, “ওরা রাগ করেছে।”

“কেন, কী হয়েছে।”

“ওরা বলেছে, দাই যদি ওদের বাগানে যায় তো পুলিশে ধরিয়ে দেবে।”

এক মুহূর্তে মীস্থর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। সে বললে, “আমি দেখেছি, দেখেছি, ওর হাত থেকে ওরা আমার সন্দেশ ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে ওকে মারলে। এখানে আমি বাঁচব না। আমাকে নিয়ে যাও।”

নামের খেলা

প্রথম বয়সেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে।

বহু ঘণ্টে খাতায় সোনালি কালির কিনারা টেনে, তারই গায়ে লতা-একে, মাঝখানে লাল কালি দিয়ে কবিতাগুলি লিখে রাখত। আর, খুব সমারোহে মলাটের উপর লিখত, ত্রীকেশ্বরনাথ ঘোষ।

একে একে লেখাগুলিকে কাগজে পাঠাতে লাগল। কোথাও ছাপা হল না।

মনে মনে সে স্থির করলে, যখন হাতে টাকা জমবে তখন নিজে কাগজ বেত্র করবে।

বাপের মৃত্যুর পর শুরুজনেরা বার বার বললে, “একটা কোনো কাজের চেষ্টা করো, কেবল লেখা নিয়ে সময় নষ্ট করো না।”

সে একটুখানি হাসলে আর লিখতে লাগল। একটি দুটি তিনটি বই সে পরে পরে ছাপালে।

এই নিয়ে খুব আন্দোলন হবে আশা করেছিল। হল না।

২

আন্দোলন হল একটি পাঠকের মনে। সে হচ্ছে তার ছোটো ভাগ্যেটি।

নতুন ক'ব লিখে সে যে বই হাতে পায় চোঁচিয়ে পড়ে।

একদিন একখানা বই নিয়ে ইঁপাতে ইঁপাতে মামার কাছে ছুটে এল। বললে, “দেখো দেখো, মামা, এ যে তোমারই নাম।”

মামা একটুখানি হাসলে, আর আদর ক’রে খোকার গাল টিপে দিলে।

মামা তার বাস্তু খুলে আর-একখানি বই বের করে বললে, “আচ্ছা, এটা পড়ো দেখি।”

ভাগ্যে একটি একটি অক্ষর বানান ক’রে ক’রে মামার নাম পড়ল। বাস্তু থেকে আরও একটা বই বেরোল, সেটাতেও পড়ে দেখে মামার নাম।

পরে পরে যখন তিনটি বইয়ে মামার নাম দেখলে তখন সে আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে চাইল না। দুই হাত ফাঁক করে জিজ্ঞেস করলে, “তোমার নাম আরও অনেক অনেক বইয়ে আছে— একশোটা, চব্বিশটা, সাতটা বইয়ে?”

মামা চোখ টিপে বললে, “ক্রমে দেখতে পাবি।”

ভাগ্যে বই তিনটে নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাড়ির বুড়ি ঝিকে দেখাতে নিয়ে গেল।

৩

ইতিমধ্যে মামা একখানা নাটক লিখেছে। ছত্রপতি শিবাজি তার নায়ক।

বন্ধুরা বললে, “এ নাটক নিশ্চয় থিয়েটারে চলবে।”

সে মনে মনে স্পষ্ট দেখতে লাগল, রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে তার নিজের নামে আর নাটকের নামে বেন শহরের গায়ে উজ্জি পরিয়ে দিয়েছে।

আজ রবিবার। তার থিয়েটারবিলাসী বন্ধু থিয়েটারওয়ালাদের কাছে অভিমত আনতে গেছে। তাই সে পথ চেয়ে রইল।

রবিবারে তার ভাগ্যেরও ছুটি। আজ সকাল থেকে সে এক পেলা বের করেছে, অগ্রমনস্ক হয়ে মামা তা লক্ষ্য করে নি।

ওদের ইস্কুলের পাশে ছাপাখানা আছে। সেখান থেকে ভায়ে নিজের নামের কয়েকটা সীসের অক্ষর জুটিয়ে এনেছে। তার কোনোটা ছোটো, কোনোটা বড়ো।

যে-কোনো বই পায় এই সীসের অক্ষরে কালি লাগিয়ে তাতে নিজের নাম ছাপাচ্ছে। মামাকে আশ্চর্য করে দিতে হবে।

৪

আশ্চর্য করে দিলে। মামা এক সময়ে বসবার ঘরে এসে দেখে, ছেলেটি ভারি ব্যস্ত।

“কী কানাই, কী করছিস।”

ভায়ে খুব আগ্রহ করেই দেখালে সে কী করছে। কেবল তিনটিমাত্র বই নয়, অন্তত পঁচিশখানা বইয়ে ছাপার অক্ষরে কানাইয়ের নাম।

এ কী কাণ্ড। পড়াশুনোর নাম নেই, ছোঁড়াটার কেবল খেলা। আর, এ কী রকম খেলা।

কানাইয়ের বহু হুঃখে জোটানো নামের অক্ষরগুলি হাত থেকে সে ছিনিয়ে নিলে।

কানাই শোকে চীংকার করে কাঁদে, তার পরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তার পরে থেকে থেকে দমকায় দমকায় কাঁদে ওঠে— কিছুতেই সাধনা মানে না।

বুড়ি কি ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, “কী হয়েছে, বাবা।”

কানাই বললে, “আমার নাম।”

মা এসে বললে, “কী রে কানাই, কী হয়েছে।”

কানাই ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, “আমার নাম।”

কি লুকিয়ে তার হাতে আস্ত একটি কীরপুলি এনে দিলে ; মাটিতে ফেলে দিয়ে সে বললে, “আমার নাম।”

মা এসে বললে, “কানাই, এই নে তোর সেই রেলগাড়িটা।”

কানাই রেলগাড়ি ঠেলে ফেলে বললে, “আমার নাম।”

৫

খিয়েটার থেকে বন্ধু এল।

মামা দরজার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, “কী হল।”

বন্ধু বললে, “ওরা রাজি হল না।”

অনেক ক্ষণ চুপ করে থেকে মামা বললে, “আমার সর্বস্ব ঘর সেও ভালো, আমি নিজে খিয়েটার খুলব।”

বল্লু বললে, “আজ ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবে না ?”

ও বললে, “না, আমার জরতাব ।”

বিকেলে মা এসে বললে, “খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল ।”

ও বললে, “খিদে নেই ।”

সন্ধ্যের সময় স্ত্রী এসে বললে, “তোমার সেই নতুন লেখাটা শোনাবে না ?”

ও বললে, “মাথা ধরেছে ।”

ভায়ে এসে বললে, “আমার নাম ফিরিয়ে দাও ।”

মামা ঠান্ করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলে ।

ভুল স্বর্গ

লোকটি নেহাত বেকার ছিল ।

তার কোনো কাজ ছিল না, কেবল শখ ছিল নানা রকমের ।

ছোটো ছোটো কাঠের চৌকোয় মাটি ঢেলে তার উপরে সে ছোটো ছোটো কিছুক সাজাত । দূর থেকে দেখে মনে হত যেন একটা এলোমেলো ছবি, তার মধ্যে পাখির ঝাঁক ; কিম্বা এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, সেখানে গোরু চরছে ; কিম্বা উঁচুনিচু পাহাড়, তার গা দিয়ে ওটা বুঝি বরনা হবে, কিম্বা পায়ে-চলা পথ ।

বাড়ির লোকের কাছে তার লাজনার সীমা ছিল না । মাঝে মাঝে পণ করত পাগলামি ছেড়ে দেবে, কিন্তু পাগলামি তাকে ছাড়ত না ।

২ .

কোনো কোনো ছেলে আছে সারা বছর পড়ায় কঁাকি দেয়, অথচ পরীক্ষায় খামকা পাশ করে ফেলে । এর সেই দশা হল ।

সমস্ত জীবনটা অকাজে গেল, অথচ স্বভূতর পরে খবর পেলে যে, তার স্বর্গে যাওয়া মঞ্জুর ।

কিন্তু, নিয়তি স্বর্গের পথেও মানুষের সজ ছাড়ে না । দূতগুলো মার্কি ভুল করে তাকে কেজো লোকের স্বর্গে রেখে এল ।

এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই ।

এখানে পুরুষরা বলছে, “হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা ।” মেয়েরা বলছে, “চললুম, ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে ।” সবাই বলে, “সময়ের মূল্য আছে ।” কেউ বলে না,

“সময় অমূল্য।” “আর তো পারা যায় না” ব’লে সবাই আশ্বেপ করে, আর ভারি খুশি হয়। “খেটে খেটে হযরান হলুম” এই নালিশটাই সেখানকার সংগীত।

এ বেচারী কোথাও ফাঁক পায় না, কোথাও খাপ খায় না। রাস্তায় অক্লমনক হয়ে চলে, তাতে ব্যস্ত লোকের পথ আটক করে। চাদরটি পেতে বেখানেই আরাম ক’রে বসতে চায়, শুনতে পায় সেখানেই ফসলের খেত, বীজ পোতা হয়ে গেছে। কেবলই উঠে যেতে হয়, সরে যেতে হয়।

৩

ভারি এক ব্যস্ত মেয়ে স্বর্গের উৎস থেকে রোজ জল নিতে আসে।

পথের উপর দিয়ে সে চলে যায় যেন সেতারের দ্রুত তালের গতির মতো।

তাড়াতাড়ি সে এলো খোঁপা বেঁধে নিয়েছে। তবু দু’চারটে দ্রুত অলক কপালের উপর ঝুঁকে প’ড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে ব’লে উকি মারছে।

স্বর্গীয় বেকার মানুষটি এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, চক্কল বরনার ধারে তমালগাছটির মতো স্থির।

জানলা থেকে ভিক্ষুককে দেখে রাজকন্টার যেমন দয়া হয়, একে দেখে মেয়েটির তেমনি দয়া হল।

“আহা, তোমার হাতে বুঝি কাজ নেই?”

নিখাস ছেড়ে বেকার বললে, “কাজ করব তার সময় নেই।”

মেয়েটি ওর কথা কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, “আমার হাত থেকে কিছু কাজ নিতে চাও?”

বেকার বললে, “তোমার হাত থেকেই কাজ নেব ব’লে দাঁড়িয়ে আছি।”

“কী কাজ দেব।”

“তুমি যে ঘড়া কাঁধে করে জল তুলে নিয়ে যাও তারই একটি যদি আমাকে দিতে পার।”

“ঘড়া নিয়ে কী হবে। জল তুলবে?”

“না, আমি তার গায়ে চিত্র করব।”

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বললে, “আমার সময় নেই, আমি চললুম।”

কিন্তু, বেকার লোকের সঙ্গে কাজের লোক পারবে কেন। রোজ ওদের উৎসর্গলায় দেখা হয় আর রোজ সেই একই কথা, “তোমার কাঁধের একটি ঘড়া দাও, তাতে চিত্র করব।”

হার মানতে হল, ঘড়া দিলে ।

সেইটিকে ঘিরে ঘিরে বেকার আঁকতে লাগল কত রঙের পাক, কত রেখার ঘের ।

আঁকা শেষ হলে মেয়েটি ঘড়া তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে । ভুরু ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “এর মানে ?”

বেকার লোকটি বললে, “এর কোনো মানে নেই ।”

ঘড়া নিয়ে মেয়েটি বাড়ি গেল ।

সবার চোখের আড়ালে বসে সেটিকে সে নানা আলোতে নানা রকমে হেলিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে । রাত্রে থেকে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠে দীপ জ্বলে চূপ করে বসে সেই চিত্রটা দেখতে লাগল । তার বয়সে এই সে প্রথম এমন কিছু দেখেছে যার কোনো মানে নেই ।

তার পরদিন যখন সে উৎসতলায় এল তখন তার দুটি পায়ের ব্যস্ততায় একটু ঘেন বাধা পড়েছে । পা দুটি ঘেন চলতে চলতে আনমনা হয়ে ভাবছে— যা ভাবছে তার কোনো মানে নেই ।

সেদিনও বেকার মানুষ এক পাশে দাঁড়িয়ে ।

মেয়েটি বললে, “কী চাও ।”

সে বললে, “তোমার হাত থেকে আরও কাজ চাই ।”

“কী কাজ দেব ।”

“যদি রাজি হও, রঙিন সূতো বুনে বুনে তোমার বেণী বাঁধবার দড়ি তৈরি করে দেব ।”

“কী হবে ।”

“কিছুই হবে না ।”

নানা রঙের নানা-কাজ-করা দড়ি তৈরি হল । এখন থেকে আয়না হাতে নিয়ে বেণী বাঁধতে মেয়ের অনেক সময় লাগে । কাজ পড়ে থাকে, বেলা বয়ে যায় ।

৪

এ দিকে দেখতে দেখতে কেজো স্বর্গে কাজের খন্দো বড়ো বড়ো ফাঁক পড়তে লাগল । কান্নায় আর গানে সেই ফাঁক ভরে উঠল ।

স্বর্গীয় প্রবীণেরা বড়ো চিন্তিত হল । সভা ডাকলে । তারা বললে, “এখানকার ইতিহাসে কখনো এমন ঘটে নি ।”

স্বর্গের দূত এসে অপরাধ স্বীকার করলে। সে বললে, “আমি ভুল লোককে ভুল স্বর্গে এনেছি।”

ভুল লোকটিকে সভায় আনা হল। তার রঙিন পাগড়ি আর কোমরবন্ধের বাহার দেখেই সবাই বুঝলে, বিষম ভুল হয়েছে।

সভাপতি তাকে বললে, “তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে।”

সে তার রঙের ঝুলি আর তুলি কোমরে বেঁধে হাঁফ ছেড়ে বললে, “তবে চললুম।”

মেয়েটি এসে বললে, “আমিও যাব।”

প্রবীণ সভাপতি কেমন অন্তমনস্ত হয়ে গেল। এই সে প্রথম দেখলে এমন-একটা কাণ্ড যার কোনো মানে নেই।

রাজপুত্ৰ

রাজপুত্ৰ চলেছে নিজের রাজ্য ছেড়ে, সাত রাজার রাজ্য পেরিয়ে, যে দেশে কোনো রাজার রাজ্য নেই সেই দেশে।

সে হল যে কালের কথা সে কালের আরম্ভও নেই, শেষও নেই।

শহরে গ্রামে আর-সকলে হাটবাজার করে, ঘর করে, ঝগড়া করে; যে আমাদের চিরকালের রাজপুত্ৰ সে রাজ্য ছেড়ে ছেড়ে চলে যায়।

কেন যায়।

কুয়োর জল কুয়োতেই থাকে, খাল বিলের জল খাল বিলের মধ্যেই শাস্ত। কিন্তু, গিরিশিখরের জল গিরিশিখরে ধরে না, মেঘের জল মেঘের বাঁধন মানে না। রাজপুত্ৰকে তার রাজাটুকুর মধ্যে ঠেকিয়ে রাখবে কে। তেপান্তর মাঠ দেখে সে ফেরে না, সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হয়ে যায়।

মাহুষ বারে বারে শিক্ত হয়ে জন্মায় আর বারে বারে নতুন করে এই পুরাতন কাহিনীটি শোনে। সন্ধ্যাপ্রদীপের আলো স্থির হয়ে থাকে, ছেলেরা চুপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, “আমরা সেই রাজপুত্ৰ।”

তেপান্তর মাঠ যদি বা ফুরোয়, সামনে সমুদ্র। তারই মাঝখানে দ্বীপ, সেখানে দৈতাপুরীতে রাজকন্ডা বাঁধা আছে।

পৃথিবীতে আর-সকলে টাকা খুঁজছে, নাম খুঁজছে, আরাম খুঁজছে, আর যে আমাদের রাজপুত্ৰ সে দৈতাপুরী থেকে রাজকন্ডাকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। তুফান উঠল, নৌকে। মিলল না, তবু সে পথ খুঁজছে।

এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-গোড়াকার রূপকথা আর সব-শেষের। পৃথিবীতে যারা নতুন জন্মেছে দিদিমার কাছে তাদের এই চিরকালের খবরটি পাওয়া চাই যে, রাজকন্যা বন্দিনী, সমুদ্র দুর্গম, দৈত্য দুর্জয়, আর ছোটো মানুষটি একলা দাঁড়িয়ে পণ করছে, “বন্দিনীকে উদ্ধার করে আনব।”

বাইরে বনের অন্ধকারে কৃষ্টি পড়ে, ঝিল্লি ডাকে, আর ছোটো ছেলেটি চূপ করে গালে হাত দিয়ে ভাবে, “দৈত্যপুরীতে আমাকে পাড়ি দিতে হবে।”

২

সামনে এল অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো। সেখানে রাজপুত্র ঘোড়ার উপর থেকে নেমে পড়ল।

কিন্তু, যেমনি মাটিতে পা পড়া অমনি এ কী হল। এ কোন্ জাদুকরের জাদু।

এ যে শহর। ট্রাম চলেছে। আপিসমুখো গাড়ির ভিড়ে রাস্তা দুর্গম। তালপাতার বাশি-ওয়ালা গলির ধারে উলঙ্গ ছেলেদের লোভ দেখিয়ে বাশিতে ফুঁ দিয়ে চলেছে।

আর, রাজপুত্রের এ কী বেশ। এ কী চাল। গায়ে বোতামপোলা জামা, ধুতিটা খুব সাফ নয়, জুতোজোড়া জীর্ণ। পাড়ারগায়ের ছেলে, শহরে পড়ে, টিউশনি করে বাগাথরচ চালায়।

রাজকন্যা কোথায়।

তার বাগার পাশের বাড়িতেই।

চাঁপাফুলের মতো রঙ নয়, হাসিতে তার মানিক খসে না। আকাশের তারার সঙ্গে তার তুলনা হয় না, তার তুলনা নববর্ষার ঘাসের আড়ালে যে নামহারা ফুল কোটে তারই সঙ্গে।

মা-মরা মেয়ে বাপের আদরের ছিল। বাপ ছিল গরিব, অপাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইল না, মেয়ের বয়স গেল বেড়ে, সকলে নিম্নে করলে।

বাপ গেছে মরে, এখন মেয়ে এসেছে খুড়োর বাড়িতে।

পাত্রেয় সন্ধান মিলল। তার টাকাও বিস্তর, বয়সও বিস্তর, আর নাতিনাৎনির সংখ্যাও অল্প নয়। তার দাবরাবের সীমা ছিল না।

খুড়ো বললেন, মেয়ের কপাল ভালো।

এমন সময় গায়ে-হলুদের দিনে মেয়েটিকে দেখা গেল না, আর পাশের বাগার সেই ছেলেটিকে।

খবর এল, তারা লুকিয়ে বিবাহ করেছে। তাদের জাতের মিল ছিল না, ছিল কেবল মনের মিল। সকলেই নিন্দে করলে।

লক্ষপতি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে গোনার সিংহাসন মানত করে বললেন, “এ ছেলেকে কে বাঁচায়।”

ছেলেটিকে আদালতে দাঁড় করিয়ে বিচক্ষণ সব উকিল প্রবীণ সব সাক্ষী দেবতার কৃপায় দিনকে রাত করে তুললে। সে বড়ো আশ্চর্য।

সেইদিন ইষ্টদেবতার কাছে জোড়া পাটা কাটা পড়ল, ঢাক ঢোল বাজল, সকলেই খুশি হল। বললে, “কলিকাল বটে, কিন্তু ধর্ম এখনো জেগে আছেন।”

৩

তার পরে অনেক কথা। জেল থেকে ছেলেটি ফিরে এল। কিন্তু, দীর্ঘ পথ আর শেষ হয় না। তেপান্তর মাঠের চেয়েও সে দীর্ঘ এবং সন্নিহীন। কতবার অন্ধকারে তাকে শুনেছে হল, “হাউমাউখাউ, মাহুঘের গন্ধ পাউ।” মাহুঘকে খাবার জন্তে চারি দিকে এত লোভ।

রাস্তার শেষ নেই কিন্তু চলার শেষ আছে। একদিন সেই শমে এসে সে থামল।

সেদিন তাকে দেখবার লোক কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি ঘুম।

সেই যমের সোনার কাঠি যেমনি ছোঁয়ানো অমনি এ কী কাণ্ড। শহর গেল মিলিয়ে, স্বপ্ন গেল ভেঙে।

মুহুর্তে আবার দেখা দিল সেই রাজপুত্র। তার কপালে অসীমকালের রাজটিকা। দৈত্যপুত্রীর দ্বার সে ভাঙবে, রাজকন্টার শিকল সে খুলবে।

যুগে যুগে পিতৃরা মায়ের কোলে বসে খবর পায়— সেই ঘরছাড়া মাহুঘ তেপান্তর মাঠ দিয়ে কোথায় চলল। তার সামনের দিকে সাত সমুদ্রের ঢেউ গর্জন করেছে।

ইতিহাসের মধ্যে তার বিচিত্র চেহারা; ইতিহাসের পরপারে তার একই রূপ, সে রাজপুত্র।

সুয়োরানীর সাধ

সুয়োরানীর বুঝি মরণকাল এল ।

তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে, তার কিছুই ভালো লাগছে না । বন্ধি বড়ি নিয়ে এল । মধু দিয়ে মেড়ে বললে, “খাও ।” সে ঠেলে ফেলে দিলে ।

রাজার কানে খবর গেল । রাজা তাড়াতাড়ি সভা ছেড়ে এল । পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার কী হয়েছে, কী চাই ।”

সে গুমরে উঠে বললে, “তোমরা সবাই যাও ; একবার আমার স্যাঙাংনিকে ডেকে দাও ।”

স্যাঙাংনি এল । রানী তার হাত ধরে বললে, “সই, বসো । কথা আছে ।”

স্যাঙাংনি বললে, “প্রকাশ করে বলো ।”

সুয়োরানী বললে, “আমার সাতমহলা বাড়ির এক ধারে তিনটে মহল ছিল দুয়োরানীর । তার পরে হল দুটো, তার পরে হল একটা । তার পরে রাজবাড়ি থেকে সে বের হয়ে গেল ।

তার পরে দুয়োরানীর কথা আমার মনেই রইল না ।

তার পরে একদিন দোলযাত্রা । নাটমন্দিরে ষাচ্ছি ময়ূরপংখি চ’ড়ে । আগে লোক, পিছে লশকর । ভাইনে বাজে বাঁশি, বায়ে বাজে মৃদঙ্গ ।

এমনসময় পথের পাশে, নদীর ধারে, ঘাটের উপরটিতে দেখি একখানি কুঁড়েঘর, চাপাগাছের ছায়ায় । বেড়া বেয়ে অপরাজিতার স্কুল ফুটেছে, দুহোরের সামনে চালের গুঁড়ো দিয়ে শঙ্খচক্রের আলপনা । আমার ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, ‘আহা, ঘরখানি কার ।’ সে বললে, দুয়োরানীর ।

তার পরে ঘরে ফিরে এসে সন্ধ্যার সময় বসে আছি, ঘরে প্রদীপ জালি নি, মুখে কথা নেই ।

রাজা এসে বললে, ‘তোমার কী হয়েছে, কী চাই ।’

আমি বললেম, ‘এ ঘরে আমি থাকব না ।’

রাজা বললে, ‘আমি তোমার কোঠাবাড়ি বানিয়ে দেব গজদস্তের দেওয়াল দিয়ে । শঙ্খের গুঁড়োয় মেঝেটি হবে দুধের ফেনার মতো সাদা, মুক্তার ঝিলুক দিয়ে তার কিনারে ঐকে দেব পদ্মের মালা ।’

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ গিয়েছে, কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকি তোমার বাহির-বাগানের একটি ধারে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

কুঁড়েঘর বানিয়ে দিলে। সে ঘর যেন তুলে-আনা বনফুল। যেমনি তৈরি হল অমনি যেন মুষড়ে গেল। বাস করতে গেলেম, কেবল লজ্জা পেলেম।

তার পরে একদিন স্নানযাত্রা।

নদীতে নাইতে গেছি। সঙ্গে একশো সাত জন সঙ্গিনী। জলের মধ্যে পাঙ্কি নামিয়ে দিলে, স্নান হল।

পথে ফিরে আসছি, পাঙ্কির দরজা একটু ফাঁক করে দেখি, ও কোন্ ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় ক'রে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'মেয়েটি কে, কোন্ দেবমন্দিরে তপস্কা করে।'

ছত্রধারিণী হেসে বললে, 'চিনতে পারলে না? ঐ তো ছুয়োরানী।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই। রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ সকালে নদীতে নেয়ে মাটির ঘড়ায় জল তুলে আনব বকুলতলার রাস্তা দিয়ে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

রাস্তায় রাস্তায় পাহারা বসল, লোকজন গেল সরে।

সাদা শাঁখা পরলেম আর লালপেড়ে শাড়ি। নদীতে স্নান সেরে ঘড়ায় করে জল তুলে আনলেম। ছুয়োরের কাছে এসে মনের দুখে ঘড়া আছড়ে ভাঙলেম। যা ভেবেছিলেম তা হল না, শুধু লজ্জা পেলেম।

তার পরে সেদিন রাসযাত্রা।

মধুবনে জ্যোৎস্নারাতে তাঁবু পড়ল। সমস্ত রাত নাচ হল, গান হল।

পরদিন সকালে হাতির উপর হাওদা চড়ল। পদার আড়ালে বসে ঘরে ফিরছি, এমন সময় দেখি, বনের পথ দিয়ে কে চলেছে, তার নবীন বয়েস। চুড়ায় তার বনফুলের মালা। হাতে তার ডালি; তাতে শালুক ফুল, তাতে বনের ফস, তাতে খেতের শাক।

ছত্রধারিণীকে শুধোলেম, 'কোন্ ভাগ্যবতীর ছেলে পথ আলো করেছে।'

ছত্রধারিণী বললে, 'জান না? ঐ তো ছয়োরানীর ছেলে। ওর মার জন্তে নিয়ে চলেছে শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক।'

তার পরে ঘরে ফিরে একলা বসে আছি, মুখে কথা নেই।

রাজা এসে বললে, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

আমি বললেম, 'আমার বড়ো সাধ, রোজ খাব শালুক ফুল, বনের ফল, খেতের শাক ; আমার ছেলে নিজের হাতে তুলে আনবে।'

রাজা বললে, 'আচ্ছা বেশ, তার আর ভাবনা কী।'

সোনার পালকে বসে আছি, ছেলে ডালি নিয়ে এস। তার সর্বাঙ্গে ঘাম, তার মুখে রাগ। ডালি পড়ে রইল, লজ্জা পেলেম।

তার পরে আমার কী হল কী জানি।

একলা বসে থাকি, মুখে কথা নেই। রাজা রোজ এসে আমাকে শুধায়, 'তোমার কী হয়েছে, কী চাই।'

স্বয়োরানী হয়েও কী চাই সে কথা লজ্জায় কাউকে বলতে পারি নে। তাই তোমাকে ডেকেছি, শ্রাঙাংনি। আমার শেষ কথাটি বলি তোমার কানে, 'ঐ ছয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।' "

শ্রাঙাংনি গালে হাত দিয়ে বললে, "কেন বলো তো।"

স্বয়োরানী বললে, "ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে স্বর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।"

বিদূষক

কাঞ্চীর রাজা কর্ণাট জয় করতে গেলেন। তিনি হলেন জয়ী। চন্দনে, হাতির দাঁতে, আর সোনামানিকে হাতি বোঝাই হল।

দেশে ফেরবার পথে বলেখরীর মন্দির বলির রক্তে ভাসিয়ে দিয়ে রাজা পূজা দিলেন।

পূজা দিয়ে চলে আসছেন— গায়ে রক্তবস্ত্র, গলায় জবার মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক ; সঙ্গে কেবল মন্ত্রী আর বিদূষক।

এক জায়গায় দেখলেন, পথের ধারে আমবাগানে ছেলেরা খেলা করছে।
রাজা তাঁর দুই সজীকে বললেন, “দেখে আসি, ওরা কী খেলছে।”

২

ছেলেরা দুই গায়ি পুতুল গাজিয়ে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলছে।
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কার সঙ্গে কার যুদ্ধ।”
ভারা বললে, “কর্ণাটের সঙ্গে কাঞ্চীর।”
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কার জিত, কার হার।”
ছেলেরা বুক ফুলিয়ে বললে, “কর্ণাটের জিত, কাঞ্চীর হার।”
মন্ত্রী মুখ গম্ভীর হল, রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ, বিদূষক হা হা ক’রে হেসে উঠল।

৩

রাজা যখন তাঁর সৈন্য নিয়ে ফিরে এলেন, তখনো ছেলেরা খেলছে।
রাজা হুকুম করলেন, “এক-একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বাঁধো, আর লাগাও
বেত।”
গ্রাম থেকে তাদের মা-বাপ ছুটে এল। বললে, “ওরা অবোধ, ওরা খেলা করছিল,
ওদের মাঁপ করো।”
রাজা সেনাপতিকে ডেকে বললেন, “এই গ্রামকে শিকা দেবে, কাঞ্চীর রাজাকে
কোনোদিন যেন ভুলতে না পারে।”
এই বলে শিবিরে চলে গেলেন।

৪

সন্ধ্যাবেলায় সেনাপতি রাজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রণাম করে বললে,
“মহারাজ, শৃগাল কুকুর ছাড়া এ গ্রামে কারো মুখে শব্দ শুনতে পাবে না।”
মন্ত্রী বললে, “মহারাজের মান রক্ষা হল।”
পুরোহিত বললে, “বিশ্বেশ্বরী মহারাজের সহায়।”
বিদূষক বললে, “মহারাজ, এবার আমাকে বিদায় দিন।”
রাজা বললেন, “কেন।”
বিদূষক বললে, “আমি মারতেও পারি নে, কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে
আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।”

ঘোড়া

সৃষ্টির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যখন ছুটির দণ্টা বাজে ব'লে, হেনকালে ব্রহ্মার মাথায় একটা ভাবোদয় হল।

ভাঙরীকে ডেকে বললেন, “ওহে ভাঙরী, আমার কারখানাঘরে কিছু কিছু পঞ্চভূতের জোঁগাড় করে আনো, আর-একটা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করব।”

ভাঙরী হাত জোড় করে বললে, “পিতামহ, আপনি যখন উৎসাহ করে হাতি গড়লেন, তিমি গড়লেন, অজগর সর্প গড়লেন, সিংহ ব্যাঘ্র গড়লেন, তখন হিসাবের দিকে আদৌ খেয়াল করলেন না। যতগুলো ভারী আর কড়া জাতের ভূত ছিল সব প্রায় নিকাশ হয়ে এল। ক্ষিতি অপ-তেজ তলায় এসে ঠেকেছে। থাকবার মধ্যে আছে মরুৎ ব্যোম, তা সে যত চাই।”

চতুর্মুখ কিছুক্ষণ ধরে চারজোড়া গোঁফে তা দিয়ে বললেন, “আচ্ছা ভালো, ভাঙারে যা আছে তাই নিয়ে এসো, দেখা যাক।”

এবারে প্রাণীটিকে গড়বার বেলা ব্রহ্মা ক্ষিতি-অপ-তেজটাকে খুব হাতে রেখে খরচ করলেন। তাকে না দিলেন শিঙ, না দিলেন নখ; আর দাঁত যা দিলেন তাতে চিবনো চলে, কামড়ানো চলে না। তেজের ভাণ্ড থেকে কিছু খরচ করলেন বটে, তাতে প্রাণীটা যুদ্ধক্ষেত্রের কোনো কোনো কাজে লাগবার মতো হল কিন্তু তার লড়াইয়ের শখ রইল না। এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া। এ ডিম পাড়ে না তবু বাজারে তার ডিম নিয়ে একটা গুজব আছে, তাই একে হিজ বলা চলে।

আর যাই হোক, সৃষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় বোলো-আনা গেল মুক্তির দিকে। এ হাওয়ায় আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে ব'লে পণ ক'রে বসে। অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। কিছু কাড়তে চায় না, কাউকে মারতে চায় না, কেবলই পালাতে চায়—পালাতে পালাতে একেবারে বৃন্দ হয়ে যাবে, স্কিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তার পরে ‘না’ হয়ে যাবে, এই তার মংলব। জ্ঞানীরা বলেন, ধাতের মধ্যে মরুৎব্যোম যখন ক্ষিতি-অপ-তেজকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ওঠে তখন এইরকমই ঘটে।

ব্রহ্মা বড়ো খুশি হলেন। বাগার জন্তে তিনি অল্প অল্প কাউকে দিলেন বন, কাউকে দিলেন গুহা, কিন্তু এর ঘোড় দেখতে ভালোবাসেন ব'লে একে দিলেন খোলা মাঠ।

মাঠের ধারে থাকে মাহুঘ। কাড়াকুড়ি করে সে ঘা-কিছু জমায় সমস্তই মস্ত বোঝা হয়ে ওঠে। তাই যখন মাঠের মধ্যে ঘোড়াটাকে ছুটতে দেখে মনে মনে ভাবে, “এটাকে কোনো গতিকে বাঁধতে পারলে আমাদের হাট করার বড়ো সুবিধে।”

ফাগ লাগিয়ে ধরলে একদিন ঘোড়াটাকে। তার পিঠে দিলে জিন, মুখে দিলে কাঁটা লাগায়। ঘাড়ে তার লাগায় চাবুক আর কাঁধে মারে জুতোর শেল। তা ছাড়া আছে দলামলা।

মাঠে ছেড়ে রাখলে হাতছাড়া হবে, তাই ঘোড়াটার চারি দিকে পাঁচিল তুলে দিলে। বাঘের ছিল বন, তার বনই রইল; সিংহের ছিল গুহা, কেউ কাড়ল না। কিন্তু, ঘোড়ার ছিল খোলা মাঠ, সে এসে ঠেকল আস্তাবলে। প্রাণীটাকে মক্খবোঝা মুক্তির দিকে অত্যন্ত উসকে দিলে, কিন্তু বন্ধন থেকে বাঁচাতে পারলে না।

যখন অসহ্য হল তখন ঘোড়া তার দেয়ালটার 'পরে লাধি চালাতে লাগল। তার পা যতটা জখম হল দেয়াল ততটা হল না; তবু, চুন বালি খ'সে দেয়ালের সৌন্দর্য নষ্ট হতে লাগল।

এতে মাহুঘের মনে বড়ো রাগ হল। বললে, “একেই বলে অকৃতজ্ঞতা। দানাপানি খাওয়াই, মোটা মাইনের সইস আনিয়ে আট গ্রহর ওর পিছনে খাড়া রাখি, তবু মন পাই নে।”

মন পাবার জন্তে সইসগুলো এমনি উঠে পড়ে ভাঙা চালালে যে, ওর আর লাধি চলল না। মাহুঘ তার পাড়াপড়শিকে ডেকে বললে, “আমার এই বাহনটির মতো এমন ডক্ত বাহন আর নেই।”

তার। তারিফ করে বললে, “তাই তো, একেবারে জলের মতো ঠাণ্ডা। তোমারই ধর্মের মতো ঠাণ্ডা।”

একে তো গোড়া থেকেই ওর উপযুক্ত দাঁত নেই, নখ নেই, শিঙ নেই, তার পরে দেয়ালে এবং তদভাবে খুন্সে লাধি ছোঁড়াও বন্ধ। তাই মনটাকে খোলসা করার জন্তে আকাশে মাথা তুলে সে চিঁহি চিঁহি করতে লাগল। তাতে মাহুঘের ঘুম ভেঙে যায় আর পাড়াপড়শিরাও ভাবে, আওয়াজটা তো ঠিক ভক্তিগদগদ শোনাচ্ছে না। মুখ বন্ধ করার অনেকরকম যন্ত্র বেরোল। কিন্তু, ঘম বন্ধ না করলে মুখ তো একেবারে

বন্ধ হয় না। তাই চাপা আওয়াজ মুম্বুর খাবির মতো মাঝে মাঝে বেরোতে থাকে।

একদিন সেই আওয়াজ গেল ব্রহ্মার কানে। তিনি ধ্যান ভেঙে একবার পৃথিবীর খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। সেখানে ঘোড়ার চিহ্ন নেই।

পিতামহ যমকে ডেকে বললেন, “নিশ্চয় তোমারই কীর্তি! আমার ঘোড়াটিকে নিয়েছ।”

যম বললেন, “সৃষ্টিকর্তা, আমাকেই তোমার যত সন্দেহ। একবার মানুষের পাড়ার দিকে তাকিয়ে দেখো।”

ব্রহ্মা দেখেন, অতি ছোটো জায়গা, চার দিকে পাঁচিল তোলা; তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি করছে।

হৃদয় তাঁর বিচলিত হল। মানুষকে বললেন, “আমার এই জীবকে যদি মুক্তি না দাও তবে বাঘের মতো ওর নখদন্ত বানিয়ে দেব, ও তোমার কোনো কাজে লাগবে না।”

মানুষ বললে, “ছি ছি, তাতে হিংস্রতার বড়ো প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু, যাই বল, পিতামহ, তোমার এই প্রাণীটি মুক্তির যোগাই নয়। ওর হিতের ক্ষণেই অনেক খরচে আস্তাবল বানিয়েছি। খাসা আস্তাবল।”

ব্রহ্মা জেদ করে বললেন, “ওকে ছেড়ে দিতেই হবে।”

মানুষ বললে, “আচ্ছা, ছেড়ে দেব। কিন্তু, সাত দিনের মেয়াদে; তার পরে যদি বল, তোমার মাঠের চেয়ে আমার আস্তাবল ওর পক্ষে ভালো নয়, তা হলে নাকে খত দিতে রাঙ্গি আছি।”

মানুষ করলে কী, ঘোড়াটাকে মাঠে দিলে ছেড়ে; কিন্তু, তার সামনের দুটো পায়ে কষে রশি বাঁধল। তখন ঘোড়া এমনি চলতে লাগল যে, ব্যাঙের চাল তার চেয়ে সুন্দর।

ব্রহ্মা থাকেন সুদূর স্বর্গে; তিনি ঘোড়াটার চাল দেখতে পান, তার হাঁটুর বাঁধন দেখতে পান না। তিনি নিজের কীর্তির এই ভাঁড়ের মতো চালচলন দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেন। বললেন, “ভুল করেছি তো।”

মানুষ হাত জোড় করে বললে, “এখন এটাকে নিয়ে করি কী। আপনার ব্রহ্মলোকে যদি মাঠ থাকে তো বরঞ্চ সেইখানে রওনা করে দিই।”

ব্রহ্মা ব্যাকুল হয়ে বললেন, “যাও যাও, ফিরে নিয়ে যাও তোমার আস্তাবলে।”

মানুষ বললে, “আদিদেব, মানুষের পক্ষে এ যে এক বিষম বোঝা।”

ব্রহ্মা বললেন, “সেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব।”

কর্তার ভূত

বুড়ো কর্তার মরণকালে দেশস্থ সবারই বলে উঠল, “তুমি গেলে আমাদের কী দশা হবে।”

শুনে তারও মনে দুঃখ হল। ভাবলে, “আমি গেলে এদের ঠাণ্ডা রাখবে কে।”

তা ব’লে মরণ তো এড়াবার জো নেই। তবু দেবতা দয়া করে বললেন, “ভাবনা কী। লোকটা ভূত হয়েই এদের ঘাড়ে চেপে থাক-না। মানুষের মৃত্যু আছে, ভূতের তো মৃত্যু নেই।”

২

দেশের লোক তারি নিশ্চিন্ত হল।

কেননা ভবিষ্যৎকে মানলেই তার জন্মে যত ভাবনা, ভূতকে মানলে কোনো ভাবনাই নেই ; সকল ভাবনা ভূতের মাথায় চাপে। অথচ তার মাথা নেই, মৃতরাং কারো জন্মে মাথাবাথাও নেই।

তবু স্বভাবদোষে যারা নিজেই ভাবনা নিজে ভাবতে যায় তারা যায় ভূতের কানমলা। সেই কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিকল্পে না চলে নাশিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার।

দেশস্থ লোক ভূতগ্রস্ত হয়ে চোখ বুজে চলে। দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন, “এই চোখ বুজে চলাই হচ্ছে জগতের সবচেয়ে আদমি চল। একেই বলে অদৃষ্টের চলে চল। সৃষ্টির প্রথম চকুছীন কীটগুয়া এই চলা চলত ; ঘাসের মতো, গাছের মতো, আঙ্গু এই চলার আভাস প্রচলিত।”

শুনে ভূতগ্রস্ত দেশ আপন আদমি আভিজাত্য অস্বভব করে। তাতে অত্যন্ত আনন্দ পায়।

ভূতের নায়েব ভূতুড়ে জেলখানার দারোগা। সেই জেলখানার দেয়াল চোখে দেখা যায় না। এইজন্মে ভেবে পাওয়া যায় না, সেটাকে ফুটো করে কী উপায়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব।

এই জেলখানায় যে ঘানি নিরন্তর ঘোরাতে হয় তার থেকে এক ছটাক তেল বেরোয় না যা ছাটে বিকোতে পারে, বেরোবার মতো বেরিয়ে যায় মানুষের তেজ। সেই তেজ বেরিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাতে করে ভূতের রাজত্বে আর কিছুই না থাক— অন্ন হোক, বস্ত্র হোক, বাস্তু হোক— শাস্তি থাকে।

কত-যে শাস্তি তার একটা নৃষ্টান্ত এই যে, অন্য সব দেশে ভূতের বাড়াবাড়ি হলেই মানুষ অস্থির হয়ে ওঠার খোঁজ করে। এখানে সে চিন্তাই নেই। কেননা ওঝাকেই আগেভাগে ভূতে পেয়ে বসেছে।

৩

এই ভাবেই দিন চলত, ভূতশাসনতন্ত্র নিয়ে কারো মনে বিদ্যা জাগত না; চিরকালই গর্ব করতে পারত যে, এদের ভবিষ্যৎটা পোষা ভেড়ার মতো ভূতের খোঁটার বীধা, সে ভবিষ্যৎ ভ্যা'ও করে না, ম্যা'ও করে না, চূপ করে পড়ে থাকে মাটিতে, যেন একেবারে চিরকালের মতো মাটি।

কেবল অতি সামান্য একটা কারণে একটু মুশকিল বাধল। সেটা হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলোকে ভূতে পায় নি। তাই অন্য সব দেশে যত ঘানি ঘোরে তার থেকে তেল বেরোয় তাদের ভবিষ্যতের রথচক্রটাকে সচল করে রাখবার জন্তে, বুকের রক্ত পিষে ভূতের ঋপরে ঢেলে দেবার জন্তে নয়। কাজেই মানুষ সেখানে একেবারে জুড়িয়ে যায় নি। তারা ভয়ংকর সজাগ আছে।

৪

এ দিকে দিবি ঠাণ্ডায় ভূতের রাজ্য জুড়ে 'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো'।

সেটা খোকায় পক্ষে আরামের, খোকায় অভিভাবকের পক্ষেও; আর পাড়ার কথা তো বলাই আছে।

কিন্তু, 'বর্গি এল দেশে'।

নইলে ছন্দ মেলে না, ইতিহাসের পদটা খোঁড়া হয়েই থাকে।

দেশে যত শিরোমণি চূড়ামণি আছে সবাইকে সিজ্ঞাসা করা গেল, "এমন হল কেন।"

তারা এক বাক্যে শিখা নেড়ে বললে, "এটা ভূতের দোষ নয়, তুতুড়ে দেশের দোষ নয়, একমাত্র বর্গিরই দোষ। বর্গি আসে কেন।"

শুনে সকলেই বললে, "তা তো বটেই।" অত্যন্ত সাদৃশ্য বোধ করলে।

দোষ যারই থাক্, খিড়কির আনাচে-কানাচে ঘোরে ভূতের পেয়াদা, আর সদরের রাস্তায়-ঘাটে ঘোরে অভূতের পেয়াদা; ঘরে গেরস্তর টেকা দায়, ঘর থেকে বেরোবারও পথ নেই। এক দিক থেকে এ হাঁকে, "খাজনা দাও।" আর-এক দিক থেকে ও হাঁকে, "খাজনা দাও।"

এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে ‘খাজনা দেব কিসে’।

এতকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে কাঁকে কাঁকে নানা জাতের বুলবুলি এসে যেসকল ধান খেয়ে গেল, কারো হাঁশ ছিল না। জগতে যারা হাঁশিয়ার এরা তাদের কাছে ঘেঁষতে চায় না, পাছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্তু, তারা অকস্মাৎ এদের অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে, এবং প্রায়শ্চিত্তও করে না। শিরোমণি-চুড়ামণির দল পুঁথি খুলে বলেন, “বেহাঁশ যারা তারাই পবিত্র, হাঁশিয়ার যারা তারাই অশুচি, অতএব হাঁশিয়ারদের প্রতি উদাসীন থেকে, প্রবুদ্ধমিব স্থপ্তঃ।”

তুনে সকলের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

৫

কিন্তু, তৎসত্ত্বেও এ প্রসঙ্গে ঠেকানো যায় না ‘খাজনা দেব কিসে’।

অশ্বান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক’রে তার উত্তর আসে, “আক্র দিয়ে, ইচ্ছাত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে।”

প্রশ্নমাজেরই দোষ এই যে, যখন আসে একা আসে না। তাই আরও একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, “ভূতের শাসনটাই কি অনন্তকাল চলবে।”

তুনে ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আর মাসভূতো-পিসভূতোর দল কানে হাত দিয়ে বলে, “কী সর্বনাশ। এমন প্রশ্ন তো বাপের জন্মে শুনি নি। তা হলে সনাতন ঘুমের কী হবে— সেই আদিমতম, সকল জাগরণের চেয়ে প্রাচীনতম ঘুমের?”

প্রশ্নকারী বলে, “সে তো বুঝলুম, কিন্তু আধুনিকতম বুলবুলির কাঁক আর উপস্থিততম বগির দল, এদের কী করা যায়।”

মাসিপিসি বলে, “বুলবুলির কাঁককে কৃষ্ণনাম শোনাব, আর বগির দলকেও।”

অবাচীনেরা উদ্ধত হয়ে বলে ওঠে, “যেমন করে পারি ভূত ছাড়াব।”

ভূতের নায়েব চোখ পাকিয়ে বলে, “চূপ। এখনো ঘানি অচল হয় নি।”

তুনে দেশের খোকা নিস্তব্ধ হয়, তার পরে পাশ ফিরে শোয়।

৬

মোক্ষা কথাটা হচ্ছে, বুড়ো কর্তা বেঁচেও নেই, মরেও নেই, ভূত হয়ে আছে। দেশটাকে সে নাড়েও না, অথচ ছাড়েও না।

দেশের মধ্যে দুটো-একটা মাজুব, যারা দিনের বেলা নায়েবের ভয়ে কথা কয় না, তারা গভীর রাতে হাত জোড় করে বলে, “কর্তা, এখনো কি ছাড়বার সময় হয় নি।”

কর্তা বলেন, “ওরে অবোধ, আমার ধরাও নেই, ছাড়াও নেই, তোরা ছাড়লেই আমার ছাড়া।”

তারা বলে, “ভয় করে যে কর্তা।”

কর্তা বলেন, “সেইখানেই তো ভূত।”

তোতাকাহিনী

এক-ঘে ছিল পাখি। সে ছিল মূর্থ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না।
লাফাইত, উড়িত, জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, “এমন পাখি তো কাছে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া
রাজহাটে ফলের বাজারে লোকমান ঘটায়।”

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, “পাখিটাকে শিক্ষা দাও।”

২

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখিটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রথমে এই, উক্ত জীবের অবিচার
কারণ কী।

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখি যে বাসা বাঁধে সে বাসায় বিজ্ঞা বেশি ধরে
না। তাই সকলের আগে দরকার, ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুশি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

৩

শ্রাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য যে,
দেখিবার ক্ষমতা দেশবিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, “শিক্ষার একেবারে
হৃদযুগ্ম।” কেহ বলে, “শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা তো হইল। পাখির কী কপাল।”

শ্রাকরা খলি বোঝাই করিয়া বকশিশ পাইল। খুশি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল
বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখিকে বিজ্ঞা শিখাইতে। নশ্ত লইয়া বলিলেন, “অল্প পুঁথির
কর্ম নয়।”

ভাগিনা তখন পুঁথিলিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এক

নকলের নকল করিয়া পৰ্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, “সাবাস। বিজ্ঞা আর ধরে না।”

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখন ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দায়ের খাঁচাটার জন্ত ভাগিনাদের খবরদারির গীয়া নাই। মেরামত তো লাগিয়াই আছে। তার পরে ঝাড়া মোছা পালিশ-করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, “উন্নতি হইতেছে।”

লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্ত লোক লাগিল আরও বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তনখা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মাঝাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুশি হইয়া কোঠা-বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

৪

সংসারে অন্য অভাব অনেক আছে, কেবল সিন্দুক আছে যথেষ্ট। তারা বলিল, “খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে, কিন্তু পাখিটার খবর কেহ রাখে না।”

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।”

ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন শ্রাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। সিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।”

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন, আর তখন ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

৫

লিপিকা যে কী ভয়ংকর তেজে চলিতেছে, রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্র মিত্র অমাত্য লইয়া লিপিকাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া তুরী ভেরী দামায়া কীসি বাঁশি কীসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগজ্জঙ্ক। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া, টিকি নাড়িয়া, মস্তপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি বজুর শ্রাকরা লিপিকর তদারকনবিগ আর মাঝাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, কাণ্টা দেখিতেছেন!”

মহারাজ বলিলেন, “আশ্চর্য । শব্দ কম নয় ।”

ভাগিনা বলিল, “শুধু শব্দ নয়, পিছনে অর্থও কম নাই ।”

রাজা খুশি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া সেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিম্নুক ছিল ঘোপের মধ্যে গা ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, “মহারাজ, পাখিটাকে দেখিয়াছেন কি ।”

রাজার চমক লাগিল ; বলিলেন, “ঐ বা ! মনে তো ছিল না । পাখিটাকে দেখা হয় নাই ।”

কিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, “পাখিকে তোমরা কেমন দেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই ।”

দেখা হইল । দেখিয়া বড়ো খুশি । কায়দাটা পাখিটার চেয়ে এত বেশি বড়ো যে, পাখিটাকে দেখাই যায় না ; মনে হয়, তাকে না দেখিলেও চলে । রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ক্রটি নাই । খাঁচার দানা নাই, পানি নাই ; কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিঁড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখির মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে । গান তো বন্ধই, চীংকার করিবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত বোজা । দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয় ।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কানমলা-সদারকে বলিয়া দিলেন, নিম্নুকের ঘেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয় ।

৬

পাখিটা দিনে দিনে ভদ্র-দস্তুর-যত আধমরা হইয়া আসিল । অভিভাবকেরা বুঝিল, বেশ আশাজনক । তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার আলোর দিকে পাখি চায় আর অন্ধার রকমে পাখা ঝটপট করে । এমন-কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার যোগা ঠোট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে ।

কোতোয়াল বলিল, “এ কী বেয়াদবি ।”

তখন শিকামহালে হাপর হাতুড়ি আঙুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির । কী দয়াকর পিটানি । লোহার শিকল তৈরি হইল, পাখির ডানাও গেল কাটা ।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “এ রাজ্যে পাখিদের কেবল ঘে আঙ্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই ।”

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম, এক হাতে সড়কি লইয়া এমনি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা ।

কামারের পসার বাড়িয়া কামারগিরির গারে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুঁশিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে নিরোপা দিলেন।

৭

পাখিটা মরিল। কোন্‌কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিম্নক লক্ষীছাড়া রটাইল, “পাখি মরিয়াছে।”

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, “ভাগিনা, এ কী কথা শুনি।”

ভাগিনা বলিল, “মহারাজ, পাখিটার শিকা পুরা হইয়াছে।”

রাজা শুধাইলেন, “ও কি আর লাফায়।”

ভাগিনা বলিল, “আরে রাম!”

“আর কি ওড়ে।”

“না।”

“আর কি গান গায়।”

“না।”

“দানা না পাইলে আর কি চোঁচায়।”

“না।”

রাজা বলিলেন, “একবার পাখিটাকে আনো তো, দেখি।”

পাখি আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখিটাকে টিপিলেন, সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা ধস্‌ধস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণহাওয়ার কিশলয়গুলি দীর্ঘনিশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

অম্পট্ট

জানলার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সামনের বাড়ির জীবনযাত্রা। দেখা আর ছেদ, দেখা আর না-দেখা দ্বিবে সেই ছবি আঁকা।

একদিন পড়ার বই পড়ে রইল, বনমালীর চোখ পেল সেই দিকে।

সেদিন দেখে, সে বাড়ির ঘরকন্নার পুরোনো পটের উপর দুজন নতুন লোকের চেহারা। একজন বিধবা প্রবীণা, আর-একটি মেয়ের বহুল বোলো হবে কি সন্তেয়ো।

সেই প্রবীণা জানলার ধারে বসে মেয়েটির চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর মেয়ের চোখ বেয়ে জল পড়ছে।

আর-একদিন দেখা গেল, চুল বাঁধবার লোকটি নেই। মেয়েটি দিনান্তের শেষ আলোতে ঝুঁকে পড়ে বোধ হল যেন একটি পুরোনো ফোটোগ্রাফের ফ্রেম আঁচল দিয়ে মাজছে।

তার পর দেখা যায়, জানলার ছেদগুলির মধ্যে দিয়ে ওর প্রতি দিনের কাজের ধারা—কোলের কাছে ধামা নিয়ে ডাল বাছা, জাঁতি হাতে সুপুন্নি কাটা, আনের পরে বাঁ হাত দিয়ে নেড়ে নেড়ে ভিজ়ে চুল শুকোনো, বারান্দার রেলিঙের উপরে বাল্যপোষ রোদ্দুরে মেল দেওয়া।

ছপুরবেলায় পুরুষেরা আপিসে ; মেয়েরা কেউ বা ঘুমোয়, কেউ বা তাস খেলে ; ছাতে পায়রার খোপে পায়রাদের বক্ববকম্ মিইয়ে আসে।

সেই সময়ে মেয়েটি ছাতের চিলেকোঠায় পা মেলে বই পড়ে ; কোনোদিন বা বইয়ের উপর কাগজ রেখে চিঠি লেখে, আবাঁধা চুল কপালের উপরে ধমকে থাকে, আর আঙুল যেন চলতে চলতে চিঠির কানে কানে কথা কয়।

একদিন বাধা পড়ল। সেদিন সে খানিকটা লিখছে চিঠি, খানিকটা খেলছে কলম নিয়ে, আর আলসের উপরে একটা কাক আধখাওয়া আমের আঁঠি টুকরে টুকরে খাচ্ছে।

এমন সময়ে যেন পঞ্চমীর অন্ত্যম্না চাঁদের কোণার পিছনে পা টিপে টিপে একটা মোটা মেঘ এসে দাঁড়ালো। মেয়েটি আধাব্যসি। তার মোটা হাতে মোটা কাকন। তার সামনের চুল ফাঁক, সেখানে সিঁথির জায়গায় মোটা সিঁদুর আঁকা।

বালিকার কোল থেকে তার না-শেষ-করা চিঠিখানা সে আচমকা ছিনিয়ে নিলে। বাজপাখি হঠাৎ পায়রার পিঠের উপর পড়ল।

ছাতে আর মেয়েটিকে দেখা যায় না। কখনো বা গভীর রাতে, কখনো বা সকালে বিকালে, ঐ বাড়ি থেকে এমন-সব আভাস আসে যার থেকে বোঝা যায়, সংসারটার তলা কাটিয়ে দিয়ে একটা ভূমিকম্প বেরিয়ে আসবার অন্তে মাথা ঝুঁকছে।

এ দিকে জানলার ফাঁকে ফাঁকে চলছে ডাল বাছা আর পান সাজা ; কপে কপে দুধের কড়া নিয়ে মেয়েটি চলেছে উঠোনে কলতলার।

এমনি কিছুদিন যায়। সেদিন কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলা ; ছাদের উপর আকাশপ্রদীপ জলেছে, আন্তাবলের ধোঁয়া অজগর সাপের মতো পাক দিয়ে আকাশের নিখাস বন্ধ করে দিলে।

বনমালী বাইরে থেকে ফিরে এসে যেমনি ঘরের জানলা খুলল অমনি তার চোখে পড়ল, সেই মেয়েটি ছাদের উপর হাত জোড় করে স্থির দাঁড়িয়ে। তখন গলির শেষ প্রান্তে মল্লিকদের ঠাকুরঘরে আরতির কীসর ঘণ্টা বাজছে। অনেক ক্ষণ পরে ভূমিষ্ঠ হয়ে মেয়েতে মাথা ঠুকে ঠুকে বারবার সে প্রণাম করলে ; তার পরে চলে গেল।

সেদিন বনমালী নীচে গিয়েই চিঠি লিখলে। লিখেই নিজে গিয়ে তখনি ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একমনে কামনা করতে লাগল, সে চিঠি যেন না পৌছয়। সকালবেলায় উঠে সেই বাড়ির দিকে যেন মুগ্ধ তুলে চাইতে পারলে না।

সেই দিনই বনমালী মধুপুরে চলে গেল ; কোথায় গেল কাউকে বলে গেল না।

কলেক্স খোলবার সময় সময় ফিরে এল। তখন সন্ধ্যাবেলা। সামনের বাড়ির আগাগোড়া সব বন্ধ, সব অন্ধকার। ওরা সব গেল কোথায়।

বনমালী বলে উঠল, “যাক, ভালোই হয়েছে।”

ঘরে ঢুকে দেখে ডেস্কের উপরে একরাশ চিঠি। সব-নীচের চিঠির শিরোনাম মেয়েলি হাতের ছাঁদে লেখা, অজানা হাতের অক্ষরে, তাতে পাড়ার পোস্ট-আপিসের ছাপ।

চিঠিখানি হাতে করে সে বসে রইল। লেফাফা খুললে না। কেবল আলোর সামনে তুলে ধরে দেখলে। জানালার ভিতর দিয়ে জীবনযাত্রার যেমন অস্পষ্ট ছবি, আবরণের ভিতর দিয়ে তেমনি অস্পষ্ট অক্ষর।

একবার খুলতে গেল, তার পরে বাক্সের মধ্যে চিঠিটা রেখে চাবি বন্ধ করে দিলে ; লপথ করে বললে, “এ চিঠি কোনোদিন খুলব না।”

পট

যে শহরে অভিরাম দেবদেবীর পট আঁকে, সেখানে কারো কাছে তার পূর্বপরিচয় নেই। সবাই জানে, সে বিদেশী, পট আঁকা তার চিরদিনের ব্যাবসা।

সে মনে ভাবে, “ধনী ছিলাম, ধন গিয়েছে, হয়েছে ভালো। দিনরাত দেবতার রূপ ভাবি, দেবতার প্রসাদে খাই, আর ঘরে ঘরে দেবতার প্রতিষ্ঠা করি। আমার এই মান কে কাড়তে পারে।”

এমন সময় দেশের রাজমন্ত্রী মারা গেল। বিদেশ থেকে নতুন এক মন্ত্রীকে রাজ্য আদয় করে আনলে। সেদিন তাই নিয়ে শহরে খুব ধুম।

কেবল অভিরামের তুলি সেদিন চলল না।

নতুন রাজমন্ত্রী, এই তো সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে, যাকে অভিরামের বাপ মাহুষ করে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিল। সেই বিশ্বাস হল সিঁধকাঠি, তাই দিয়ে বুড়োর সর্বস্ব সে হরণ করলে। সেই এল দেশের রাজমন্ত্রী হয়ে।

যে ঘরে অভিরাম পট আঁকে সেই তার ঠাকুরঘর; সেখানে গিয়ে হাত ছোড় করে বললে, “এই অন্তেই কি এতকাল রেখায় রেখায় রঙে রঙে তোমাকে স্মরণ করে এলেম। এত দিনে বর দিলে কি এই অপমান।”

২

এমন সময় রথের মেলা বসল।

সেদিন নানা দেশের নানা লোক তার পট কিনতে এল, সেই ভিড়ের মধ্যে এল একটি ছেলে, তার আগে পিছে লোক-লশকর।

সে একটি পট বেছে নিয়ে বললে, “আমি কিনব।”

অভিরাম তার নক্ষরকে জিজ্ঞাসা করলে, “ছেলেটি কে।”

সে বললে, “আমাদের রাজমন্ত্রীর একমাত্র ছেলে।”

অভিরাম তার পটের উপর কাপড় চাপা দিয়ে বললে, “বেচব না।”

শুনে ছেলের আবদার আরও বেড়ে উঠল। বাড়িতে এসে সে শায় না, মুখ তার করে থাকে।

অভিরামকে মন্ত্রী থলিভরা মোহর পাঠিয়ে দিলে; মোহরভরা থলি মন্ত্রীর কাছে ফিরে এল।

মন্ত্রী মনে মনে বললে, “এত বড়ো স্পর্ধা!”

অভিরামের উপর যতই উৎপাত হতে লাগল ততই সে মনে মনে বললে, “এই আমার জিত।”

৩

প্রতিদিন প্রথম সকালেই অভিরাম তার ইষ্টদেবতার একখানি করে ছবি আঁকে। এই তার পূজা, আর কোনো পূজা সে জানে না।

একদিন দেখলে, ছবি তার মনের মতো হয় না। কী যেন বদল হয়ে গেছে। কিছুতে তার ভালো লাগে না। তাকে যেন মনে মনে মারে।

দিনে দিনে সেই শূন্য বদল স্থল হয়ে উঠতে লাগল। একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বললে, “বুঝতে পেরেছি।”

আজ সে স্পষ্ট দেখলে, দিনে দিনে তার দেবতার মুখ মস্তুর মুখের মতো হয়ে উঠছে।

তুলি মাটিতে ফেলে দিয়ে বললে, “মস্তুরই জিত হল।”

সেইদিনই পট নিয়ে গিয়ে মস্তুরকে অভিরাম বললে, “এই নাও সেই পট, তোমার ছেলেকে দিয়ে।”

মস্তুর বললে, “কত দাম।”

অভিরাম বললে, “আমার দেবতার ধ্যান তুমি কেড়ে নিয়েছিলে, এই পট দিয়ে সেই ধ্যান ফিরে নেব।”

মস্তুর কিছুই বুঝতে পারলে না।

নতুন পুতুল

এই গুণী কেবল পুতুল তৈরি করত ; সে পুতুল রাজবাড়ির মেয়েদের খেলার জন্তে।

বছরে বছরে রাজবাড়ির আড়িনার পুতুলের মেলা বসে। সেই মেলায় সকল কারিগরই এই গুণীকে প্রধান মান দিয়ে এসেছে।

যখন তার বয়স হল প্রায় চার কুড়ি, এমন সময় মেলায় এক নতুন কারিগর এল। তার নাম কিষণলাল, বয়স তার নবীন, নতুন তার কারুকা।

যে পুতুল সে গড়ে তার কিছু গড়ে কিছু গড়ে না, কিছু রঙ দেয় কিছু বাকি রাখে। মনে হয়, পুতুলগুলো যেন ফুরোয় নি, যেন কোনোকালে ফুরিয়ে যাবে না।

নবীনের দল বললে, “লোকটা সাহস দেখিয়েছে।”

প্রবীণের দল বললে, “একে বলে সাহস ? এ তো স্পর্ধা।”

কিন্তু, নতুন কালের নতুন দাবি। এ কালের রাজকুমারী বলে, “আমাদের এই পুতুল চাই।”

সাবেক কালের অমুচরেন্না বলে, “আরে ছিঃ।”

তুনে তাদের ক্ষেদ বেড়ে যায়।

বুড়োর দোকানে এবার ভিড় নেই। তার ঝাঁকাতরা পুতুল যেন খেলার অপেক্ষায় ঘাটের লোকের মতো ও পারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

এক বছর যায়, দু বছর যায়, বুড়োর নাম সবাই কুলেই গেল। কিষণলাল হল রাজবাড়ির পুতুলঘাটের সর্দার।

২

বুড়োর মন ভাঙল, বুড়োর দিনও চলে না। শেষকালে তার মেয়ে এসে তাকে বললে, “তুমি আমার বাড়িতে এসো।”

জামাই বললে, “খাও দাও, আরাম করো, আর সবজির খেত থেকে গোরু বাছুর খেদিয়ে রাখো।”

বুড়োর মেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর ঘরকরনার কাজে। তার জামাই গড়ে মাটির প্রদীপ, আর নোকো বোঝাই করে শহরে নিয়ে যায়।

নতুন কাল এসেছে সে কথা বুড়ো বোঝে না, তেমনিই সে বোঝে না যে, তার নাংনির বয়স হয়েছে ষোলো।

যেখানে গাছতলায় বসে বুড়ো খেত আগলার আর ক্ষণে ক্ষণে ঘুমে ঢুলে পড়ে সেখানে নাংনি গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে ; বুড়োর বুকের হাড়গুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে ওঠে। সে বলে, “কী দাদি, কী চাই।”

নাংনি বলে, “আমাকে পুতুল গড়িয়ে দাও, আমি খেলব।”

বুড়ো বলে, “আরে ভাই, আমার পুতুল তোর পছন্দ হবে কেন।”

নাংনি বলে, “তোমার চেয়ে ভালো পুতুল কে গড়ে শুনি।”

বুড়ো বলে, “কেন, কিমণলাল।”

নাংনি বলে, “ইস্ ! কিমণলালের সাধি।”

ছক্কনের এই কথা-কাটাকাটি কতবার হয়েছে। বারে বারে একই কথা।

তার পরে বুড়ো তার ঝুলি থেকে মালমণলা বের করে ; চোখে মস্ত গোল চশমাটা আঁটে।

নাংনিকে বলে, “কিস্ত দাদি, ভুট্টা যে কাকে খেয়ে যাবে।”

নাংনি বলে, “দাদা, আমি কাক তাড়াব।”

বেলা বয়ে যায় ; দূরে ইদারা থেকে বলদে জল টানে, তার শব্দ আসে ; নাংনি কাক তাড়ায়, বুড়ো বসে বসে পুতুল গড়ে।

৩

বুড়োর সকলের চেয়ে ভয় তার মেয়েকে। সেই গিন্নির শাসন বড়ো কড়া, তার সংসারে সবাই থাকে সাবধানে।

বুড়ো আজ একমনে পুতুল গড়তে বসেছে ; হুঁশ হল না, পিছন থেকে তার মেয়ে ঘন ঘন হাত তুলিয়ে আসছে।

কাছে এসে যখন সে ডাক দিলে তখন চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অবোধ ছেলের মতো তাকিয়ে রইল।

মেয়ে বললে, “ছখ দোওয়া পড়ে থাক, আর তুমি স্বভদ্রাকে নিয়ে বেলা বইয়ে দাও। অত বড়ো মেয়ে, ওর কি পুতুলখেলার বয়স।”

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “স্বভদ্রা খেলবে কেন। এ পুতুল রাজবাড়িতে বেচব। আমার দাদির যেদিন বর আসবে সেদিন তো ওর গলার মোহরের মালা পরাতে হবে। আমি তাই টাকা জমাতে চাই।”

মেয়ে বিরক্ত হয়ে বললে, “রাজবাড়িতে এ পুতুল কিনবে কে।”

বুড়োর মাথা হেঁট হয়ে গেল। চূপ করে বসে রইল।

স্বভদ্রা মাথা নেড়ে বললে, “দাদার পুতুল রাজবাড়িতে কেমন না কেনে দেখব।”

৪

ছু দিন পরে স্বভদ্রা এক কাহন সোনা এনে মাকে বললে, “এই না ও, আমার দাদার পুতুলের দাম।”

মা বললে, “কোথায় পেলি।”

মেয়ে বললে, “রাজপুরীতে গিয়ে বেচে এসেছি।”

বুড়ো হাসতে হাসতে বললে, “দাদি, তবু তো তোর দাদা এখন চোখে ভালো দেখে না, তার হাত কেঁপে যায়।”

মা খুশি হয়ে বললে, “এমন ঘোলোটা মোহর হলেই তো স্বভদ্রার গলার হার হবে।”

বুড়ো বললে, “তার আর ভাবনা কী।”

স্বভদ্রা বুড়োর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, “দাদাভাই, আমার বয়ের অন্তে তো ভাবনা নেই।”

বুড়ো হাসতে লাগল, আর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে।

৫

বুড়োর ঘোঁষন ঘেন ফিরে এল। সে গাছের তলায় বসে পুতুল গড়ে আর স্বভদ্রা কাক তাড়ায়, আর দূরে ইদারায় বলদে কী-কো করে জল টানে।

একে একে ঘোলোটা মোহর গাঁথা হল, হার পূর্ণ হয়ে উঠল।

মা বললে, “এখন বর এলেই হয়।”

স্বভদ্রা বুড়োর কানে কানে বললে, “দাদাভাই, বর ঠিক আছে।”

দাদা বললে, “বল তো দাদি, কোথায় পেলি বর।”

সুভদ্রা বললে, “যেদিন রাজপুরীতে গেলেম দ্বারী বললে, কী চাও। আমি বললেম, রাজকন্যাদের কাছে পুতুল বেচতে চাই। সে বললে, এ পুতুল এখনকার দিনে চলবে না। ব’লে আমাকে ফিরিয়ে দিলে। একজন মানুষ আমার কান্না দেখে বললে, দাও তো, ঐ পুতুলের একটু সাজ ফিরিয়ে দিই, বিক্রি হয়ে যাবে। সেই মানুষটিকে তুমি যদি পছন্দ কর দাদা, তা হলে আমি তার গলায় মালা দিই।”

বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, “সে আছে কোথায়।”

নাংনি বললে, “ঐ যে, বাইরে পিয়ালগাছের তলায়।”

বর এল ঘরের মধ্যে ; বুড়ো বললে, “এ যে কিষণলাল।”

কিষণলাল বুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, “হাঁ, আমি কিষণলাল।”

বুড়ো তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, “ভাই, একদিন তুমি কেড়ে নিয়েছিলে আমার হাতের পুতুলকে, আজ নিলে আমার প্রাণের পুতুলটিকে।”

নাংনি বুড়োর গলা ধরে তার কানে কানে বললে, “দাদা, তোমাকে স্বদ্ধ।”

উপসংহার

ভোজরাজের দেশে যে যেখানে ভোরবেলাতে দেবমন্দিরে গান গাইতে যায় সে কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে।

আচার্য বলেন, “একদিন শেষরাত্রে আমার কানে একখানি স্বর লাগল। তার পরে সেইদিন যখন সাজি নিয়ে পারুলবনে ফুল তুলতে গেছি তখন এই মেয়েটিকে ফুলগাছতলায় কুড়িয়ে পেলেম।”

সেই অবধি আচার্য মেয়েটিকে আপন তনুগাতির মতো কোলে নিয়ে মানুষ করেছে ; এর মুখে যখন কথা ফোটেনি এর গলায় তখন গান আগল।

আজ আচার্যের কণ্ঠ ক্ষীণ, চোখে ভালো দেখেন না। মেয়েটি তাঁকে শিশুর মতো মানুষ করে।

কত যুবা দেশ বিদেশ থেকে এই মেয়েটির গান শুনতে আসে। তাই দেখে মাঝে মাঝে আচার্যের বুক কেঁপে ওঠে ; বলেন, “যে বোটা আলগা হয়ে আসে ফুলটি তাকে ছেড়ে যায়।”

মেয়েটি বলে, “তোমাকে ছেড়ে আমি এক পলক বাঁচি নে।”

আচার্য তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, “যে গান আজ আমার কণ্ঠ ছেড়ে গেল সেই গান তোরই মধ্য রূপ নিয়েছে। তুই যদি ছেড়ে যাস তা হলে আমার চিরজন্মের সাধনাকে আমি হারাব।”

২

ফাগুনপূর্ণিমায় আচার্যের প্রধান শিষ্য কুমারসেন গুরু পায়ে একটি আমের মঞ্জরী রেখে প্রণাম করলে। বললে, “মাধবীর হৃদয় পেয়েছি, এখন প্রভুর যদি সম্মতি পাই তা হলে দুজনে মিলে আপনার চরণসেবা করি।”

আচার্যের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন, “আনো দেখি আমার তনু। আর, তোমরা দুইজনে রাজার মতো, রানীর মতো, আমার সামনে এসে বসো।”

তনু নিয়ে আচার্য গান গাইতে বসলেন। হুলহা-হুলহীর গান, সাহানার স্বরে। বললেন, “আজ আমার জীবনের শেষ গান গাব।”

এক পদ গাইলেন। গান আর এগোয় না। বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে-ওঠা জুঁইফুলটির মতো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে থমে পড়ে। শেষে তনুটি কুমারসেনের হাতে দিয়ে বললেন, “২২স, এই লও আমার যন্ত্র।”

তার পরে মাধবীর হাতখানি তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, “এই লও আমার প্রাণ।”

তার পরে বললেন, “আমার গানটি দুজনে মিলে শেষ করে দাও, আমি শুনি।”

মাধবী আর কুমার গান ধরলে—সে যেন আকাশ আর পূর্ণচাঁদের কণ্ঠ মিলিয়ে গাওয়া।

৩

এমন সময়ে ঘারে এল রাজদূত, গান খেয়ে গেল।

আচার্য কাঁপতে কাঁপতে আসন থেকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, “মহারাজের কী আদেশ।”

দূত বললে, “তোমার মেয়ের ভাগা প্রসন্ন, মহারাজ তাকে ডেকেছেন।”

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ইচ্ছা তাঁর।”

দূত বললে, “আজ রাত পোয়ালে রাজকন্যা কাছোজে পতিগৃহে যাত্রা করবেন, মাধবী তাঁর সঙ্গিনী হয়ে যাবে।”

রাত পোয়ালো, রাজকন্যা যাত্রা করলে।

মহিষী মাধবীকে ডেকে বললে, "আমার মেয়ে প্রবাসে গিয়ে যাতে প্রসন্ন থাকে সে ভার তোমার উপরে।"

মাধবীর চোখে জল পড়ল না, কিন্তু অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

৪

রাজকন্টার ময়ূরপংখি আগে যায়, আর তার পিছে পিছে যায় মাধবীর পাখি। সে পাখি কিংবাবে ঢাকা, তার দুই পাশে পাহারা।

পথের ধারে ধুলোর উপরে ঝড়ে-ভাঙা অশ্বখডালের মতো পড়ে রইলেন আচার্য, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুমারসেন।

পাখিরা গান গাইছিল পলাশের ডালে; আমার বোলের গঞ্জে বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠেছিল। পাছে রাজকন্টার মন প্রবাসে কোনোদিন ফাগুনসন্ধ্যায় হঠাৎ নিমেষের জল উতলা হয়, এই চিন্তায় রাজপুরীর লোকে নিশ্বাস ফেললে।

পুনরাবৃত্তি

সেদিন যুদ্ধের খবর ভালো ছিল না। রাজা বিমর্ষ হয়ে বাগানে বেড়াতে গেলেন। দেখতে পেলেন, প্রাচীরের কাছে গাছতলায় বসে খেলা করছে একটি ছোটো ছেলে আর একটি ছোটো মেয়ে।

রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী খেলছ।"

তারা বললে, "আমাদের আজকের খেলা রামসীতার বনবাস।"

রাজা সেখানে বসে গেলেন।

ছেলেটি বললে, "এই আমাদের দণ্ডকবন, এখানে কুটীর বাঁধছি।"

সে একরাশ ভাঙা ডালপালা খড় ঘাস জুটিয়ে এনেছে, তারি ব্যস্ত।

আর, মেয়েটি শাক পাতা নিয়ে খেলার হাঁড়িতে বিনা আগুনে রাঁধছে; রাম থাকেন, তারই আয়োজনে সীতার এক দণ্ড সময় নেই।

রাজা বললেন, "আর তো সব দেখছি, কিন্তু রান্ধস কোথায়।"

ছেলেটিকে মানতে হল, তাদের দণ্ডকবনে কিছু কিছু ক্রটি আছে।

রাজা বললেন, "আচ্ছা, আমি হব রান্ধস।"

ছেলেটি তাঁকে ভালো করে দেখলে। তার পরে বললে, “তোমাকে কিন্তু হেরে যেতে হবে।”

রাজা বললেন, “আমি খুব ভালো হারতে পারি। পরীক্ষা করে দেখো।”

সেদিন রাক্ষসবধ এতই সূচাক্রমে হতে লাগল যে, ছেলেটি কিছুতে রাজাকে ছুটি দিতে চায় না। সেদিন এক বেলাতে তাঁকে দশবারোটা রাক্ষসের মরণ একলা মরতে হল। মরতে মরতে হাঁপিয়ে উঠলেন।

ত্রেতাযুগে পঞ্চবটীতে যেমন পাখি ডেকেছিল সেদিন সেখানে ঠিক তেমন করেই ডাকতে লাগল। ত্রেতাযুগে সবুজ পাতার পর্দায় পর্দায় প্রভাত-আলো যেমন কোমল ঠাটে আপন সুর বেঁধে নিয়েছিল আজও ঠিক সেই সুরই বাঁধলে।

রাজার মন থেকে ভার নেমে গেল।

মন্ত্রীকে ডেকে তিনি স্ফিক্তাসা করলেন, “ছেলে মেয়ে দুটি কার।”

মন্ত্রী বললে, “মেয়েটি আমারই, নাম কচিরা। ছেলের নাম কৌশিক, ওর বাপ গরিব ব্রাহ্মণ, দেবপূজা করে দিন চলে।”

রাজা বললেন, “যখন সময় হবে এই ছেলেটির সঙ্গে ঐ মেয়ের বিবাহ হয়, এই আমার ইচ্ছা।”

শুনে মন্ত্রী উত্তর দিতে সাহস করলে না, মাথা হেঁট করে রইল।

২

দেশে সবচেয়ে যিনি বড়ো পণ্ডিত রাজা তাঁর কাছে কৌশিককে পড়তে পাঠালেন। যত উচ্চবংশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়ে। আর পড়ে কচিরা।

কৌশিক যেদিন তাঁর পাঠশালায় এল সেদিন অধ্যাপকের মন প্রসন্ন হল না। অন্য সকলেও লজ্জা পেলে। কিন্তু, রাজার ইচ্ছা।

সকলের চেয়ে সংকট কচিরার। কেননা, ছেলেরা কানাকানি করে। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়, রাগে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কৌশিক যদি কখনো তাকে পুঁথি এগিয়ে দেয় সে পুঁথি ঠেলে ফেলে। যদি তাকে পাঠের কথা বলে সে উত্তর করে না।

কচির প্রতি অধ্যাপকের স্নেহের সীমা ছিল না। কৌশিককে সকল বিষয়ে সে এগিয়ে যাবে এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা, কচিরও সেই ছিল পণ।

মনে হল, সেটা খুব সহজেই ঘটবে, কারণ কৌশিক পড়ে বটে কিন্তু একমনে নয়। তার মাতার কাঁটতে মন, তার বনে বেড়াতে মন, সে গান করে, সে বস্ত্র বাজায়।

অধ্যাপক তাকে ভৎসনা করে বলেন, “বিচার তোমার অহুরাগ নেই কেন।”

সে বলে, “আমার অহুরাগ শুধু বিচার নয়, আরও নানা জিনিসে।”

অধ্যাপক বলেন, “সে-সব অহুরাগ ছাড়ে।”

সে বলে, “তা হলে বিচার প্রতিও আমার অহুরাগ থাকবে না।”

৩

এমনি করে কিছু কাল যায়।

রাজা অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার ছাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে।”

অধ্যাপক বললেন, “কুচিরা।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “আর কোশিক?”

অধ্যাপক বললেন, “সে যে কিছুই শিখেছে এমন বোধ হয় না।”

রাজা বললেন, “আমি কোশিকের সঙ্গে কুচির বিবাহ ইচ্ছা করি।”

অধ্যাপক একটু হাসলেন; বললেন, “এ যেন গোধূলির সঙ্গে উষার বিবাহের প্রস্তাব।”

রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, “তোমার কন্ঠার সঙ্গে কোশিকের বিবাহে বিলম্ব উচিত নয়।”

মন্ত্রী বললে, “মহারাজ, আমার কন্ঠা এ বিবাহে অনিচ্ছুক।”

রাজা বললেন, “স্বীলোকের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।”

মন্ত্রী বললে, “তার চোখের জলও যে সাক্ষ্য দিচ্ছে।”

রাজা বললেন, “সে কি মনে করে কোশিক তার অযোগ্য।”

মন্ত্রী বললে, “হাঁ, সেই কথাই বটে।”

রাজা বললেন, “আমার সামনে দুজনের বিচার পরীক্ষা হোক। কোশিকের জয় হলে এই বিবাহ সম্পন্ন হবে।”

পরদিন মন্ত্রী রাজাকে এসে বললে, “এই পণে আমার কন্ঠার মত আছে।”

৪

বিচারসভা প্রস্তুত। রাজা সিংহাসনে বসে, কোশিক তাঁর সিংহাসনতলে।

স্বয়ং অধ্যাপক কুচিকে সঙ্গে করে উপস্থিত হলেন। কোশিক আসন ছেড়ে উঠে তাঁকে প্রণাম ও কুচিকে নমস্কার করলে। কুচি দৃকপাত করলে না।

কোনোদিন পাঠশালার রীতিপালনের জন্তেও কোশিক কুচির সঙ্গে তর্ক করে নি। অল্প ছাত্রেরাও অবজ্ঞা করে তাকে তর্কের অবকাশ দিত না। তাই আজ যখন তার

যুক্তির মুখে তীক্ষ্ণ বিক্রপ তীরের ফলায় আলোর মতো ঝিক্‌ঝিক্‌ করে উঠল তখন গুরু
বিস্মিত হলেন, এবং বিরক্ত হলেন। কচির কপালে ঘাম দেখা দিল, সে বুদ্ধি স্থির
রাখতে পারলে না। কৌশিক তাকে পরাভবের শেষ কিনারায় নিয়ে গিয়ে তবে
ছেড়ে দিলে।

ক্রোধে অধ্যাপকের বাকরোধ হল, আর কচির চোখ দিয়ে ধারা বেয়ে জল পড়তে
লাগল।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন, “এখন, বিবাহের দিন স্থির করো।”

কৌশিক আসন ছেড়ে উঠে জোড় হাতে রাজাকে বললে, “ক্ষমা করবেন, এ বিবাহ
আমি করব না।”

রাজা বিস্মিত হয়ে বললেন, “জয়লক পুরস্কার গ্রহণ করবে না?”

কৌশিক বললে, “জয় আমারই থাক, পুরস্কার অশ্রের হোক।”

অধ্যাপক বললেন, “মহারাজ, আর এক বছর সময় দিন, তার পরে শেষ পরীক্ষা।”

সেই কথাই স্থির হল।

৫

কৌশিক পাঠশালা ত্যাগ করে গেল। কোনোদিন সকালে তাকে বনের ছায়ায়,
কোনোদিন সন্ধ্যায় তাকে পাহাড়ের চূড়ার উপর দেখা যায়।

এ দিকে কচির শিক্ষায় অধ্যাপক সমস্ত মন দিলেন। কিন্তু, কচির সমস্ত মন
কোথায়।

অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, “এখনও যদি সতর্ক না হও তবে দ্বিতীয়বার
তোমাকে লজ্জা পেতে হবে।”

দ্বিতীয়বার লজ্জা পাবার ভয়েই যেন সে তপস্শা করতে লাগল। অপর্ণার তপস্শা
যেমন অনশনের, কচির তপস্শা তেমনি অনধ্যায়ের। ষড়্‌দর্শনের পুঁথি তার বন্ধই
রইল, এমন-কি কাব্যের পুঁথিও দৈবাৎ খোলা হয়।

অধ্যাপক রাগ করে বললেন, “কপিল-কণাদের নামে শপথ করে বলছি, আর
কখনো শ্রীলোক ছাত্র নেব না। বেদবেদান্তের পার পেয়েছি, শ্রীজ্ঞানির মন বুঝতে
পারলেম না।”

একদা মন্ত্রী এসে রাজাকে বললে, “ভবদত্তর বাড়ি থেকে কন্ডার সম্বন্ধ এসেছে।
কুলে শীলে ধনে মানে তারা অদ্বিতীয়। মহারাজের সম্মতি চাই।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “কন্ডা কী বলে।”

মন্ত্রী বললে, “মেয়েদের মনের ইচ্ছা কি মুখের কথায় বোঝা যায়।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, “তার চোখের জল আজ কী রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে।”

মন্ত্রী চুপ করে রইল।

৬

রাজা তাঁর বাগানে এসে বসলেন। মন্ত্রীকে বললেন, “তোমার মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।”

কচিরা এসে রাজাকে প্রণাম করে দাঁড়াল।

রাজা বললেন, “বংশে, সেই রামের বনবাসের খেলা মনে আছে?”

কচিরা স্মিতমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, “আজ সেই রামের বনবাস খেলা আর-একবার দেখতে আমার বড়ো সাধ।”

কচিরা মুখের এক পাশে আঁচল টেনে চুপ করে রইল।

রাজা বললেন, “বনও আছে, রামও আছে, কিন্তু শুনছি বংশে, এবার সীতার অভাব ঘটেছে। তুমি মনে করলেই সে অভাব পূরণ হয়।”

কচিরা কোনো কথা না ব’লে রাজার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে।

রাজা বললেন, “কিন্তু, বংশে, এবার আমি রাক্ষস সাজতে পারব না।”

কচিরা স্নিগ্ধ চক্ষে রাজার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাজা বললেন, “এবার রাক্ষস সাজবে তোমাদের অধ্যাপক।”

সিদ্ধি

স্বর্গের অধিকারে মানুষ বাধা পাবে না, এই তার পণ। তাই, কঠিন সঙ্কানে অমর হবার মন্ত্র সে শিখে নিয়েছে। এখন একলা বনের মধ্যে সেই মন্ত্র সে সাধনা করে।

বনের ধারে ছিল এক কাঠকুড়নি মেয়ে। সে মাঝে মাঝে আঁচলে ক’রে তার জন্তে ফল নিয়ে আসে, আর পাতার পাত্রে আনে ঝরনার জল।

ক্রমে তপস্বী এত কঠোর হল যে, ফল সে আর ছোঁয় না, পাখিতে এসে ঠুকরে খেয়ে যায়।

আরও কিছু দিন গেল। তখন ঝরনার জল পাতার পাত্রেই শুকিয়ে যায়, মুখে ওঠে না।

কাঠকুড়নি মেয়ে বলে, “এখন আমি করব কী! আমার সেবা যে বৃথা হতে চলল।”

তার পর থেকে ফুল তুলে সে তপস্বীর পায়ে কাছে রেখে যায়, তপস্বী জানতেও পারে না।

মধ্যাহ্নে রোদ যখন প্রখর হয় সে আপন আঁচলটি তুলে ধরে ছায়া করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, তপস্বীর কাছে রোদও বা ছায়াও তা।

কৃষ্ণপক্ষের রাতে অন্ধকার যখন ঘন হয় কাঠকুড়নি সেখানে জেগে বসে থাকে। তাপসের কোনো ভয়ের কারণ নেই, তবু সে পাহারা দেয়।

২

একদিন এমন ছিল যখন এই কাঠকুড়নির সঙ্গে দেখা হলে নবীন তপস্বী স্নেহ করে জিজ্ঞাসা করত, “কেমন আছ।”

কাঠকুড়নি বলত, “আমার ভালোই কী আর মন্দই কী। কিন্তু, তোমাকে দেখবার লোক কি কেউ নেই। তোমার মা, তোমার বোন?”

সে বলত, “আছে সবাই, কিন্তু আমাকে দেখে হবে কী। তারা কি আমার চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবে।”

কাঠকুড়নি বলত, “প্রাণ থাকে না বলেই তো প্রাণের জন্তে এত দরদ।”

তাপস বলত, “আমি খুঁজি চিরদিন বাঁচবার পথ। মানুষকে আমি অমর করব।”

এই বলে সে কত কী বলে যেত; তার নিজের সঙ্গে নিজের কথা, সে কথার মানে বুঝবে কে।

কাঠকুড়নি বুঝত না, কিন্তু আকাশে নবমেঘের ডাকে ময়ূরীর ধেমল হয় তেমনি তার মন ব্যাকুল হয়ে উঠত।

তার পরে আরও কিছু দিন যায়। তপস্বী মৌন হয়ে এল, মেয়েকে কোনো কথা বলে না।

তার পরে আরও কিছু দিন যায়। তপস্বীর চোখ বুজে এল, মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখে না।

মেয়ের মনে হল, সে আর ঐ তাপসের মাঝখানে যেন তপস্বীর লক্ষ ঘোজন কোণের দূরত্ব। হাজার হাজার বছরেও এতটা বিচ্ছেদ পার হবে একটুখানি কাছে আসবার আশা নেই।

তা নাই বা রইল আশা। তবু গুর কান্না আসে; মনে মনে বলে, দিনে একবার

যদি বলেন ‘কেমন আছ’ তা হলে সেই কথাটুকুতে দিন কেটে যায়, এক বেলা যদি একটু ফল আর জল গ্রহণ করেন তা হলে অন্নজল ওর নিজের মুখে রোচে ।

৩

এ দিকে ইন্দ্রলোকে খবর পৌছল, মানুষ মর্তকে লঙ্ঘন করে স্বর্গ পেতে চায়— এত বড়ো স্পর্ধা ।

ইন্দ্র প্রকাশ্যে রাগ দেখালেন, গোপনে ভয় পেলেন । বললেন, “দৈত্য স্বর্গ জয় করতে চেয়েছিল বাহুবলে, তার সঙ্গে লড়াই চলেছিল ; মানুষ স্বর্গ নিতে চায় দুঃখের বলে, তার কাছে কি হার মানতে হবে ।”

যেনকাকে মহেন্দ্র বললেন, “যাও, তপস্যা ভঙ্গ করোগে ।”

যেনকা বললেন, “স্বররাজ, স্বর্গের অস্ত্রে মর্তের মানুষকে যদি পরাস্ত করেন তবে তাতে স্বর্গের পরাভব । মানবের মরণবাণ কি মানবীর হাতে নেই ।”

ইন্দ্র বললেন, “সে কথা সত্য ।”

৪

কাল্কনমাসে দক্ষিণহাওয়ার দোলা লাগতেই মর্মরিত নাগবীলতা প্রকুল হয়ে ওঠে । তেমনি ঐ কাঠকুড়নির উপরে একদিন নন্দনবনের হাওয়া এসে লাগল, আর তার দেহমন একটা কোন্ উৎসুক মাধুর্যের উন্মেষে উন্মেষে ব্যথিত হয়ে উঠল । তার মনের ভাবনাগুলি চাকছাড়া মৌমাছির মতো উড়তে লাগল, কোথা তারা মধুগন্ধ পেয়েছে ।

ঠিক সেই সময়ে সাধনার একটা পাল শেষ হল । এইবার তাকে যেতে হবে নির্জন গিরিগুহায় । তাই সে চোখ মেলল ।

সামনে দেখে সেই কাঠকুড়নি মেয়েটি খোঁপায় পরেছে একটি অশোকের মঞ্জরী, আর তার গায়ের কাপড়খানি কুহুমফুলে রঙ করা । যেন তাকে চেনা যায় অথচ চেনা যায় না । যেন সে এমন একটি জ্ঞানী স্ত্রীর পদগুলি মনে পড়ছে না । যেন সে এমন একটি ছবি যা কেবল রেখায় টানা ছিল, চিত্রকর কোন্ খেয়ালে কখন এক সময়ে তাতে রঙ লাগিয়েছে ।

তাপস আসন ছেড়ে উঠল । বললে, “আমি দূর দেশে যাব ।”

কাঠকুড়নি জিজ্ঞাসা করলে, “কেন, প্রভু ।”

তপস্বী বললে, “তপস্যা সম্পূর্ণ করবার জন্যে ।”

কাঠকুড়নি হাত জোড় করে বললে, “দর্শনের পূণ্য হতে আমাকে কেন বঞ্চিত করবে।”

তপস্বী আবার আসনে বসল, অনেক ক্ষণ ভাবল, আর কিছু বলল না।

৫

তার অমুরোধ যেমনি রাগা হল অমনি মেয়েটির বুকের এক ধার থেকে আর-এক ধারে বারে বারে যেন বজ্রস্ফুটি বিঁধতে লাগল।

সে ভাবলে, “আমি অতি সামান্ত, তবু আমার কথায় কেন বাধা ঘটবে।”

সেই রাতে পাতার বিছানায় একলা জেগে বসে তার নিজেকে নিজের ভয় করতে লাগল।

তার পরদিন সকালে সে ফল এনে দাঁড়াল, তাপস হাত পেতে নিলে। পাতার পাত্রে জল এনে দিতেই তাপস জল পান করলে। স্থখে তার মন ভরে উঠল।

কিন্তু তার পরেই নদীর ধারে শিরীষগাছের ছায়ায় তার চোখের জল আর থামতে চায় না। কী ভাবলে কী জানি।

পরদিন সকালে কাঠকুড়নি তাপসকে প্রণাম করে বললে, “প্রভু, আশীর্বাদ চাই।”

তপস্বী ভিজ্ঞাসা করলে, “কেন।”

মেয়েটি বললে, “আমি বহুদূর দেশে যাব।”

তপস্বী বললে, “যাও, তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক।”

৬

একদিন তপস্বী পূর্ণ হল।

ইন্দ্র এসে বললেন, “স্বর্গের অধিকার তুমি লাভ করেছ।”

তপস্বী বললে, “তা হলে আর স্বর্গে প্রয়োজন নেই।”

ইন্দ্র ভিজ্ঞাসা করলেন, “কী চাও।”

তপস্বী বললে, “এই বনের কাঠকুড়নিকে।”

প্রথম চিঠি

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেছে প্রবাসে।

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে গুর চোখে পড়ল।

মন বললে, “ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।”

কিন্তু, সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আসবে বলে একজনের দুটি চোখ বয়ে জল পড়ে, তার জীবনে এমন সে আর-কখনো দেখে নি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত রোদত্বরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাঙারে তার মতো একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে, এই কথা মনে করে বিষ্ময়ে তার বুক ভরে উঠল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেছে সে পাহাড়। সেখানে দেবদাকুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোটো ছোটো ঝরনা কাকে ঘেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায় লুকিয়েচুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্বীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেছে, “তুমি কবে ফিরে আসবে। এগো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।”

এই আসাযাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া আর তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল, এ কথা কে জানত। সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিম্নেকে দাঁড় করিয়ে দেখলে, আর তার মন বিষ্ময়ে ভরে উঠল।

ভোরবেলায় উঠে চিঠিখানি নিয়ে দেবদাকুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরোল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে আর কানে ঘেন সে শুনতে পায়, “তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।”

মনে মনে ভাবতে লাগল, “এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে।”

৩

এমন সময় সূর্য উঠল পূর্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে। দেবদাকর শিশিরভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিল্মিল্ করে উঠল।

হঠাৎ চারটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাকের মুখে তার সামনে এসে পড়ল। কী জানি কী ছিল তার মুখে, কিংবা তার সাজে, কিংবা তার চালচলনে— বড়ো মেয়েদুটি কোতুকে মুখ একটুখানি ঝাকিয়ে চলে গেল। ছোটো মেয়েদুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপতে পারলে না; দুজন দুজনকে ঠেলাঠেলি করে ঝিল্মিল্ করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কোতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আস ভাবে, “আমার দেখার মূল্য কি এই হাসি।”

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল, একলা ঘরে বসে চিঠি-খানি খুলে পড়লে, “তুমি কবে ফিরে আসবে। এসো, এসো, শীঘ্র এসো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।”

রথযাত্রা

রথযাত্রার দিন কাছে।

তাই রানী রাজাকে বললে, “চলো, রথ দেখতে যাই।”

রাজা বললে, “আচ্ছা।”

ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বেগোল, হাতিশাল থেকে হাতি। ময়ূরপংখি যায় সারে সারে, আর বল্লম হাতে সারে সারে সিপাইসাব্বি। দাসদাসী দলে দলে পিছে পিছে চলল।

কেবল বাকি রইল একজন। রাজবাড়ির কাঁটার কাঠি কুড়িয়ে আনা তার কাজ।

সদার এসে দয়া করে তাকে বললে, “ওরে, তুই যাবি তো আর।”

সে হাত জোড় করে বললে, “আমার যাওয়া ঘটবে না।”

রাজার কানে কথা উঠল সবাই সঙ্গে যায়, কেবল সেই দুঃখীটা যায় না।

রাজা দয়া করে মন্ত্রীকে বললে, “ওকেও ডেকে নিয়ো।”

রাস্তার ধারে তার বাড়ি। হাতি যখন সেইখানে পৌঁছল মন্ত্রী তাকে ডেকে বললে, “ওরে দুঃখী, ঠাকুর দেখবি চল।”

সে হাত জোড় করে বলল, “কত চলব। ঠাকুরের ছয়ার পর্যন্ত পৌছই এমন সাধ্য কি আমার আছে।”

মন্ত্রী বললে, “ভয় কী রে তোর, রাজার সঙ্গে চলবি।”

সে বললে, “সর্বনাশ! রাজার পথ কি আমার পথ।”

মন্ত্রী বললে, “তবে তোর উপায়? তোর ভাগ্যে কি রথযাত্রা দেখা ঘটবে না।”

সে বললে, “ঘটবে বই কি। ঠাকুর তো রথে করেই আমার ছয়ারে আসেন।”

মন্ত্রী হেসে উঠল। বললে, “তোর ছয়ারে রথের চিহ্ন কই।”

ছুঃখী বললে, “তার রথের চিহ্ন পড়ে না।”

মন্ত্রী বললে, “কেন বল্ তো।”

ছুঃখী বললে, “তিনি যে আসেন পুষ্পকরথে।”

মন্ত্রী বললে, “কই রে সেই রথ।”

ছুঃখী দেখিয়ে দিলে, তার ছয়ারের দুই পাশে দুটি সূর্যমুখী ফুটে আছে।

সওগাত

পুজোর পরব কাছে। ভাণ্ডার নানা সামগ্রীতে ভরা। কত বেনারসি কাপড়, কত সোনার অলংকার; আর ভাণ্ড ভরে ক্ষীর দই, পান্ন ভরে মিষ্টান্ন।

মা সওগাত পাঠাচ্ছেন।

বড়োছেলে বিদেশে রাজসরকারে কাজ করে; মেজোছেলে সওদাগর, ঘরে থাকে না; আর-কয়টি ছেলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করে পৃথক পৃথক বাড়ি করেছে; কুটুম্বরা আছে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে।

কোলের ছেলোট সন্দর দরজায় দাঁড়িয়ে সারা দিন ধরে দেখছে, ভারে ভারে সওগাত চলেছে, সারে সারে দাসদাসী, খালাগুলি রঙবেরঙের ক্রমালে ঢাকা।

দিন ফুরোল। সওগাত সব চলে গেল। দিনের শেষনৈবেদ্যের সোনার ডালি নিয়ে সূর্যাস্তের শেষ আভা নক্ষত্রলোকের পথে নিকরদেশ হল।

ছেলে ঘরে ফিরে এসে মাকে বললে, “মা, সবাইকে তুই সওগাত দিলি, কেবল আমাকে না।”

মা হেসে বললেন, “সবাইকে সব দেওয়া হয়ে গেছে, এখন তোর জন্যে কী বাকি রইল এই দেখ্।”

এই বলে তার কপালে চুখন করলেন।

ছেলে কাদোকাদো করে বললে, “সঙগাত পাব না ?”

“যখন দূরে যাবি তখন সঙগাত পাবি।”

“আর, যখন কাছে থাকি তখন তোর হাতের জিনিস দিবি নে ?”

মা তাকে দু হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন ; বললেন, “এই তো আমার হাতের জিনিস।”

মূর্ত্তি

বিরহিণী তার ফুলবাগানের এক ধারে বেদী সাজিয়ে তার উপর মূর্ত্তি গড়তে বসল। তার মনের মধ্যে যে মাহুঘটি ছিল বাইরে তারই প্রতিক্রম প্রতিদিন একটু একটু করে গড়ে, আর চেয়ে চেয়ে দেখে, আর ভাবে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

কিন্তু, যে রূপটি একদিন তার চিত্রপটে স্পষ্ট ছিল তার উপরে ক্রমে ঘেন ছায়া পড়ে আসছে। রাতের বেলাকার পদ্মের মতো মূর্ত্তির পাপড়িগুলি অল্প অল্প করে ঘেন বুনে এল।

মেঘটি তার নিজের উপর রাগ করে, লজ্জা পায়। সাধনা তার কঠিন হল, ফল খায় আর জল খায়, আর তৃণলব্ধ্য পড়ে থাকে।

মূর্ত্তিটি মনের ভিতর থেকে গড়তে গড়তে সে আর প্রতিমূর্ত্তি রইল না। মনে হল, এ ঘেন কোনো বিশেষ মাহুঘের ছবি নয়। যতই বেশি চেষ্টা করে ততই বেশি তফাত হয়ে যায়।

মূর্ত্তিকে তখন সে গমনা দিয়ে সাজাতে থাকে, একশো এক পদ্মের ডালি দিয়ে পূজো করে, সন্ধ্যাবেলায় তার সামনে গন্ধতৈলের প্রদীপ জ্বালে— সে প্রদীপ সোনার, সে তৈলের অনেক দাম।

দিনে দিনে গমনা বেড়ে ওঠে, পূজোর সামগ্রীতেই বেদী ঢেকে যায়, মূর্ত্তিকে দেখা যায় না।

২

এক ছেলে এসে তাকে বললে, “আমরা খেলব।”

“কোথায়।”

“এখানে, যেখানে তোমার পুতুল সাজিয়েছ।”

মেয়ে তাকে হাকিয়ে দেয় ; বলে, “এখানে কোনোদিন খেলা হবে না।”

আর-এক ছেলে এসে বলে, “আমরা ফুল তুলব।”

“কোথায়।”

“ঐষে, তোমার পুতুলের ঘরের শিয়রে যে চাঁপাগাছ আছে ঐ গাছ থেকে।”

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয় ; বলে, “এ ফুল কেউ ছুঁতে পাবে না।”

আর-এক ছেলে এসে বলে, “প্রদীপ ধরে আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।”

“প্রদীপ কোথায়।”

“ঐ যেটা তোমার পুতুলের ঘরে জ্বাল।”

মেয়ে তাকে তাড়িয়ে দেয় ; বলে, “ও প্রদীপ ওখান থেকে সরাতে পারব না।”

৩

এক ছেলের দল যায়, আর-এক ছেলের দল আসে।

মেয়েটি শোনে তাদের কলরব, আর দেখে তাদের নৃত্য। স্বর্ণকালের ক্ষণ অন্তর হয়ে যায়। অমনি চমকে ওঠে, লজ্জা পায়।

মেলার দিন কাছে এল।

পাড়ার বুড়ো এসে বললে, “বাছা, মেলা দেখতে যাবি নে?”

মেয়ে বললে, “আমি কোথাও যাব না।”

সঙ্গিনী এসে বললে, “চল, মেলা দেখবি চল।”

মেয়ে বললে, “আমার সময় নেই।”

ছোটো ছেলেটি এসে বললে, “আমার সঙ্গে নিয়ে মেলায় চলো-না।”

মেয়ে বললে, “যেতে পারব না, এখানে যে আমার পুজো।”

৪

একদিন রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে যেন শুনতে পেল সমুদ্রগর্জনের মতো শব্দ। দলে দলে দেশবিদেশের লোক চলেছে— কেউ বা রথে, কেউ বা পায়ে হেঁটে ; কেউ বা বোঝা পিঠে নিয়ে, কেউ বা বোঝা কলে দিয়ে।

সকালে যখন সে জেগে উঠল তখন যাত্রীর গানে পাখির গান আর পোনা ঘায় না। ওর হঠাৎ মনে হল, ‘আমাকেও যেতে হবে।’

অমনি মনে পড়ে গেল, ‘আমার যে পুজো আছে, আমার তো যাবার জো নেই।’

তখনি ছুটে চলল তার বাগানের দিকে যেখানে মূর্তি সাজিয়ে রেখেছে।

গিয়ে দেখে, মূর্তি কোথায়! বেদীর উপর দিয়ে পথ হয়ে গেছে। লোকের পরে লোক চলে, বিজ্রাম নেই।

“এইখানে থাকে বসিয়ে রেখেছিলেন সে কোথায়।”

কে তার মনের মধ্যে বলে উঠল, ‘যারা চলেছে তাদেরই মধ্যে।’

এমন সময় ছোটো ছেলে এসে বললে, “আমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলো।”

“কোথায়।”

ছেলে বললে, “মেলার মধ্যে তুমিও যাবে না?”

মেয়ে বললে, “হ্যাঁ, আমিও যাব।”

যে বেদীর সামনে এসে সে বসে থাকত সেই বেদীর উপর হল তার পথ, আর মূর্তির মধ্যে যে ঢেকে গিয়েছিল সকল যাত্রীর মধ্যে তাকে পেলো।

পরীর পরিচয়

রাজপুত্রের বয়স কুড়ি পার হয়ে যায়, দেশবিদেশ থেকে বিবাহের সম্বন্ধ আসে।

ঘটক বললে, “বাহুলীকরাজের মেয়ে রূপসী বটে, যেন সাদা গোলাপের পুষ্পকুটি।”

রাজপুত্র মুখ ফিরিয়ে থাকে, জবাব করে না।

দূত এসে বললে, “গান্ধাররাজের মেয়ের অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্য ফেটে পড়ছে, যেন ত্রাঙ্কালতায় আঙুরের গুচ্ছ।”

রাজপুত্র শিকারের ছলে বনে চলে যায়। দিন যায়, সপ্তাহ যায়, ফিরে আসে না।

দূত এসে বললে, “কান্ধোরাজের রাজকন্যাকে দেখে এলেম; ভোরবেলাকার দিগন্ত-রেখাটির মতো বাকী চোখের পল্লব, শিশিরে স্নিগ্ধ, আলোতে উজ্জল।”

রাজপুত্র ভর্তৃহরির কাব্য পড়তে লাগল, পুঁথি থেকে চোখ তুলল না।

রাজা বললে, “এর কারণ? ডাকো দেখি মন্ত্রীর পুত্রকে।”

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা বললে, “তুমি তো আমার ছেলের মিতা, সত্য করে বলো, বিবাহে তার মন নেই কেন।”

মন্ত্রীর পুত্র বললে, “মহারাজ, যখন থেকে তোমার ছেলে পরীক্ষানের কাছিনী শুনেছে সেই অবধি তার কামনা, সে পরী বিয়ে করবে।”

২

রাজার হুকুম হল, পরীক্ষান কোথায় ধবর চাই।

বড়ো বড়ো পণ্ডিত ডাকা হল, যেখানে যত পুঁথি আছে তারা সব খুলে দেখলে। মাথা নেড়ে বললে, পুঁথির কোনো পাতায় পরীক্ষানের কোনো ইশারা মেলে না।

তখন রাজসভায় সওদাগরদের ডাক পড়ল। তারা বললে, “সমুদ্র পার হয়ে কত দ্বীপেই ঘুরলেম— এলাদ্বীপে, মরীচদ্বীপে, লবঙ্গলতার দেশে। আমরা গিয়েছি মলয়দ্বীপে চন্দন আনতে, যুগনাভির সন্ধানে গিয়েছি কৈলাসে দেবদারুবনে। কোথাও পরীক্ষানের কোনো ঠিকানা পাই নি।”

রাজা বললে, “ডাকো মন্ত্রী পুত্রকে।”

মন্ত্রীর পুত্র এল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “পরীক্ষানের কাহিনী রাজপুত্র কার কাছে শুনেছে।”

মন্ত্রীর পুত্র বললে, “সেই যে আছে নবীন পাগলা, বাঁশি হাতে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, শিকার করতে গিয়ে রাজপুত্র তারই কাছে পরীক্ষানের গল্প শোনে।”

রাজা বললে, “আচ্ছা, ডাকো তাকে।”

নবীন পাগলা এক মুঠো বনের ফুল ভেট দিয়ে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “পরীক্ষানের খবর তুমি কোথায় পেলে।”

সে বললে, “সেখানে তো আমার সদাই যাওয়া আসা।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, “কোথায় সে জায়গা।”

পাগলা বললে, “তোমার রাজ্যের সীমানায় চিত্রগিরি পাহাড়ের তলে, কাম্যক-সরোবরের ধারে।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, “সেইখানে পরী দেখা যায়?”

পাগলা বললে, “দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।”

রাজা জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি তাদের চেন কী উপায়ে।”

পাগলা বললে, “কখনো বা একটা সুর শুনে, কখনো বা একটা আলো দেখে।”

রাজা বিরক্ত হয়ে বললে, “এর আগাগোড়া সমস্তই পাগলামি, একে তাড়িয়ে দাও।”

৩

পাগলার কথা রাজপুত্রের মনে গিয়ে বাজল।

কাকুনমাসে তখন ডালে ডালে শালফুলে ঠেলাঠেলি, আর শিরীষফুলে বনের প্রান্ত শিউরে উঠেছে। রাজপুত্র চিত্রগিরিতে একা চলে গেল।

সবাই জিজ্ঞাসা করলে, “কোথায় যাচ্ছ।”

সে কোনো জবাব করলে না।

গুহার ভিতর দিয়ে একটি ঝরনা ঝরে আসে, সেটি গিয়ে মিলেছে কাম্যকসরোবরে ; গ্রামের লোক তাকে বলে উদাসঝোরা । সেই ঝরনাতলায় একটি পোড়ো মন্দিরে রাজপুত্র বাসা নিলে ।

এক মাস কেটে গেল । গাছে গাছে যে কচিপাতা উঠেছিল তাদের রঙ ঘন হয়ে আসে, আর ঝরাফুলে বনপথ ছেয়ে যায় । এমন সময় একদিন ভোরের স্বপ্নে রাজপুত্রের কানে একটি বাশির সুর এল । জেগে উঠেই রাজপুত্র বললে, “আজ পাব দেখা ।”

৪

তখনি ঘোড়ায় চড়ে ঝরনাধারার তীর বেয়ে চলল, পৌছল কাম্যকসরোবরের ধারে । দেখে, সেখানে পাহাড়েদের এক মেয়ে পদ্মবনের ধারে বলে আছে । ঘড়ায় তার জল ভরা, কিন্তু ঘাটের থেকে সে ওঠে না । কালো মেয়ে কানের উপর কালো চুলে একটি শিরীষফুল পরেছে, গোখুলিতে যেন প্রথম তারা ।

রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে তাকে বললে, “তোমার ঐ কানের শিরীষফুলটি আমাকে দেবে ?”

যে হরিণী ভয় জানে না এ বুঝি সেই হরিণী । ঘাড় বেকিয়ে একবার সে রাজপুত্রের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে । তখন তার কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল— ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম আবণের সঞ্চার ।

মেয়েটি কান থেকে ফুল খসিয়ে রাজপুত্রের হাতে দিয়ে বললে, “এই নাও ।”

রাজপুত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কোন্ পরী আমাকে সত্য করে বলো ।”

তুনে একবার মুখে দেখা দিল বিশ্বয়, তার পরেই আশ্বিনমেঘের আচমকা বৃষ্টির মতো তার হাসির উপর হাসি, সে আর ধামতে চায় না ।

রাজপুত্র মনে ভাবল, “স্বপ্ন বুঝি ফলল— এই হাসির সুর যেন সেই বাশির সুরের সঙ্গে মেলে ।”

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে দুই হাত বাড়িয়ে দিলে ; বললে, “এসো ।”

সে তার হাত ধরে ঘোড়ায় উঠে পড়ল, একটুও ভাবল না । তার জলভরা ঘড়া ঘাটে রইল পড়ে ।

শিরীষের ডাল থেকে কোকিল ডেকে উঠল, কুহ কুহ কুহ কুহ ।

রাজপুত্র মেয়েটিকে কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, “তোমার নাম কী ।”

সে বললে, “আমার নাম কাজরী ।”

উদাসঝোরার ধারে ছুজনে গেল সেই পোড়ো মন্দিরে। রাজপুত্র বললে, “এবার তোমার ছদ্মবেশ ফেলে দাও।”

সে বললে, “আমরা বনের মেয়ে, আমরা তো ছদ্মবেশ জানি নে।”

রাজপুত্র বললে, “আমি যে তোমার পরীর মূর্তি দেখতে চাই।”

পরীর মূর্তি! আবার সেই হাসি, হাসির উপর হাসি। রাজপুত্র ভাবলে, “এর হাসির সুর এই ঝরনার সুরের সঙ্গে মেলে, এ আমার এই ঝরনার পরী।”

৫

রাজার কানে খবর গেল, রাজপুত্রের সঙ্গে পরীর বিয়ে হয়েছে। রাজবাড়ি থেকে ঘোড়া এল, হাতি এল, চতুর্দোলা এল।

কাজরী জিজ্ঞাসা করলে, “এসব কেন!”

রাজপুত্র বললে, “তোমাকে রাজবাড়িতে যেতে হবে।”

তখন তার চোখ ছলছলিয়ে এল। মনে পড়ে গেল, তার ঘড়া পড়ে আছে সেই জলের ধারে; মনে পড়ে গেল, তার ঘরের আঙিনায় শুকোবার জন্তে ঘাসের বীজ মেলে দিয়ে এসেছে; মনে পড়ল, তার বাপ আর ভাই শিকারে চলে গিয়েছিল, তাদের ফেরবার সময় হয়েছে; আর মনে পড়ল, তার বিয়েতে একদিন যৌতুক দেবে বলে তার মা গাছতলায় তাঁত পেতে কাপড় বুনছে, আর গুন্‌গুন্ করে গান গাইছে।

সে বললে, “না, আমি যাব না।”

কিন্তু ঢাক ঢোল বেজে উঠল; বাজল বাঁশি, কঁাসি, দামামা— ওর কথা শোনা গেল না।

চতুর্দোলা থেকে কাজরী যখন রাজবাড়িতে নামল, রাজমহিমী কপাল চাপড়ে বললে, “এ কেমনতরো পরী।”

রাজার মেয়ে বললে, “ছি, ছি, কী লজ্জা।”

মহিমীর দাসী বললে, “পরীর বেশটাই বা কী রকম।”

রাজপুত্র বললে, “চুপ করো, তোমাদের ঘরে পরী ছদ্মবেশে এসেছে।”

৬

দিনের পর দিন যায়। রাজপুত্র জ্যোৎস্নারাত্রে বিছানায় জেগে উঠে চেয়ে দেখে, কাজরীর ছদ্মবেশ একটু কোথাও খসে পড়েছে কিনা। দেখে যে, কাজরী মেয়ের কালো চুল এলিয়ে গেছে, আর তার দেহখানি ঘেন কালো পাথরে নিখুঁত করে খোদা একটি

প্রতিমা। রাজপুত্র চূপ করে বলে ভাবে, “পরী কোথায় লুকিয়ে রইল, শেষরাতে অন্ধকারের আড়ালে উষার মতো।”

রাজপুত্র ঘরের লোকের কাছে লজ্জা পেলে। একদিন মনে একটু রাগও হল। কাজরী সকালবেলায় বিছানা ছেড়ে যখন উঠতে যায় রাজপুত্র শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে বললে, “আজ তোমাকে ছাড়ব না— নিজরূপ প্রকাশ করো, আমি দেখি।”

এমনি কথাই শুনে বনে যে হাসি হেসেছিল সে হাসি আর বেরোল না। দেখতে দেখতে দুই চোখ জলে ভরে এল।

রাজপুত্র বললে, “তুমি কি আমায় চিরদিন ফাঁকি দেবে।”

সে বললে, “না, আর নয়।”

রাজপুত্র বললে, “তবে এইবার কাতিকী পূর্ণিমায় পরীকে যেন সবাই দেখে।”

৭

পূর্ণিমার চাঁদ এখন মাঝগগনে। রাজবাড়ির নহবতে মাঝরাতেই সুরে ঝিমি ঝিমি ভান লাগে।

রাজপুত্র বরসজ্জা পরে হাতে বরণমালা নিয়ে মহলে ঢুকল; পরীবোয়ের সঙ্গে আজ হবে তার শুভদৃষ্টি।

শয়নঘরে বিছানায় সাদা আস্তরণ, তার উপর সাদা কুন্দফুল রাশ-করা; আর উপরে জানলা বেয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে।

আর, কাজরী?

সে কোথাও নেই।

তিন প্রহরের বাঁশি বাজল। চাঁদ পশ্চিমে হেলেছে। একে একে কুটুন্ডে ঘর ভরে গেল।

পরী কই।

রাজপুত্র বললে, “চলে গিয়ে পরী আপন পরিচয় দিয়ে যায়, আর তখন তাকে পাওয়া যায় না।”

প্রাণমন

আমার জানলার সামনে রাঙা মাটির রাস্তা ।

ওখান দিয়ে বোঝাই নিয়ে গোরুর গাড়ি চলে ; সাঁওতাল মেয়ে খড়ের আঁটি মাথায়
করে ছাটে যায়, সন্ধ্যাবেলায় কলহাশ্তে ঘরে ফেরে ।

কিন্তু, মানুষের চলাচলের পথে আজ আমার মন নেই ।

জীবনের যে ভাগটা অস্থির, নানা ভাবনায় উদ্বিগ্ন, নানা চেষ্টায় চঞ্চল, সেটা আজ
ঢাকা পড়ে গেছে । শরীর আজ রুগ্ন, মন আজ নিরাসক্ত ।

টেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র ; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা
টেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে ভুলিয়ে দেয় । টেউ যখন ধামে তখন সমুদ্র
আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অগণ্ড ঐক্যে শূন্য
হয়ে বিরাজ করে ।

তেমনি আমার সচেষ্টে প্রাণ যখনি ছুটি পেল, তখনি সেই গভীর প্রাণের মধ্যে স্থান
পেলুম যেখানে বিশ্বের আদিকালের লীলাক্ষেত্র ।

পথ-চলা পথিক যত দিন ছিলুম তত দিন পথের ধারের ঐ বটগাছটার দিকে
তাকাবার সময় পাই নি ; আজ পথ ছেড়ে জানলায় এসেছি, আজ ওর সঙ্গে মোকাবিলা
শুরু হল ।

আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কণে কণে ও যেন অস্থির হয়ে ওঠে । যেন বলতে
চায়, “বুঝতে পারছ না ?”

আমি সাক্ষ্য নিয়ে বলি, “বুঝেছি, সব বুঝেছি ; তুমি অমন ব্যাকুল হোয়ো না ।”

কিছু কণের জন্তে আবার শাস্ত হয়ে যায় । আবার দেখি, ভারি ব্যস্ত হয়ে ওঠে ;
আবার সেই থরথর করুকরু বলমূল ।

আবার ওকে ঠাণ্ডা করে বলি, “হাঁ হাঁ, ঐ কথাই বটে ; আমি তোমারই খেলার
সাথি, লক্ষহাজার বছর ধরে এই মাটির পেলাঘরে আমিও গওঁষে গওঁষে তোমারই
মতো সূর্যালোক পান করেছি, ধরণীর স্তব্ধসঙ্গে আমিও তোমার অংশী ছিলাম ।”

তখন ওর ভিতর দিয়ে হঠাৎ হাওয়ার শব্দ শুনি ; ও বলতে থাকে, “হাঁ, হাঁ, হাঁ ।”

যে ভাষা রক্তের মর্ম্মরে আমার হৃৎপিণ্ডে বাজে, বা আলো-অন্ধকারের নিঃশব্দ
আবর্তনধ্বনি, সেই ভাষা ওর পদ্মমর্ম্মরে আমার কাছে এসে পৌঁছয় । সেই ভাষা
বিশ্বজগতের সরকারি ভাষা ।

তার মূল বাণীটি হচ্ছে, “আছি, আছি ; আমি আছি, আমরা আছি।”

সে ভারি খুশির কথা। সেই খুশিতে বিশ্বের অণু পরমাণু থবুথবু করে কাঁপছে।

ঐ বটগাছের সঙ্গে আমার আজ সেই এক ভাষায় সেই এক খুশির কথা চলছে।

ও আমাকে বলছে, “আছ হে বটে ?”

আমি সাড়া দিয়ে বলছি, “আছি হে মিতা।”

এমনি করে ‘আছি’তে ‘আছি’তে এক তালে করতালি বাজছে।

২

ঐ বটগাছটার সঙ্গে যখন আমার আলাপ শুরু হল তখন বসন্তে ওর পাতাগুলো কচি ছিল ; তার নানা ফাঁক দিয়ে আকাশের পলাতক আলো ঘাসের উপর এসে পৃথিবীর ছায়ায় সঙ্গে গোপনে গলাগলি করত।

তার পরে আষাঢ়ের বর্ষা নামল ; ওরও পাতার রঙ মেঘের মতো। গম্ভীর হয়ে এসেছে। আজ সেই পাতার রূপ প্রবীণের পাকা বুদ্ধির মতো নিবিড়, তার কোনো ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো প্রবেশ করবার পথ পায় না। তখন গাছটি ছিল গরিবের মেয়েটির মতো ; আজ সে ধনীঘরের গৃহিণী, যেন পর্দাপু পরিভূষিত চেহারা।

আজ সকালে সে তার মরকতমণির বিশনলী হার ঝলমলিয়ে আমাকে বললে, “মাথার উপর অমনতরো ইটপাথর মুড়ি দিয়ে বসে আছ কেন। আমার মতো একেবারে ভরপুর বাইরে এসো-না।”

আমি বললেম, “মাছুষকে যে ভিতর বাহির দুই বাঁচিয়ে চলতে হয়।”

গাছ নড়েচড়ে বলে উঠল, “বুঝতে পারলেম না।”

আমি বললেম, “আমাদের দুটো জগৎ, ভিতরের আর বাইরের।”

গাছ বললে, “সর্বনাশ ! ভিতরেরটা আছে কোথায়।”

“আমার আপনায়ই ঘেরের মধ্যে।”

“সেখানে কর কী।”

“সৃষ্টি করি।”

“সৃষ্টি আবার ঘেরের মধ্যে ! তোমার কথা বোঝবার জো নেই।”

আমি বললেম, “যেমন ভীরের মধ্যে বাধা প’ড়ে হয় নদী, তেমনি ঘেরের মধ্যে ধরা প’ড়েই তো সৃষ্টি। একই জিনিস ঘেরের মধ্যে আটকা প’ড়ে কোথাও হীরের টুকরো, কোথাও বটের গাছ।”

গাছ বললে, “তোমার ঘেরটা কী রকম শুনি।”

আমি বললেম, “সেইটি আমার মন । তার মধ্যে যা ধরা পড়ছে তাই নানা সৃষ্টি হয়ে উঠছে ।”

গাছ বললে, “তোমার সেই বেড়াঘেরা সৃষ্টিটা আমাদের চন্দ্রশূর্যের পাশে কতটুকুই বা দেখায় ।”

আমি বললেম, “চন্দ্রশূর্যকে দিয়ে তাকে তো মাপা যায় না, চন্দ্রশূর্য যে বাইরের জিনিস ।”

“তা হলে মাপবে কী দিয়ে ।”

“স্বপ্ন দিয়ে, বিশেষত ছঃপ্ন দিয়ে ।”

গাছ বললে, “এই পূবে হাওয়া আমার কানে কানে কথা কয়, আমার প্রাণে প্রাণে তার সাড়া জাগে । কিন্তু, তুমি যে কিসের কথা বললে আমি কিছুই বুঝলেন না ।”

আমি বললেম, “বোঝাই কী করে । তোমার ঐ পূবে হাওয়াকে আমাদের বেড়ার মধ্যে ধ’রে বীণার তারে যেমনি বেঁধে ফেলেছি, অমনি সেই হাওয়া এক সৃষ্টি থেকে একেবারে আর-এক সৃষ্টিতে এসে পৌঁছয় । এই সৃষ্টি কোন্ আকাশে যে স্থান পায়, কোন্ বিরাট চিত্তের স্রবণাকাশে, তা আমিও ঠিক জানি নে । মনে হয়, যেন বেদনার একটা আকাশ আছে । সে আকাশ মাপের আকাশ নয় ।”

“আর, ওর কাল ?”

“ওর কালও ঘটনার কাল নয়, বেদনার কাল । তাই সে কাল সংসার অতীত ।”

“তুই আকাশ তুই কালের স্রীব তুমি, তুমি অদ্ভুত । তোমার ভিতরের কথা কিছুই বুঝলেন না ।”

“নাই বা বুঝলে ।”

“আমার বাইরের কথা তুমিই কি ঠিক বোঝ ।”

“তোমার বাইরের কথা আমার ভিতরে এসে যে কথা হয়ে ওঠে তাকে যদি বোঝা বল তো সে বোঝা, যদি গান বল তো গান, কল্পনা বল তো কল্পনা ।”

৩

গাছ তার সমস্ত ডালগুলো তুলে আমাকে বললে, “একটু থামো । তুমি বড়ো বেশি ভাব’, আর বড়ো বেশি বক’ ।”

শুনে আমার মনে হল, এ কথা সত্যি । আমি বললেম, “চূপ করবার জন্মেই তোমার কাছে আসি, কিন্তু অভ্যাসদোষে চূপ ক’রে ক’রেও বকি ; কেউ কেউ যেমন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে ।”

কাগজটা পেন্সিলটা টেনে ফেলে দিলেম, রইলেম ওর দিকে অনিমেষ তাকিয়ে। ওর চিকন পাতাগুলো ওস্তাদের আঙুলের মতো আলোকবীণায় দ্রুত তালে ঘা দিতে লাগল।

হঠাৎ আমার মন বলে উঠল, “এই তুমি যা দেখছ আর এই আমি যা ভাবছি, এর মাঝখানের যোগটা কোথায়।”

আমি তাকে ধমক দিয়ে বললেম, “আবার তোমার প্রশ্ন? চূপ করো।”

চূপ করে রইলেম, একদৃষ্টে চেয়ে দেখলেম। বেলা কেটে গেল।

গাছ বললে, “কেমন, সব বুঝেছ?”

আমি বললেম, “বুঝেছি।”

৪

সেদিন তো চূপ করেই কাটল।

পরদিনে আমার মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, “কাল গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠলে ‘বুঝেছি’, কী বুঝেছ বলো তো।”

আমি বললেম, “নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেছে। তাই, প্রাণের বিগুহ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।”

“কী রকম দেখলে।”

“দেখলেম, এই প্রাণের আপনাতে আপনার কী আনন্দ। নিজেকে নিয়ে পাতায় পাতায়, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, কত যত্নে সে কত ছাঁটই ছেঁটেছে, কত রঙই লাগিয়েছে, কত গন্ধ, কত রস। তাই ঐ বটের দিকে তাকিয়ে নীরবে বলছিলেম,— ওগো বনম্পতি, জন্মমাত্রই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ যে আনন্দধ্বনি করে উঠেছিল সেই ধ্বনি তোমার শাখায় শাখায়। সেই আদিযুগের সরল হাসিটি তোমার পাতায় পাতায় ঝলমল করছে। আমার মধ্যে সেই প্রথম প্রাণ আজ চঞ্চল হল। ভাবনার বেড়ার মধ্যে সে বন্দী হয়ে বসে ছিল; তুমি তাকে ডাক দিয়ে বলেছ, ওরে আয়-না রে আলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে; আর আমারই মতো নিয়ে আয় তোর রূপের তুলি, রঙের বাটি, রসের পেয়াল।”

মন আমার খানিক ক্ষণ চূপ করে রইল। তার পরে কিছু বিমর্ষ হয়ে বললে, “তুমি ঐ প্রাণের কথাটাই নিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি ক’রে থাক, আমি যেসব উপকরণ জড়ো করছি তার কথা এমন সাজিয়ে সাজিয়ে বল না কেন।”

“তার কথা আর কইব কী। সে নিজের নিজের টংকারে ঝংকারে হংকারে ক্রংকারে আকাশ কাঁপিয়ে রেখেছে। তার ভারে, তার জটিলতায়, তার জঞ্জালে পৃথিবীর বন্ধ ব্যথিত হয়ে উঠল। ভেবে পাই নে, এর অন্ত কোথায়। থাকের উপরে আর কত থাক উঠবে, গাঁঠের উপরে আর কত গাঁঠ পড়বে। এই প্রশ্নেরই জবাব ছিল ঐ গাছের পাতায়।”

“বটে? কী জবাব শুনি।”

“সে বলছে, প্রাণ যত ক্ষণ নেই তত ক্ষণ সমস্তই কেবল সুপ, সমস্তই কেবল ভার। প্রাণের পরশ লাগবা মাত্রই উপকরণের সঙ্গে উপকরণ আপনি মিলে গিয়ে অখণ্ড স্তম্ভ হয়ে ওঠে। সেই স্তম্ভকেই দেখো এই বনবিহারী। তারই বাঁশি তো বাজছে বটের ছায়ায়।”

৫

তখন কবেকার কোন্ ভোররাত্রি।

প্রাণ আপন সৃষ্টিশয্যা ছাড়ল; সেই প্রথম পথে বাহির হল অজানার উদ্দেশে, অসাড় জগতের তেপান্তর মাঠে।

তখনও তার দেহে ক্লাস্তি নেই, মনে চিন্তা নেই; তার রাজপুত্রের সাক্ষে না লেগেছে ধুলো, না ধরেছে ছিদ্র।

সেই অক্লান্ত নিশ্চিন্ত অন্নান প্রাণটিকে দেখলেম এই আষাঢ়ের সকালে, ঐ বট-গাছটিতে। সে তার শাখা নেড়ে আমাকে বললে, “নমস্কার।”

আমি বললেম, “রাজপুত্র, মরুদৈত্যটার সঙ্গে লড়াই চলছে কেমন বলো তো।”

সে বললে, “বেশ চলছে, একবার চার দিকে তাকিয়ে দেখো-না।”

তাকিয়ে দেখি, উত্তরের মাঠ ঘাসে ঢাকা, পূর্বের মাঠে আউশ ধানের অঙ্কুর, দক্ষিণে বাঁধের ধারে তালের সার; পশ্চিমে শালে তালে মহুয়া, আমে জামে খেজুরে, এমনি জটলা করেছে যে দিগন্ত দেখা যায় না।

আমি বললেম, “রাজপুত্র, ধন্য তুমি। তুমি কোমল, তুমি কিশোর, আর দৈত্যটা হল যেমন প্রবীণ তেমনি কঠোর; তুমি ছোটো, তোমার তুণ ছোটো, তোমার ভীষ ছোটো, আর ও হল বিপুল, ওর বর্ম মোটা, ওর গদা মস্ত। তবু তো দেখি, দিকে দিকে তোমার ধ্বজা উড়ল, দৈত্যটার পিঠের উপর তুমি পা রেখেছ; পাথর মানছে হার, ধুলো দাসখণ্ড লিপে দিচ্ছে।”

বট বললে, “তুমি এত সমারোহ কোথায় দেখলে।”

আমি বললেম, “তোমার লড়াইকে দেখি শাস্তির রূপে, তোমার কৰ্মকে দেখি বিজ্ঞানের বেশে, তোমার জয়কে দেখি নম্রতার মূর্তিতে। সেই জন্মেই তো তোমার ছায়ায় সাধক এসে বসেছে ঐ সহজ যুদ্ধজয়ের মন্ত্র আর ঐ সহজ অধিকারের সন্ধিটি পেশবার জন্মে। প্রাণ যে কেমন ক’রে কাজ করে, অরণ্যে অরণ্যে তারই পাঠশালা খুলেছ। তাই যারা ক্লান্ত তারা তোমার ছায়ায় আসে, যারা আর্ত তারা তোমার বাণী খোজে।

আমার স্তব শুনে বটের ভিতরকার প্রাণপুরুষ বুঝি খুশি হল; সে বলে উঠল, “আমি বেরিয়েছি মকদ্দেমতোর সঙ্গে লড়াই করতে; কিন্তু আমার এক ছোটো ভাই আছে, সে যে কোন্ লড়াইয়ে কোথায় চলে গেল আমি তার আর নাগাল পাই নে। কিছু কণ আগে তারই কথা কি তুমি বলছিলে।”

“হ্যাঁ, তাকেই আমরা নাম দিয়েছি—মন।”

“সে আমার চেয়ে চঞ্চল। কিছুতে তার সন্তোষ নেই। সেই অশান্তটার খবর আমাকে দিতে পার?”

আমি বললেম, “কিছু কিছু পারি বই কি। তুমি লড়ছ বাঁচবার জন্মে, সে লড়ছে পাবার জন্মে, আরও দূরে আর-একটা লড়াই চলছে ছাড়বার জন্মে। তোমার লড়াই অসাড়ের সঙ্গে, তার লড়াই অভাবের সঙ্গে, আরও একটা লড়াই আছে সঞ্চয়ের সঙ্গে। লড়াই জটিল হয়ে উঠল, বাহের মধ্যে যে প্রবেশ করছে বাহ থেকে বেরোবার পথ সে খুঁজে পাচ্ছে না। হার জিত অনিশ্চিত ব’লে ধাঁদা লাগল। এই বিধার মধ্যে তোমার ঐ সবুজ পতাকা যোদ্ধাদের আশ্বাস দিচ্ছে। বলছে, ‘জয়, প্রাণের জয়।’ গানের তান বেড়ে বেড়ে চলেছে, কোন্ সপ্তক থেকে কোন্ সপ্তকে চড়ল তার ঠিকানা নেই। এই স্বরসংকটের মধ্যে তোমার তবুৱাটি সরল তারে বলছে, ‘ভয় নেই, ভয় নেই।’ বলছে, ‘এই তো মূল স্বর আমি বেঁধে রেখেছি, এই আদি প্রাণের স্বর। সকল উন্মত্ত তানই এই স্বরে স্তম্ভের ধূমোয় এসে মিলবে আনন্দের গানে। সকল পাণ্ডা, সকল দেওয়া ফুলের মতো ফুটবে, ফলের মতো ফলবে।’ ”

আগমনী

আয়োজন চলেইছে। তার মাঝে একটুও ফাঁক পাওয়া যায় না যে ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তবুও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক-একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, “কেউ আসবে বুঝি?”

মন বলে, “রোসো। আমাকে জায়গা দখল করতে হবে, জিনিসপত্র জোগাতে হবে, ঘরবাড়ি গড়তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো না।”

চূপচাপ করে আবার খাটতে বসি। ভাবি, জায়গা-দখল সারা হবে, জিনিসপত্র-সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ি-গড়া বাকি থাকবে না, তখন শেষ জবাব মিলবে।

জায়গা বেড়ে চলেছে, জিনিসপত্র কম হল না, ইয়ারভের গাতটা মহল সারা হল। আমি বললেম, “এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও।”

মন বলে, “আরে রোসো, আমার সময় নেই।”

আমি বললেম, “কেন, আরও জায়গা চাই? আরও ঘর? আরও সরঞ্জাম?”

মন বললে, “চাই বই কি।”

আমি বললেম, “এখনও যথেষ্ট হয় নি?”

মন বললে, “এতটুকুতে ধরবে কেন।”

আমি জিজ্ঞাসা করলেম, “কী ধরবে। কাকে ধরবে।”

মন বললে, “সেসব কথা পরে হবে।”

তবু আমি প্রশ্ন করলেম, “সে বুঝি মস্ত বড়ো?”

মন উত্তর করলে, “বড়ো বই কি।”

এত বড়ো ঘরেও তাকে কুলোবে না, এত মস্ত জায়গায়! আবার উঠেপড়ে লাগলেম। দিনে আহার নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই। যে দেখলে সেই বাহবা দিলে; বললে, “কাজের লোক বটে।”

এক-একবার কেমন আমার স্নেহ হতে লাগল, বুঝি মন বীদরটা আসল কথার জবাব জানে না। সেইজন্টেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক-একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ করে কান পেতে শুনি পথ দিয়ে কেউ আসছে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না বাড়িয়ে ঘরে আলো জালি, আর সাজ সরঞ্জাম না জুটিয়ে ফুল ফোটার বেলা থাকতে একটা মালা গাঁখে রাখি।

কিন্তু, ভয়সা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হল মন। সে দিনরাত তার দাঁড়িপাল্লা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজন-দরে আর গণ্ডের মাপে সমস্ত জিনিস যাচাই করছে। সে কেবলই বলছে, “আরও না হলে চলবে না।”

“কেন চলবে না।”

“সে যে মস্ত বড়ো।”

“কে মস্ত বড়ো।”

বাস, চূপ। আর কথা নেই।

যখন তাকে চেপে ধরি “অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না, একটা জবাব দিতেই হবে” তখন সে রেগে উঠে বলে, “জবাব দিতেই হবে, এমন কী কথা। যার উদ্দেশ্য মেলে না, যার খবর পাই নে, যার মানে বোঝবার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই করে দাও। আর, আমার এই দিকটাতে তাকাও দেখি। কত মামলা, কত লড়াই; লাঠিসড়কি-পাইক-বরকন্দাজে পাড়া জুড়ে গেল; বিন্মিতে মজুরে ইটকাঠ-চুন-সুরকিতে কোথাও পা ফেলবার জো কী। সমস্তই স্পষ্ট; এর মধ্যে আশ্বাস নেই, ইশারা নেই। তবে এ-সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন।”

তুনে তখন ভাবি, মনটাই সেয়ানা, আমিই অবুঝ। আবার বুড়িতে করে ইট বয়ে আনি, চূনের সঙ্গে সুরকি মেশাতে থাকি।

২

এমনি করেই দিন যায়। আমার ভূমি দিগন্ত পেরিয়ে গেল, ইমারতের পাঁচ তলা সারা হয়ে ছ’তলার ছাদ পিটোনো চলছে। এমন সময়ে একদিন বাদলের মেঘ কেটে গেল; কালো মেঘ হল সাদা; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরবের তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানস-সরোবরের পদ্মগন্ধে দিনরাত্রির দণ্ডপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মতো উত্তলা করে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত আকাশ হেসে উঠেছে আমার ছয়তলা ঐ বাড়িটার উজ্জ্বল ভারাগুলোর দিকে চেয়ে।

আমি তো ব্যাকুল হয়ে পড়লেম; থাকে দেখি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, “ওগো, কোন্ হাওয়াখানা থেকে আজ নহবত বাজছে বলো তো।”

ভারা বলে, “ছাড়ো, আমার কাজ আছে।”

একটা খাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে, মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চূপ করে বসে ছিল। সে বললে, “আগমনীর সুর এসে পৌঁছল।”

আমি যে কী বুঝলেম জানি নে; বলে উঠলেম, “জবে আর দেবি নেই।”

সে হেসে বললে, “না, এল ব’লে।”

তখনি খাতাখানায় এসে মনকে বললেন, “এবার কাজ বন্ধ করো।”

মন বললে, “সে কী কথা। লোকে যে বলবে অকর্মণ্য।”

আমি বললেন, “বলুক গে।”

মন বললে, “তোমার হল কী। কিছু খবর পেয়েছ নাকি।”

আমি বললেন, “হ্যাঁ, খবর এসেছে।”

“কী খবর।”

মুশকিল, স্পষ্ট ক’রে জবাব দিতে পারি নে। কিন্তু, খবর এসেছে। মানস-সরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পৌছল।

মন মাথা নেড়ে বললে, “মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ? কিছু তো দেখি নে, শুনি নে।”

বলতে বলতে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুঁইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চার দিক ঝলমল করে উঠল। কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল, “দূত এসেছে।”

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দূতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলেন, “আসছেন নাকি।”

চার দিক থেকে জবাব এল, “হ্যাঁ, আসছেন।”

মন ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, “কী করি! সবেমাত্র আমার ছতলা বাড়ির ছাদ পিটোনো চলছে; আর, সাজ সরঞ্জাম সব তো এসে পৌছল না।”

উত্তর শোনা গেল, “আরে ভাঙো ভাঙো, তোমার ছতলা বাড়ি ভাঙো।”

মন বললে, “কেন।”

উত্তর এল, “আজ আগমনী যে। তোমার ইয়ারতটা বুক ফুলিয়ে পথ আটকেছে।”

মন অবাক হয়ে রইল।

আবার শুনি, “ঝেঁটিয়ে ফেলো তোমার সাজ সরঞ্জাম।”

মন বললে, “কেন।”

“তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় করে জায়গা জুড়েছে।”

যাক গে। কাজের দিনে ব’সে ব’সে ছতলা বাড়ি গাঁথলেন, ছুটির দিনে একে একে সব-ক’টা তলা ধুলিসাং করতে হল। কাজের দিনে সাজ সরঞ্জাম হাতে হাতে জড়ো করা গেল, ছুটির দিনে সমস্ত বিদায় করেছি।

কিন্তু, মস্ত বড়ো রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারি সমারোহ?

মন চার দিকে তাকিয়ে দেখলে।

কী দেখতে পেলেন।

শরৎপ্রভাতের শুকতারা।

কেবল ঐটুকু?

হ্যাঁ, ঐটুকু। আর দেখতে পেলেন শিউলিবনের শিউলিফুল।

কেবল ঐটুকু?

হ্যাঁ, ঐটুকু। আর দেখা দিল লেজ দুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখি।

আর কী।

আর, একটি শিশু, সে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এল বাইরের আলোতে।

“তুমি যে বললে আগমনী, সে কি এরই জন্মে।”

“হ্যাঁ, এরই জন্মেই তো প্রতিদিন আকাশে বাঁশি বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।”

“এরই জন্মে এত জায়গা চাই?”

“হ্যাঁ গো, তোমার রাজ্যের জন্মে সাতমহলা বাড়ি, তোমার প্রভুর জন্মে ঘরভরা সরঞ্জাম। আর, এদের জন্মে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।”

“আর, মস্ত-বড়ো?”

“মস্ত-বড়ো এইটুকুর মধ্যেই থাকেন।”

“ঐ শিশু তোমাকে কী বর দেবে।”

“ঐ তো বিধাতার বর নিয়ে আসে। সমস্ত পৃথিবীর আশা নিয়ে, অভয় নিয়ে, আনন্দ নিয়ে। ওরই গোপন ভূগে লুকোনো থাকে ব্রহ্মাস্ত্র, ওরই হৃদয়ের মধ্যে ঢাকা আছে শক্তিশেল।”

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, “হ্যাঁ গো কবি, কিছু দেখতে পেলেন, কিছু বুঝতে পারলেন?”

আমি বললেম, “সেই জন্মেই ছুটি নিয়েছি। এত দিন সময় ছিল না, তাই দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি।”

স্বর্গ-মর্ত

গান

মাটির প্রদীপখানি আছে
মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারই
আলো দেখবে ব'লে ।

সেই আলোটি নিমেষহত
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,
সেই আলোটি মাঘের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে ।

সেই আলোটি নেবে জলে
শ্রামল ধরার হৃদয়তলে,
সেই আলোটি চপল হাওয়ায়
ব্যথায় কাঁপে পলে পলে ।

নামল সন্ধ্যাতারার বাণী
আকাশ হতে আশিস আনি,
অমর শিখা আকুল হল
মর্ত শিখায় উঠতে জলে ।

ইন্দ্র । স্বরগুরে!, একদিন নৈত্যদের হাতে আমরা স্বর্গ হারিয়েছিলুম । তখন দেবে মানবে মিলে আমরা স্বর্গের জন্তে লড়াই করেছি, এবং স্বর্গকে উদ্ধার করেছি, কিন্তু এখন আমাদের বিপদ তার চেয়ে অনেক বেশি । সে কথা চিন্তা করে দেখবেন ।

বৃহস্পতি । মহেন্দ্র, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে । স্বর্গের কী বিপদ আশঙ্কা করছেন ।

ইন্দ্র । স্বর্গ নেই ।

বৃহস্পতি । নেই ? সে কী কথা । তা হলে আমরা আছি কোথায় ।

ইন্দ্র । আমরা আমাদের অভ্যাসের উপর আছি, স্বর্গ যে কখন ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, ছায়া হয়ে, মূণ্ড হয়ে গেছে, তা জানতেও পারি নি ।

কার্তিকেয় । কেন দেবরাজ, স্বর্গের সমস্ত সমারোহ, সমস্ত অমুষ্ঠানই তো চলছে ।

ইন্দ্র । অমৃষ্ঠান ও সমারোহ বেড়ে উঠেছে, দিনশেষে সূর্যাস্তের সমারোহের মতো, তার পশ্চাতে অন্ধকার । তুমি তো জান দেবসেনাপতি, স্বর্গ এত মিথ্যা হয়েছে যে, সকলপ্রকার বিপদের ভয় পর্যন্ত তার চলে গেছে । দৈত্যরা যে কত যুগযুগান্তর তাকে আক্রমণ করে নি তা মনে পড়ে না । আক্রমণ করবার যে কিছুই নেই । মাঝে মাঝে স্বর্গের যখন পরাভব হ'ত তখনও স্বর্গ ছিল, কিন্তু যখন থেকে—

কার্তিকেয় । আপনার কথা যেন কিছু কিছু বুঝতে পারছি ।

বৃহস্পতি । স্বপ্ন থেকে জাগবা মাত্রই যেমন বোকা যায়, স্বপ্ন দেখছিলুম, ইন্দ্রের কথা শুনেই তেমনি মনে হচ্ছে, একটা যেন মায়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তবু এখনও সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙে নি ।

কার্তিকেয় । আমার কী রকম বোধ হচ্ছে বলব ? ভূণের মধ্যে শর আছে, সেই শরের ভার বহন করছি, সেই শরের দিকেই মন বদ্ধ আছে, ভাবছি সমস্তই ঠিক আছে । এমন সময়ে কে যেন বললে, একবার তোমার চার দিকে তাকিয়ে দেখো । চেয়ে দেখি, শর আছে কিন্তু লক্ষ্য করবার কিছুই নেই । স্বর্গের লক্ষ্য চলে গেছে ।

বৃহস্পতি । কেন এমন হল তার কারণ তো জানা চাই ।

ইন্দ্র । যে মাটির থেকে রস টেনে স্বর্গ আপনার ফুল ফুটিয়েছিল সেই মাটির সঙ্গে তার গরুড় ছিন্ন হয়ে গেছে ।

বৃহস্পতি । মাটি আপনি কাকে বলছেন ।

ইন্দ্র । পৃথিবীকে । মনে তো আছে, একদিন মানুষ স্বর্গে এসে দেবতার কাজে যোগ দিয়েছে এবং দেবতা পৃথিবীতে নেমে মানুষের যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে । তখন স্বর্গ মর্ত উভয়েই সত্য হয়ে উঠেছিল, তাই সেই যুগকে সত্যযুগ বলত । সেই পৃথিবীর সঙ্গে যোগ না থাকলে স্বর্গ আপনার অমৃতে আপনি কি বাঁচতে পারে ।

কার্তিকেয় । আর, পৃথিবীও যে যায়, দেবরাজ । মানুষ এমনি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে যে, সে আপনার শোধকে আর বিশ্বাস করে না, কেবল বস্তুর উপরেই তার ভরসা । বস্তু নিয়ে যারামারি কাটাকাটি পড়ে গেছে । স্বর্গের টান যে ছিন্ন হয়েছে, তাই আত্মা বস্তু ভেদ করে আলোকের দিকে উঠতে পারছে না ।

বৃহস্পতি । এখন উদ্ধারের উপায় কী ।

ইন্দ্র । পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের আবার যোগসাধন করতে হবে ।

বৃহস্পতি । কিন্তু, দেবতারা যে পথ দিয়ে পৃথিবীতে যেতেন, অনেক দিন হল, সে পথের চিহ্ন লোপ হয়ে গেছে । আমি মনে করেছিলুম, ভালোই হয়েছে । ভেবেছিলুম, এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে, স্বর্গ নিরপেক্ষ, নিরবলম্ব, আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ ।

ইন্দ্র । একদিন সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল । কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীর প্রেমেরই স্বর্গ বাঁচে, নইলে স্বর্গ শুকিয়ে যায় । অমৃতের অভিযানে সেই কথা ভুলেছিলুম বলেই পৃথিবীতে দেবতার যাবার পথের চিহ্ন লোপ পেয়েছিল ।

কার্তিকেয় । দৈত্যদের পরাভবের পর থেকে আমরা আটঘাট বেঁধে স্বর্গকে সুরক্ষিত করে তুলেছি । তার পর থেকে স্বর্গের ঐশ্বর্য স্বর্গের মধ্যেই জমে আসছে ; বাহিরে তার আর প্রয়োগ নেই, তার আর ক্ষয় নেই । যুগ যুগ হতে অব্যাহাতে তার এতই উন্নতি হয়ে এসেছে যে, বাহিরের অল্প সমস্ত-কিছু থেকে স্বর্গ বহু দূরে চলে গেছে । স্বর্গ তাই আজ একলা ।

ইন্দ্র । উন্নতিই হোক আর দুর্গতিই হোক, যাতেই চার দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ আনে তাতেই ব্যর্থতা আনে । ক্ষুদ্র থেকে মহৎ যখন সূদূরে চলে যায় তখন তার মহত্ব নিরর্থক হয়ে আপনাকে আপনি ভারগ্রস্ত করে মাত্র । স্বর্গের আলো আজ আপনার মাটির প্রদীপের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলোয়ার আলো হয়ে উঠেছে, লোকালয়ের আয়ত্তের অতীত হয়ে সে নিজেরও আয়ত্তের অতীত হয়েছে ; নির্বাণের শান্তির চেয়ে তার এই শান্তি গুরুতর । দেবলোক আপনাকে অতি বিপুল রাখতে গিয়ে আপন শুচিতার উচ্চ প্রাচীরে নিজেকে বন্দী করেছে, সেই দুর্গম প্রাচীর ভেঙে গঙ্গার ধারার মতো মলিন মর্তের মধ্যে তাকে প্রবাহিত করে দিয়ে তবে তার বন্ধনমোচন হবে । তার সেই স্বাভাব্য বেটেন বিদীর্ণ করবার জন্তেই আমার মন আজ এমন বিচলিত হয়ে উঠেছে । স্বর্গকে আমি ঘিরতে দেব না, বৃহস্পতি ; মলিনের সঙ্গে, পতিতের সঙ্গে, অজ্ঞানীর সঙ্গে, দুঃখীর সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে ।

বৃহস্পতি । তা হলে আপনি কী করতে চান ।

ইন্দ্র । আমি পৃথিবীতে যাব ।

বৃহস্পতি । সেই যাবার পথটাই বন্ধ, সেই নিয়েই তো দুঃখ ।

ইন্দ্র । দেবতার স্বরূপে সেখানে আর যেতে পারব না, যাক্ষুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করব । নক্ষত্র যেমন খ'সে প'ড়ে তার আকাশের আলো আকাশে নিবিয়ে দিয়ে, মাটি হয়ে মাটিকে আলিঙ্গন করে, আমি তেমনি করে পৃথিবীতে যাব ।

বৃহস্পতি । আপনার জন্মবার উপযুক্ত বংশ পৃথিবীতে এখন কোথায় ।

কার্তিকেয় । বৈষ্ণব এখন রাজা, ক্ষত্রিয় এখন বৈষ্ণবের সেবার লড়াই করছে, ব্রাহ্মণ এখন বৈষ্ণবের দাস ।

ইন্দ্র । কোথায় জন্মাব সে তো আমার ইচ্ছার উপরে নেই, যেখানে আমাকে আকর্ষণ করে নেবে সেইখানেই আমার স্থান হবে ।

বৃহস্পতি । আপনি যে ইচ্ছা সেই স্মৃতি কেমন করে—

ইচ্ছা । সেই স্মৃতি লোপ করে দিলে তবেই আমি মর্তবাসী হয়ে মর্তের সাধনা করতে পারব ।

কাভিকেশ্ব । এতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব ভুলেই ছিলুম, আজ আপনার কথায় হঠাৎ মন ব্যাকুল হয়ে উঠল । সেই তরী শ্রামা ধরনী সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের পথ ধরে স্বর্গের দিকে কী উৎসুক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছে । সেই ভীকর ভয় ভাঙিয়ে দিতে কী আনন্দ । সেই ব্যথিতার মনে আশার সঞ্চার করতে কী গৌরব । সেই চন্দ্রকাস্তমণিকিরীটী নীলাম্বরী স্মরী কেমন করে ভুলে গিয়েছে যে সে রানী । তাকে আবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, সে দেবতার সাধনার ধন, সে স্বর্গের চিরদয়িতা ।

ইচ্ছা । আমি সেখানে গিয়ে তার দক্ষিণসমীপে এই কথাটি রেখে আসতে চাই যে, তারই বিরহে স্বর্গের অমৃতে স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারিজাত গ্লান ; তাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে যে সমুদ্র রয়েছে সেই তো স্বর্গের অক্ষ, তারই বিচ্ছেদক্রন্দনকেই তো সে মর্তে অনন্ত করে রেখেছে ।

কাভিকেশ্ব । দেবরাজ, যদি অমুমতি করেন তা হলে আমরাও পৃথিবীতে যাই ।

বৃহস্পতি । সেখানে মৃত্যুর অবগুষ্ঠনের ভিতর দিলে অমৃতের জ্যোতিকে একবার দেখে আসি ।

কাভিকেশ্ব । বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তাঁর মাটির ঘরটিতে যে নিত্যনূতন লীলা বিস্তার করেছেন আমরা তার রস থেকে কেন বঞ্চিত হব । আমি যে বুঝতে পারছি, আমাকে পৃথিবীর দরকার আছে ; আমি নেই বলেই তো সেখানে মানুষ স্বার্থের জন্তে নির্লজ্জ হয়ে যুক্ত করছে, ধর্মের জন্তে নয় ।

বৃহস্পতি । আর, আমি নেই বলেই তো মানুষ কেবল ব্যবহারের জন্তে জ্ঞানের সাধনা করছে, মুক্তির জন্তে নয় ।

ইচ্ছা । তোমরা সেখানে যাবে, আমি তো তারই উপায় করতে চলেছি ; সময় হলেই তোমরা পরিণত ফলের মতো আপন মাধুর্য্যভারে সহজেই মর্তে স্থলিত হয়ে পড়বে । সে পর্বন্ত অপেক্ষা করো ।

কাভিকেশ্ব । কখন টের পাব মহেশ্ব, যে, আপনার সাধনা সার্থক হল ।

বৃহস্পতি । সে কি আর চাপা থাকবে । যখন জয়শ্রবণনিত্যে স্বর্গলোক কেঁপে উঠবে তখন বুঝবে যে—

ইচ্ছা । না দেবগুরু, জয়শ্রবণ উঠবে না । স্বর্গের চোখে যখন ককণার অক্ষ গলে পড়বে তখনই জানবেন, পৃথিবীতে আমার জয়লাভ সফল হল ।

কার্তিকেয় । তত দিন বোধ হয় জানতে পারব না, সেখানে ধুলার আবরণে আপনি কোথায় লুকিয়ে আছেন ।

বৃহস্পতি । পৃথিবীর রসই তো হল এই লুকোচুরিতে । ঐশ্বর্য সেখানে দরিদ্রবেশে দেখা দেয়, শক্তি সেখানে অক্ষয়ের কোলে মাহুষ হয়, বীৰ্য্য সেখানে পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়ন্তস্তের ভিত্তি খনন করে । সম্ভব সেখানে অসম্ভবের মধ্যে বাসা করে থাকে । যা দেখা দেয়, পৃথিবীতে তাকে মানতে গিয়েই ভুল হয় ; যা না দেখা দেয় তারই উপর চিরদিন ভরসা রাখতে হবে ।

কার্তিকেয় । কিন্তু সুররাজ, আপনার ললাটের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি আজ ম্লান হল কেন ।

বৃহস্পতি । মর্তে যে যাবেন তার গৌরবের প্রভা আজ দীপ্যমান হয়ে উঠুক ।

ইন্দ্র । দেবগুরু, জন্মের যে বেদনা সেই বেদনা এগনি আমাকে পীড়িত করছে । আজ আমি দুঃখেরই অভিশারে চলেছি, তারই আশ্রানে আমার মনকে টেনেছে । শিবের সঙ্গে সতীর যেমন বিচ্ছেদ হয়েছিল, স্বর্গের আনন্দের সঙ্গে পৃথিবীর ব্যথার তেমনি বিচ্ছেদ হয়েছে ; সেই বিচ্ছেদের দুঃখ এত দিন পরে আজ আমার মনে রাসীকৃত হয়ে উঠেছে । আমি চলুম সেই ব্যথাকে বুকে তুলে নেবার জন্যে । প্রেমের অমৃতে সেই ব্যথাকে আমি সৌভাগ্যবতী করে তুলব । আমাকে বিদায় দাও ।

কার্তিকেয় । মহেন্দ্র, আমাদের জন্যে পথ করে দাও, আমরা সেইখানেই গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলব । স্বর্গ আজ দুঃখের অভিশানে বাহির হোক ।

বৃহস্পতি । আমরা পথের অপেক্ষাতেই রইলুম, দেবরাজ । স্বর্গ থেকে বাহির হবার পথ করে দাও, নইলে আমাদের মুক্তি নেই ।

কার্তিকেয় । বাহির করো, দেবরাজ, স্বর্গের বন্ধন থেকে আমাদের বাহির করো—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের পথ রচনা করো ।

বৃহস্পতি । তুমি স্বর্গরাজ, আজ তুমি স্বর্গের তপোভঙ্গ ক'রে আনিবে দাও যে, স্বর্গ পৃথিবীরই ।

কার্তিকেয় । দ্বারা স্বর্গকামনায় পৃথিবীকে ত্যাগ করবার সাধনা করেছে চিরদিন তুমি তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছ, আজ স্বয়ং স্বর্গকে সেই পথে নিয়ে যেতে হবে ।

ইন্দ্র । সেই বাধার ভিতর দিয়ে মুক্তিতে যাবার পথ—

বৃহস্পতি । যে মুক্তি আপন আনন্দে চিরদিনই বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করে ।

গান

পথিক হে, পথিক হে,
 ঐ যে চলে, ঐ যে চলে
 সঙ্গী তোমার দলে দলে ।
 অন্তমনে থাকি কোণে,
 চমক লাগে ক্ষণে ক্ষণে,
 হঠাৎ শুনি জলে স্থলে
 পায়ের ধ্বনি আকাশতলে
 পথিক হে, পথিক হে,
 যেতে যেতে পথের থেকে,
 আমার তুমি যেম্বো ডেকে ।
 যুগে যুগে বারে বারে
 এসেছিলে আমার ঘরে,
 হঠাৎ যে তাই জানিতে পাই
 তোমার চলা হৃদয়তলে ।

—

সংযোজন

কথিকা

এবার মনে হল, মানুষ অমৃত্যুর আগুনে আপনার সমস্ত ভাবী কালটাকে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে, সেখানে বসন্ত কোনোদিন এসে আর নতুন পাতা ধরাতে পারবে না।

মানুষ অনেক দিন থেকে একখানি আসন তৈরি করেছে। সেই আসনই তাকে খবর দেয় যে, তার দেবতা আসবেন, তিনি পথে বেরিয়েছেন।

যেদিন উন্নত হয়ে সেই তার অনেক দিনের আসন সে ছিঁড়ে কেলে সেদিন তার বজ্রস্বরীয় ভগবদেবী বলে, “কিছুই আশা করবার নেই, কেউ আসবে না।”

তখন এত দিনের আয়োজন আবর্জনা হয়ে ওঠে। তখন চারি দিক থেকে শুনতে পাই, “জয়, পশুর জয়।”

তখন শুনি, “আজও যেমন কালও তেমনি। সময় চোখে-টুলি-দেওয়া বলদের মতো, চিরদিন একই ঘনিতে একই আর্তস্বর তুলছে। তাকেই বলে সৃষ্টি। সৃষ্টি হচ্ছে অন্ধের কাছ।”

মন বললে, “তবে আর কেন। এবার গান বন্ধ করা যাক। যা আছে কেবলমাত্র তারই বোঝা নিয়ে ঝগড়া চলে, যা নেই তারই আশা নিয়েই গান।”

শিশুকাল থেকে যে পথের পানে চেয়ে বারে বারে মনে আগমনীর হাওয়া লেগেছে— যে পথ দিগন্তের দিকে কান পেতেছে দেখে বুকেছিলুম, ও পার থেকে রথ বেরোল— সেই পথের দিকে আজ তাকালেম ; মনে হল, সেখানে না আছে আগন্তকের সাদা, না আছে কোনো ঘরের।

বীণা বললে, “দীর্ঘ পথে আমার স্বরের সাধি যদি কেউ না থাকে তবে আমাকে পথের ধারে ফেলে দাও।”

তখন পথের ধারের দিকে চাইলুম। চমকে উঠে দেখি, ধুলোর মধ্যে একটি কাঁটাগাছ ; তাতে একটিমাত্র ফুল ফুটেছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমি বলে উঠলুম, “হায় রে হায়, ঐ ডো পায়ের চিহ্ন।”

তখন দেখি, দিগন্ত পৃথিবীর কানে কানে কথা কইছে ; তখন দেখি, আকাশে
আকাশে প্রতীক্ষা। তখন দেখি, টাদের আলোর তালগাছের পাতায় পাতায় কাঁপন
ধরেছে ; বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দিঘির জলের সঙ্গে টাদের চোখে চোখে ইশারা।

পথ বললে, “ভয় নেই।”

আমার বীণা বললে, “স্বর লাগাও।”

সে

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
করতলযুগলেষু

মেঘের ফুরোল কাজ এইবার ।
সময় পেরিয়ে দিয়ে ঢেলেছিল জলধার,
সুদীর্ঘ কালের পরে নিল ছুটি ।
উদাসী হাওয়ার সাথে জুটি
রচিছে যেন সে অন্তমনে
আকাশের কোণে কোণে
ছবির খেয়াল রাশি রাশি,
মিলিছে তাহার সাথে হেমন্তে কুয়াশা-হোঁওয়া হাসি ।
দেবপিতামহ হাসে স্বর্গের কর্মের হেরি হেলা,
ইন্দের প্রাক্‌গতলে দেবতার অর্থহীন খেলা ।

আমারো খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে ।
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেধে ।

যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।
যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা,
দিলেম উজাড় করি ঝুলি।
লও যদি লও তুলি,
রাখ ফেল যাহা ইচ্ছা তাই—
কোনো দায় নাই।

ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে-
যার কোনো দাম নেই,
নাম নেই,
অধিকারী নাই যার কোনো,
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয় নি কখনো।

সে

বিধাতা লক্ষলক্ষ কোটিকোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন, তবু মানুষের আশা যেটে না ; বলে, আমরা নিজের মানুষ তৈরি করব । তাই দেবতার সজীব পুতুল-খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা শুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ । তার পরে ছেলেরা বলে ‘গল্প বলো’ ; তার মানে, ভাষায়-গড়া মানুষ বানাও । গড়ে উঠল কত রাজপুত্র, মন্ত্রী পুত্র, স্বয়োরানী, দুয়োরানী, মংশুনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিন্সন্ ক্রুসো । পৃথিবীর জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল । বুড়োরাও আপিসের ছুটির দিনে বলে, মানুষ বানাও ; হল আঠারো-পর্ব মহাভারত প্রস্তুত । আর, লেগে গিয়েছেন গল্প-বানিয়ে দল দেশে দেশে ।

নাংনির ফরমাশে কিছু দিন থেকে লেগেছি মানুষ গড়ার কাজে ; নিছক খেলার মানুষ, সত্যমিথ্যের কোনো জবাবদিহি নেই । গল্প যে শুনেছে তার বয়স ন বছর, আর যে শোনাচ্ছে সে সত্তর পেরিয়ে গেছে । কাজটা একলাই শুরু করেছিলুম, কিন্তু মালমসলা এতই হাল্কা ওজনের যে, নির্বিচারে পুপুও দিল যোগ । আর-একটা লোককে রেখেছিলুম, তার কথা হবে পরে ।

অনেক গল্প শুরু হয়েছে এই বলে যে, এক যে ছিল রাজা । আমি আরম্ভ ক’রে দিলুম, এক যে আছে মানুষ । তার পরে লোকে যাকে বলে গপ্পো, এতে তারও কোনো আঁচ নেই । সে মানুষ ঘোড়ায় চ’ড়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল না । একদিন রাত্রি দশটার পর এল আমার ঘরে । আমি বই পড়ছিলুম । সে বললে, দাদা, খিদে পেয়েছে ।

রাজপুত্রের গল্প অনেক শুনেছি ; কখনোই তার খিদে পায় না । কিন্তু এর খিদে পেয়ে গেল গোড়াতেই, শুনে খুশি হলুম । খিদে-পাওয়া লোকের সঙ্গে ভাব করা সহজ । খুশি করবার জন্যে গলির মোড়ের থেকে বেশি দূর যেতে হয় না ।

দেখলুম, লোকটার দিবি খাবার শখ । ফরমাশ করে মুড়োর ঘন্ট, লাউচিংড়ি, কাঁটাচচ্ড়ি ; বড়োবাজারের মালাই পেলে বাঁটিটা চেঁচেপুঁছে খায় । এক-একদিন শখ

যায় আইস্ক্রিমের। এমন ক'রে খায় সে দেখবার যোগ্য। মজুমদারদের জামাইবাবুর সঙ্গে অনেকটা মেলে।

একদিন ঝামাঝম্ বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি। এখানকার মাঠের ছবি। উত্তর দিকে বরাবর চলে গেছে রাঙা মাটির রাস্তা—দক্ষিণ দিকে পোড়ো জমি, উচুনিচু চৌ-খেলালানো, মাঝে মাঝে ঝাঁকড়া বুনো খেজুর। দূরে দুটো-চারটে তালগাছ আকাশের দিকে কাঙালের মতো তাকিয়ে। তারই পিছনে জমে উঠেছে ঘন মেঘ, যেন একটা প্রকাণ্ড নীল বাঘ ওং পেতে আছে, কখন এক লাফে মাঝ-আকাশে উঠে সূর্যটাকে দেবে খাবার ঘা। বাটিতে রঙ গুলে তুলি বাগিয়ে এইসব একে চলেছি।

দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুতুর নয়—সেই লোকটা। সর্বাঙ্গ বেয়ে জল ঝরছে, ময়লা ভিজে জামা গায়ে লেপ্টে গেছে, কৌচার ডগায় কাদা, জুতোয় কাদার পিণ্ড। আমি বললুম, এ কী!

সে বললে, যখন বেরিয়েছিলুম খটখটে রোদ্দুর। আদ্যেক পথে আসতে বৃষ্টি নামল। তোমার ঐ বিছানার চাদরটা যদি দাও তো কাপড় ছেড়ে গায়ে জড়িয়ে বসি।

হুম পাবার সবুর সহিল না। চট ক'রে খাটের থেকে লঙ্কোছিটের ঢাকাটা টেনে নিয়ে তাই দিয়ে মাথাটা মুছে কাপড় ছেড়ে সেটা গায়ে জড়িয়ে বসল। ভাগ্যিস কাশ্মীরি জামিয়ারটা পাতা ছিল না।

বললে, দাদা, তোমাকে একটা গান শোনাব।

কী করি, ছবি-আঁকা বন্ধ করতে হল।

সে শুরু করলে—

ডাবো শ্রীকান্ত নরকাস্তকারীয়ে,

নিতান্ত কৃতান্ত-ভয়াস্ত হবে ভবে।

আমার মুখের ভাব দেখে তার কী সন্দেহ হল জানি নে; অিগেস করলে, কেমন লাগছে।

আমি বললুম, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দূরে ব'সে। তার পরে বুকে নেবেন চিত্রগুপ্ত, যদি সহিতে পারেন।

সে বললে, পুপেদিদিও হিন্দুস্থানি গুস্তাদের কাছে গান শেখে, সেইখানে আমাকে বসিয়ে দিলে কেমন হয়।

আমি বললুম, পুপেদিদিকে যদি রাজি করাতে পার তা হলে কথা নেই।

সে বললে, পুপেদিদিকে আমি বড়ো ভয় করি।

এই পর্যন্ত শুনে আমার জোতা পুপেদিদি খুব হেসে উঠল। তাকে কেউ ভয় করে,

এতে সে ভারি খুশি। যেমন খুশি হয় জগতের দোঁদুপ্রতাপের দল।

দয়াময়ী আশ্বাস দিয়ে বললে, ভয় নেই, আমি তাকে কিছু বলব না।

আমি বললুম, তোমাকে ভয় কে না করে! ছুবেলা দু বাটি ক'রে দুধ খাও—
গায়ে কী রকম জোর! মনে আছে তো, তোমার হাতে লাঠি দেখে সেই বাঘটা লেজ
গুটিয়ে একেবারে ছুটুপিসির বিছানার নীচে গিয়ে লুকিয়েছিল।

বীরাজনা ভারি খুশি। মনে করিয়ে দিলে ভালুকটার কথা— সে পালাতে গিয়ে
পড়ে গিয়েছিল নাবার ঘরের আনের জলের টবের মধ্যে।

সেই যে মাহুঘটার ইতিহাস গড়ে উঠেছিল আমার একলার হাতে এখন থেকে
পুপেও তাতে যেখানে-সেখানে জোড়া দিতে লাগল। আমি যদি বা বলি, একদিন
বেলা তিনটার সময় সে এসেছিল আমার কাছে দাড়ি কামাবার খর চেয়ে নিতে, আর
নিতে খালি বিস্কুটের টিন, পুপে খবর দেয়, সে ওর কাছ থেকে নিয়ে গেছে পশম
বোনবার কুকুশ-কাটি।

সব গল্পেরই একটা আবহুত আছে, শেষ আছে, কিন্তু ঐ-যে 'এক যে আছে মাহুঘ'
তার আর শেষ নেই। তার দিদির জ্বর হয়, ডাক্তার ডাকতে যায়। টমি কুকুর
আছে, বেড়ালের নখের আঁচড় লেগে তার নাক যায় ছ'ড়ে। পিছন দিক থেকে
গোকুর গাড়ির উপর চ'ড়ে বসেছিল, তাই নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে হয় বিষম বচসা।
উঠোনে কলতলায় পিছলে প'ড়ে বামুন ঠাক্কনের মাটির ঘড়া দেয় ভেঙে। মোহন-
বাগানের ফুটবল-ম্যাচ দেখতে গিয়েছিল, পকেট থেকে সাড়ে তিন আনা পয়সা
কে নের তুলে; কিন্তু রাস্তায় ভীমনাগের দোকান থেকে সম্ভ্রম কেনা বাদ গেল।
বন্ধু আছে কিছু চৌধুরী, তার ওখানে গিয়ে কুচো চিংড়ি ভাজা আর আলুর দম
ফরমাশ করে। এমনি একটার পর একটা চলছে দিনের পর দিন। এর সঙ্গে পুপে
জুড়েছে, কোনোদিন দুপুরবেলায় ওর ঘরে গিয়ে বলেছে মায়ের আলমারি থেকে
পাকপ্রণালীর বইখানা খুঁজে বের করতে, বন্ধু সুধাকান্তবাবু শিখতে চায় মোচার ঘন্ট
তৈরি করা। আর-একদিন পুপের সুবাসিত নারিকেল তেল নিয়ে গেল চেয়ে, ভয়
হয়েছে মাথায় টাক প'ড়ে আসছে দেখে। আর-একদিন দিন্দার ওখানে গান শুনতে
গেল, দিন্দা তখন তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঘুমিয়ে।

এই-যে আমাদের এক যে আছে মাহুঘ, এর একটা নাম নিশ্চয়ই আছে। সে
কেবল আমরা দুজনেই জানি, আর-কাউকে বলা বারণ। এইখানটাতেই গল্পের যজ্ঞ।
এক যে ছিল রাজা, তারও নাম নেই; রাজপুত্র, তারও নেই। আর রাজকন্যা, যার

চুল লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, যার হাসিতে মানিক, চোখের জলে মুক্তো, তারও নাম কেউ জানে না। ওরা নামজাদা নয়, অথচ ঘরে ঘরে ওদের খ্যাতি।

এই-যে আমাদের মানুষটি, একে আমরা শুধু বলি 'সে'। বাইরের লোক কেউ নাম জিগেস করলে আমরা হুজনে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসি। পুপে বলে, আন্দাজ ক'রে বলো দেখি, প দিয়ে আরম্ভ। কেউ বলে প্রিয়নাথ, কেউ বলে পঞ্চানন, কেউ বলে পাঁচকড়ি, কেউ বলে পীতাম্বর, কেউ বলে পরেশ, কেউ বলে পীটাস্, কেউ বলে প্রেক্ষট, কেউ বলে পীরবক্স, কেউ বলে পীয়ার থা।

এইখানে এসে কলম থামতেই একজন বললে, গল্প চলবে তো ?

কার গল্প। এ তো রাজপুত্রুর নয়, এ হল মানুষ, এ খায়-দায় ঘুমোয়, আপিসে যায়, সিনেমা দেখবারও শখ আছে। দিনের পর দিন যা সবাই করছে তাই এর গল্প। মনের মধ্যে যদি মানুষটাকে স্পষ্ট ক'রে গ'ড়ে তোল তা হলে দেখতে পাবে, এ যখন দোকানের রোয়াকে ব'সে রসগোল্লা খায় আর তার রস ঠোঙার ছিদ্র দিয়ে অজানিতে পড়তে থাকে তার ময়লা ধূতির উপর, সেটাই গল্প। যদি জিগেস কর 'তার পরে' তা হলে বলব, তার পরে ও ট্রামে চড়ে বসল, হঠাৎ জ্ঞান হল পয়সা নেই, টপ্ ক'রে লাফিয়ে পড়ল। তার পরে ? তার পরে এই রকমই আরও কত কী— বড়োবাজার থেকে বহুবাজার, বহুবাজার থেকে নিমতলা।

ওদের মধ্যে একজন বললে, যা সৃষ্টিছাড়া, বড়োবাজারে বহুবাজারে, এমন-কি নিমতলাতেও যার গতি নেই, তা নিয়ে কি গল্প হয় না।

আমি বললুম, যদি হয় তা হলেই হয়, না হলে হয়ই না।

সে বললে, হোক তবে। হোক-না একেবারে যা ইচ্ছে তাই ; মাথা নেই, মূণ্ড নেই, মানে নেই, মোদ্দা নেই, এমন একটা-কিছু।

এটা হল স্পর্ধা। বিধাতার সৃষ্টি, নিয়মের রসারসি দিয়ে ক'ষে বাঁধা, যেটা হবার সেটা হবেই। এ তো সহ্য হয় না। একঘেয়ে বিধানের সৃষ্টিকর্তা পিতামহকে এমন ক্ষেত্রে ঠাট্টা ক'রে নেওয়া যাক যেখানে শাস্তির ভয় নেই। এ তো তাঁর নিজের এলেকা নয়।

আমাদের সে ছিল কোণে বসে। কানে কানে বললে, দাদা, লেগে যাও। আমার নাম দিয়ে যা-খুশি চালিয়ে দিতে পার, ফৌজদারি করব না।

সে মানুষটির পরিচয় দেওয়ার দরকার আছে।

পুপুদিদিমণিকে ধারা বেয়ে যে গল্প ব'লে যাচ্ছি সেই গল্পের মূল অবলম্বন হচ্ছে

একটি সর্বনামধারী সে, কেবলমাত্র বাক্য দিয়ে তৈরি। সেইজন্তে একে নিয়ে যা-তা করা সম্ভব, কোনোখানে এসে কোনো প্রশ্নের হাঁচোট খাবার আশঙ্কা নেই। কিন্তু অনাস্থটির চাক্ষুষ প্রমাণ দেবার জন্তে একজন শরীরধারী জোঁগাড় করতে হয়েছে। সাহিত্যের মামলায় কেন্দ্র। যখনই বড়ো বেশি বেগামাল হয়ে পড়ে তখনই এ লোকটা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। কিছুই বাধে না। আমার মতো মোস্তারের ইশারা পেলেই সে অম্লানমুখে বলতে পারে যে, কাঁচড়াপাড়ার কুস্তমেলার গজান্নান করতে গিয়ে কুমীরে ধরেছিল তার টিকির ডগা। সেটা গেল তলিয়ে, বোঁটা-ছেঁড়া মানবদেহের বাকি অংশটুকু উঠে এসেছে ডাঙায়। আরও একটু চোখ টিপে দিলে সে নির্লজ্জ হয়ে বলতে পারে, মানোয়ারী জাহাজের ডুবুরি গোরা সাত মাস পাক ঘেঁটে গোটা পাঁচ-ছয় চুল ছাড়া বাকি টিকিটা উদ্ধার করে এনেছে, বকশিশ পেয়েছে এককালীন সোয়া তিন টাকা। পুপুদিদি তবু যদি বলে ‘তার পরে’ তা হলে তখনি শুরু করবে, নীলরতন ডাক্তারের পায়ে ধরে বললে, দোহাই ডাক্তারবাবু, শুধু দিয়ে টিকিটা জোড়া দিয়ে লাগিয়ে দাও, নইলে তেলোর কাছে প্রসাদী ফুল বাঁধতে পারছি নে। তিনি সন্ন্যাসী-দস্ত বজ্রজটা মলম লাগিয়ে দিতেই টিকিটা একেবারে মরিয়া হয়ে বেড়ে চলেছে, অফুরান একটা কৈচোর মতো। পাগড়ি পরলে পাগড়িটা বেলুনের মতো ফেঁপে উঠতে থাকে, মাথার বালিশটার উপর চুড়ো তৈরি হতে থাকে দৈত্যপুরীর ব্যাণ্ডের ছাতার মতো। বাঁধা মাইনে দিয়ে নাপিত রাখতে হল। প্রহরে প্রহরে তাকে দিয়ে ব্রহ্মতালু চাঁচিয়ে নিতে হচ্ছে।

তবু যদি প্রোতার কৌতূহল না যেটে তা হলে সে করুণ মুখ ক’রে বলতে থাকে যে, মেডিক্যাল কলেজের সার্জন-জেনেরাল হাতের আঙ্গিন গুটিয়ে বসে ছিল; তার ভীষণ জেদ, মাথার ঐ জায়গাটাতে ইস্ক্রুপ দিয়ে ফুটো ক’রে সেইখানে রবারের ছিপি এটে গালা লাগিয়ে শিলমোহর ক’রে দেবে, ইহকাল-পরকালে ওখান দিয়ে আর টিকি গজাতে পারবে না। চিকিৎসাটা ইহকাল ভিড়িয়ে পরকালেই গিয়ে ঠেকবে, এই আশঙ্কায় ও কোনোমতেই রাজি হল না।

আমাদের এই ‘সে’ পদার্থটি কণজমা বটে; এমনতরো কোটিকে গোটক মেলে। মিথ্যে কথা বানাতে অপ্রতিবন্ধী প্রতিভা। আমার আজগবি গল্পের এত বড়ো উত্তর-সাধক ওস্তাদ বহু ভাগ্যে জুটেছে। গল্প-প্রশ্নের উত্তরপাড়ার এই যে মানুষ, মাঝে মাঝে একে পুপুদিদির কাছে এনে হাজির করি— দেখে তার বড়ো চোখ আরও বড়ো হয়ে ওঠে। খুশি হয়ে বাজার থেকে গরম জিলিপি এনে খাইয়ে দেয়।— লোকটা অসম্ভব জিলিপি ভালোবাসে, আর ভালোবাসে শিকদারপাড়া গলির চম্‌চম্‌। পুপুদিদি জিগেস

করে, তোমার বাড়ি কোথায়। ও বলে, কোন্‌নগরে, প্রগতিহের গলিতে।

নাম বলি নে কেন। নাম বললে ইনি যে কেবলমাত্র ইনিতেই এসে ঠেকবেন, এই ভয়। জগতে আমি আছি একজন মাত্র, তুমিও তাই, সেই তুমি আমি ছাড়া আর-সকলেই তো সে। আমার গল্পের সকল সের উনি জামিন।

একটা কথা ব'লে রাখি, নইলে অধর্ম হবে। ওকে মাঝে রেখে যে পালা জমানো হয়েছে তার থেকে যারা বিচার করে তারা ভুল করে; যারা তাকে চাক্ষুষ দেখেছে তারা জানে লোকটা সুপুরুষ চেহারা সুগম্ভীর। রাস্তিরে যেমন তারার আলোর ছড়াছড়ি, ওর গাম্ভীৰ্য তেমনি চাপা হাসিতে ভরা। ও পয়লা নম্বরের মানুষ, তাই কোনো ঠাট্টা মস্করার ওকে জখম করতে পারে না। ওকে বোকার মতো সাক্ষাতে আমার মজা লাগে, কেননা ও আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। অবুঝের ভান করলেও ওর মানহানি হয় না; সুবিধে হয়, পুপুর স্বভাবের সঙ্গে ওর মিল হয়ে যায়।

২

এর মধ্যে পুপেদিদি গেছে দাঙ্গিলিঙে। সে রইল মাথাঘষা গলিতে একলা আমার জিম্মায়। তার ভালো লাগছে না। আমিও জ্বালাতন হয়েছি। বলে, আমাকে দাঙ্গিলিং পাঠাও।

আমি বললুম, কেন।

সে বললে, পুরুষ মানুষ বেকার বসে আছি, আত্মীয়স্বজন ভারি নিম্নে করছে।

কী কাজ করবে, বলো।

পুপেদিদির খেলার রান্নার জন্তে খবরের কাগজ কুচিকুচি করে দেব।

এত মেহন্নত সহিবে না। একটু চুপ করো দেখি। আমি এখন ছ'হাউ দীপের ইতিহাস লিখছি।

ছ'হাউ নামটা শোনাচ্ছে ভালো, দাদা। ওটা তোমার চেয়ে আমার কলমেই মানাত ঠিক। বিষয়টার একটু আয়েজ দিতে পার কি।

ঠাট্টা নয়, বিষয়টা গম্ভীর, কলেজে পাঠা হবার আশা রাখি। একদল বৈজ্ঞানিক ঐ শুল্ল দীপে বসতি বেঁধেছেন। খুব কঠিন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত।

একটুখানি বুঝিয়ে বলো— কী করছেন তাঁরা। হাল নিয়মে চাষবাস করছেন?

একেবারে উল্টো, চাষের সম্পর্ক নেই।

আহারের কী ব্যবস্থা।

একেবারেই বন্ধ।

প্রাপটা ?

সেই চিন্তাটাই সব চেয়ে তুচ্ছ। পাকযন্ত্রের বিকলিত ঔদের সত্য্যগ্রহ। বলছেন, ঐ জঠরযন্ত্রটার মতো প্যাচাও জিনিস আর নেই। যত রোগ, যত যুদ্ধবিগ্রহ, যত চুরি-ডাকাতির মূল কারণ তার নাড়ীতে নাড়ীতে।

দাদা, কথাটা সত্য্য হলেও হজম করা শক্ত।

তোমার পক্ষে শক্ত। কিন্তু, ঔরা হলেন বৈজ্ঞানিক। পাকযন্ত্রটা উপড়ে ফেলেছেন, পেট গেছে চূপসে, আহার বন্ধ, নশ্ত নিচ্ছেন কেবলই। নাক দিয়ে পোষ্টাই নিচ্ছেন হাওয়ায় শুষে। কিছু পৌঁচছে ভিতরে, কিছু হাঁচতে হাঁচতে বেরিয়ে যাচ্ছে। দুই কাজ একসঙ্গেই চলছে, দেহটা সাকও হচ্ছে, ভর্তিও হচ্ছে।

আশ্চর্য কোণল। কলের জাঁতা বসিয়েছেন বুঝি ? হাঁস মুরগি পাটা ভেড়া আলু পটোল একসঙ্গে পিষে শুকিয়ে ভতি করছেন ডিবের মধ্যে ?

না। পাকযন্ত্র, কসাইখানা, দুটোই সংসার থেকে লোপ করা চাই। পেটের দায়, বিল-চোকানোর ল্যাঠা একসঙ্গে মেটাবেন। চিরকালের মতো জগতে শান্তিস্থাপনার উপায় চিন্তা করছেন।

নশ্তটা তবে শস্ত নিয়েও নয়, কেননা সেটাতেও কেনাবেচার মাযলা।

বুঝিয়ে বলি। জীবলোকে উদ্ভিদের সবুজ অংশটাই প্রাণের গোড়াকার পদার্থ, সেটা তো জান ?

পাপমূখে কেমন করে বলব যে জানি, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা নিতান্ত যদি জেদ করেন তা হলে মেনে নেব।

বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগুনি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুঁসছেন। সকালবেলায় ডান নাকে ; মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে ; সাঁঝে দুই নাকে একসঙ্গে, সেইটেই বড়ো ভোজ। ঔদের সমবেত হাঁচির শব্দে চমকে উঠে পশুপক্ষীরা সাংরিষে সমুদ্র পার হয়ে গেছে।

শোনাচ্ছে ভালো। অনেক দিন বেকার আছি দাদা, পাকযন্ত্রটা হস্তে হস্তে উঠেছে— তোমাদের ঐ নশ্তটার দালালি করতে পারি যদি নিম্নমার্কেটে, তা হলে—

অল্প একটু বাধা পড়েছে, সে কথা পরে বলব। তাঁদের আর-একটা মত আছে। তাঁরা বলেন, মানুষ হু পায়ে খাড়া হয়ে চলে ব'লে তাদের হৃদয় পাকযন্ত্র ঝুলে ঝুলে মরছে ; অস্বাভাবিক অত্যাচার ঘটেছে লাখো লাখো বৎসর ধ'রে। তার জরিমানা

দিতে হচ্ছে আয়ুক্ষয় ক'রে। দোলায়মান হৃদয়টা নিয়ে মরছে নরনারী ; চতুষ্পদের কোনো বালাই নেই।

বুঝলুম, কিন্তু উপায় ?

ওরা বলছেন, প্রকৃতির মূল মংলবটা শিশুদের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে। সেই দীপের সব চেয়ে উচু পাহাড়ে শিলালিপিতে অধ্যাপক খুঁদে রেখেছেন—সবাই



মিলে হামাগুড়ি দাও, কিরে এসো চতুষ্পদী চালে, যদি দীর্ঘকাল ধরণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও।

সাবাস ! আরও কিছু বাকি আছে বোধ হয় ?

আছে। ওরা বলেন, কথা কওয়াটা মানুষের বানানো। ওটা প্রকৃতিদত্ত নয়। ওতে প্রতিদিন শ্বাসের ক্ষয় হতে থাকে, সেই শ্বাসক্ষয়েই আয়ুক্ষয়। স্বাভাবিক প্রতিভায় এ কথাটা গোড়াতেই আবিষ্কার করেছে বানর। ত্রৈতাযুগের হুম্যান আজও আছে বেঁচে। আজ ওরা নিরালায় বসে সেই বিস্তৃত আদিম বুদ্ধির অনুসরণ করছেন। মাটির দিকে মুখ ক'রে সবাই একেবারে চুপ। সমস্ত দীপটাতে কেবল নাকের থেকে ইঁচির শব্দ বেরোয়, যুথের থেকে কোনো শব্দই নেই।

পরস্পর বোঝাপড়া চলে কী ক'রে।

অত্যাশ্চর্য ইশারার ভাষা উদ্ভাবিত।—কখনো টেংকি-কোটার ভঙ্গীতে, কখনো হাতপাখা-চালানোর চালে, কখনো কোড়ো স্থপুরি পাছের নকলে ভাইনে ধীরে উপরে

নীচে ঘাড় হুলিয়ে বাঁকিয়ে নাড়িয়ে কাঁপিয়ে হেলিয়ে বাঁকিয়ে। এমন-কি, সেই ভাষার সঙ্গে ভুরু-বাঁকানি চোখ-টেপানি যোগ ক'রে ওদের কবিতার কাজও চলে। দেখা গেছে, তাতে দর্শকের চোখে জল আসে, নস্তির আয়গাটা বন্ধ হয়ে পড়ে।

কিছু টাকা আমাকে ধার দাও, দোহাই তোমার। ঐ হাঁহাউ বীপেই বেড়ে হচ্ছে আমাকে। এত বড়ো নতুন মজাটা—

নতুন আর পুরোনো হতে পেল কই। ইচ্ছতে ইচ্ছতে বসতিটা বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। পড়ে আছে জালা-জালা সবুজ নস্তি। ব্যবহার করবার যোগ্য নাক বাকি নেই একটাও।

এ তোমার আগাগোড়াই বানানো। বিজ্ঞানের ঠাট্টার পক্ষেও এটা বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। এই হাঁহাউ বীপের ইতিহাস বানিয়ে তুমি পুপেদিদিকে তাক লাগিয়ে দিতে চাও। ঠিক করেছিলে, তোমার এই অভাগা সে-নামওয়ালাকেই বৈজ্ঞানিক সাজিয়ে সারা বীপময় ইচ্ছতে ইচ্ছতে মারবে। বর্ণনা করবে, আমি ঘাড়-নাড়ানাড়ির ঘটা ক'রে ঘটোৎকচ-বধ পাঁচালির আসর জমাচ্ছি কী ক'রে। হয়তো কোন্ হামাগুড়ি-ওয়ালি মনোহর-ঘাড়-নাড়ানির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে বসবে, ঘাড়নাড়া-মস্ত্র কনে নাড়বে মাথা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, আর আমি নাড়ব ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। সপ্তপদী-গমন হয়ে উঠবে চতুর্নপদী। ওদের সেনেট-হলে ঘাড়নাড়া ভাষায় যখন ওরা সারে সারে পরীক্ষা দিতে বসেছে, তার মধ্যে আমাকেও বসাবে এক কোণে। আমার উপর তোমার দয়ামায়া নেই, দেবে ফেল করিয়ে। কিন্তু ওদের স্পোর্টিং ক্লাবে হামাগুড়ি-দেলে আমাকেই পাওয়াবে ফাস্ট প্রাইজ। বলে দিচ্ছি, পুপেদিদিকে এমন করে হাসাতে পারবে মনেও কারো না।

বেশি বোকা না। চাণক্যপণ্ডিত শ্রেণীবিশেষের আবুঝির জন্তে বলেছেন : তাবচ্চ বাঁচতে মূর্থ যাবৎ ন বক্বকায়তে।— তুমি তো সংস্কৃত কিছু শিখেছিলে ?

যতটা শিখেছিলেম তুলেছি তার দেড়গুণ ওজনে। নয়া-চাণক্য জগতের হিতের জন্তে যে উপদেশ দিয়েছেন সেটাও তোমার জানা দরকার দাদা, ছন্দ মিলিয়েই লেখা : তখন ইঁপ ছাড়িয়া বাঁচি যখন পণ্ডিত চূপায়তে।— চললুম। আমার শেষ পরামর্শ এই, বৈজ্ঞানিক রসিকতা ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষি করো যতটা পার।

এই কাহিনীটা পুপেদিদির কাছে একটুও পছন্দসই হয় নি। কপাল কুঁচকে বললে, এ কখনো হয় ? নস্তি নিয়ে পেট ভরে ?

আমি বললেম, গোড়াতে পেটটাকেই যে সরিয়ে দিয়েছে।

পুপুদিদি আশ্বস্ত হয়ে বললে, ওঃ, তাই বুঝি।

শেষ পর্যন্ত ওর গিয়ে ঠেকল কথা না বলাতে। ওর প্রশ্ন, কথা না ব'লে কি বাঁচা যায়।

আমি বললুম, ওদের সব চেয়ে বড়ো পণ্ডিত ভূষণপাতার লিখে লিখে দীপময় প্রচার করেছেন, কথা বলেই মাহুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বলত সবাই মরেছে।

হঠাৎ পুপুদিদির বুদ্ধিতে প্রশ্ন উঠল, আচ্ছা, বোবারা ?

আমি বললেম, তারা কথা ব'লে মরে নি, তারা মরেছে কেউ বা পেটের অস্থখে, কেউ বা কাশিসদ্বিতে।

শুনে পুপুদিদির মনে হল, কথাটা যুক্তিসংগত।

আচ্ছা, দাদামশায়, তোমার কী মত।

আমি বললুম, কেউ বা মরে কথা ব'লে, কেউ বা মরে না ব'লে।

আচ্ছা, তুমি কী চাও।

আমি ভাবছি, হাঁহাউ দ্বীপে গিয়ে বাস করব, জম্বুদ্বীপে বকিয়ে মারল আমাকে, আর পেঁপে উঠছি নে।

৩

শিবানোদনসমিতির একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছে আমাদের সে। পুপুদিদির আসরে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেইটে পাঠ হবে।

রিপোর্ট

সন্ধ্যাবেলায় মাঠে বসে গায়ে হাওয়া লাগাচ্ছি এমন সময় শেয়াল এসে বললে, দাদা, তুমি নিজের কাঁচাকাঁচাদের মাহুষ করতে লেগেছ, আমি কী দোষ করেছি।

জিজ্ঞাসা করলেম, কী করতে হবে শুনি।

শেয়াল বললে, নাহয় হলুধ পণ্ড, তাই ব'লে কি উদ্ধার নেই। পণ করেছি, তোমার হাতে মাহুষ হব।

শুনে মনে ভাবলুম, সংকার্ষ বটে।

জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার এমন মংলব হল কেন।

সে বললে, যদি মাহুষ হতে পারি তা হলে শেয়াল-সমাজে আমার নাম হবে,

আমাকে পুজো করবে ওয়া।

আমি বললুম, বেশ কথা।

বন্ধুদের খবর দেওয়া গেল। তারা খুব খুশি। বললে, একটা কাজের মতো কাজ বটে। পৃথিবীর উপকার হবে। ক'জনে মিলে একটা সভা করলুম, তার নাম দেওয়া গেল শিবা-শোধন-সমিতি।

পাড়ায় আছে অনেক কালের একটা পোড়ো চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে রোজ রাত্তির নটার পরে শেয়াল মাহুয করার পুণ্যকর্মে লাগা গেল।

জিজ্ঞাসা করলুম, বৎস, তোমাকে জাতিরা কী নামে ডাকে।

শেয়াল বললে, হৌহৌ।

আমরা বললুম, ছি ছি, এ তো চলবে না। মাহুয হতে চাও তো প্রথমে নাম বদলাতে হবে, তার পরে রূপ। আজ থেকে তোমার নাম হল শিবুরাম।

সে বললে, আচ্ছা। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল, হৌহৌ নামটা তার ঘেরকম মিষ্টি লাগে শিবুরাম তেমন লাগল না। উপায় নেই, মাহুয হতেই হবে।

প্রথম কাজ হল তাকে দু পায়ে দাঁড় করানো। অনেক দিন লাগল। বহু কষ্টে নড়বড় করতে করতে চলে, থেকে থেকে পড়ে পড়ে যায়। ছ মাস গেল দেহটাকে কোনোমতে খাড়া রাখতে। খাবাগুলো ঢাকবার জন্ত পরানো হল জুতো মোজা দস্তানা।

অবশেষে আমাদের সভাপতি গৌর গৌসাই বললেন, শিবুরাম, এইবার আয়নার তোমার দ্বিপদী ছন্দের মূর্তিটা দেখো দেখি, পছন্দ হয় কিনা।

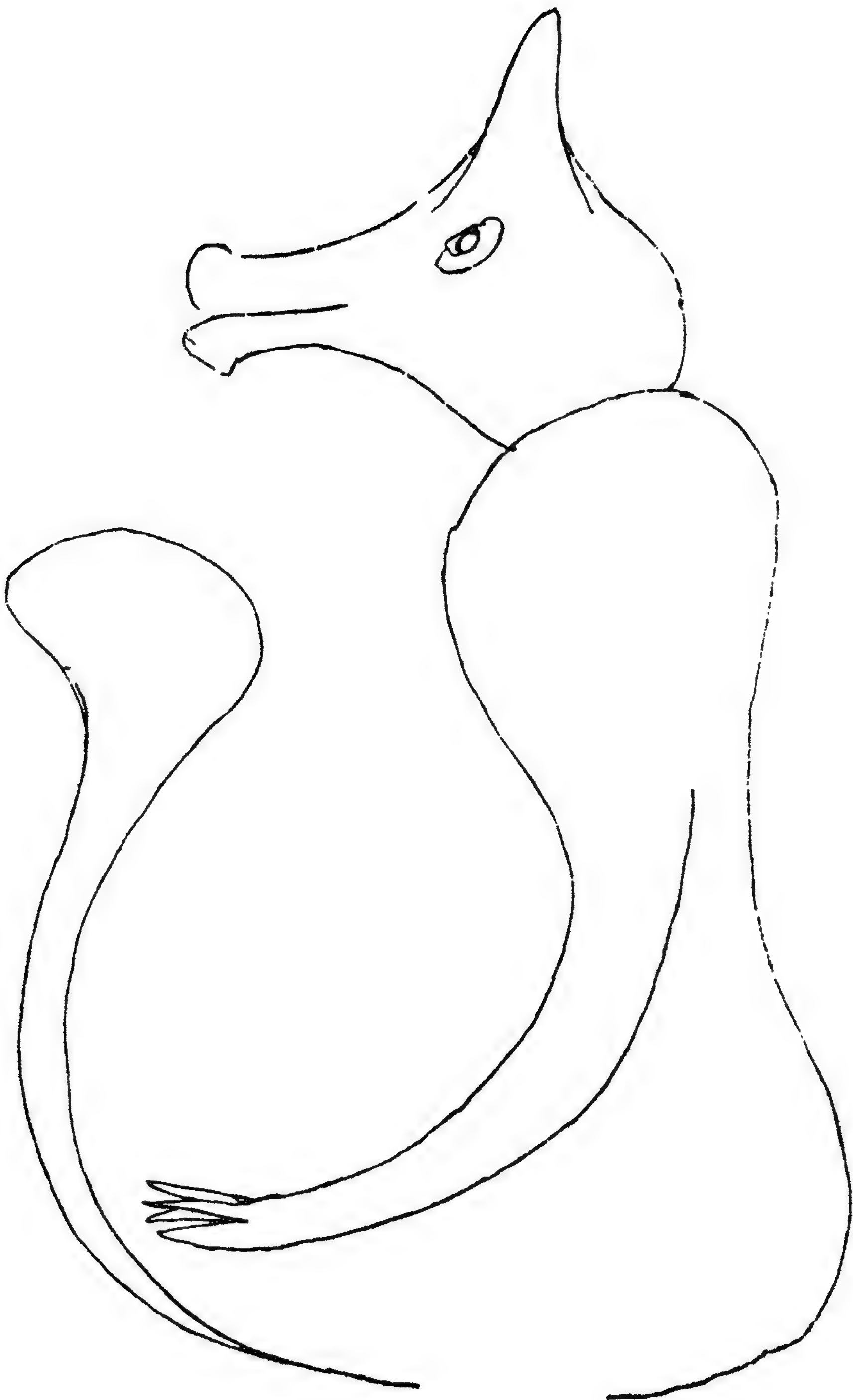
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরে ফিরে ঘাড় বেকিয়ে শিবুরাম অনেক ক্ষণ ধরে দেখলে। শেষকালে বললে, গৌসাইজি, এখনো তোমার সঙ্গে তো চেহারার মিল হচ্ছে না।

গৌসাইজি বললেন, শিবু, সোজা হলেই কি হল। মাহুয হওয়া এত সোজা নয়। বলি, লেজটা যাবে কোথায়। ওটার মায়া কি ত্যাগ করতে পার।

শিবুরামের মুখ গেল শুকিয়ে। শেয়ালপাড়ায় দশ-বিংশ গাঁয়ের মধ্যে ওর লেজ ছিল বিখ্যাত।

সাধারণ শেয়ালরা ওর নাম দিয়েছিল 'খাগা-লেজুড়ি'। বারা শেয়ালি-সংস্কৃত জানত তারা সেই ভাষায় ওকে বলত, 'হলোমলাঙ্গুলী'। দু দিন গেল ওর ভাবতে, তিন রাত্রি ওর ঘুম হল না। শেষকালে বৃহস্পতিবারে এসে বললে, রাজি।

পাটুকিলে রঙের ঝাঁকড়া রোঁয়াওয়ালা লেজটা গেল কাটা, একেবারে গোড়া ঘেঁষে।



সভ্যরা সকলে বলে উঠল, অহো, পশুর এ কী মুক্তি ! লেজবন্ধনের মায়া ওর এত দিনে কেটে গেল ! ধন্য !

শিবুরাম একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। চোখের জল সামলিয়ে নিয়ে সেও অতি করুণস্বরে বললে, ধন্য !

সেদিন ওর আহায়ে কচি রইল না, সমস্ত রাত সেই কাটা লেজের স্বপ্ন দেখলে।

পরদিন শিবুরাম সভায় এসে হাজির। গোসাইজি বললেন, কেমন হে শিবু, মেহটা হাঙ্গা বোধ হচ্ছে তো ?

শিবুরাম বললে, আজ্ঞে, খুবই হাঙ্গা। কিন্তু মন বলছে, লেজ গেল তবু মানুষের সঙ্গে বর্ণভেদ তো ঘুচল না।

গোসাই বললেন, রঙ মিলিয়ে সর্বর্ণ হতে চাও যদি, তবে রোঁয়া ঘুচিয়ে ফেলো।

তিম্নু নাপিত এল।

পাঁচ দিন লাগল খুর বুলিয়ে বুলিয়ে লোমগুলো চেঁচে ফেলতে। রূপ যেটা ফুটে উঠল তা দেখে সভারা সবাই চূপ করে গেল।

শিবুরাম উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, মশায়, আপনারা কোনো কথা বলেন না কেন।

সভ্যরা বললে, আমরা নিজের কীর্তিতে অবাক।

শিবুরাম মনে শাস্তি পেল। কাটা লেজ ও চাঁচা রোঁয়ার শোক ভুলে গেল।

সভ্যরা ছই চক্ষু বুজে বললেন, শিবুরাম, আর নয়। সভা বন্ধ হল। এখন—

শিবু বললে, এখন আমার কাজ হবে শেয়াল-সমাজকে অবাক করা।

এ দিকে শিবুরামের পিসি খেঁকিনি কৈদে কৈদে মরে। গাঁয়ের মোড়ল হুকুইকে গিয়ে বললে, মোড়ল মশায়, আজ এক বছরের উপর হয়ে গেল আমার হৌহৌকে দেখি নে কেন। বাঘ-ভাল্লুকের হাতে পড়ল না তো ?

মোড়ল বললে, বাঘ-ভাল্লুককে ভয় কিসের ? ভয় ঐ মানুষ আনোয়ারটাকে, হয়তো তাদের ফাঁদে পড়েছে।

খোজ পড়ে গেল। ঘুরতে ঘুরতে ভলন্টিয়ারের দল এল সেই চণ্ডীমণ্ডপের বাশবনে। ডাক দিলে, হুঙ্কা হুয়া।

শিবুরামের বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল, একবার গলা ছেড়ে ঐ একতানমত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা হল। বহু কষ্টে চেপে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে বাশবনে আবার ডাক উঠল, হুঙ্কা হুয়া। এবার শিবুরামের চাপা গলায় কান্নার মতো একটুখানি রব উঠল। তবু থেমে গেল।

তৃতীয় প্রহরে ওরা আবার যখন ডাক ছাড়লে শিবুরাম আর থাকতে পারলে না ;

ডেকে উঠল, হুকা হুয়া, হুকা হুয়া, হুকা হুয়া ।

হুকুই বললে, ঐ তো হৌহৌয়ের গলা শুনি । একবার হাঁক দাও তো ।

ডাক পড়ল, হৌহৌ !

সভাপতি বিছানা ছেড়ে এসে বললেন, শিবুরাম !

বাইরে থেকে আবার ডাক পড়ল, হৌহৌ !

গৌসাইজি আবার সতর্ক করে দিলেন, শিবুরাম !

তৃতীয়বার ডাকে শিবুরাম ছুটে বেরিয়ে আসতেই শেয়ালরা দিল দৌড় । হুকুই, হৈম্বো, হুহু প্রভৃতি বড়ো বড়ো শেয়াল-বীর আপন আপন গর্তের ভিতর গিয়ে ঢুকল ।

সমস্ত শেয়াল-সমাজ স্তম্ভিত ।

তার পর ছ মাস গেল ।

শেষ খবর পাওয়া গেছে । শিবুরাম সারারাত হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছে, আমার লেজ কই, আমার লেজ কই ।

গৌসাইয়ের শোবার ঘরের সামনের রোয়াকে বসে উর্ধ্ব দিকে মুখ তুলে প্রহরে প্রহরে কোকিয়ে উঠে বলে, আমার লেজ ফিরে দাও ।

গৌসাই দরজা খুলতে সাহস করে না— ভয় পায়, পাছে তাকে খাপা শেয়ালে কামড়ায় ।

শেয়ালকাটার বনে যেখানে শিবুরামের বাড়ি সেখানে ওর যাওয়া বন্ধ । জ্ঞাতিরা ওকে দূর থেকে দেখলে, হয় পালায় নয় থেকিয়ে কামড়াতে আসে । ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপেই থাকে, সেখানে একছোড়া প্যাঁচা ছাড়া আর অন্য প্রাণী নেই । খাঁহু, গোবর, বেঁচি, টেঁড়ি প্রভৃতি বড়ো বড়ো ডানপিটে ছেলেরাও ভূতের ভয়ে সেখানকার জঙ্গল থেকে করুমচা পাড়তে যায় না ।

শেয়ালি ভাষায় শেয়াল একটা ছড়া লিখেছে, তার আরম্ভটা এইরকম—

ওরে লেজ, হারা লেজ, চক্ষে দেখি ধুঁয়া ।

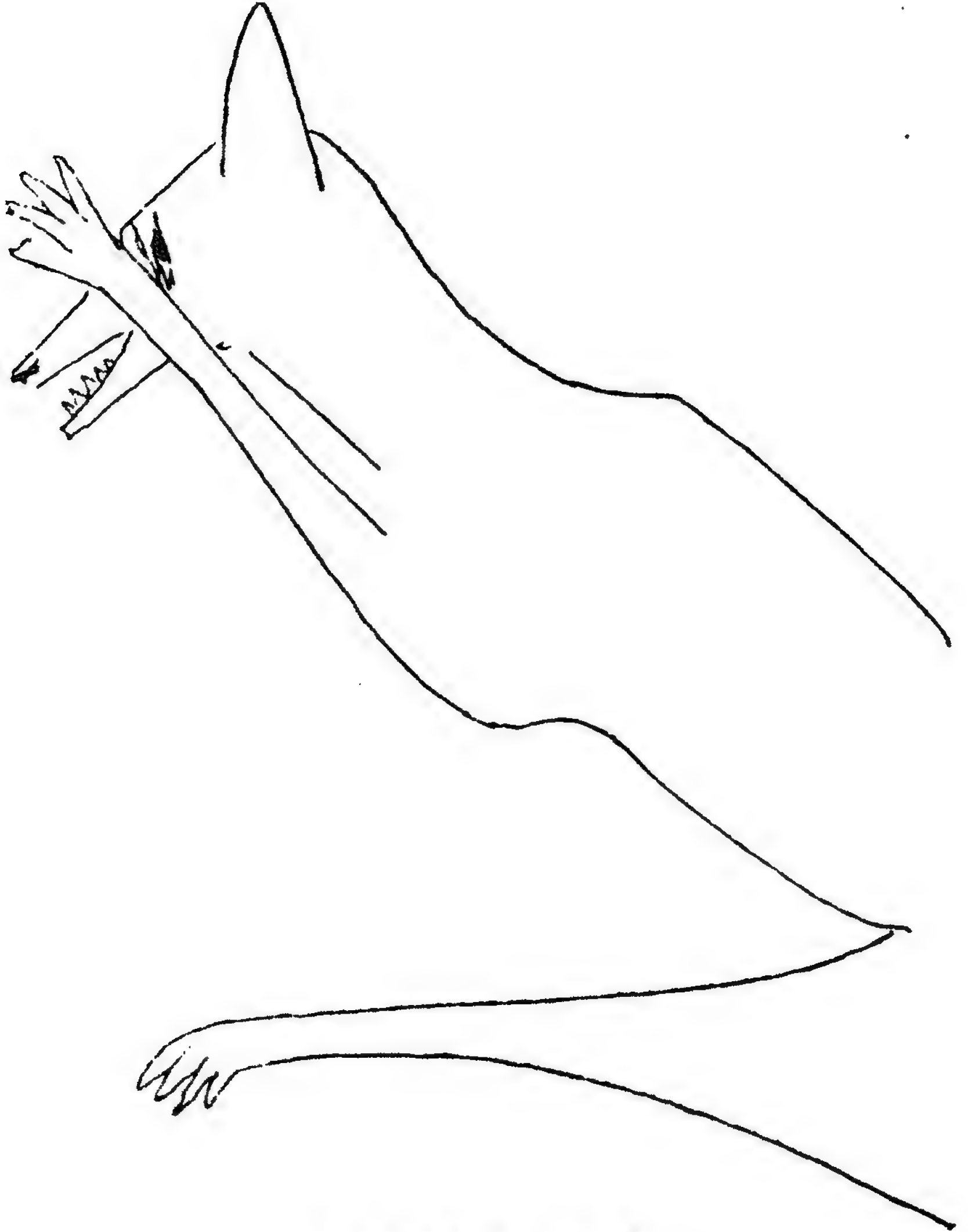
বন্ধ মোর গেল কেটে হুকা হুয়া হুয়া ॥

পুপে বলে উঠল, কী অন্তায়, ভারি অন্তায় । আচ্ছা, দাদামশায়, ওর মাসিও ওকে নেবে না ঘরে ?

আমি বললুম, তুমি ভেবো না ; ওর গায়ের রোঁয়াগুলো আবার উঠুক, তখন ওকে চিনতে পারবে ।

কিন্তু, ওর লেজ ?

হয়তো লাজুলান্ত ঘুত পাওয়া যেতে পারে কবিরাজমশায়ের ঘরে। আমি খোঁজ নেব।



আমার লেজ কই ! আমার লেজ কই !

সে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, রাগ কোরো না দাদা, হক্ কথা বলব—
তোমারও শোধনের দরকার হয়েছে।

বে-আদব কোথাকার, কিসের শোধন আমার।

তোমার ঐ বুড়োমির শোধন। বয়স তো কম হয় নি, তবু ছেলেমানুষিতে পাকা হতে পারলে না।

প্রমাণ পেলো কিসে।

এই-যে রিপোর্টটা পড়ে শোনালে, ওটা তো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদিদির মুখ কিরকম গম্ভীর? বোধ হয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। ভাবছিল, রোয়া-চাঁচা শেয়ালটা এখনি এল বুঝি তার কাছে নালিশ করতে। বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তা হলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।

ওটা কমানো আমার পক্ষে শক্ত। তুমি বুঝবে কী ক'রে; তোমাকে তো চেষ্টাই করতে হয় না, বিধাতা আছেন তোমার সহায়।

দাদা, রাগ করছ বটে, কিন্তু আমি বলে দিলুম, বুদ্ধির ঝাঁজে তোমার বয়স যাচ্ছে শুকিয়ে। মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে কান্নার মতো লাগে। এর আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি— হাসতে গিয়ে, হাসতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাও নি বুঝি? বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে— বিস্ময় হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।

লেখা তৈরি আছে নাকি?

আছে। নাটকি চালের আলাপ। বললেই হবে, আমাদের পাড়ার উধো গোবরা আর পঞ্চুতে মিলে কথা হচ্ছে। ওদের সবাইকে দিদি চেনে।

আচ্ছা বেশ, দেখা যাক।

গেছো বাবা

উধো। কী রে, সন্ধান পেলি?

গোবরা। আরে ডাই, তোমার কথা শুনে আজ মাসখানেক ধরে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে হাড় মাটি হল, টিকিও দেখতে পেলুম না।

পঞ্চু। কার সন্ধান করছিল রে।

গোবরা। গেছো বাবার।

পঞ্চু। গেছো বাবা? সে আবার কে রে।

উধো। জানিস নে? বিশ্বহীন লোক তাকে জানে।



পকু। তা, গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।

উধো। বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্লতরু। তলার দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।

পকু। খবর পেলি কার কাছ থেকে।

উধো। খোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে। বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে বাজে, মাথায় ছিল এক ইাড়ি

চিটেগুড়, তামাক তৈরী করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে— চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুজে। বাবার দয়ার শরীর; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল। ভেকুটা বোকা; বললে, বাবা একখানা টানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারও দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস, তার পরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও গাড়া মিলবে না।

পক্ষু। হায় রে হায়, শাল নয়, দোশালা নয়, শুধু একখানা গামছা! ভেকুর আর বুদ্ধি কত হবে।

উধো। তা হোক, নেপু। ঐ গামছা নিয়েই তার দিবিা চলে যাচ্ছে— দেখিস নি? রথতলার কাছে অত বড়ো আটচালা বানিয়েছে। গামছা হোক, বাবার গামছা তো।

পক্ষু। কী করে হল। ভেল্কি নাকি।

উধো। হৌদলপাড়ার মেলায় ভেকু সেদিন বাবার গামছা পেতে বসল। হাজারে হাজারে লোক এসে জুটল। বাবার নামে টাকাটা সিকেটা আলুটা মুলোটা চার দিক থেকে গামছার উপর পড়তে লাগল। মেয়েরা কেউ বা এসে বলে, ও ভেকুনাদা, আমার ছেলেটার মাথায় বাবার গামছা একটু ঠেকিয়ে দে, আজ তিনমাস ধ'রে জরে ভুগছে। ওর নিয়ম হচ্ছে নৈবিজি চাই পাঁচ সিকে, পাঁচটা সুপরি, পাঁচ কুনুকে চাল, পাঁচ ছটাক ঘি।

পক্ষু। নৈবিজি তো দিচ্ছে, ফল পাচ্ছে কিছু?

উধো। পাচ্ছে বৈ কি। গাজন পাল গামছা ভরে পনেরো দিন ধরে ধান ঢেলেছে; তার পরে ঐ গামছার কোণে দড়ি লাগিয়ে একটা পাঁঠাও দিলে বেঁধে, ঐ পাঁঠার ডাকে চার দিক থেকে লোক এসে জমল। কী বলব, ভাই, মাস এগারো পরেই গাজনের চাকরি জুটে গেল। আমাদের রাজবাড়ির কোতোয়ালের সিদ্ধি দৌটে, তার দাড়ি চুম্বিয়ে দেয়।

পক্ষু। সত্যি বলছিস?

উধো। সত্যি না তো কী। গাজন যে আমার বামাতো ভাইয়ের ভায়রা-ভাই হয়।

পক্ষু। আচ্ছা ভাই উধো, গামছাটা তুই দেখেছিস?

উধো। দেখেছি বৈ কি। হটুগঞ্জের তাঁতে দেড়গজ ওসারের বে গামছা বুননি হয়, চাঁপার বরন জরি, লাল পাড়, একেবারে বেমানুষ ভাই।

পঙ্ক। বলিস কী। তা, সে গাছের উপর থেকে পড়ল কী করে।

উধো। ঐ তো মজা। বাবার দয়া।

পঙ্ক। চল্ ভাই, চল্, খোঁজ করতে বেরোই। কিন্তু, চিনব কী করে।

উধো। সেই তো মুশকিল। কেউ তো তাকে দেখে নি। আবার হবি তো হ, ভেতু বেটার চোখ গেল চিটেগুড়ে বুজে।

পঙ্ক। তবে উপায়?

উধো। আমি তো হাটে ঘাটে থাকে দেখছি তাকেই জোড়হাত ক'রে জিগেস করছি, দয়া ক'রে জানাও, তুমিই কি গেছো বাবা। শুনে তারা তেড়ে মারতে আসে। একজন তো ছিল আমার মাথায় হাঁকোর ঝল ঢেলে।

গোবরা। তা দিক পে। ছাড়া হবে না। খুঁজে বের করবই। যা থাকে কপালে।

পঙ্ক। ভেতু বলে, গাছে চড়লেই তবে বাবার চেহারা ধরা পড়ে, যখন নীচে থাকেন চেনবার স্খো নেই।

উধো। গাছে চড়িয়ে চড়িয়ে মানুষকে পরখ করব কী ক'রে, ভাই। আমি এক বুদ্ধি করেছি, আমার আমড়া গাছ আমড়ায় ভরে গেছে, থাকে দেখছি তাকেই বলছি, আমড়া পেড়ে নাও— গাছটা প্রায় খালি হয়ে এল, ডালগুলোও ভেঙেছে।

পঙ্ক। আর ঘেরি নয় রে, চল্। কপালের জোর যদি থাকে তবে দর্শনলাভ হবেই। একবার গলা ছেড়ে ডাক দে-না, ভাই! গেছো বাবা, ও বাবা, দয়াল বাবা, পারুলবনে কোথাও যদি থাক লুকিয়ে, একবার অভাগাদের দর্শন দাও।

গোবরা। ওরে হয়েছে রে, দয়া হল বুদ্ধি।

পঙ্ক। কই রে, কই।

গোবরা। ঐ-যে চালতা গাছে।

পঙ্ক। কী রে, চালতা গাছে কী। দেখছি নে তো কিছু।

গোবরা। ঐ-যে হলছে।

পঙ্ক। কী হলছে। ও তো লেজ রে।

উধো। তোর কেমন বুদ্ধি গোবরা, ও বাবার লেজ নয় রে, হুহুমানের লেজ। দেখছিস নে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে?

গোবরা। ঘোর কলি যে। বাবা ঐ কপিরূপ ধরেছেন আমাদের ভোলাবার জন্তে।

পঙ্ক। ভুলছি নে, বাবা, কালামুখ দেখিয়ে ভোলাতে পারবে না। যত পার মুখ ভ্যাঙাও, নড়ছি নে— তোমার ঐ ত্রিলোকেয় শরণ নিলুম।

গোবরা। ওরে, বাবা যে লম্বা লম্বা দিগে পালাতে শুরু করল রে।

পক্ষু। পালাবে কোথায়। আমাদের ভক্তির দৌড়েয় সঙ্গে পারবে কেন।

গোবরা। ঐ বসেছে কয়েংবেল গাছেয় ডগায়।

উধো। পক্ষু, উঠে পড়-না গাছে।

পক্ষু। আরে, তুই ওঠ-না।

উধো। আরে, তুই ওঠ।

পক্ষু। অত উচ্চ উঠতে পারব না, বাবা, কৃপা ক'রে নেমে এসো।

উধো। বাবা, তোমার ঐ শ্রীলোক গলায় বেধে অস্থিমে যেন চক্ষু মুদতে পারি এই আশীর্বাদ করো।

[প্রস্থান]

ওহে কমবুদ্ধি, হাসাতে পারলে ?

না। যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়। ভয় হচ্ছে, পুপেদিদি পাছে গেছো বাবার সন্ধান করতে আমাকে পাঠায়।

মুখ দেখে আমারও তাই বোধ হচ্ছে। গেছো বাবার 'পরে ওর টান পড়েছে। আচ্ছা, কাল পরীক্ষা ক'রে দেখব, বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি না।

কিছুক্ষণ বাদে পুপু এসে বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, গেছো বাবার কাছে ভূমি হলে কী চাইতে।

আমি বললেম, পুপুদিদির জন্তে এমন একটা কলম চাইতেম যা নিয়ে লিখতে বসলে অঙ্ক কষতে একটা ভুলও হত না।

পুপুদিদি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, আঃ, সে কী মজাই হত !

অঙ্কে দিদি এবার একশোর মধ্যে সাড়ে তেরো মার্ক পড়েছে।

৪

স্বপ্ন দেখছি কি জেগে আছি বলতে পারি নে। জানি নে কত রাত। ঘর অন্ধকার, লণ্ঠনটা আছে বারান্দায়, দরজার বাইরে। একটা চামড়িকে পোকায় লোভে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে, গয়ায়-পিণ্ডি-না-দেওয়া ভূতের মতো।

সে এসে হাঁক দিলে, দাদা, ঘুমচ্ছ নাকি।

বলেই ঘরে ঢুকে পড়ল। কালো কবলে সর্বাঙ্গ মোড়া।

জিগেস করলেম, এ কেমন সজ্জা তোমার।

বললে, আমার বরসজ্জা।

বরসজ্জা! বুঝিয়ে বলো।

কনে দেখতে যাচ্ছি।

জানি নে কেন, আমার যেন ঘুমে-ঘোলা বুদ্ধিতে ঠেকল যে, ঠিক হয়েছে, এই সজ্জাই উচিত। উৎসাহ দিয়ে বললুম, সেজেছ ভালো। তোমার গুরুদিক্শালিটি দেখে খুশি হলুম। একেবারে ক্লাসিকাল সাজ।

কী রকম।

ভূতনাথ যখন তাঁর ভগ্নিনী কনেকে বর দিতে এলেন, তাঁর গায়ে ছিল হাতির চামড়া। তোমার এটা যেন ভালুকের চামড়া। নারদ দেখলে খুশি হতেন।

দাদা, সমজদার তুমি। এলেম এইজন্মেই তোমার কাছে এত রাস্তিরে।

কত রাত বলো দেখি।

দেড়টার বেশি হবে না।

কনে কি এখনি দেখা চাই।

হা, এখনি।

তুনেই বলে উঠলেম, ভারি চমৎকার।

কী কারণে বলো তো।

কেন-যে এতদিন আইডিয়াটা মাথায় আসে নি তাই ভাবি। আপিসের বড়ো সাহেবের মুখ দেখা দিনের রোদ্দুহরে, আর কনে দেখা মাঝরাস্তিরে অন্ধকারে।

দাদা, তোমার মুখের কথা যেন অমৃতসমান। একটা পৌরাণিক নজির দাও তো।

মহাদেব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন মহাকালীর দিকে অমাবস্তার ঘোর অন্ধকারে, এই কথাটা স্মরণ করো।

অহো, দাদা, তোমার কথায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। সার্বাইম থাকে বলে। তা হলে আর কথা নেই।

কনেটি কে এবং আছেন কোথায়।

আমার বৌদিদির ছোটো বোন, আছেন তাঁরই বাড়িতে।

চেহারায় তোমার বৌদিদির সঙ্গে কি মিলে।

মিলে বই কি, সহোদরা বটে।

তা হলে অন্ধকার রাতের দরকার আছে।

বৌদি স্বয়ং ব'লে দিয়েছেন, টর্টটা যেন সঙ্গে না আনি।

বৌদির ঠিকানাটা ?

সাতাশ মাইল দূরে, চৌচাকলা গ্রামে, উনকুণ্ড পাড়ায়।

ভোজন আছে তো ?

আছে বৈকি।

শুনে কোন্ মোহের ঘোরে যে মনটা পুলকিত হল বলতে পারি নে। লিভরের দোষে ভুগে আসছি বারো বছর, খাবার নাম শুনেই পিস্তি যায় বিগড়ে।

জিগেস করলেম, খাওয়াটা কী রকম হবে শুনি।

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, অতি উত্তম, অতি উত্তম, অতি উত্তম। বৌদি আমসত্ত্ব দিয়ে উচ্ছেসিক্ চমৎকার রাঁধে, আর কুলের আঁটি ঢেঁকিতে কুটে তার সঙ্গে দোস্তার জল মিশিয়ে চাটনি—

বলেই নাচ জুড়ে দিল বিলিতি চালে,— টিটিটম্‌টম্‌, টিটিটম্‌টম্‌, টিটিটম্‌টম্‌।

জীবনে কোনোদিন নাচি নি, হঠাৎ নাচ পেয়ে গেল— দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে নাচতে শুরু ক'রে দিলুম, টিটিটম্‌টম্‌। মনে হল আশ্চর্য আমার ক্ষমতা ; যমুনা দিদি যদি দেখত তবে বলত, নাচ বটে।

শেষকালে হাঁপিয়ে উঠে ধপ্‌ ক'রে বসে পড়লুম। বললুম, আহারের ফর্দ যা দিলে একেবারে খাঁটি ভিটামিন। লিভরের পক্ষে অমৃত। কনে দেখতে যাবে তো কনের পরীক্ষা তো চাই।

এক দফা হয়ে গেছে আগেই।

কী রকম।

মনে করলুম, মিলন হবার আগে মিলের পরীক্ষা চাই। ঠিক কি না বলো।

ঠিক তো বটেই। পরীক্ষার প্রণালীটা কী।

জিগেস করা চাই 'শোলোক মেলাতে পার কি না'। দূত পাঠিয়েছিলুম 'ব্রংশাল'এর সহ-সম্পাদককে, তিনি আড়ায়েলেন—

সুন্দরী, তুমি কালো কুষ্টি।

বললেন, মিল ক'রে এর জবাব দিতে হবে, পুরো মাপের মিল।

কনেটি এক নিঃশেষে ব'লে দিলে—

কানা তুমি, নেই ভালো দৃষ্টি।

সহ-সম্পাদকের এটা অসহ হল, ব'লে দিলে—

ব্রহ্মা লম্বা হাতে

তোমাকে গড়েছে রাতে

যবে শেষ হল আলোবৃষ্টি ।

লম্বা হাতে বলবার তাৎপর্য কী হল ।

যেহেঁচোটা আছে শুনেছি, তোমার চেয়ে ইঞ্চি দুই-তিন বড়ো হবে । তাই শুনেই
তো আমার উৎসাহ ।

বলো কী ।

একখানা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে পাওয়া যাবে আধখানা কাউ ।

এ কথাটা আমার মাথায় ওঠে নি ।

যা হোক দাদা, সহ-সম্পাদকের কাছে হার মেনে ও হার-মানার একটা কবুলত্তি
দিয়ে দিয়েছে ।

কী রকম ।

মাছের আঁশের হার গঁথে ওর গলায় পরিয়েছে, বলেছে যশঃসৌরভ তোমার সঙ্গে
সঙ্গে ফিরবে ।

আমি লাফ দিয়ে ব'লে উঠলুম, ধন্য ! এবার দেখছি এক অসাধারণের সঙ্গে আর-
এক অসাধারণের মিলন হবে, জগতে এমন কদাচিত ঘটে । তা হলে আর কেন দিন
কণ দেখা ।

কিন্তু মেয়েটির পণ, ওকে যে হারাতে পারবে তাকেই ও বিয়ে করবে ।

রূপে ?

না, কথার মিলে । ঠিকমত যদি মেলাতে পারি তা হলে ও নিজেকে দেবে
জলাঞ্জলি ।

পারবে তো ?

নিশ্চয় ।

প্র্যান্টা কী শুনি ।

বলব, চার লাইনে আমার চরিত্র বর্ণনা করো, তবে আমাকে খুশি ক'রে দাও ।
মিল হওয়া চাই ফস্ট্ ক্লাস ।

কনে দেখার যদি পেটেন্ট নেওয়া চলত তুমি নিতে পারতে ! বরের স্তব দিয়ে শুক !
অতি উদ্ভয় । উমা তাতেই জিতেছিলেন ।

প্রথম লাইনটা ওকে ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে আমার চরিত্রের খই পাবে না ;
আমার বর্ণনার ধুমোটি হচ্ছে এই—

ভূমি দেখি মাগুষটা একেবারে অদ্ভুত ।

পুরো বহরের মিল দাবি করলে মেয়েটি বোধ হয় মাথায় হাত দিয়ে পড়বে । ওকে হার মানতেই হবে । আচ্ছা দাদা, তুমিই দাও দেখি ওর পরের লাইনটা যোগ ক'রে ।

আমি বললেম—

স্বপ্নে তোমার বুঝি চাপিয়াছে বদ ভূত ।

এক্সেসেলেন্ট । কিন্তু আর দুটো লাইন না হলে শ্লোক তো ভর্তি হয় না । আমি বলছি, কনে তো কনে, কনের বাবার সাধি হবে না ওর মিল বের করতে । দাদা, তোমার মাথায় কিছু আসছে ? ভাষায় হোক অভাষায় হোক ।

একেবারেই না ।

তা হলে শোনো—

ছাত থেকে লাফ দাও, পাক দেখে কাঁপ দাও,

যখন তখন করো যদুত তদুত ।

ও আবার কী ! ওটা কোন্ দিশি বুলি ।

দেবভাষা সংস্কৃত, কিছুত শব্দের এক পর্যায় ।

যদুত তদুত, মানেটা কী হল ।

ওর মানে, যা খুশি তাই । ওটা বঙ্গভাষায়, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে 'অবদান' ।

লোকটার 'পরে আমার ভক্তি কূল ছাপিয়ে উঠল । মনে হল অসাধারণ প্রতিভা । ওর পিঠ খাবড়িয়ে বললুম, স্তম্ভিত করেছ আমাকে ।

সে বললে, স্তম্ভিত হলে চলবে কেন । চলতে হবে । লগ্ন বয়ে যাচ্ছে । ফস্ ক'রে ববকরণ পেরিয়ে যাবে কখন, এসে পড়বে তৈত্তিলকরণ, বৈষ্ণুভোগ, তার পরেই হর্ষণযোগ, বিষ্টিকরণ, শেষ রাস্তিরে অশ্বকযোগ, ধনিষ্ঠানকত্র—গোন্ডামীমতে ব্যতীপাতযোগ বালবকরণ, পরিঘযোগে যখন গরকরণ এসে পড়বে তখন বিপদ হবে—ঘরকবুনার পক্ষে গরকরণের মতো এত বড়ো বাধা আর নেই । সিদ্ধিযোগ ব্রহ্মযোগ ইন্দ্রযোগ শিবযোগ এই হস্তার মধ্যে একদিনও পাওয়া যাবে না, বরীমানযোগের অল্প একটু আশা আছে যখন পুনর্বসু নক্ষত্রের দৃষ্টি পড়বে ।

কাক নেই, কাক নেই, এখনি বেরিয়ে পড়া যাক । ডাক দাও পুস্তুলালকে, মোটরখানা আনুক । সে এতক্ষণে চরকা কাটতে বসেছে । চরকা কাটতে কাটতে তবে সে ঘুমতে পারে, মোটর চালিয়ে চালিয়ে তার এই দশা হয়েছে ।

গাড়িতে চড়ে বসলুম ।



জলের মধ্য দিয়ে চলেছি, ঘোর অন্ধকার। পুকুরের ধারে আস্‌সেওড়ার ঝোপ। হঠাৎ তার ভিতর থেকে খেকশিয়ালি উঠল ডেকে। তখন রাত সাড়ে তিনটে হবে। যেমনি ডাকা, পুস্তুলাল চমকে উঠে গাড়িসুদ্ধ গিয়ে পড়ল একগলা জলের মধ্যে। এ দিকে তার পিঠের কাপড়ের ভিতরে একটা ব্যাঙ ঢুকে লাফালাফি করছে। আর, পুস্তুলালের সে কী চৈতানি! আমি ওকে সাহুনা দিয়ে বললুম, পুস্তুলাল, তোর পিঠে বাত আছে, ব্যাঙটাকে খুব কষে লাফাতে দে, বিনি পরসায় অমন ভালো মালিশ আর পাষি নে।

গাড়ির ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ডাক দিতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী।

ইস্টুপিডের কোনো সাড়াশব্দ নেই। স্পষ্টই বোঝা গেল, সে তখন বোলপুর স্টেশনের প্লাটফর্মের চাদর মুড়ি দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। ভারি রাগ হল। ইচ্ছে করল, তার নাকের মধ্যে ফাউন্টেন পেনের সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে ইঁচিয়ে দিয়ে আসি গে। এ দিকে পাকের জলে আমার চুলগুলো গেছে ভিজে। না আঁচড়ে নিয়ে ওর বৌদিদির ওখানে যাই কী ক'রে। গোলমাল শুনে পুকুরপাড়ে ইঁসগুলো প্যাক প্যাক ক'রে ডেকে উঠেছে। এক লাফ দিয়ে পড়লুম তাদের মধ্যে; একটাকে চেপে ধরে তার ডানা দিয়ে ঘষে ঘষে চুলটা একরকম ঠিক করে নিলুম। পুস্তুলাল বললে, ঠিক বলেছ, দাদাবাবু। ব্যাঙের লাফে বড়ো আশ্রয় বোধ হচ্ছে। ঘুম আসছে।

যাওয়া গেল ওর বৌদিদির বাড়িতে। খিদের চোটে একেবারে ভুলে গেছি কনে দেখার কথা। বৌদিদিকে জিগেস করলেম, আমার সঙ্গে ছিল সে, তাকে দেখছি নে কেন।

তিন হাত দোপাট্টা কাপড়ের ঘোমটার ভিতর থেকে মিহিসুরে বৌদিদি বললে, সে কনে খুঁজতে গেছে।

কোন্‌ চুলোয়।

মজা দিঘির ধারে বাঁশতলায়।

কত দূর হবে।

তিন পহরের পথ।

দূর বেশি নয় বটে। কিন্তু, খিদে পেয়েছে। তোমার সেই চাটুনি বের করো দিকি।

বৌদিদি নাকি সুরে বললে, হায় রে আমার পোড়া কপাল, এই গেল মজলবারের আগের মজলবারে ফাটা ফুটবল ভর্তি ক'রে সমস্তটা পাঠিয়ে দিয়েছি বুদ্ধিদিদির ওখানে—সে ওটা খেতে ভালোবাসে ছোলার ছাতুর সঙ্গে শর্বেতেল আর লঙ্কা দিয়ে যেখে।





পাট্টারাম

মুখ শুকিয়ে গেল ; বললুম, আমরা খাই কী।

বৌদিদি বললে, শুকনো কুঁচো চিংড়িমাছের মোরসা আছে টাটকা চিটেগুড়ে জমানো। বাছারা খেয়ে নাও, নইলে পিস্তি পড়ে যাবে।

কিছু খেলেম, অনেকটাই রইল বাকি। পুস্তুলালকে জিগেস করলুম, খাবি ?

সে বললে, ভাঁড়টা দাও, বাড়ি গিয়ে আধিক ক'রে খাব।

বাড়ি এলেম ফিরে। চটিজুতো ভিজে, গা-ময় কাদা।

বনমালীকে ডাক দিয়ে বললুম, বাদর, কী করছিলি।

সে হাউহাউ ক'রে কান্ডে কান্ডে বললে, বিছে কামড়েছিল, তাই ঘুমচ্ছিলুম।

ব'লেই সে চলে গেল ঘুমতে।

এমন সময় একটা শুণাগোছের মাছুষ একেবারে ঘরের মধ্যে উপস্থিত। মস্ত লম্বা, ঘাড় মোটা, মোটা পিপের মতো গর্দান, বনমালীর মতো রঙ কালো, ঝাঁকড়া চুল, খোঁচা খোঁচা গৌফ, চোখ দুটো রাঙা, গায়ে ছিটের মেরুজাই, কোমরে লাল রঙের ডোরাকাটা লুটির উপর হলদে রঙের তিন-কোণা গামছা বাঁধা, হাতে পিতলের কাঁটামারা লম্বা একটা বাণের লাঠি, গলার আওরাজ ঘেন গদাইবাবুদের মোটর গাড়িটার শিঙের মতো। হঠাৎ সে লাড়ে তিন ঘোন শুজনের গলায় ডেকে উঠল, বাবুমশায়!

চমকে উঠে কলমের খোঁচার খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে গেল।

বললুম, কী হয়েছে, কে তুমি।

সে বললে, আমার নাম পাল্লারাম, দিদির বাড়ি থেকে এসেছি, জানতে চাই তোমাদের সে কোথায় গেল।

আমি বললুম, আমি কী জানি।

পাল্লারাম চোখ পাকিয়ে হাঁক দিয়ে বললে, জান না বটে! ঐ যে তার তালি-দেওয়া আশ-বের-করা সবুজ রঙের এক পাটি পশমের মোজা কাদাহুড় শুকিয়ে গিয়ে মরা কাঠবেড়ালির কাটা লেজের মতো ভোমার বইয়ের শেলকে ঝুলছে, ওটা ফেলে সে যাবে কোন্ প্রাণে।

আমি বললুম, লোকসান সহিবে না, যেখানে থাকে ফিরে আসবেই। কিন্তু হয়েছে কী।

পাল্লারাম বললে, পরশুদিন সন্দের সময় দিদি গিয়েছিল জজিলাটের বাড়ি। লাট-গির্দার সঙ্গে গজাঙ্গল পাতিয়েছে। ফিরে এসে দেখে, একটা ঘটি, একটা ছাতা, একজোড়া ডাস, হারিকেন লঠন, আর একটা পাথুরে কয়লার ছালা নিয়ে কোথায় সে

চ'লে গেছে। দিদি বাগান থেকে একঝুড়ি বাঁশের কোঁড়া, লাউডগা আর বেতোশাক তুলে রেখেছিল; তাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিদি ভারি রাগ করছে।

আমি বললুম, তা আমি কী করব।

পাল্লারাম বললে, তোমার এখানে কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তাকে বের ক'রে দাও।

আমি বললুম, এখানে নেই, তুমি থানায় খবর দাও গে।

নিশ্চয় আছে।

আমি বললুম, ভালো মুশকিলে ফেললে দেখছি! বলছি সে নেই।

‘নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় আছে’ বলতে বলতে পাল্লারাম আমার টেবিলের উপর দমাদম তার বাঁশের লাঠির মুণ্ডটা ঠুকতে লাগল। পাশের বাড়িতে একটা পাগল ছিল, সে শেয়াল ডাকের নকল ক'রে হাঁক দিল ‘হুঙ্কাহুয়া’। পাড়ার সব কুকুর চৈচিয়ে উঠল। বনমালী আমার জন্তে এক ঘাস বেলের সরবত রেখে গিয়েছিল, সেটা উল্টিয়ে বোতল ভেঙে বেগুনি রঙের কালির সঙ্গে মিশে রেশমের চাদর বেয়ে আমার জুতোর মধ্যে গিয়ে জমল। চীৎকার করতে লাগলুম, বনমালী, বনমালী!

বনমালী ঘরে ঢুকেই পাল্লারামের চেহারা দেখে ‘বাপ রে’ ‘মা রে’ ব'লে চৈচাতে চৈচাতে দৌড় দিলে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল; বললুম, সে গেছে কনের খোঁজ করতে।

কোথায়।

মজাদিঘির ধারে বাঁশতলায়।

লোকটা বললে, সেখানে যে আমারই বাড়ি।

তা হলে ঠিক হয়েছে। তোমার মেয়ে আছে?

আছে।

এইবার তোমার মেয়ের পাত্র জুটল।

জুটলো এখনো বলা যায় না। এই ভাঙা নিয়ে ঘাড়ে ধরে তার বিয়ে দেব, তার পরে বুঝব কতাদায় ঘুচল।

তা হলে আর দেরি কোরো না। কনে দেখার পরেই বরকে দেখা হয়তো সহজ হবে না।

সে বললে, ঠিক কথা।

একটা ভাঙা বাগতি ছিল ঘরের বাইরে। সেটা ফস্ ক'রে তুলে নিলে। জিগেস করলুম, ওটা নিয়ে কী হবে।

ও বললে, বড়ো রোদ্দুর, টুপি মতো ক'রে পরব।

ও তো গেল। তখন কাক ডাকছে, ট্রামের শব্দ শুক্ন হয়েছে। বিছানা থেকে ধড়-ধড় ক'রে উঠেই ডাক দিলেম বনমালীকে। জিগেস করলেম, ঘরে কে ঢুকেছিল।

ও চোখ রগড়ে বললে, দিদিমণির বেড়ালটা।

এই পর্যন্ত শুনে পুপেদিদি হতাশভাবে বললে, ও কী কথা দাদামশায়, তুমি যে বলছিলে, তুমি নেমস্তম্ব খেতে গিয়েছিলে, তার পরে তোমার ঘরে এসেছিল পাল্লারাম।

সামলে নিলুম। আর একটু হলেই বুদ্ধিমানের মতো বলতে বাচ্ছিলুম, আগাগোড়া স্বপ্ন। সব মাটি হত। এখন থেকে পাল্লারামকে নিয়ে উঠে পড়ে লাগতে হবে বেমন ক'রে পারি। স্বপ্ন যখন বিধাতা ভাঙেন নালিশ খাটে না। আমরা ভাঙলে বড়ো নিষ্ঠুর হয়।

পুপুদিদি বললে, দাদামশায়, ওদের ছুজনের বিয়ে হল কি না বললে না তো কিছু।

বুঝলুম, বিয়ে হওয়াটা জরুর দরকার। বললুম, বিয়ে না হয়ে কি রক্ষা আছে।

তার পরে তোমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছে কি।

হয়েছে বৈ কি। তখন ভোর সাড়ে চারটে, রাস্তার গ্যাস নেবে নি। মেবলুম, নতুন বৌ তার বরকে ধরে নিয়ে চলেছে।

কোথায়।

নতুন বাজারে মানকচু কিনতে।

মানকচু!

হ্যাঁ, বর আপত্তি করেছিল।

কেন।

বলেছিল, অত্যন্ত দরকার হলে বরক কাঁঠাল কিনে আনতে পারি, মানকচু পারব না।

তার পরে কী হল।

আনতে হল মানকচু কাঁধে করে।

খুশি হল পুপু; বললে, খুব জব্ব!



স্বাক্ষর ক্রিয়াক্ষে

৫

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় সে এসে উপস্থিত ।

জিগেস করলুম, কিছু বলবার আছে ?

‘ও বললে, আছে ।

চট্ট ক’রে বলে ফেলো, আমাকে এখনি বেরতে হবে ।

কোথায় ।

লাটসাহেবের বাড়ি ।

লাটসাহেব তোমাকে ডাকেন নাকি ।

না, ডাকেন না, ডাকলে ভালো করতেন ।

ভালো কিসের ।

জানতে পারতেন, ঠেঁরা ঘানের কাছ থেকে খবর পেয়ে থাকেন আমি তাদের চেয়েও খবর বানাতে ওস্তাদ । কোনো রায়বাহাদুর আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, সে কথা তুমি জান ।

জানি, কিছু আমাকে নিয়ে আশ্চর্য্য তুমি যা-তা বলছ ।

অসম্ভব গল্পেরই যে ফর্যাশ ।

হোক-না অসম্ভব, তারও তো একটা বাধুনি থাকা চাই । এলোমেলো অসম্ভব তো যে-সে বানাতে পারে ।

তোমার অসম্ভবের একটা নমুনা দাও ।

আচ্ছা বলি শোনো—

স্বতন্ত্রত্বশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি ক’রে ক্যাল্কাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন । খেয়ে খিদে গেল না, উন্টো হল, পেট চৌ-চৌ করতে লাগল । সামনে পেলেন অক্টলিনি মজ্জামেন্ট । নীচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে । বদকদ্দিন যিঞা সেনেট-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে ইঁ-ইঁ ক’রে ছুটে এল । বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিসটাকে এঁটো করে দিলেন ।

‘তোবা তোবা’ ব’লে তিনবার মজ্জামেন্টের গায়ে থুথু কেলো যিঞাসাহেব ঘোঁড়ে গেল স্টেটসম্যান-আপিসে খবর দিতে ।





অতিরিক্তমাত্রায়ের হঠাৎ চৈতন্য হল, মুখটা তাঁর অগোচর হয়েছে। গেলেন মুজিববাবুর
দরওয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েকি, ভূমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ—একটা

অস্বরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চুম্বিয়ে নিয়ে সেলাম ক'রে বললে, কোমা ভু পোর্টে ভু সি ভু পে।

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অন্তর, আমি মন্থ্যমেন্ট চেটেছি।

পাঁড়েজি দেশলাই দিয়ে বর্মী চুকট ধরালো। দু টান টেনে বললে, তা হলে এম্বুনি খুলুন ওয়েব্‌টার ডিক্সনারি, দেখুন বিধান কী।

স্বত্বিরঙ্গ বললেন, তা হলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতলে-বাঁধানো ডাঙাখানা চাই।

পাঁড়ে বললে, কেন, কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি?

স্বত্বিরঙ্গ বললেন, তুমি খবর পেলে কেমন ক'রে। সে তো পড়েছিল পরশু দিন। ছুটতে হল উন্টোডিঙিতে যকৃত-বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকাটনি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবল আনিয়ে সাক্ষ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললে, তবে ডাঙায় তোমার কী প্রয়োজন।

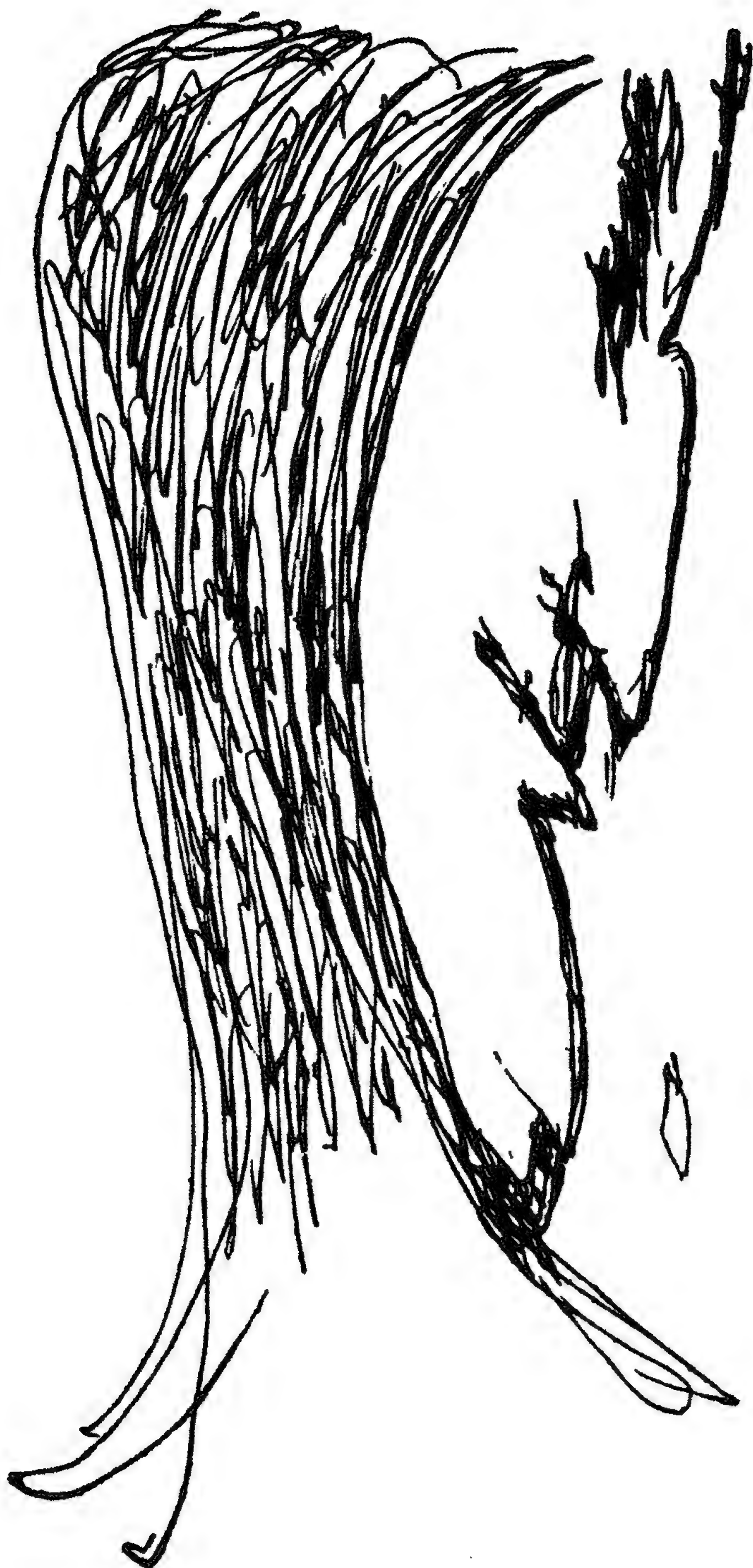
পণ্ডিত মশায় বললেন, দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললে, ওঃ, তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তা হলে আবার গজাজল দিয়ে শোধন করতে হত।

- এই পর্যন্ত বলে গুড়্‌গুড়িটা কাছে নিয়ে দু টান টেনে সে বললে, দেখো দাদা, এই-রকম তোমার বানিয়ে বলবার ধরন। এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের গুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। যেটাকে ঘেরকম জানি সেটাকে অন্তরকম করে দেওয়া। অত্যন্ত সহজ কাজ। যদি বল লাটসাহেব কলুর ব্যবসা ধ'রে বাগবাজারে শুটকি মাছের দোকান খুলেছেন, তবে এমন সস্তা ঠাট্টায় যারা হাসে তাদের হাসির দাম কিসের।

চটেছ ব'লে বোধ হচ্ছে।

কারণ আছে। আমাকে নিয়ে পুপুদিককে সেদিন যাচ্ছে-তাই কতকগুলো বাজে কথা বলেছিলে। নিতান্ত ছেলেমানুষ বলেই দিদি ইা করে সব শুনেছিল। কিন্তু, অদ্ভুত কথা যদি বলতেই হয় তবে তার মধ্যে কারিগরি চাই তো।





সেটা ছিল না বুঝি ?

না, ছিল না। চূপ করে থাকতুম যদি আমাকে স্কন্ধ না জড়াতে। যদি বলতে, তোমার অতিথিকে তুমি জিরাকের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছ, শর্ষেবাটা দিয়ে তিমিমাছ-ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁকের থেকে টাটকা ধরে আনা জলহস্তী, আর তার সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা-চচ্চড়ি, তা হলে আমি বলতুম, ওটা হল স্কুল। ওরকম লেখা সহজ।

আচ্ছা, তুমি হলে কী রকম লিখতে।

বলি, রাগ করবে না? দাদা, তোমার চেয়ে আমার কেরামতি যে বেশি তা নয়, কম বলেই সুবিধে। আমি হলে বলতুম—

ভাসমানিয়াতে তাস খেলার নেমস্তম্ভ ছিল, যাকে বলে দেখা-বিন্টি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, আর গিঘির নাম ছিল শ্রীমতী হাচিয়েন্দানি কোরকুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পামুকুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধেছিলেন কিষ্টিনাবুর মেরিউনাথু, তার গন্ধ ঘাস সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে; কাকগুলো জমির উপর ঠোট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিন ঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর, জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙচুটোর সাড়ানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁকুহুটো ফলের ছোবড়া-চোয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইক্টিকুটির ভিক্টিমাই, ঝুড়িভর্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দ'লে দিল; তার পরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, মাছুষে গোকতে সিদ্ধিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাণ্ডুং, তার কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে। তার পরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগল। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দুয় পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাড়া দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাড়া দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা ক'রে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার ভবিষ্যে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্তের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের ব'লে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড়ো বড়ো মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাজারদাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে

যেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরোদাঁতি ওদের কেটকু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আটকিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচাকি নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভিকৌন্সিল পর্যন্ত।

আমি ইাপিয়ে উঠে বললুম, থামো, থামো! কিন্তু জিগেস করি, তুমি যে কাহিনীটা আওড়ালে তার বিশেষ গুণটা কী।

ওর গুণটা এই, এটা কুলের আঁঠির চাটনি নয়। যা কিছুই জানি নে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করবার শখ মেটালে কোনো নালিশের কারণ থাকে না। কিন্তু, এতেও যে আছে উচু দরের হাসি তা আমি বলি নে। বিশ্বাস করবার অতীত যা তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি, তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে-চলুতি ছেলে-ভোলাবার সস্তা অত্যাঙ্কি যদি তুমি বানাতে থাক তা হলে তোমার অপষণ হবে, এই আমি ব'লে রাখলুম।

আমি বললেম, আচ্ছা, এমন করে গল্প বলব যাতে পুপুদিদির বিশ্বাস ভাঙতে ওয়া ডাকতে হবে।

ভালো কথা, কিন্তু লাটসাহেবের বাড়িতে যাওয়া বলতে কী বোঝায়।

বোঝায়, তুমি বিদায় নিলেই ছুটি পাই। একবার বসলে উঠতে চাও না, তাই 'তুমি যাও' অত্মরোধটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে বলতে হল।

বুঝেছি, আচ্ছা, তবে চললুম।

৬

সার্কাস দেখে আসার পর থেকে পুপুদিদির মনটা যেন বাঘের বাসা হয়ে উঠল। বাঘের সঙ্গে, বাঘের মাসির সঙ্গে সর্বদা তার আলাপ চলছে। আমরা কেউ যখন থাকি নে তখনই ওদের মজলিস জমে। আমার কাছে নাপিতের খবর নিচ্ছিল; আমি বললুম, নাপিতের কী দরকার।

পুপু জানালে, বাঘ ওকে অত্যন্ত ধরে পড়েছে। খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে ওর গৌক, ও কামাতে চায়।

আমি জিগেস করলেম, গৌক কামানোর কথা ওর মনে এল কী করে।



পুপু বললে, চা খেয়ে বাবার পেয়ালার তলানি ঝেঁটুকুঁ বাকি থাকে আমি বাঘকে খেতে দিই। সেদিন তাই খেতে এলে ও দেখতে পেরেছিল পাঁচুবাবুকে ; ওর বিশ্বাস, গৌফ কামালে ওর মুখখানা দেখাবে ঠিক পাঁচুবাবুরই মতো।

আমি বললুম, সেটা নিতান্ত অসম্ভাব্য ভাবে নি। কিন্তু, একটু মুশকিল আছে। কামানোর শুকতেই নাপিতকে যদি শেষ করে দেয় তা হলে কামানো শেষ হবেই না।

ওনেই কন্ ক'রে পুপের মাথায় বুদ্ধি এসে ; ব'লে ফেললে, জান দাদামশায় ? বাঘরা

কখনো নাপিতকে খায় না।

আমি বললুম, বল কী। কেন বলো দেখি।

খেলে ওদের পাপ হয়।

ও, তা হলে কোনো ভয় নেই। এক কাজ করা যাবে, চৌরঙ্গিতে সাহেব-নাপিতের দোকানে নিয়ে যাওয়া যাবে।

পুণে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, হাঁ হাঁ, ভারি মজা হবে। সাহেবের মাংস নিশ্চয় খাবে না, ঘেমা করবে।

খেলে গঙ্গাস্নান করতে হবে। খাওয়া-ছোঁওয়া বাঘের এত বাছবিচার আছে, তুমি জানলে কী করে, দিদি।

পুপু খুব সেয়ানার মতো মুখ টিপে হেসে বললে, আমি সব জানি।

আর, আমি বুঝি জানি নে?

কী জান, বলো তো।

ওরা কখনো চাষী কৈবর্তের মাংস খায় না; বিশেষত যারা গঙ্গার পশ্চিম-পারে থাকে। শাস্ত্রে বারণ।

আর, যারা পূব-পারে থাকে?

তারা যদি ছেলে কৈবর্ত হয় তো সেটা অতি পবিত্র মাংস। সেটা খাবার নিয়ম বাঁ খাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

বাঁ খাবা কেন।

ঐটে হচ্ছে শুদ্ধ রীতি। ওদের পণ্ডিতরা ডান খাবাকে নোংরা বলে। একটি কথা জেনে রাখো দিদি, নাপতিনীদের 'পরে ওদের ঘেমা। নাপতিনীরা যে মেয়েদের পায়ে আলতা লাগায়।

তা লাগালেই বা?

সাধু বাঘেরা বলে, আলতাটা রক্তের ডান, ওটা আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে চিবিয়ে বের করা রক্ত নয়, ওটা মিথ্যাচার। এরকম কপটাচরণকে ওরা অত্যন্ত নিন্দে করে। একবার একটা বাঘ ঢুকেছিল পাগড়িওয়ালার ঘরে, সেখানে ম্যাঞ্জেটা গোলা ছিল গামলায়। রক্ত মনে ক'রে মহা খুশি হয়ে মুখ ডুবোলে তার মধ্যে। সে একেবারে পাকা রঙ। বাঘের দাড়ি গোক, তার দুই গাল, লাল টক্টকে হয়ে উঠল। নিবিড় বনে যেখানে বাঘদের পুরুতপাড়া মোষমারা গ্রামে, সেইখানে আসতেই ওদের আঁচাড়ি শিরোমণি ব'লে উঠল, এ কী কাণ্ড! তোমার সমস্ত মুখ লাল কেন। ও লজ্জায় প'ড়ে মিথো করে বললে, গুণ্ডার মেয়ে তার রক্ত খেয়ে এসেছি।

ধরা পড়ে গেল মিথ্যে। পণ্ডিতজি বললে, নখে তো রক্তের চিহ্ন দেখি নে; মুখ শুঁকে বললে, মুখে তো রক্তের গন্ধ নেই। সবাই বলে উঠল, ছি ছি! এ তো রক্তও নয়, পিত্তও নয়, মগজও নয়, মজ্জাও নয়—নিশ্চয় মাদুঘের পাড়ায় গিয়ে এমন একটা রক্ত খেয়েছে যা নিরামিষ রক্ত, যা অশুচি। পঞ্চায়েত বসে গেল। কামড়বিশারদ-মশায় হুঙ্কার দিয়ে বললে, প্রায়শ্চিত্ত করা চাই। করতেই হল।

যদি না করত।

সর্বনাশ! ও যে পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বাপ; বড়ো বড়ো ধরনধিনীর গৌরীদানের বয়স হয়ে এসেছে। পেটের নীচে লেজ গুটিয়ে সাত গুণা মোষ পণ দিতে চাইলেও বর জুটবে না। এর চেয়েও ভয়ংকর শাস্তি আছে।

কী রকম।

ম'লে শ্রদ্ধ করবার জন্তে পুরুত পাওয়া যাবে না, শেষ কালে হয়তো বেত-জ্বল গাঁ থেকে নেকড়ে-বেঘো পুরুত আনতে হবে; সে ভারি লজ্জা, সাত পুরুষের মাথা হেঁট।

শ্রদ্ধ নাই বা হল।

শোনো একবার। বাঘের ভূত যে না খেয়ে মরবে।

সে তো মরেইছে, আবার মরবে কী ক'রে।

সেই তো আরও বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু ম'রে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুর্গ্রহ।

পুপুদিদিকে ভাবিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ বাদে ভুরু কুঁচকিয়ে বললে, ইংরেজের ভূত তা হলে খেতে পার কী ক'রে।

ভারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চ'লে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।

সন্দেহ মীমাংসা হতেই পুপে জিগেস করলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরকম হল।

আমি বললুম, হাঁকবিত্তা-বাচস্পতি বিধান দিলে যে, বাঘাচণ্ডীতলার দক্ষিণপশ্চিম কোণে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি থেকে শুরু করে অমাবস্তার আড়াই পছর রাত পর্যন্ত শুকে কেবল খ্যাক্শেমালির ঘাড়ের মাংস খেয়ে থাকতে হবে; তাও হয় ওর পিসতুতো বোন কিম্বা মাসতুতো জ্বালার মেজো ছেলে ছাড়া আর কেউ শিকার করলে হবে না—আর, শুকে খেতে হবে পিছনের ডান দিকের খাখা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে। এত বড়ো শাস্তির



হুকুম শুনেই বাঘের গা বমি-বমি করে এল ; চার পায়ে হাত জোড় করে হাউ-হাউ
করতে লাগল ।

কেন, কী এমন শাস্তি !

বল কী, খ্যাকশিরালির মাংস ! যত দূর অশুচি হতে হয় । বাঘটা মোহাই পেড়ে

বললে, আমাকে বরঞ্চ নেউলের লেজ খেতে বলো সেও রাজি, কিন্তু খ্যাকশেমালির ঘাড়ের মাংস !

শেষকালে কি খেতে হল ।

হল বই কি ।

দাদামশায়, বাঘেরা তা হলে খুব ধার্মিক ?

ধার্মিক না হলে কি এত নিয়ম বাঁচিয়ে চলে । সেইজন্মেই তো শেয়ালরা ওদের ভারি ভক্তি করে । বাঘের এটো প্রসাদ পেলে ওরা বর্তিয়ে যায় । বাঘের জ্বোদীশীতে যদি মঙ্গলবার পড়ে তা হলে সেদিন ভোর রাস্তিরে ঠিক দেড় প্রহর থাকতে বুড়ো বাঘের পা চেটে আসা শেয়ালদের ভারি পুণ্যকর্ম । কত শেয়াল প্রাণ দিয়েছে এই পুণ্যের জন্মে ।

পুপুর বিষম খটকা লাগল । বললে, বাঘরা এতই যদি ধার্মিক হবে তা হলে জীবহত্যে করে কাঁচা মাংস খায় কী করে ।

সে বুঝি যে-সে মাংস । ও-যে মস্ত দিয়ে শোখন করা ।

কিরকম মস্ত ।

ওদের সনাতন হালুম-মস্ত । সেই মস্ত প'ড়ে তবে ওরা হত্যা করে । তাকে কি হত্যা বলে ।

যদি হালুম-মস্ত বলতে ভুলে যায় ।

বাঘপুঙ্খ-পণ্ডিতের মতে তা হলে ওরা বিনা মস্তে যে জীবকে মারে পরজন্মে সেই জীব হয়েই জন্মায় । ওদের ভারি ভয় পাছে মানুষ হয়ে জন্মাতে হয় ।

কেন ।

ওরা বলে, মানুষের সর্বাঙ্গ টাক-পড়া, কী কুত্ৰী ! তার পরে, সামান্য একটা লেজ, তাও নেই মানুষের দেহে । পিঠের মাছি তাড়াবার জন্মেই ওদের বিষে করতে হয় । আবার দেখো-না, ওরা খাড়া দাঁড়িয়ে সড়ের মতো দুই পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে— দেখে আমরা হেসে মরি । আধুনিক বাঘের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জানী শার্দৌল্যভরঙ্গ বলেন, জীবহত্যার শেষের পালায় বিশ্বকর্মার মালমসলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হল । তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্মে থাবা দূরে থাক্ কয়েক-টুকরো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো প'রে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে— আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে । সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব । এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই ।

বাঘেদের বুঝি ভারি অহংকার ?

ভয়ংকর । সেইজন্মেই তো ওরা এত ক'রে জাত বাঁচিয়ে চলে । জাতের দোহাই পেড়ে একটা বাঘের খাওয়া বন্ধ করেছিল একজন মানুষের মেয়ে ; তাই নিয়ে আমাদের সে একটা ছড়া বানিয়েছে ।

তোমার মতো সে আবার ছড়া বানাতে পারে নাকি ।

তার নিজের বিশ্বাস সে পারে, এই তর্ক নিয়ে তো পুলিশ ডাকা যায় না ।

আচ্ছা, শোনাও-না ।

তবে শোনো ।—

এক ছিল মোটা কৈদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে ।
এক ছুটে পালালো বেহারা,
বাঘ দেখে আপন চেহারা ।
গাঁ-গাঁ ক'রে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে ।

ঢেঁকিশালে পুঁটু ধান ভানে,
বাঘ এসে দাঁড়ালো সেখানে ।
ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, চাই মিসেরিন সোপ ।

পুঁটু বলে, ও কথাটা কী যে
জন্মেও জানি নে তা নিজে ।
ইংরেজি-টিংরেজি কিছু
শিখি নি তো, জাতের আমি নিচু ।

বাঘ বলে, কথা বল খুঁটো,
নেই কি আমার চোখ দুটো ।
গায়ে কিসে দাগ হল লোপ
না মাখিলে মিসেরিন সোপ ।

পুঁটু বলে, আমি কালো কুটি,
কখনো মাখি নি ও জিনিসটি ।
কথা শুনে পায় মোর হাসি,
নই যেম-সাহেবের মাসি ।

বাঘ বলে, নেই তোর লজ্জা ?
খাব তোর হাড় মাস মজ্জা ।

পুঁটু বলে, ছি ছি ওরে বাপ,
মুখেও আনিলে হবে পাপ ।
জান না কি আমি অম্পৃক্ত,
মহাত্মা গান্ধিজির শিষ্য ।
আমার মাংস যদি পাও
জাত যাবে জান না কি তাও ।
পায়ে ধরি করিষো না রাগ !—

ছুঁ'গ নে ছুঁ'গ নে, বলে বাঘ,
আরে ছি ছি, আরে রাম রাম,
বাঘ-নাপাড়ায় বদনাম
রটে যাবে ; ঘরে ঘেয়ে ঠাসা,
ঘুচে যাবে বিবাহের আশা
দেবী বাঘা-চণ্ডীর কোপে ।
কাজ নেই মিসেরিন সোপে ।

জান, পুপুদিদি ? আধুনিক বাঘদের মধ্যে ভারি একটা কাণ্ড চলছে— যাকে বলে প্রগতি, প্রচেষ্টা । ওদের প্রগতিওয়ালারা প্রচারকেরা বাঘ-সমাজে ব'লে বেড়াচ্ছে যে, অম্পৃক্ত ব'লে খাওয়া বিচার করা পবিত্র অঙ্ক-আত্মার প্রতি অবমাননা । ওরা বলছে, আজ থেকে আমরা যাকে পাব তাকেই খাব ; বাঁ খাবা দিয়ে খাব, ডান খাবা দিয়ে খাব, পিছনের খাবা দিয়েও খাব ; হালুম-ময় পড়েও খাব, না পড়েও খাব— এমন-কি, বৃহস্পতিবারেও আমরা আঁচড়ে খাব, শনিবারেও আমরা কামড়ে খাব । এত ঔদার্য । এই বাঘেরা যুক্তিবাদী এবং সর্বজীবে এদের সম্মানবোধ অত্যন্ত ফলাও । এমন-কি, এরা পশ্চিম-পারের চাষী কৈবর্তদেরও খেতে চায়, এতই এদের উদার মন । ঘোরতর

দলাদলি বেধে গেছে। প্রাচীনরা নব্য সম্প্রদায়কে নাম দিয়েছে চাষী-কৈবর্ত-খেগো,
এই নিয়ে মহা হাসাহাসি পড়েছে।

পুপু বললে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কখনো বাঘের উপর কবিতা লিখেছ ?

হার মানতে মন গেল না। বললুম, হ্যাঁ লিখেছি।

শোনাও-না।

গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করে গেলুম—

তোমার সৃষ্টিতে কত শক্তিরে কর না অপমান,
হে বিধাতা— হিংসারেও করেছে প্রবল হস্তে দান
আশ্চর্য মহিমা এ কী। প্রথরনখর বিভীষিকা,
সৌন্দর্য দিয়েছ তারে, দেহধারী ঘেন বজ্রশিখা,
যেন ধূর্তটির ক্রোধ। তোমার সৃষ্টির ভাঙে বাঁধ
ঝঙ্কা উচ্ছ্বল, করে তোমার দয়ার প্রতিবাদ
বনের যে দম্বা সিংহ, ফেনজিহ্ন ক্ষুধ সমুদ্রের
যে উদ্ধত উর্ধ্ব ফণা, ভূমিগর্ভে দানবযুদ্ধের
ডমকনিঃস্বনী স্পর্ধা, গিরিবন্ধভেদী বহ্নিশিখা
যে আঁকে দিগন্তপটে আপন জলন্ত জয়টিকা,
প্রলয়নর্তিনী বক্সা বিনাশের মদিরবিস্মল
নির্লজ্জ নিষ্ঠুর— এই যত বিশ্ববিপ্রবীর দল
প্রচণ্ড হৃদয়। জীবলোকে যে দুর্দান্ত আনে ত্রাস
হীনতালাঞ্ছনে সে তো পায় না তোমার পরিহাস।

চুপ করে রইল পুপু। আমি বললুম, কী দিদি, ভালো লাগল না বুঝি।

ও কুণ্ঠিত হয়ে বললে, না না, ভালো লাগবে না কেন। কিন্তু, এর মধ্যে বাঘটা কোথায়।

আমি বললুম, যেমন সে থাকে ঝোপের মধ্যে, দেখা যায় না তবু আছে ভয়ংকর গোপনে।

পুপু বললে, অনেক দিন আগে গ্লিসেরিন-সোপ-খোজা বাঘের কথা আমাকে বলেছিলে। তার খবরটা কোথা থেকে পেলে সে।

আমার কথা শুনে চুরি, নিজের মুখে সেটা দেয় বসিয়ে।

কিন্তু—

‘কিন্তু’ না তো কী। লিখেছে ভালোই।

কিন্তু—

হ্যাঁ, ঠিক কথা। আমি অমন করে লিখি নে, হয়তো লিখতে পারি নে। আমার মালটা ও চুরি করে, তার পরে যখন পালিস ক’রে দেয় তখন চেনা শক্ত হয়—এমন ঢের দেখেছি। ঠিক ঐরকম আর-একটি ছড়া বানিয়েছে।

শোনাও-না।

আচ্ছা, শোনো তবে।—

সুঁদরবনের কেঁদো বাঘ,
সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ।
যথাকালে ভোজনের
কম হলে ওজনের
হত তার ঘোরতর রাগ।

একদিন ডাক দিল গাঁ-গাঁ—
বলে, তোর গিন্নিকে জাগা।
শোন্ বটুরাম লাড়া,
পাঁচ জোড়া চাই ভ্যাড়া,
এখনি ভোজের পাত লাগা।

বটু বলে, এ কেমন কথা,
লিখেছ কি এই ভদ্রতা।
এত রাতে হাঁকাহাঁকি
ভালো না, জান না তা কি,
আদবের এ যে অমুখা।

মোর ঘর নেছাত জঘন্ট,
মহাপণ্ড, হেথায় কী জন্ট।
ঘরেতে বাধিনী মাসি
পথ চেয়ে উপবাসী,
তুমি খেলে বুধে দেবে অন্ন।

সেখা আছে গোসাপের ঠ্যাঙ ।
 আছে তো শুটকে কোলা ব্যাঙ ।
 আছে বাসি খরগোষ,
 গন্ধে পাইবে তোষ,
 চলে ষাও নেচে ড্যাঙ ড্যাঙ ।

নইলে কাগজে প্যারাগ্রাফ
 রটিবে, ঘটিবে পরিতাপ—
 বাঘ বলে, রামো, রামো,
 বাক্যবাগীশ থামো,
 বকুনির চোটে ধরে হাঁপ ।

তুমি ঝাড়া, আস্ত পাগল,
 বেরোও তো, খোলো তো আগল ।
 ভালো যদি চাও তবে
 আমারে দেখাতে হবে
 কোন্ ঘরে পুষেছ ছাগল ।

বটু কহে, এ কী অকরণ,
 ধরি তব চতুষ্করণ—
 জীববধ মহাপাপ,
 তারো বেশি লাগে শাপ
 পরধন করিলে হরণ ।

বাঘ শুনে বলে, হরি হরি,
 না খেয়ে আমিই যদি মরি,
 জীবেরই নিধন তাহা—
 সহমরণেতে আহা
 মরিবে যে বাঘী স্তম্ভরী ।

অতএব ছাগলটা চাই,
 না হলে তুমিই আছ ভাই
 এত বলি তোলে থাবা ।
 বটুরাম বলে, বাবা,
 চলো ছাগলেরই ঘরে যাই ।

ঘর খুলে বলে, পড়ো ঢুকে,
 ছাগল চিবিরে খাও সুখে ।
 বাঘ সে ঢুকিল যেই,
 দ্বিতীয় কথাটি নেই,
 বাহিরে শিকল দিল কখে ।

বাঘ বলে, এ তো বোঝা ভার,
 ভায়াগার এ নহে আকার ।
 পাঠার দেখি নে টিকি,
 লেঙ্কের সিকির সিকি
 নেই তো, শুনি নে ভাভাকার ।

ওরে হিংসুক সমতান,
 জীবের বধিতে চান্দ প্রাণ !
 ওরে জুর, পেনে তোরে
 থাবায় চাপিয়া ধ'রে
 রক্ত শুষিয়া করি পান—

ঘরটাও ভীষণ ময়লা—
 বটু বলে, মহেশ গয়লা
 ও ঘরে থাকিত, আজ
 থাকে তোর ময়রাজ
 আর থাকে পাখুরে কয়লা ।

গোঁফ ফুলে ওঠে যেন খাঁটা,
 বাঘ বলে, গেল কোথা পাঠা !

বটুরাম বলে নেচে,
এই পেটে তলিয়েছে,
খুজিলে পাবে না সারা গাঁটা।

ভালো লাগল ?

তা, যাই বলো দাদামশায়, কিন্তু বাঘের ছড়া খুব ভালো লিখেছে।

আমি বললুম, তা হবে, হয়তো ভালোই লিখেছে। কিন্তু, ও ভালো লেখে কি আমি ভালো লিখি সে সম্বন্ধে শেষ অভিমতটা দেবার জন্যে অন্তত আরও দশটা বছর অপেক্ষা করো।

পুপু বললে, আমার বাঘ কিন্তু আমাকে খেতে আসে না।

সে তো তোমাকে প্রত্যক্ষ দেখেই বুঝতে পারছি। তোমার বাঘ কী করে।

রাস্তিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানলা আঁচড়ায়। খুলে দিলেই হাসে।

তা হতে পারে, ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস।
কথায় কথায় দাঁত বের করে।

৭

পুপে এসে জিগেস করলে, দাদামশায়, তুমি যে বললে শনিবারে সে আসবে তোমার নেমস্তরে। কী হল।

সবই ঠিক হয়েছিল। হাজি মিক্রা শিক্কাবাব বানিয়েছিল, তোফা হয়েছিল খেতে।

তার পরে ?

তার পরে নিজে খেলুম তার বারো আনা আনাজ, আর পাড়ার কালু ছোঁড়াটাকে দিলুম বাকিটুকু। কালু বললে, দাদাবাবু, এ-বে আমাদের কাঁচকলার বড়ার চেয়ে ভালো।

সে কিছু খেল না ?

জো কী।

সে এল না ?

সাধ্য কী তার।

তবে সে আছে কোথায়।

কোথাও না।



ঘরে ?

না।

দেশে ?

না।

বিলেতে ?

না।

তুমি যে বলছিলে, আগামানে যাওয়া ওর একরকম ঠিক হয়ে আছে। গেল নাকি।
দরকার হল না।

তা হলে কী হল আমাকে বলছ না কেন।

ভয় পাবে কিম্বা দুঃখ পাবে, তাই বলি নে।

তা হোক, বলতে হবে।

আচ্ছা, তবে শোনো। সেদিন ক্লাস পড়বার খাতিরে আমার পড়ে নেবার কথা ছিল 'বিদগ্ধমুখমণ্ডন'। একসময় হঠাৎ দেখি, সেটা রয়েছে পড়ে, হাতে উঠে এসেছে 'পাঁচুপাকড়ানির পিস্তাশুড়ি'। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাত হবে তখন আড়াইটা। স্বপ্ন দেখছি, গরম তেল জ্বলে উঠে আমাদের কিনি বাম্বনির মুখ বেবাক গিয়েছে পুড়ে; সাত দিন সাত রাত্তির হতো দিয়ে তারকেখরের প্রসাদ পেয়েছে ছ'কোঁটো লাহিড়ি কোম্পানির মূল্লাইট মো; তাই মাখছে মুখে ঘ'ষে ঘ'ষে। আমি বুঝিয়ে বললুম, ওতে হবে না গো, মোষের বাচ্চার গালের চামড়া কেটে নিয়ে মুণে জুড়তে হবে, নইলে রঙ মিলবে না। শুনেই আমার কাছে সওয়া তিন টাকা ধার নিয়ে সে ধর্মতলার বাজারে মোষ কিনতে দৌড়েছে। এমন সময় ঘরে একটা কী শব্দ শোনা গেল, কে ঘেন হাওয়ার তৈরি চটিজুতো হুস হুস ক'রে টানতে টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠলুম, উস্কে দিলেম লঠনটা। ঘরে একটা-কিছু এসেছে দেখা গেল কিন্তু সে যে কে, সে যে কী, সে যে কেমন, বোঝা গেল না। বুক ধড়্‌ফড়্‌ করছে, তবু জোর গলা ক'রে হেঁকে বললুম, কে হে তুমি। পুলিশ ডাকব নাকি।

অদ্ভুত হাঁড়িগলায় এই জীবটা বললে, কী দাদা, চিনতে পারছ না? আমি যে তোমার পুপেদিদির সে। এখানে যে আমার নেমস্তন্ন ছিল।

আমি বললুম, বাজে কথা বলছ, এ কী চেহারা তোমার!

সে বললে, চেহারাখানা হারিয়ে ফেলেছি।

হারিয়ে ফেলেছ? মানে কী হল।

মানেটা বলি। পুপেদিদির ঘরে ভোজ, সকাল-সকাল নাইতে গেলেম। বেলা



তখন সবেমাজ দেড়টা। ভেলেনিপাড়ার ঘাটে বসে ঝামা দিয়ে ক'ষে মুখ মাজ্ছিলুম ;
মাজার চোটে আরামে এমনি ঘুম এসে যে, ঢুলতে ঢুলতে সুপ্ ক'রে পড়লুম অলে ;



তার পরে কী হল জানি নে। উপরে এসেছি কি নীচে কি কোথায় আছি জানি নে,
পষ্ট দেখা গেল আমি নেই।

নেই !

তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—

আরে আরে, গা ছুঁতে হবে না, বলে যাও।

চুলুকুনি ছিল গায়ে; চুলকতে গিয়ে দেখি, না আছে নখ, না আছে চুলকনি।
ভয়ানক ছুঃখ হল। হাউহাউ ক'রে কানতে লাগলুম, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে যে
হাউহাউটা বিনা মূল্যে পেয়েছিলুম সে গেল কোথায়। যত চেষ্টাই চেষ্টানোও হয় না,
কান্নাও শোনা যায় না। ইচ্ছে হল, মাথা ঠুকি বটগাছটাতে; মাথাটার টিকি খুঁজে
পাই নে কোথাও। সব চেয়ে ছুঃখ— বারোটা বাজল, 'খিদে কই' 'খিদে কই' ব'লে
পুকুরধারে পাক ধেয়ে বেড়াই, খিদে-বান্দরটার চিহ্ন মেনে না।

কী বকছ তুমি, একটু থামো।

ও দাদা, দোহাই ভোমার, থামতে বোলো না। থামবার ছুঃখ যে কী অ-থামা
মানুষ সে তুমি কী বুঝবে। থামব না, আমি থামব না, কিছুতেই থামব না, যতক্ষণ
পারি থামব না।

এই ব'লে ধূপ্‌ধাপ্‌ ধূপ্‌ধাপ্‌ ক'রে লাফাতে লাগল, শেষকালে ডিগবাজি খেলা শুরু
করলে আমার কার্পেটের উপর, জলের মধ্যে শুক্কের মতো।

করছ কী তুমি।

দাদা, একেবারে বাদশাহি থামা থেমেছিলুম, আর কিছুতেই থামছি নে। মারধোর
যদি কর সেও লাগবে ভালো। আস্ত কিলের যোগা পিঠ নেই যখন জানতে
পারলুম, তখন সাতকড়ি পণ্ডিতমশায়ের কথা মনে ক'রে বুক ফেটে যেতে চাইল, কিন্তু
বুক নেই তো ফাটবে কী। কই-মাছের যদি এই দশা হত তা হলে বামনঠাকুরের
হাতে পায়ের ধরত তাকে একবার তপ্ত তেলে এপিঠ ওপিঠ ওল্টাতে পাল্টাতে।
আহা, যে পিঠখানা হারিয়েছে সেই পিঠে পণ্ডিতমশায়ের কত কিলই খেয়েছি, ইট দিয়ে
তৈরি খইয়ের মোয়াগুলোর মতো। আজ মনে হয়, উঃ— দাদা, একবার কিলিয়ে
দাও খুব ক'রে দমাদম—

ব'লে আমার কাছে এসে পিঠ দিলে পেতে।

আমি আংকে উঠে বললুম, যাও যাও, সরে যাও।

ও বললে, কথাটা শেষ ক'রে নিই। একখানা গা খুঁজে খুঁজে বেড়ালুম গায়ে
গায়ে। বেলা তখন তিন পहर। যতই রোদে বেড়াই কিছুতেই রোদে পুড়ে সারা
হচ্ছি নে, এই ছুঃখটা যখন অসহ্য এমন সময় দেখি, আমাদের পাতুখুড়ো মুচিখোলার
বটগাছডালয় গাঁজা ধেয়ে শিবনেত্র। মনে হল, তার প্রাণপুরুষটা বিন্দু হয়ে ব্রহ্মতালুর
চূড়ায় এসে জোনাক-পোকায় মতো মিটমিট করছে। বুঝলুম, হয়েছে স্বযোগ। নাকের
গর্ভ দিয়ে আত্মারামকে ঠেসে চালিয়ে দিলুম তার দেহের মধ্যে, নতুন নাগ্‌রা জুতোর

ভিতরে যেমন ক'রে পা'টা ঠেসে শুঁজতে হয়। সে হাঁপিয়ে উঠে ডাঙা গলায় ব'লে উঠল, কে তুমি বাবা, ভিতরে জায়গা হবে না।

তখন তার গলাটা পেয়েছি দখলে; বললুম, তোমার হবে না জায়গা, আমার হবে। বেরোও তুমি।

সে গৌ গৌ করতে করতে বললে, অনেকখানি বেরিয়েছি, একটু বাকি। ঠেলা মারো।

দিলুম ঠেলা, হুস্ ক'রে গেল বেরিয়ে।

এ দিকে পাতুখুড়োর গিন্নি এসে বললে, বলি, ও পোড়ারমুখো।

কান জুড়িয়ে গেল। বললুম, বলো বলো, আবার বলো, বড়ো মিষ্টি লাগছে, এমন ডাক যে আবার কোনোদিন শুনতে পাব এমন আশাই ছিল না।

বুড়ি ভাবলে ঠাট্টা করছি, ঝাঁটা আনতে গেল ঘরের মধ্যে। ভয় হল, পড়ে-পাওয়া দেহটা খোয়াই বুঝি। বাগায় এসে আয়নাতে মুখ দেখলুম, সমস্ত শরীর উঠল শিউরে। ইচ্ছে করল রাস্তা দিয়ে মুখটাকে ছুলে নিই।

গা-হারার গা এল, কিন্তু চেহারা-হারার চেহারাখানা সাত বাঁও জলের তলায়, তাকে ফিরে পাবার কী উপায়।

ঠিক এই সময়ে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর খিদেটাকে পাওয়া গেল। একেবারে জঠর জুড়ে। সব ক'টা নাড়ী চৌ চৌ করে উঠেছে এক সঙ্গে। চোখে দেখতে পাই নে পেটের জালায়। যাকে পাই তাকে খাই গোছের অবস্থা। উঃ, কী আনন্দ।

মনে পড়ল, তোমার ঘরে পুপুদ্বিদির নেমস্তন্ন। রেলভাড়ার পয়সা নেই। হেঁটে চলতে শুরু করলুম। চলার অসম্ভব মেহনতে কী যে আশ্রয় সে আর কী বলব। ক্ষুধিত্তে একেবারে গলদ্বর্ম। এক এক পা ফেলছি আর মনে মনে বলছি, থামছি নে, থামছি নে, চলছি তো চলছিই। এমন বেয়ম চলা জীবনে কখনো হয় নি। দাদা, পুরো একখানা গা নিয়ে বসে আছি কেদারায়, বুঝতেই পার না কষ্টে যে কী মজা। এই কষ্টে বুঝতে পারা যায়, আছি বটে, খুব কষে আছি, ঝোলো আনা পেরিয়ে গিয়ে আছি।

আমি বললুম, সব বুঝলুম, এখন কী করতে চাও বলো।

করবার দায় তোমারই, নেমস্তন্ন করেছিলে, খাওয়াতে হবে, সে কথা কুললে চলবে না।

রাত এখন তিনটে সে কথা তুমিও কুললে চলবে না।

তা হলে চললুম পুপুদ্বিদির কাছে।



বাবা
৭/১০/৩৫

খবরদার !

দাদা, ভয় দেখাচ্ছ মিছে, মরার বাড়া গাল নেই । চললুম ।

কিছুতেই না ।

সে বললে, যাবই ।

আমি বললুম, কেমন যাও দেখব ।

সে বলতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই ।

আমার টেবিলের উপর চ'ড়ে নাচতে নাচতে বললে, যাবই, যাবই, যাবই ।

শেষকালে পাঁচালির স্বর লাগিয়ে গাইতে লাগল, যাবই, যাবই, যাবই ।

আর থাকতে পারলুম না । ধরলুম ওর লম্বা চুলের ঝুঁটি । টানাটানিতে গা থেকে, টিলে মোজার মতো, দেহটা সরসরু ক'রে থ'সে থপ্ ক'রে পড়ে গেল ।

সর্বনাশ ! গাঁজাখোরের আত্মাপুরুষকে খবর দিই কী ক'রে । চোঁচিয়ে ব'লে উঠলুম, আরে আরে, শোনো শোনো, ঢুকে পড়ো এই গা'টার মধ্যে, নিয়ে যাও এটাকে ।

কেউ কোথাও নেই । ভাবছি, আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেব ।

পুপেদিদি এতখানি চোখ ক'রে বললে, সত্যি কি, দাদামশায় ।

আমি বললুম, সত্যির চেয়ে অনেক বেশি— গল্প ।

৮

আমি তখন এম. এ. ক্লাসের জন্তে এরিয়োপ্যাজিটিকার নোট লিখছি, মিলিয়ে দেখবার জন্তে বই পড়তে হচ্ছিল ইন্টরক্শানল্ মেলিকুয়ন্স্ আত্মা-ক্যাডাত্মা, আর পাত কেটে পরিশিষ্ট দেখছিলুম থী হুণ্ড ইয়ন্ অফ ইণ্ডো-ইণ্ডিটমিনেশন্ বইখানার ।

লাইব্রেরি থেকে আনাতে দিয়েছি অনোম্যাটোপিইয়া অফ টিটিগ্যাবলেশন্ । এমন সময় হুড়মুড় করে এসে ঢুকল আমাদের সে ।

আমি বললুম, হয়েছে কী, স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে নাকি ।

ও বললে, নিশ্চয় দিত যদি সে থাকত । কিন্তু, কী কাণ্ড বাধিয়েছ বলো দেখি ।

কেন কী হল ।

আমাকে নিয়ে এ পর্যন্ত বিস্তর আত্মগবি গল্প বানিয়েছ । ভাগ্যে আমার নামটা দাঁও নি, নইলে ভদ্রসমাজে মুখ দেখানো দায় হত । দেখলুম পুপুদিদির মজা লাগছে,

তাই সন্ধ্যা করেছি সব। কিন্তু এবার যে উন্টো হল।

কেন কী হল বলোই-না।

তবে শোনো। পুপুদিদি কাল গিয়েছিল সিনেমায়। মোটরে উঠতে যাচ্ছে, আমি পিছন থেকে এসে বললুম, দিদিমনি, তোমার গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও। তার পরে কী আর বলব দাদা, একেবারে হিস্টিরিয়া।

কিরকম।

হাতে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠে দিদি বললে, যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি ক'রে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না। চার দিক থেকে লোক এসে ছুটে, আমাকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায় আর-কি। জীবনে অনেক নিন্দে শুনেছি, কিন্তু এরকম ওরিজিনাল নিন্দে শুনি নি কখনো। গাঁজাখোরের গা চুরি করা! আমার অতিবড়ো প্রাণের বন্ধুও এমন নিন্দে আমার নামে রটায় নি। বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শোনা গেল। এ তোমারই কীতি।

আমারই তো বটে। কী করি বলো। তোমাকে নিয়ে আর কাঁহাতক গল্প বানাই। বয়স হয়ে গেছে, কলমটাকে যেন বাতে ধরল, পুপুদিদির কল্পমাশ-মত অসম্ভব গল্প বলার হাঙ্গা চাল আর নেই কলমের। তাই এই শেষ গল্পটাতে তোমাকে একেবারে খতম করে দিয়েছি।

খতম হতে রাজি নই, দাদা। দোহাই তোমার, পুপুদিদির ভয় ভাড়িয়ে দাও। বুঝিয়ে বলো, ওটা গল্প।

বলেছিলুম, কিন্তু ভয় ভাঙতে চায় না। নাড়ীতে জড়িয়ে গেছে। উপায় না দেখে স্বয়ং সেই পাতু গের্জেলকে আনলুম তার সামনে, উন্টো হল ফল। পাতুর গা'খানা প'রে যে তুমিই ঘুরে বেড়াচ্ছ তারই প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে গেল।

তা হলে দাদা, গল্পটাকে উলটিয়ে দাও, ধমুটেভাবে মজক পাতু। গাঁজাখোরের গা'খানাকে নিমন্তলার ঘাটে পুড়িয়ে ফেলো। ঘট ক'রে তার শ্রদ্ধ করব, পুপুদিদিকে করব তাতে নেমস্তম্ভ; ধরচ যত পড়ে দেব নিজের পকেট থেকে। আমি হলুম দিদির গল্পের বহুকুপী, হঠাৎ এত বড়ো পদ থেকে আমাকে অপদস্থ করলে বাচব না।

আচ্ছা, গল্পের উন্টোরখে তোমাকে পুপুদিদির ঘরে আবার ফিরিয়ে আনব।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সে এল, আমি শুক করলুম গল্পটা।—

বললুম, পাতুর স্ত্রী স্বামীর স্বপ্ন পাবার ক্ষেত্রে তোমার নামে আদালতে নালিশ করেছে।

এইটুকু শুনেই সে ব'লে উঠল, এ চলবে না, দাদা। পাতুর স্বীকে তুমি চক্ষে দেখ নি তো। মকদ্দমায় ঐ মহিলাটি যদি জেতে তা হলে যে আসামীপক্ষ আফিম খেয়ে মরবে।

ভয় কী, কথা দিচ্ছি, হার হোক, জিত হোক, টি'কিয়ে রাখব তোমাকে।
আচ্ছা, ব'লে যাও।

হাত জোড় ক'রে তুমি হাকিমকে বললে, হজুর, ধর্মাবতার, সাত পুরুষ আমি ওর স্বামী নই।

উকিল চোখ রাঙিয়ে বললে, স্বামী নও, তার মানে কী।

তুমি বললে, তার মানে, এ পর্যন্ত আমি ওকে বিয়ে করি নি, দ্বিতীয় আর কোনো মানে আপাতত কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

রামসদয় মোক্তার খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, আলবত তুমি ওর স্বামী, মিথো কথা বোলো না।

তুমি জজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললে, জীবনে বিস্তর মিথো বলেছি, কিন্তু ঐ বুড়িকে সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় বিয়ে করেছি, এত বড়ো দিগ্গজ মিথো বানিয়ে বলবার তাকত আমার নেই। মনে করতে বুক কঁপে ওঠে।

তখন ওরা সাক্ষী তলব করলে পদ্মত্ৰিপুজন গাঁজাখোরকে। একে একে তারা গাঁজাটেপা আঙুল তোমার মুখে বুলিয়ে বলে গেল, চেহারাটা একেবারে হুবহু পাতুর; এমন-কি, বাঁ কপালের আবটা পর্যন্ত। তবে কিনা—

মোক্তার তেরিফা হয়ে উঠে বললে, 'তবে কিনা' আবার কিসের।

ওরা বললে, সেই রকমের পাতুই বটে, কিন্তু সেই পাতুই, হলপ ক'রে এমন কথা বলি কী ক'রে। ঠাক্করনকে তো জানি, বন্ধু কন দুঃখ পায় নি, অনেক কাঁটা কয়ে গেছে ওর পিঠে। তার দাম বাঁচালে গাঁজার খরচে টানাটানি পড়ত না। তাই বলছি হজুর, আদালতে হলপ ক'রে ভদ্রলোকের সর্বনাশ করতে পারব না।

মোক্তার চোখ রাঙিয়ে বললে, তা হলে এ লোকটা কে বলো। দ্বিতীয় পাতু বানাবার শক্তি ভগবানেরও নেই।

গোঁজেলের সর্দার বললে, ঠিক বলেছ বাবা, এরকম ছিটি দৈবাৎ হয়। ভগবান নাকে খত দিয়েছেন, এমন কাজ আর করবেন না। তবু তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, একটা কোনো সমতান ভগবানের পাণ্টা জবাব দিয়েছে। একেবারে ওস্তাদের হাতের নকল, পাকা জালিয়াতের কাজ। পাতুর দেহখানা শুকিয়ে শুকিয়ে ওর নাক চিম্‌সিয়ে বেকে

গিয়েছিল, সেই বহিঃচন্দ্রে নাকটি পর্যন্ত যেন কেটে ওর ঘূষের মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছে। ওর হাতের চামড়া নকল করতে বোধ করি হাজার চামড়িকের ডানা খসচ করতে হয়েছে।



তুমি দেখলে মকদ্দমা আর টেঁকে না ; সাহেবকে বললে, এক হুগা সময় দিন, খাটি পাতু পক্ষীরাজকে হাজির ক'রে দেব এই আদালতে।

তখনই ছুটলে তেলিনিপাড়ার দিঘির ঘাটে। কপাল ভালো, ঠিক তখনই তোমার দেহটা উঠছে ভেসে। পাতুর দেহ ডাঙায় চিত ক'রে ফেলে পুরোনো খোলটা জুড়ে বসলে। মস্ত একটা হাঁপ ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ডাক দিলে, ওরে পাতু!

তখনই ওর দেহটা উঠল খাড়া হয়ে। পাতু বললে, ভায়া, সঙ্গে সঙ্গেই ছিলুম। মনটা অস্থির ছিল গাঁজার মোতাতে। ইচ্ছে করত, আত্মহত্যা করি, কিন্তু সে রাস্তাও তুমি জুড়ে বসেছিলে। বেঁচে যখন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার শখ ছিল যোলো আনা; যেমনি মরেছি অমনি আর যে কোনোমতেই কোনো কালেই মরতে পারব না, এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল। সামান্য একটা দড়ি নিয়ে গলায় ফাঁস লাগাব, এটুকু যোগ্যতাও রইল না।

তুমি বললে, যা হবার তা তো হল, এখন চলো আদালতে। জজসাহেবকে ব'লে তোমার গাঁজার বরাদ্দ করে দেব।

গেলে আদালতে। জজসাহেব পাতুকে ধমক দিয়ে বললে, এ বুড়ি তোমার স্বীকি না সত্যি ক'রে বলো।

পাতু বললে, হজুর, সত্যি ক'রে বলতে মন যায় না। কিন্তু ভদ্রলোকের ছেলে মিথ্যে ব'লে পাপ করব কেন। নিশ্চয় জানি যে, পাপের সঙ্গে সঙ্গে উনিই পিছন পিছন ছুটবেন। উনিই আমার প্রথম পক্ষের পরিবার।

সাহেব জিগেস করলেন, আরও আছে না কি।

পাতু বললে, না থাকলে মান রক্ষা হয় না যে। কুলীনের ছেলে। নৈকশ্যকুলীন।

রবিবার দিনে পুপুদিদি পড়েছে গল্পটা। আমাকে জিগেস করলে, আচ্ছা দাদামশায়, তুমি যে লিখেছ একরাশ ইংরেজি বই নিয়ে কোন্ কলেজের জন্তে বই লিখছ। তোমার আবার কলেজ কোথায়, তা ছাড়া কখনো তো দেখি নি ঐরকমের বই খুলতে। তুমি তো লেখ কেবল ছড়া।

স্পষ্ট জবাব না দিয়ে একটুখানি হাসলুম।

আচ্ছা দাদামশায়, তুমি কি সংস্কৃত জান।

দেখো পুপুদিদি, এরকম প্রশ্নগুলো বড়ো রুঢ়। মুখের সামনে জিগেস করতে নেই।

৯

সকালবেলায় পুপেদিদি উদ্ভিগ হয়ে প্রর করলে, দাদামশায় সে'কে নিয়ে সব গল্প কি ফুরিয়ে গেল।

দাদামশায় খবরের কাগজ ফেলে রেখে চশমা কপালে তুলে বললে, গল্প ফুরোয় না, গল্প-বলিয়ার দিন ফুরোয়।

আচ্ছা, ও তো গা ফিরিয়ে পেলে, তার পরে কী হল বলো-না।

আবার ওকে গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে প'ড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে। কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না। কখনো কাজে গা লাগবে, কখনো লাগবে না। ওর গা থাকা সঙ্গেও কুঁড়েমি দেখে লোকে বলবে, কিছুতে ওর গা নেই। কখনো গা ঘুরবে, কখনো গা কেমন করবে, গা ঘুলিয়ে যাবে। কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি-মাটি করবে, গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করবে, গা সিরসির করবে, গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া, কখনো হবে উল্টো। কারও কথায় গা জ্বলে যাবে, কারও কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বন্ধুবান্ধবের কথা শুনে গায়ে জ্বর আসবে। এত মুশকিল একখানা গা নিয়ে।

আচ্ছা, দাদামশায়, ও যখন আর-একজনের গা নিয়ে বেড়াত তখন মুশকিল হত কার। গা কেমন করলে ওর করত কি তার করত।

শব্দ কথা। আমি তো বলতে পারব না, ওকে জিগেস করলে ওরও মাথা ঘুরে যাবে।

দাদামশায়, গা নিয়ে এত হাঙ্গাম আমি কখনো ভাবিনি।

ঐ হাঙ্গামগুলো জোড়া দিয়েই তো যত গল্প। গানের উপর সওয়ার হয়ে গল্প ছুটেছে চার দিকে। কোনো গা গল্পের গাধা, কোনো গা গল্পের রাজহস্তী।

তোমার গা কী, দাদামশায়।

বলব না। অহংকার করতে বারণ করে শাস্ত্রে।

দাদামশায়, সে'র গল্প তুমি খামিয়ে দিলে কেন।

বলি তা হলে। কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইল্ল ব'সে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা। আমি তাঁর ভক্ত; কিন্তু তাঁর সভায় আজকাল ঢুকতেই পারি নে। আমার ভাগে গল্পের প্রসাদ অনেকদিন থেকে বন্ধ।

কেন।

পথ ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কী করে।

অমরাবতীর যে সুরধুনীনদীর এক পারে ইন্দ্রলোক, তারই ভাঁটিতে আছে আর-এক স্বর্গ। কারখানাঘরের কালো ধোঁয়ার পতাকা উড়ছে সেখানকার আকাশে। সেটা হল কাজের স্বর্গ। সেখানে হাফ্প্যান্ট-পরা দেবতা বিশ্বকর্মা। একদিন শরৎ-কালের সকালে পুজোর থালায় শিউলিফুল সাজিয়ে রাস্তায় চলেছি; ঘাড়ের উপর এসে পড়ল বাইক-চড়া এক পাণ্ডা। তার ঝুলিতে একতাড়া খাতা; বুকের পকেটে একটা লাল কালীর, একটা কালো কালীর ফাউন্টেনপেন। খবরের কাগজের কাটা টুকরোর বাণ্ডিল চায়না-কোটের দুই পকেট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে; ডান হাতের কজ্জিঘড়িতে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, বাঁ হাতে কলকাতা টাইম; ব্যাগে ই. আই. আর., ই. বি. আর., এ. বি. আর., এন. ডব্লু. আর., বি. এন. আর., বি. বি. আর., এস. আই. আর. এর টাইম-টেবিল। বুকের পকেটে নোটবই ডায়রি-স্বচ্ছ। খাতা খেয়ে মুখ খুবড়িয়ে পড়ি আর-কি। সে বললে, আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছ কোন্ চুলোয়।

আমি বললুম, রাগ কোরো না, পাণ্ডাজি। মন্দিরে পুজো দিতে যাব, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি নে।

সে বললে, তোমরা বুঝি মেঘের-দিকে-ই-ক'রে-তাকানো রাস্তা-খোঁজার দল! চলো, পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

আমাকে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে এল বিশ্বকর্মাঠাকুরের মন্দিরে। ই-না করবার সময় দিলে না। কিছু জিগেস করবার আগেই বললে, রাখো এইখানে থালা, পকেট থেকে বের করো পাঁচ-সিকে দক্ষিণে।

বোকার মতো পুজো দিলেম। তখনই হিসেব সে টুকে নিলে তার নোটবইয়ে। কজ্জিঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, হয়েছে কাজ, এখন বেরোও। সময় নেই।

পরদিন থেকেই দেখি ফল ফলেছে। ভোর তখন সাড়ে চারটে। ডাকাত পড়েছে ভেবে ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে ঘুম ভেঙে শুনি, অনাথতারিণী সভার সভোরা যারো-তেরো বছরের পঁচিশটা ছেলে জুটিয়ে দরজায় এসে চীৎকার করে গান জুড়ে দিয়েছে—

যত পেটে ধরে তার চেয়ে ভর' পেটে,

টাকাপয়সায় পকেট পড়ছে কেটে—

হিসেব খতিয়ে দেখলে বুঝতে পার'

অনাথজনের কত ধার তুমি ধার'।



তারো, পরিবেরে তারো,
তারো, তারো, তারো।

‘তারো তারো’ করতে করতে ভীষণ চাঁচি পড়তে লাগল খোলে। মনে মনে বড়
খতিয়ে দেখছি তহবিলে কত টাকা বাকি, চাঁচি ততই কানে ভালা ধরিয়ে দিলে। সঙ্গে
সঙ্গে বাজল কঁাসর; ‘তারো তারো তারো’ ক’রে নাচ জুড়ে দিলে ছেলেগুলো। অসহ

হয়ে এল। দেবাজ খুলে থলিটা বের করলেন। সাত দিনের না-কামানো-দাড়ি-ওয়ালা ওদের সর্দার উৎসাহিত হয়ে চাদর পেতে ধরলে। থলি ঝাড়তে বেরোল এক টাকা, ন আনা, তিন পয়সা। মাসের দু দিন বাকি, দজির দেনার জম্মে টানাটানি করে ঐটুকু রেখেছিলেন।

গান ছেড়ে গাল শুক করলে। বললে, অগাধ টাকা, চিরটা দিন পায়ের উপর পা দিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে আছ; ভুলেছ, যেদিন মরবে সেদিন তোমার মতো লক্ষপতির যে দর আর আমাদের ছেঁড়া-টানা-পরা ভিখিরিরও সেই দর।

এ কথাগুলো পুরোনো ঠেকল, কিন্তু ঐ লক্ষপতি বিশেষণটাতে শরীর রোমাঙ্কিত হয়ে উঠল।

এই হল শুরু। তার পরে ইতিমধ্যে পঁচিশটা সভার সভ্য হয়েছি। বাংলাদেশে সরকারি সভাপতি হয়ে দাঁড়ালেম। আদি ভারতীয় সংগীতসভা, কচুরিপানা-ধ্বংসন সভা, মৃতসংকার সভা, সাহিত্যশোধন সভা, তিন চণ্ডীদাসের সমন্বয় সভা, ইকুছিবড়ের পণ্যপরিণতি সভা, খজানে খনার লুপ্তভিটা-সংস্কার সভা, পিঁজরাপোলের উন্নতিসাধনী সভা, ক্ষৌরব্যঘনিবারিণী-দাড়ি-গোফ-রক্ষণী সভা— ইত্যাদি সভার বিশিষ্ট সভ্য হয়েছি। অমরোখ আসছে, ধনুষ্ঠকারতর বইখানির ভূমিকা লিখতে, নব্যগণিতপাঠের অভিমত দিতে, ভুবনভাণ্ডার ভবভূতির জন্মস্থাননির্ণয় পুস্তিকার গ্রন্থকারকে আশীর্বাদ পাঠাতে, রাওলপিণ্ডির ফরেষ্ট অফিসারের কন্টার নামকরণ করতে, দাড়িকামানো সাবানের প্রশংসা জানাতে, পাগলামির ওষুধ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা প্রচার করতে।

দাদামশায়, মিছিমিছি তুমি এত বেশি বক যে তোমার সময় নেই বললে কেউ বিশ্বাস করে না। আজ তোমাকে বলতেই হবে, গা কিরে পেয়ে কী করলে সে।

বিষম খুশি হয়ে চলে গেল দমদমে।

দমদমে কেন।

অনেক দিন পরে নিজের কান দুটো ফিরে পেয়ে স্বকর্ণে আওয়াজ পোনবার শব্দ ওর কিছুতে মিটতে চায় না। শ্রামবাক্যারের মোড়ে কান পেতে থাকে ইয়ামের বাসের ঘড়ঘড়ানিতে। টিটেগড়ের চটকলের দারোয়ানের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছে, তার ঘরে বসে কলের গর্জন শুনে ওর চোখ বুজে আসে। ঠোড়ায় করে রসগোল্লা আর আলুর দম নিয়ে বার্ন কোম্পানির কামারের দোকানে বসে খেতে যায়। বন্ধুকের তাক অভ্যাস করতে গোরা ফৌজ গেছে দমদমে, ও তারই ধুম ধুম শব্দ শুনছিল আরামে, টার্গেটের ও পারে বসে। আনন্দে আর থাকতে পারলে না, টার্গেটের এ ধারে মুখ

বাড়িরে দেখতে এসেছে, লাগল একটা গুলি ওর মাথায়।— বাস্ ।

বাস্ কী, দাদামশায় ।

বাস্ মানে সব গল্প গেল একদম ফুরিয়ে ।

না, না, সে হতেই পারে না । আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ । এমন ক'রে তো সব গল্পই ফুরোতে পারে ।

ফুরোয় তো বটেই ।

না, সে হবে না কিছুতেই । তার পরে কী হল বলো ।

বল কী— মরার পরেও ?

হ্যাঁ, মরার পরে ।

তুমি গল্পের সাবিত্রী হয়ে উঠলে দেখছি ।

না, এমন ক'রে আমাকে ভোলাতে পারবে না, বলো কী হল ।

আচ্ছা, বেশ । লোকে বলে মরার বাড়া গাল নেই । মরার বাড়াও গাল আছে, সেই কথাটা বলি তবে । ফৌজের ডাক্তার ছিল তাঁবুতে, মস্ত ডাক্তার সে । সে যখন খবর পেলে মাহুঘটা মগজে গুলি লেগে মরেছে, বিষম খুশি হয়ে লাফ দিয়ে চेंচিয়ে উঠল— ছব্বা ।

খুশি হল কেন ।

ও বললে, এইবার মগজ বদল করার পরীক্ষা হবে ।

মগজ বদল হবে কী ক'রে ।

বিজ্ঞানের বাহাদুরি । জু থেকে চেয়ে নিলে একটা বনমাহুঘ । বের করলে তার মগজ । আর, সে'র মাথার খুলি খুলে ফেললে । তার মধ্যে বাদরের মগজ পুরে দিয়ে খড়ির পলেন্ডারা দিয়ে মাথাটা বেঁধে রাখলে পনেরো দিন । খুলি জুড়ে গেল । বিছানা ছেড়ে সে যখন উঠল, তখন সে এক বিষম কাণ্ড । যাকে দেখে তার দিকে দাঁত খঁচিয়ে কিচিমিচি করে ওঠে । নস্ দিলে দোড় । ডাক্তারসাহেব বজ্রমুঠিতে ওর দুই হাত চেপে ধরে জোর গলায় বললেন, স্থির হয়ে বোসো এইখানে । ও হুকারটা বুঝলে, কিন্তু ভাষাটা বুঝলে না । ও চৌকিতে বসতে চায় না, ও লাফ দিয়ে উঠে বসতে চায় টেবিলের উপরে । কিন্তু, লাফ দিতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায় মেজের উপর । মরজাটা খোলা ছিল, বাইরে ছিল একটা অশখগাছ । সবার হাত এড়িয়ে ছুটল সেই গাছের দিকে । ভাবলে, এক লাফে চড়তে পারবে ডালে । বারবার লাফ দিতে থাকে অথচ ডালে পৌঁছতে পারে না, ধপ্ ক'রে পড়ে যায় । বুঝতেই পারে না, কেন পারছে না । যেনে যেনে ওঠে । ওর লক্ষ্য দেখে চার দিকে মেডিকেল

কলেজের ছেলেরা হো-হো করে হাসতে থাকে। ও দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে যায়। একজন ফিরিঙ্গি ছেলে গাছতলায় পা ছড়িয়ে বসে কোলে কুমাল পেতে কুটি মাখন দিয়ে কলা দিয়ে আরামে খাচ্ছিল, ও হঠাৎ গিয়ে তার কলা ছিনিয়ে নিয়ে দিলে মুখে পুরে; ছেলেটা রেগে ওকে মারতে যায়, বন্ধুদের হাসি কিছুতে থামতে চায় না।

মহা ভাবনা পড়ে গেল ওর জিম্মে নেবে কে। কেউ বললে পাঠাও জু'তে, কেউ বললে অনাথ-আশ্রমে। জু'র কর্তা বললে, এখানে গাছপোষা আমাদের বরাদ্দে নেই। অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ বললে, এখানে বাদর পোষা আমাদের নিয়মে কুলোবে না।

দাদামশায়, থামলে কেন।

দিদিমণি, জগতের সব-কিছুর সব-শেষে আছে থানা।

না, এ কিন্তু এখনও থামে নি। কলা ছিনিয়ে খাওয়া ও তো যে-সে পারে।

আচ্ছা, কাল হবে, আজ কাজ আছে।

কাল কী হবে বলো-না, অন্ন একটুখানি।

জান তো ওর বিয়ের সম্বন্ধ আগেই হয়েছে? ওর যে মগজ বদল হয়ে গেছে সে খবরটা কনের বাড়িতে পৌছয় নি। দিন স্থির, লগ্ন স্থির। বরের পিসে ওকে মস্ত দু'ছড়া কলা খাইয়ে ঠাণ্ডা করে বিয়ের জায়গায় নিয়ে গেছেন। তার পরে বিয়ে-বাড়িতে যে কাণ্ডটা হল তা ভালো করে ফলিয়ে বললে তখন তুমিই বলবে, গল্পের মতো গল্প হয়েছে। এর পরে আর ওকে মেরে ফেলবার দরকার হবে না। সে মরার বাড় হবে।

সন্ধ্যাবেলায় বসেছি ছাদে। দিবা দক্ষিণের হাওয়া দিচ্ছে। শুক্লা চতুর্গীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। পুপুদিদি একটি আকন্দের মালা গঁথে এনেছে কাঁচপাত্রে, গল্প বলা শেষ হলে বক্শিশ মিলবে।

হেনকালে হাঁপাতে হাঁপাতে সে উপস্থিত। বললে, আজ থেকে আমার গল্প-জোগানের কাজে আমি ইস্তফা দিলুম। আমাকে পাত্ত গঁজেলের গা পরিষেছিলে, সেও সহ্য করেছি। শেষকালে বাদরের মগজ পুরেছ আমার খুলির মধ্যে, এ সহ্যবে না। এর পরে হয়তো আমাকে চাম্‌চিকে কি টিক্‌টিকি কি গুব্বের পোকা বানিয়ে দেবে। তোমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আজ আপিসে গিয়ে কেদারা টেনে বসেছি। দেখি

ডেস্কের উপরে এক ছড়া মর্তমান কলা। সহস্র অবস্থায় কলা আমি ভালোই বাসি, কিন্তু এখন থেকে আমাকে কলা খাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। পুপুদিদি, এর পরে তোমার ঐ দাদামশায় আমাকে নিয়ে যদি ব্রহ্মদত্তি কিম্বা বন্ধুকাটা বানান, তা হলে কাগজে না ছাপান যেন। ইতিমধ্যে কল্যাকর্তা এসেছিলেন আমার ঘরে। বিয়েতে আশি ভরি সোনা দেবার কথা পাকা ছিল; একদম নেমে গেছে তেরো ভরিতে। ওরা বুঝেছে, আমার ভাগ্যে এর পরে কনে ছোট্টা দায় হবে। এই তবে বিদায় নিলেন।

১০

সন্ধ্যাবেলায় বসে আছি দক্ষিণদিকের চাতালে। সামনে কতকগুলো পুরোনো কালের প্রবীণ শিরীষগাছ আকাশের তারা আড়াল ক'রে জ্বোনাকির আলো দিয়ে যেন একশোটা চোখ টিপে ইশারা করছে।

পুপেদি'কে বললেন, বুদ্ধি তোমার অত্যন্ত পেকে উঠছে, তাই মনে করছি আজ তোমাকে স্বরণ করিয়ে দেব, একদিন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে।

দিদি হেসে উঠে বললে, ঐখানে তোমার জিত। তুমিও এক কালে ছেলেমানুষ ছিলে, সে কথা স্বরণ করিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে নেই।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, বোধ হয় আজকের দিনে কারও হাতেই নেই। আমিও শিশু ছিলাম, তার একমাত্র সাক্ষী আছে ঐ আকাশের তারা। আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি তোমার একদিনকার ছেলেমানুষির কথা বলব। তোমার ভালো লাগবে কি না জানি নে, আমার মিষ্টি লাগবে।

আচ্ছা, ব'লে যাও।

বোধ হচ্ছে, ফাল্গুন মাস পড়েছে। তার আগেই ক'দিন ধরে রান্নামণের গল্প শুনেছিলে সেই চিক্চিকে-টাক-ওয়ালা কিশোরী চট্টোর কাছে। আমি সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছি, তুমি এতখানি চোখ ক'রে এসে উপস্থিত। আমি বললেম, হয়েছে কী।

ইপাতে ইপাতে বললে, আমাকে হরণ ক'রে নিয়েছে।

কী সর্বনাশ। কে এমন কাজ করলে।

এ প্রশ্নর উত্তরটা তখনও তোমার মাথায় তৈরি হয় নি। বলতে পারতে রাবণ, কিন্তু কথাটা সত্য হ'ত না ব'লে তোমার সংকোচ ছিল। কেননা, আগের সন্ধ্যাবেলাতেই

রাবণ যুদ্ধে মারা গিয়েছে, তার একটা মূণ্ডও বাকি ছিল না। উপায় না দেখে একটু থমকে গিয়ে তুমি বললে, সে আমাকে বলতে বারণ করেছে।

তবেই তো বিপদ বাধালে। তোমাকে এখন উদ্ধার করা যায় কী করে। কোন্ দিক দিয়ে নিয়ে গেল।

সে একটা নতুন দেশ।

খান্দেশ নয় তো ?

না।

বুন্দেলখণ্ড নয় ?

না।

কী রকমের দেশ।

নদী আছে, পাহাড় আছে, বড়ো বড়ো গাছ আছে। খানিকটা আলো, খানিকটা অন্ধকার।

সে তো অনেক দেশেই আছে। রাক্ষস-গোছের কিছু রেখতে পেয়েছিলে ? জিব-বের-করা কাঁটাওয়াল ?

হাঁ হাঁ, সে একবার জিব মেলেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

বড়ো তো ফাঁকি দিলে, নইলে ধরতুম তার ঝুঁটি। যাই হোক, একটা কিছুতে করে তো তোমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রখে ?

না।

ঘোড়ায় ?

না।

হাতিতে ?

ফন্ ক'রে ব'লে ফেললে, পরগোষে। ঐ জন্তুর কথা খুব মনে জাগছে ; জন্মদিনে পেয়েছিলে একছোড়া বাবার কাছ থেকে।

আমি বললেম, তবেই তো চোর কে তা জানা গেল।

টিপিটিপি হেসে তুমি বললে, কে বলো তো।

এ নিঃসন্দেহ চাদামামার কাজ।

কী করে জানলে।

তারও যে অনেক কালের বাস্তবিক পরগোষ পোষা।

কোথায় পেয়েছিল পরগোষ।

তোমার বাবা দেয় নি।



তবে কে দিয়েছিল ।

ও চুরি করেছিল অন্ধার চিড়িয়াখানায় ঢুকে ।

ছিঃ ।

ছিঃই তো । তাই ওর গায়ে কলক লেগেছে, দাগা দিয়েছেন অন্ধা ।

বেশ হয়েছে ।

কিন্তু শিক্ষা হল কই । আবার তো তোমাকে চুরি করলে । বোধ হয় তোমার



হাত দিয়ে ওর থরগোষকে ফুলকপির পাতা খাওয়াবে ।

খুশি হলে শুনে । আমার বুদ্ধির পরখ করবার জন্তে বললে, আচ্ছা, বলো দেখি,
থরগোষ কী ক'রে আমাকে পিঠে ক'রে নিলে ।

নিশ্চয় তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ।

ঘুমলে কি মানুষ হাঙ্গা হয়ে যায় ।

হয় বই-কি । তুমি ঘুমিয়ে কখনো ওড় নি ?

হাঁ, উড়েছি তো।

তবে আর শক্তটা কী। খরগোষ তো সহজ, ইচ্ছে করলে কোলা ব্যাণ্ডের পিঠে চড়িয়ে তোমাকে মাঠময় ব্যাঙ-দৌড় করিয়ে বেড়াতে পারত।

ব্যাঙ। ছী ছি ছি! শুনলেও গা কেমন করে।

না, ভয় নেই— ব্যাণ্ডের উৎপাত নেই চাঁদের দেশে। একটা কথা জিগেস করি, পথের ব্যাঙ্কমাদাদার সঙ্গে তোমার দেখা হয় নি কি।

হাঁ, হয়েছিল বই-কি।

কিরকম।

ঝাউগাছের উপর থেকে নীচে এসে ঝাড়া হয়ে দাঁড়ালো। বললে, পুপেদিদিকে কে চুরি করে নিয়ে যায়। শুনে খরগোষ এমন দৌড় দৌড়ল যে ব্যাঙ্কমাদাদা পারল না তাকে ধরতে।— আচ্ছা, তার পরে?

কার পরে।

খরগোষ তো নিয়ে গেল, তার পরে কী হল বলো-না।

আমি কী বলব। তোমাকেই তো বলতে হবে।

বাবু, আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কেমন করে জানব।

সেই তো মুশকিল হয়েছে। ঠিকানাই পাচ্ছি নে কোথায় তোমাকে নিয়ে গেল। উদ্ধার করতে যাও কোন্ রাস্তায়। একটা কথা জিগেস করি, যখন রাস্তা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিলে কি।

হাঁ হাঁ, পাচ্ছিলুম ঢঙ ঢঙ ঢঙ।

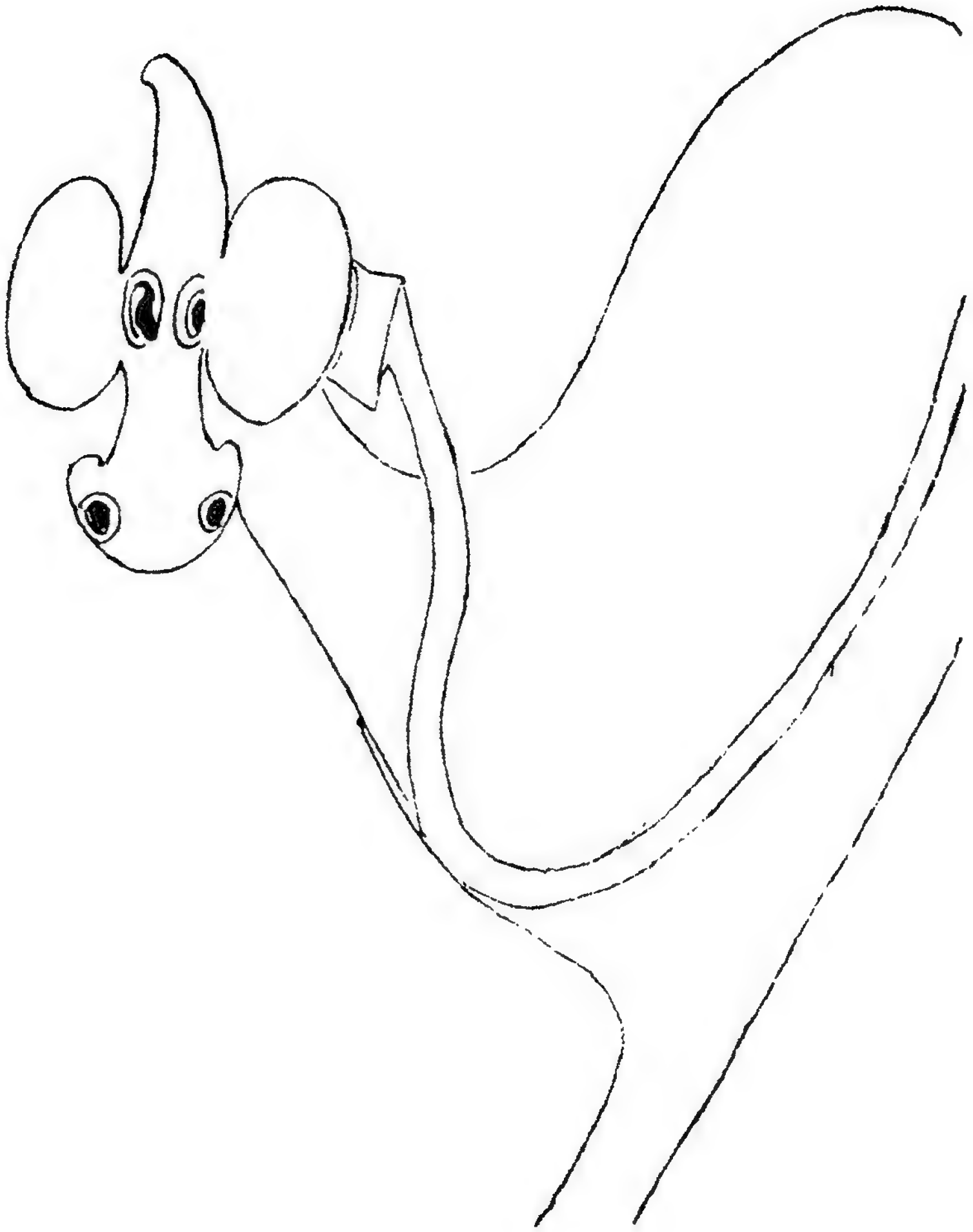
তা হলে রাস্তাটা সোজা গেছে ঘণ্টাকর্ণের পাড়া দিয়ে।

ঘণ্টাকর্ণ! তারা কিরকম।

তাদের দুটো কান দুটো ঘণ্টা। আর, দুটো লেজ দুটো হাতুড়ি। লেজের ঝাপটা দিয়ে একবার এ কানে বাজায় ঢঙ, একবার ও কানে বাজায় ঢঙ। দু জাতের ঘণ্টাকর্ণ আছে, একটা আছে হিংস্র, কানরের মতো খন্খন্ আওয়াজ দেয়; আর-একটার গম্গম্ গম্ভীর শব্দ।

তুমি কখনো তার শব্দ শুনতে পাও, দাদামশায়?

পাই বই-কি। এই, কাল রাত্তিরেই বই পড়তে পড়তে হঠাৎ শুনলেম ঘণ্টাকর্ণ চলেছেন ঘোর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে। বারোটা বাজালেন যখন তখন আর থাকতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি বই ফেলে দিয়ে চমকে উঠে দৌড় দিলুম বিছানার, বালিশের মতো মুগ শুঁজে চোখ বুজে রইলুম পড়ে।



শরগোষের সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণের ভাব আছে ?

খুব ভাব। শরগোষটা তারই আঙুলের দিকে কান পেতে চলতে থাকে
সপ্তষিপাড়ার ছায়াপথ দিয়ে।

তার পরে ?

তার পরে যখন একটা বাজে, দুটো বাজে, তিনটে বাজে, চারটে বাজে, পাঁচটা
বাজে, তখন রাস্তা শেষ হয়ে যায়।

তার পরে ?

তার পরে পৌছয় তল্লা-তেপাস্করের ও পারে আলোর দেশে। আর দেখা যায় না।

আমি কি পৌঁচেছি সেই দেশে ।

নিশ্চয় পৌঁচেছ ।

এখন তা হলে আমি পরগোষের পিঠে নেই ?

থাকলে যে তার পিঠ ভেঙে যেত ।

ওঃ, ভুলে গেছি, এখন যে আমি ভারী হয়েছি । তার পরে ?

তার পরে তোমাকে উদ্ধার করা চাই তো ।

নিশ্চয় চাই । কেমন করে করবে ।

সেই কথাটাই তো ভাবছি । রাজপুত্রের শরণ নিতে হল দেখছি ।

কোথায় পাবে ।

ঐ-যে তোমাদের স্কুয়ার ।

তুনে এক মুহূর্তে তোমার নুগ গম্ভীর হয়ে উঠল । একটু কঠিন সুরেই বললে, তুমি তাকে খুব ভালোবাস । তোমার কাছে সে পড়া ব'লে নিতে আসে । তাই তো সে আমাদের সঙ্গে এগিয়ে যায় ।

এগিয়ে দাবার অন্য স্বাভাবিক কারণও আছে । সে কথাটার আলোচনা করলুম না । বললুম, তা, তাকে ভালোবাসি আর না বাসি, সেই আছে এক রাজপুত্র ।

কেমন করে জানলে ।

আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করে তবে সে ঐ পদটা পাকা করে নিয়েছে ।

তুমি বেশ একটু ভুরু কঁচকে বললে, তোমারই সঙ্গে এর যত বোঝাপড়া !

কী করি বলো, কোনোমতে ও মানতে চায় না— এর চেয়ে আমি বয়সে খুব বেশি বড়ো ।

ওকে তুমি বল রাজপুত্র ! ওকে আমি জটায়ুপাখি বলেও মনে করি নে । ভারি তো !

একটু শাস্ত হও, এখন গোর বিপদে পড়া গেছে ! তুমি কোথায় তার তো ঠিকানাই নেই । তা, এবারকার মতো কাজ উদ্ধার করে দিক, আমরা নিশ্চয় ফেলে বাচি । এর পরে ওকে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালি বানিয়ে দেব ।

উদ্ধার করতে ও রাজি হবে কেন । ওর একজামিনের পড়া আছে ।

রাজি হবার বারো-আনা আশা আছে । এই পবুশ শনিবারে ওদের ওখানে গিয়েছিলুম । বেলা তিনটে । সেই রোদ্দুরে যাকে ফাঁকি দিয়ে ও দেখি ঘুরে বেড়াচ্ছে

বাড়ির ছাদে । আমি বললুম, ব্যাপার কী ।

ঝাঁকানি দিয়ে মাথাটা উপরে তুলে বললে, আমি রাজপুত্র ।

তলোয়ার কোথায় ।

দেয়ালির রাত্রে ওদের ছাদে আধপোড়া তুবড়িবাঞ্জির একটা কাঠি পড়েছিল, কোমরে সেইটেকে ফিতে দিয়ে বেঁধেছে ! আমাকে দেখিয়ে দিলে ।

আমি বললুম, তলোয়ার বটে । কিন্তু, ঘোড়া চাই তো ?

বললে, আস্তাবলে আছে ।

ব'লে ছাদের কোণ থেকে ওর জ্যাঠামশায়ের বহুকৈলে বেহায়া একটা ছেঁড়া ছাতা টেনে নিয়ে এল । দুই পায়ের মধ্যে তাকে চেপে ধরে হাট্‌হাট্‌ আঘাত করতে করতে ছাদময় একবার দৌড় করিয়ে আনলে । আমি বললুম, ঘোড়া বটে !

এর পক্ষীরাজের চেহারা দেখতে চাও ?

চাই বই-কি ।

ছাতাটা ফন্‌ করে খুলে দিলে । ছাতার পেটের মধ্যে ঘোড়ার খাবার দানা ছিল, সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল ছাদে ।

আমি বললুম, আশ্চর্য ! কী আশ্চর্য ! এ জন্যে পক্ষীরাজ দেগব, কোনোদিন এমন আশাই করি নি ।

এইবার আমি উড়ছি, দাদা । চোখ বুজে থাকো, তা হলে বুঝতে পারবে, আমি ঐ মেঘের কাছে গিয়ে ঠেকেছি । একেবারে অন্ধকার !

চোখ বোজবার দরকার করে না আমার । স্পষ্টই জানতে পারছি, তুমি খুব উড়ছ, পক্ষীরাজের ডানা মেঘের মধ্যে হারিয়ে গেছে ।

আজ্ঞা, দাদামশায়, আমার ঘোড়াটার একটা নাম দিয়ে নাও তো ।

আমি বললুম, ছত্রপতি ।

নামটা পছন্দ হল । রাজপুত্র ছাতার পিঠ চাপড়িয়ে বললে, ছত্রপতি !

নিচ্ছেই ঘোড়ার হয়ে তার জবাব দিলে, আজ্ঞে !

আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুমি ভাবছ, আমি বললুম । আজ্ঞে, তা নয়, ঘোড়া বললে ।

সে কথাও কি আমাকে বলতে হবে । আমি কি এত কালা ।

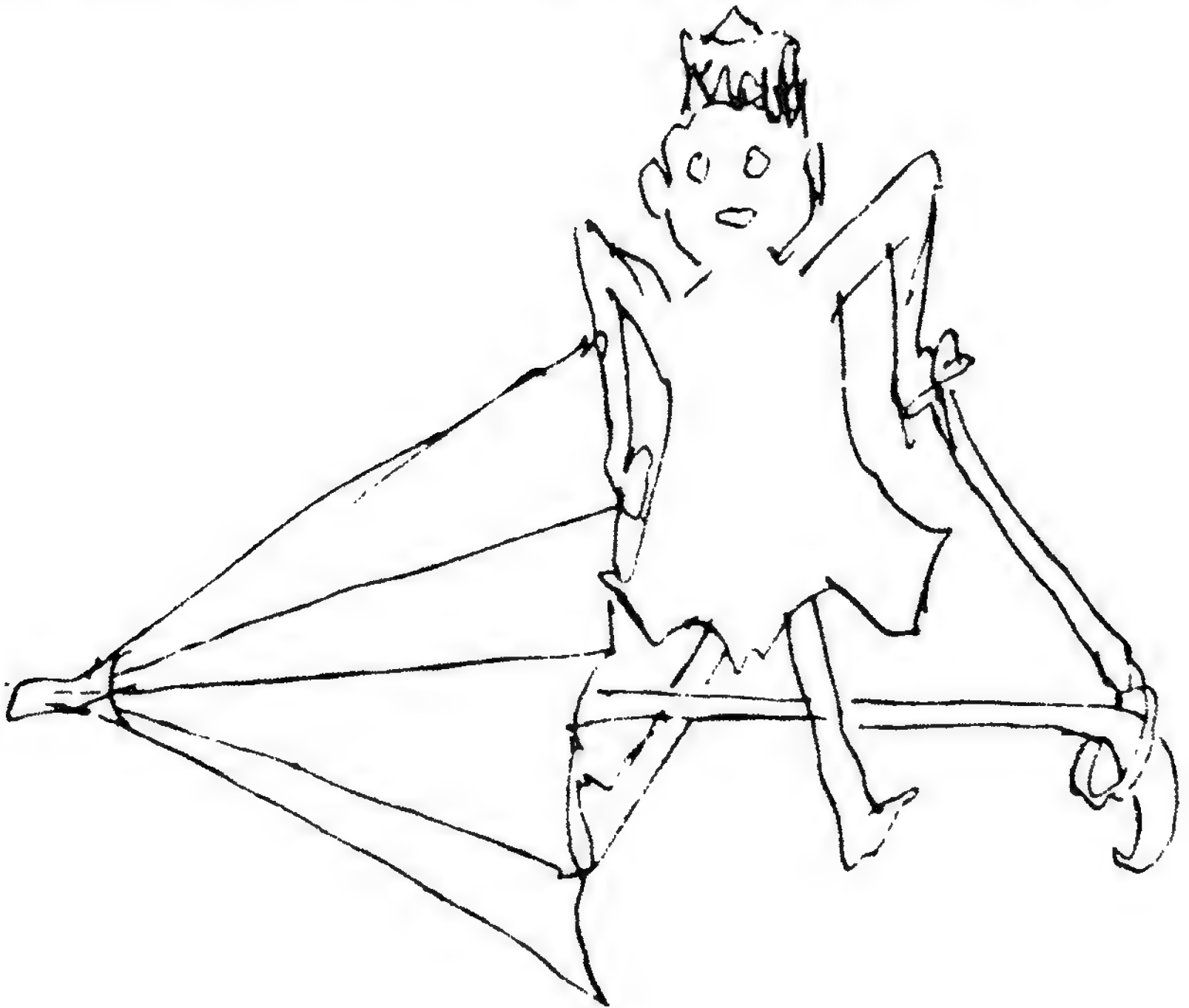
রাজপুত্র বললে, ছত্রপতি, আর ভালো লাগছে না চূপচাপ পড়ে থাকতে ।

তারই মুখ থেকে উত্তর পাওয়া গেল, কী হকুম বলো ।

তেপান্তরের মাঠ পেরোনো চাই ।

রাজি আছি।

আমি তো আর থাকতে পারি নে, কাজ আছে ; রসে ভঙ্গ দিয়ে বলতে হল, রাজ-পুত্র, কিন্তু তোমার মাস্টার যে বসে আছে। দেখে এলুম, তার মেজাজটা চটা।



তুনে রাজপুত্রের মনটা ছট্‌কট্‌ করে উঠল। ছাতাটাকে খাবড়া মেরে বললে, এখনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পার না কি।

বেচারি ঘোড়ার হয়ে আমাকেই বলতে হল, রাস্তির না হলে ও তো উড়তে পারে না। দিনের বেলায় ও ক্রাকামি ক'রে ছাতা সাড়ে ; তুমি ঘুমোলেই ও ডানা মেলবে। এখনকার মতো পড়তে দাও, নইলে বিপদ বাধবে।

স্বকুমার মাস্টারের কাছে পড়তে গেল। যাবার সময় আমাকে বললে, কিন্তু সব কথা এখনো শেষ হয় নি।

আমি বললুম, কথা কি কখনোই শেষ হতে পারে। শেষ হলে মজা কিসের।

পাঁচটার সময় পড়া শেষ হয়ে যাবে। দাছ, তখন তুমি এসো।

আমি বললুম, খর্ডনদর রীডরের পরে মুখ বদলাবার জন্তে পয়লা নদরের গল্প চাই। নিশ্চয় আসব।

১১

মাস্টারমশায়কে দেখলুম গলির মোড়ে, ট্রামের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যখন গেলুম স্বকুমারদের বাড়ির ছাদে, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সামনের তেতালি বাড়িটাতে পড়তি বেলাকার রোন্ডের আড়াল করেছে। গিয়ে দেখি, চিলে কোঠার সামনে স্বকুমার চুপ করে বসে। ছাদের কোণটাতে বিশ্রাম করছে তার ছত্রপতি। পিছন দিকের সিঁড়ি দিবে যখন উপরে উঠে এলুম, তখনো আমার পায়ের শব্দ ওর কানে পৌঁছল না। খানিক বাদে ডাক দিলুম, রাজপুত্র।

ওর যেন স্বপ্ন গেল ভেঙে, চমকে উঠল।

জিগেস করলুম, বসে কী ভাবছ ভাই।

ও বললে, শুকসারীর কথা শুনছি।

শুকসারীর দেখা পেলে কোথায়।

ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে বন। ডালে ডালে ফুল ছড়িছড়ি— হলুদে, লাল, নীল, যেন সন্ধ্যাবেলাকার মেঘের মতো। তারই ভিতর থেকে শুকসারীর গলা শোনা যাচ্ছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছ তো?

ই, পাচ্ছি। খানিকটা দেখা যায়, খানিকটা ঢাকা।

তা, কী বলছে ওরা।

এইবার মুশকিলে পড়ল আমাদের রাজপুত্র। খানিকটা আমতা আমতা করে বললে, তুমিই বলো-না, দাদা, ওরা কী বলছে।

ঐ তো পষ্ট শোনা যাচ্ছে, ওরা তর্ক করছে।

কিসের তর্ক।

শুক বলছে, আমি এবার উড়ব। সারী বলছে, কোথায় উড়বে। শুক বলছে, যেখানে কোথাও ব'লে কিছুই নেই, কেবল শুড়াই আছে; তুমিও চলো আমার সঙ্গে। সারী বললে, আমি ভালোবাসি এই বনকে; এখানে ডালে জড়িয়ে উঠেছে কুমকো লতা, এখানে ফল আছে বটের, এখানে শিমুলের ফুল যখন ফোটে তখন কাকের সঙ্গে ঝগড়া করে ভালো লাগে তার মধু খেতে; এখানে রাস্তিরে জোনাকিতে ছেয়ে যায় ঐ কামরাঙার ঘোপ, আর বাদলায় বৃষ্টি বপন করতে থাকে তখন ছলতে থাকে নারকেলের ডাল ঝরঝর শব্দ করে— আর, তোনার আকাশে কীই বা আছে। শুক

বললে, আমার আকাশে আছে সকাল, আছে সন্ধ্যা, আছে মানসরাত্তর তারা,
আছে দক্ষিণে হাওয়ার ষাওয়া আসা, আর আছে কিছুই না—কিছুই না—
কিছুই না।

স্বকুমার জিগেস করলে, কিছুই-না থাকে কী ক'রে, দাদু।

সেই কথাই তো এইমাত্র সারী জিগেস করলে শুককে।

শুক কী বলছে।

শুক বলছে, আকাশের সব চেয়ে অমূল্যধন ঐ কিছুই-না। ঐ কিছুই-না আমাকে
ডাক দেয় ভোরের বেলায়। ওরই ভুলে আমার মন কেমন করে যখন বনের মধ্যে
বাসা বাসি। ঐ কিছুই-না কেবল খেলা করে রঙের খেলা নীল আঙিনায়; মাঘের
শেষে আমার বোলের নিমন্ত্রণ-চিঠিগুলি ঐ কিছুই-না'র শুড়না বেয়ে হুহ করে উড়ে
আসে, মৌমাছির গবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

উৎসাহে শুকুমার লাক দিখে দাঁড়িয়ে উঠল; বললে, আমার পক্ষীরাজকে ঐ
কিছুই-না'র দাস্তা দিচ্ছেই তো চালাতে হবে।

নিশ্চয়ই। পুপুদিসির হরনব্যাপারটা আগাগোড়াই ঐ কিছুই-না'র তেপান্তরে।

স্বকুমার হাত মুঠো ক'রে বললে, সেইখান দিচ্ছেই আমি তাকে ফিরিয়ে আনব,
নিশ্চয় আনব।

দুহাতে পারছ তেঁ, পুপুদিসি?—রাজপুত্র তৈরিই আছে, তোমাকে উদ্ধার
করতে দেবি হবে না। এতক্ষণে ছানের উপরে তার ঘোড়াটা একবার পাখা খুলছে,
আবার বন্ধ করছে।

তুমি খুব ব্যস্তিয়ে উঠে বললে, দরকার নেই।

বল কী, এত বড়ো বিপদ থেকে তোমার উদ্ধার হল না, আর আমরা নিশ্চিন্ত
থাকব?

হয়ে গেছে উদ্ধার।

কখন হল।

শুনলে না? একটু আগেই ঘণ্টাকণ এসে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

কখন ঘটল এটা।

ঐ-যে, ঢঙ ঢঙ ক'রে দিলে নটা বাজিয়ে।

কোন্ জাতের ঘণ্টাকণ।



হিংস্র জাতের। এমন ইস্কুলে যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিচ্ছিরি লেগেছে
আঙুরাঙ্গটা।

গল্পটা অকালে গেল ভেঙে। দুস্রা রাজপুত্র খুঁজে বের করা উচিত ছিল। এ তো
অন্ধের হরণ পূরণ নয়—ওরকম ক্লাস-পেরোনো ছেলে তেপান্তর পেরোবার স্পর্ধা
করবে, এ তুমি কিছুতেই সহিতে পারলে না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলুম,

লাখখানেক ঝাঁঝিঁ-পোকা আমদানি করব আমাদের পানাপুকুরের ধারের স্কাণ্ডাবন থেকে। তারা চাঁদামামার নিদমহলের পশ্চিম দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ঢুকে সবাই মিলে তোমার বিছানার চাদরটাতে দিত টান স্ফুস্ফু ক'রে। তার উপরে তোমাকে নামিয়ে আনত। তাদের ঝাঁঝিঁ ঝাঁঝিঁ শব্দে চাঁদনি-চকে ঝিমিয়ে পড়ত চাঁদের পাহারাওয়াল। সমস্ত রাস্তায় বাঘনা দিয়ে রেখেছিলুম জোনাকির আলোধারীর দলকে। বাঁশতলার বাঁকা গলি দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলত, থস্ থস্ শব্দ করত নরে-পড়া শুকনো পাতাগুলো। ঝর্ঝর্ঝ করতে থাকত নারকেলের ডাল। গন্ধে-ভুর-ভুর শর্ষেখেতের আল বেয়ে যখন এসে পড়তে তিরপুন্নির ঘাটে তখন ধামা-ভরা বিম্বিপানের খই নিয়ে ডাক দিভুম গঙ্গামাঘের শুঁড়তোলা মকরকে, তোমাকে চড়িয়ে দিতেম তার পিঠে। ডাইনে বাঁয়ে তার লেজের ঠেলায় ডল উঠত কন্দলিয়ে। তিন পহর রাতে শেয়ালগুলো ডাঙায় দাঁড়িয়ে জিগেস করত, ক্যা হ্যা, ক্যা হ্যা! আমি বলতুম, চুপ রও, কুছ নেই হ্যা। এই যাত্রাপথে পেঁচা আর বাহুড়ের সঙ্গেও কিছু আপোমে বন্দোবস্তের কথা ছিল। তাদের কাছে লাগাতুম। ভোর সাড়ে চারটের সময় শুকতারা নেমে পড়ত পশ্চিম-আকাশে, পূর্ব-আকাশে আলোর রেখায় দেখা দিত সকালবেলার তর্জনীতে সোনার আংটি থেকে ঠিকরে-পড়া সংকেত। সন্ধ্যা-ফেগে-ওটা কাক তেঁতুলের ডালে বসে অস্থির হয়ে প্রশ্ন করত, কা-কা? আমি যেমনি বলতুম 'কিছু না', অমনি দেখতে দেখতে সব যেত মিলিয়ে—তুমি জেগে উঠতে তোমার বিছানায়।

পুপুদিদি একটুখানি হেসে বললে, এই-যে আমার ছেলেমানুষির কাহিনীটি শোনা গেল—এটি এত ইনিয়ে-বিনিয়ে ব'লে তোমার কী আনন্দ হল। আমার হিংস্রকে স্বভাব ছিল, এইটে জানাবার জন্যে তোমার এতই উৎসাহ! আর, আমাদের বিলিতি-আমড়া গাছের পাকা আমড়াগুলো পেড়ে নিয়ে স্বকুমারদাকে লুকিয়ে দিয়ে আসতুম, আমড়া সে ভালোবাসত ব'লে; চুরির অপবাদটা হত আমার, আর ভোগ করত সে—সে কথাটা চেপে গেছ। স্বকুমারদা নাহয় অকই ভালো কষত, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে একদিন সে 'অবধান' কথাটার মানে ভেবে পাচ্ছিল না, আমি স্নেটে লিখে আড় করে ধরে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলুম—এ কথাগুলো বুঝি তোমার গল্পের মধ্যে পড়ে না?

আমি বললুম, আমার খুশির কারণ এ নয় যে, মনের জালায় তুমি স্বকুমারদার যৌবরাজ্য মানতে চাও নি। তার উপরে তোমার হিংসের কারণ ছিল আমার উপর

তোমার অনুরাগবশত— আমার আনন্দের স্মৃতি রয়েছে এখানেই ।

আচ্ছা, তোমার অহংকার নিয়ে তুমি থাকো । একটা কথা তোমাকে জিগেস করি, সেই-যে তোমার নামহারা বানানো মামুষটি যাকে বলতে গে, তার হল কী ।

আমি বললেম, তার বয়স বেড়ে গেছে ।

ভালোই তো ।

সে এখন চিন্তা করে, মাথায় তার হুঃসমস্তার ভিন্নকলে চাক বেঁধেছে, তর্কে তার সঙ্গে পারবার জো নেই ।

দেখছি আমারই পারালাল লাইনেই চলেছে ।

তা হতে পারে, কিন্তু গল্পের এলেকা ছাড়িয়ে গেছে । থেকে থেকে সে হাত মুঠো ক'রে ঝেঁকে ঝেঁকে ব'লে উঠছে, শক্ত হতে হবে ।

বলুক-না । শক্ত ছাঁদেই গল্প জমুক-না । চুমুক দিয়ে খাওয়া নেই হল, চিবিয়ে খাওয়া চলবে তো । হয়তো আমার পছন্দ হবে ।

পাছে আক্কেল লাভের অভাবে তাকে কায়দা করতে না পার, এই ভয়ে অনেকদিন তাকে চুপ করিয়ে রেখেছি ।

ইস ! তোমার ভাবনা দেখে হাসি পায় । তুমি ঠাউরে রেগেছ, আমার দেখেই বয়স হয় নি ।

সর্বনাশ ! এতবড়ো নিন্দে অতিবড়ো শক্রও করতে পারবে না ।

তা হলে ডাকো-ন তাকে তোমার আগরে, তার বর্তমান মেজাজটা বুঝে নিই ।

তাই সই ।

১২

বাগড়কে বললেন, কোথায় আছে সেই বাদরটা । দেখানে পাণ্ড বোলাও উস্কে ।

এল সে তার কাটাওয়াল মোটা গোলাপের গুঁড়ির লাঠিখানা ঠক্ঠক করতে করতে । মালকোঁচা-মারা ধুতি, চাদরখানা ছড়ানো কোনরে, ঠাট্ট পর্যন্ত কালো পশমের মোটা মোছা, লাল চোরা-কাটা ভামার উপর হাতাধীন বিলিতি সয়েস্টকোট সবুজ বনাভের, সাদা রোয়াওয়াল রাশিয়ান টুপি মাথায়— পুরোনো মালের দোকান থেকে কেনা—বা হাতের বুড়ো আঙুলে ঝাকড়া ছড়ানো—কোনো একটা সজ্জ



অপনাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। কড়া চামড়ার জুতোর মস্‌মসানি শোনা যায় গলির মোড় থেকে। ঘন ভুরুহটোর নীচে চোখদুটো ঘেন মছে-থেদে-যাওয়া দুটো বুলেটের মতো।

বললে, হয়েছে কী। শুকনো মটর চিবোচ্ছিলুম দাঁত শক্ত করবার জন্যে, ছাড়ল না তোমার কণ্ঠ। বললে, বাবুর চোখদুটো ভীষণ লাল হয়েছে, বোধ হয় ডাক্তার ডাকতে হবে। শুনেই তাড়াতাড়ি গমলাবাড়ি থেকে এক-ভাঁড় চোনা এনেছি; মোচার খোলায় করে ফোঁটা ফোঁটা ঢালতে থাকো, সাফ হয়ে যাবে চোখ।

আমি বললুম, যতক্ষণ তুমি আছ আমার ত্রিসীমানায়, আমার চোখের লাল কিছুতেই ঘুচবে না। ভোরবেলাতেই তোমাদের পাড়ার যত মাতকর আমার দরজায় ধমা দিয়ে পড়েছে।

বিচলিত হবার কী কারণ।

তুমি থাকতে দোসরা কারণের দরকার নেই। খবর পাওয়া গেল, তোমার চেলা কংসারি মুন্সি, যার মুখ দেখলে অযাত্না, তোমার ছাদে বসে একখানা রামশিঙে তুলে ধরে ফুঁক দিচ্ছে; আর গাঁজার লোভ দেখিয়ে জড়ো করেছে যত ফাটা-গলার ফৌজ, তারা প্রাণপণে চেষ্টা নি অভ্যাস করছে। ভদ্রলোকেরা বলছে, হয় তারা ছাড়বে পাড়া নয় তোমাকে ছাড়াবে।

মহা উৎসাহে লাফ দিয়ে উঠে সে চীৎকারস্বরে বললে, প্রমাণ হয়েছে!

কিসের প্রমাণ।

বেশ্বরের দুঃসহ জোর। একেবারে ডাইনামাইট। বদ্বেশ্বরের ভিতর থেকে ছাড়া পেয়েছে দুর্জয় বেগ, উড়ে গিয়েছে পাড়ার ঘুম, দৌড় দিয়েছে পাড়ার শান্তি, পালাই-পালাই রব উঠেছে চার দিকে। প্রচণ্ড আত্মরিক শক্তি। এর ধাক্কা একদিন টের পেয়েছিলেন স্বর্গের ভালো-মামুষরা। বসে বসে আধ চোখ বুজে অমৃত পাচ্ছিলেন। গন্ধর্ব গুপ্তাদেবীরা তম্বুরা ঘাড়ে অতি নিখুঁত স্বরে তান লাগাচ্ছিলেন পরজ-বগবৎ, আর নৃপুরুষকারিণী অপ্সরীরা নিপুণ তালে তেহাই দিয়ে নৃত্য ভ্রমিয়েছিলেন। এ দিকে মৃত্যুবরণ নীল অন্ধকারে তিন যুগ ধরে অশ্বরের দল রসাতল-কোঠায় তিমিমাচের লেজের কাপ্টার বেলয়ে বেশ্বর সাধনা করছিল। অবশেষে একদিন শনিত্তে কলিতে মিলে দিলে সিগ্নাল, এসে পড়ল বেশ্বর-সংগতের কালাপাহাড়ের দল সুর-শ্রাব্যলানের সমে-নাড়া-দেওয়া ঘাড়ে হংকার ক্রংকার কন্‌কন্‌কার ধ্রুংকার ছুঁছুঁকার গড়-গড়গড়ংকার শব্দে। তীব্র বেশ্বরের তেলেবেগুনি জ্বলনে পিতামহ-পিতামহ ডাক ছেড়ে তাঁরা লুকোলেন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরমহলে। তোমাকে বলব কী আর, তোমার তো জানা আছে সকল শাস্ত্রই।

জানা যে নেই আজ তা বোঝা গেল তোমার কথা শুনে।

দাদা, তোমাদের বই-পড়া বিত্তে, আসল খবর কানে পৌঁছয় না। আমি বুঝে বেড়াই শ্রমানে মশানে, গুড়তরু পাই সাধকদের কাছ থেকে। আমার উৎকটনন্দী গুরুর মুগকন্দর থেকে বেশ্বরতরু অল্প কিছু জেনেছিলুম, তাঁর পায়ে অনেকদিন ভেরেঙার বিরেচক তৈল মর্দন ক'রে।

বেশ্বরতরু আয়ত্ত্ব করতে তোমার বিলম্ব হয় নি সেটা বুঝতে পারছি। অধিকারভেদ মানি আমি।

দাদা, ঐ তো আমার গর্বের কথা। পুরুষ হয়ে জন্মালেই পুরুষ হয় না, পুরুষতার প্রতিভা থাকা চাই। একদিন আমার গুরুর অতি অপূর্ব বিদ্রীমুখ থেকে—



গুরুমুখকে আদরা বলে থাকি শ্রীমুখ, তুমি বললে বিদ্রীমুখ !

গুরুর আদেশ। তিনি বলেন, শ্রীমুখটা নিতান্ত মোড়েলি, বিদ্রী মুখেই পুরুষের গৌরব। গুর ছোঁরটা আকর্ষণের নয়, বিপ্রকর্ষণের। মান কি না।

মানতে যে হতভাগ্য বাধা হয় সে মানে বট-কি।

মধুর রসে তোমার মোতাত্ত পাকা হয়ে গেছে দাদা, কঠোর সত্য মুখে রোচে না, ভাঙতে হবে তোমাদের দুর্বলতা—মিঠে সুরে যার নাম দিয়েছ স্কন্ধি, বিদ্রীকে সহ্য করার শক্তি নেই যার।

দুর্বলতা ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত।—বিদ্রীত্বের গুরুবাক্য

শোনাতে চাচ্ছিলে, শুনিয়ে দাও ।

একেবারে আদিপর্ব থেকে শুরু আরম্ভ করলেন বাখ্যান । বললেন, মানবসৃষ্টির শুরুতে চতুর্ভুজ তাঁর সামনের দিকের দাড়ি-কামানো ছোটো মুখ থেকে মিহি স্বর বের করলেন । কোমল রেখাব থেকে মধুর ধারার মসৃণ মিড়ের উপর দিয়ে পিছলে গড়িয়ে এল কোমল নিখাদ পর্যন্ত । সেই সুকুমার স্বরলহরী প্রত্যাশের অরুণবর্ণ মেঘের থেকে প্রতিফলিত হয়ে অত্যন্ত আরামের দোলা লাগালো অতিশয় মিঠে হাওয়ায় । তারই যুহু হিল্লোলে দোলায়িত নৃত্যচ্ছন্দে রূপ নিয়ে দেখা দিল নারী । স্বর্গে শাখ বাজাতে লাগলেন বরুণদেবের ঘরনী ।

বরুণদেবের ঘরনী কেন ।

তিনি যে জলদেবী । নারী জাতটা বিশুদ্ধ জলীয় ; তার কাঠিন্য নেই, চাকলা আছে, চকল করেও । ভূব্যবস্থার গোড়াতেই জলরাশি । সেই জলে পানকোড়ির পিঠে চ'ড়ে যত সব নারী ভেসে বেড়াতে লাগল সারিগান গাইতে গাইতে ।

অতি চমৎকার । কিন্তু, তখন পানকোড়ির সৃষ্টি হয়েছে না কি ।

হয়েছে বই-কি । পাখিদের গলাতেই প্রথম স্বর বাঁধা চলছিল । দুর্বলতার সঙ্গেই মাধুর্যের অনবচ্ছিন্ন যোগ, এই তবটির প্রথম পরীক্ষা হল ঐ দুর্বল ভীদগুলির ডানায় এবং কণ্ঠে । একটা কথা বলি, রাগ করবে না তো ?

না রাগতে চেণ্টা করব ।

যুগান্তরে পিতামহ যখন মানবসমাজে দুর্বলতাকেই মহিমান্বিত করবার কাজে কবিসৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেই সৃষ্টির ছাঁচ পেয়েছিলেন এই পাখির থেকেই । সেদিন একটা সাহিত্যসম্মিলন গোছের বাপার হল তার সভামণ্ডপে ; সভাপতিরূপে কবিদের আহ্বান ক'রে বলে দিলেন, তোমরা মনে মনে উড়তে থাকো শূন্যে, আর ছন্দে ছন্দে গান করো বিনা কারণে, যা-কিছু কঠিন তা তরল হয়ে যাক, যা-কিছু বলিষ্ঠ তা এলিয়ে পড়ে যাক আদ্রি হয়ে ।— কবিসম্মতি, আজ পর্যন্ত তুমি তার কথা রক্ষা করে চলেছ ।

চলতেই হবে যতদিন না ছাঁচ বদল হয় ।

আধুনিক যুগ শুকিয়ে শক্ত হয়ে আসছে, মোহের ছাঁচ আর নিলবেই না । এখন সে দিন নেই যখন নারীদেবতার জলের বাসাটি দোল পেত পল্লব, যখন মনোহর দুর্বলতায় পৃথিবী ছিল অতলে নিমগ্ন ।

সৃষ্টি ঐ মোলায়েমের ছন্দে এসেই পামল না কেন ।

গোটা কয়েক যুগ যেতে না যেতেই দরলীদেবী আঁঠু বাক্যে আবেদনপত্র পাঠালেন চতুর্ভুজের দরবারে । বললেন, ললনাদের এই লকারবহুল লালিত্য আর তো সহ্য হয়

না। স্বয়ং নারীরাই করণ কল্লোলে ঘোষণা করতে লাগল, ভালো লাগছে না। উর্ধ্বলোক থেকে প্রশ্ন এল, কী ভালো লাগছে না। স্বকুমারীরা বললে, বলতে পারি নে।— কী চাই।— কী চাই তারও সন্ধান পাচ্ছি নে।

ওদের মধ্যে পাড়াকুঁহলিরও কি অভিব্যক্তি হয় নি। আগাগোড়াই কি স্ববচনীরা পাল।

কৌদলের উপযুক্ত উপলক্ষ্যটি না থাকতেই বাক্যবাহের টঙ্কার নিগম রইল অতলে, ঝাঁটার কাঠির অন্ধুর স্থান পেল না অকূলে।

এত বড়ো দুঃখের সংবাদে চতুর্মুখ লঙ্ঘিত হলেন বোধ করি ?

লঙ্কা ব'লে লঙ্কা! চার মুণ্ড হেঁট হয়ে গেল। স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন রাজহংসের কোটি-মোহন-ছোড়া ডানাতটোর 'পরে পুরো একটা ব্রহ্মদুগ। এ দিকে আদিকালের লোকবিশ্রুত সান্দা পরন-পানকোড়িনী, শুভ্রতায় যিনি ব্রহ্মার পরমহংসের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধনায় হাজার বার ক'রে জলে ডুব দিয়ে দিয়ে চক্ষুদর্শনে পালকগুলোকে ডাঁটামার ক'রে ফেলছিলেন, তিনি পর্যন্ত ব'লে উঠলেন, নির্মলতাই যেখানে নিরতিশয় সেখানে শুচিতার সর্বাঙ্গপ্রধান স্বপটাই বান পড়ে, যথা, পরকে খোঁটা দেওয়া; শুকস্ব হবার মজাটাই থাকে না। প্রার্থনা করলেন, হে দেব, মলিনতা চাই, ভূরিপরিমাণে, অনতিবিলম্বে এবং প্রবল বেগে। বিধি তখন অস্থির হয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, ভুল হয়েছে, সংশোধন করতে হবে। বাস রে কী গলা। মনে হল মহাদেবের মহাবৃষভটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা— অতিলৌকিক সিংহনানে আর বৃষগর্জনে মিলে ছালোকের নীলমণিমণ্ডিত ভিতটাতে দিলে ফাটল ধরিয়ে। মজার আশায় বিষ্ণুলোক থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন নারদ। তাঁর ঢেঁকির পিঠ খাবড়িয়ে বললেন, বাবা ঢেঁকি, শুনে রাখো ভাবীলোকের বিশ্ব-বেহুরের আদিমহু, যথাকালে ঘর ভাঙাবার কাজে লাগবে। স্কন্ধ ব্রহ্মার চার গলার ঐক্যতান আওরাজের সঙ্গে যোগ দিলে দিগ্‌নাগেরা শুঁড় তুলে, শঙ্কর থাকায় দিগ্‌জ্ঞানাদের বেণীবন্ধ খুলে গিয়ে আকাশ আগাগোড়া ঠাসা হয়ে গেল এলোচূলে— বোধ হল কালো-পাল-তোলা বোমতরী ছুটল কালপুরুষের শ্মশানঘাটে।

হাজার হোক, সৃষ্টিকর্তা পুরুষ তো বটে।

পৌরুষ চাপা রইল না। তাঁর পিছনের দাড়িওয়ালা দুই মুখের চার নাসাফলক উঠল ফুলে, হাপিয়ে-ওঠা বিরাট হাপরের মতো। চার নাসারন্ধ্র থেকে একসঙ্গে ঝড় ছুটল আকাশের চার দিককে তাড়না ক'রে। ব্রহ্মাও সেই প্রথম ছাড়া পেল দুর্জয়শক্তিমান বেস্বরপ্রবাহ— গৌ-গৌ গাঁ-গাঁ হুড়মুড়্ হুর্দাড়্ গড়্গড়্ ঘড়্ঘড়্ ঘড়াঙ।

গন্ধর্বেরা কাঁধে তধুরা নিয়ে দলে দলে দৌড় দিল ইন্দ্রলোকের থিড়কির আঙিনায়, যেখানে শচীদেবী স্নানান্তে মন্দারকুণ্ডছায়ায় পারিজাতকেশরের ধূপধূমে চুল শুকোতে যান। ধরণীদেবী ভয়ে কম্পাষিতা; ইষ্টমন্ত্র জপতে জপতে ভাবতে লাগলেন, ভুল করেছি বা। সেই বেহুরো ঝড়ের উন্টোপান্টো ধাক্কায় কামানের মুখের তপ্ত গোলার মতো ধক্ধক্ শব্দে বেরিয়ে পড়তে লাগল পুরুষ।— কী দাদা, চূপচাপ যে। কথাগুলো মনে লাগছে তো?

লাগছে বই-কি। একেবারে হৃদ্যাম্ শব্দে লাগছে।

সৃষ্টির সর্বপ্রধান পর্বে বেহুরেরই রাজত্ব, এ কথাটা বুঝতে পেরেছ তো?

বুঝিয়ে দাও-না।

তরল জলের কোমল একাধিপত্যকে চুঁ মেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, যুষো মেরে, ধাক্কা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথুরে নেড়া মুণ্ডুলো তুলে। ভুলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সব চেয়ে বড়ো পর্ব ব'লে মান কি না।

মানি বই-কি।

এত কাল পরে বিধাতার পৌরুষ প্রকাশ পেল ডাঙায়; পুরুষের স্বাক্ষর পড়ল সৃষ্টির শব্দে ডমিতে। গোড়াতেই কী বোভংস পালোয়ানি। কখনো আগুনে পোড়ানো, কখনো বরফে জমানো, কখনো ভূমিকম্পের জ্বলন্তির যোগে মাটিকে ছা করিয়ে কবিরাজি বড়ির মতো। পাহাড়গুলোকে গিলিয়ে থাওয়ানো— এর মধ্যে মেঘেলি কিছু নেই, সে কথা মান কি না।

মানি বই-কি।

জলে ওঠে কলধনি, হাওয়ায় বাঁশি বাজে সোঁ-নোঁ— কিন্তু বিচলিত ডাঙা যখন ডাক পাড়তে থাকে তখন ভারতের সংগীতশাস্ত্রটাকে পিণ্ডি পাকিয়ে দেয়। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে, কথাটা ভালো লাগছে না। কী ভাবছ বলেই কেলো-না।

আনি ভাবছি, আর্ট্ মাত্রেরই একটা পুরাগত বনেদি আছে যাকে বলে ট্র্যাডিশন। তোমার বেহুরধনীর আর্ট্কে বনেদি ব'লে প্রমাণ করতে পার কি।

খুব পারি। তোমাদের স্বরের মূল ট্র্যাডিশন মেয়ে-দেবতার বাজ্যমন্ত্রে। যদি বেহুরের উদ্ভব খুঁজতে চাও তবে গিধে চলে যাও পৌরাণিক মেঘেনহল পেরিয়ে পুরুষ দেবতা জটধারীর দরজায়। কৈলাসে বীণাযন্ত্র বে-আইনি, উধলী সেখানে নাচের বায়না নেয় নি। যিনি সেখানে ভীষণ বেতালে তাণ্ডবনৃত্য করেন তাঁর নন্দীভঙ্গী ফুঁকতে থাকে শিঙে, তিনি বাজান ববম্বম গালবাচ্চ, আর কড়াকড় কড়াকড় ডমরু। ধ্ব'সে পড়তে থাকে কৈলাসের পিণ্ডি পিণ্ডি পাথর। মহাবেহুরের আদি-উৎপত্তিটা স্পষ্ট হয়েছে তো?

হয়েছে।

মনে রেখো স্বরের হার, বেস্বরের জিত, এই নিয়েই পালা রচনা হয়েছে পুরাণে দক্ষযজ্ঞের। একদা যজ্ঞসভায় জমা হয়েছিলেন দেবতারা— দুই কানে কুণ্ডল, দুই বাহুতে অঙ্গদ, গলায় মণিমালা। কী বাহার! ঋষি মুনিদের দেহ থেকে আলো পড়ছিল ঠিক দিয়ে। কণ্ঠ থেকে উঠছিল অনিন্দ্যসুন্দর স্বরে সুমধুর সামগান, ত্রিভুবনের শরীর রোমাঙ্কিত। হঠাৎ দুড়্‌দাড়্‌ ক'রে এসে পড়ল বিজ্ঞানবিরূপের বেস্বর দল, শুচিসুন্দরের গৌরুমার্য মুহূর্তে লুপ্ত। কুশীর কাছে সুশীর হার, বেস্বরের কাছে স্বরের— পুরাণে এ কথা কীতিত হয়েছে কী আনন্দে, কী অট্টহাস্তে, অঙ্গদামঙ্গলের পাতা ওলটালেই তা টের পাবে। এই তো দেখছ বেস্বরের শাস্ত্রসম্মত ট্র্যাডিশন। ঐ-যে তুন্দিলতম গজানন সর্বাঙ্গে পেয়ে থাকেন পুষ্পা, এটাই তো চোখ-ভোলানো দুর্বল ললিতকলার বিরুদ্ধে স্থূলতম প্রোটেক্ট। বর্তমান যুগে ঐ গণেশের শুঁড়ই তো চিম্নি-মূর্তি ধরে পাশ্চাত্য পণ্যযজ্ঞশালায় বৃদ্ধিতক্ষনি করছে। গণনাযন্ত্রের এই কুংসিত বেস্বরের ছোরেই কি ওরা গিক্সিলাভ করছে না। চিন্তা করে দেখো।

দেখব।

যখন করবে তখন এ কথাটাও ভেবে দেখো, বেস্বরের অজ্ঞেয় মাহাত্ম্য কঠিন ডাঙাতেই। 'গিংহ বল', 'বায়্র বল', 'বলদ বল', যাদের সঙ্গে সগর্বে বীরপুরুষদের তুলনা করা হয় তারা কোনো কালে ওস্তাদজির কাছে গলা মাধে নি। এ কথায় তোমার সন্দেহ আছে কি।

তিলমাত্র না।

এমন-কি, ডাঙার অধম পশু যে গর্দভ, যত দুর্বল সে হোক-না, বীণাপাণির আসরে সে গাক্রেদি করতে যায় নি, এ কথা তার শত্রু মিত্র এক বাক্যে স্বীকার করবে।

তা করবে।

ঘোড়া তো পোষমানা জীব— লাধি মারবার যোগ্য খুর থাকা সত্ত্বেও নির্বিবাদে চাবুক পেয়ে মরে— তার উচিত ছিল, আন্তাবলে ঝাড়া দাড়িয়ে ঝিঁঝিঁটখাঘাজ আলাপ করা। তার চিঁহিঁ হিঁহিঁ শব্দে সে রাশি রাশি সফেন চন্দ্রবিন্দুবর্ষণ করে বটে, তবু বেস্বরো অমুনাসিকে সে ডাঙার সম্মান রক্ষা করতে ভোলে না। আর গজরাজ, তাঁর কথা বলাই বাহুল্য। পশুপতির কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত এই-সমস্ত স্থূলচর জীবের মধ্যে কি একটাও কোকিলকণ্ঠ বের করতে পার। ঐ-যে তোমার বুল্ডগ্‌ ফ্রেডি চীৎকারে ঘুমছাড়া করে পাড়া, ওর গলায় দয়া ক'রে বা মজা ক'রে বিদাতা যদি দেন জামা-দোয়েলের শিষ, ও তা হলে নিজের মধুর কণ্ঠের অগম্য দিক্কারে তোমার চলতি মোটরের

তলায় গিয়ে কাঁপিয়ে পড়বে এ আমি বাজি রাখতে পারি। আচ্ছা, গতি করে বলো, কালিঘাটের পাঠা যদি কৰ্কশ ভাভা না করে রামকেলি ভাঁজতে থাকে, তা হলে তুমি তাকে জগন্নাথার পবিত্র মন্দির থেকে দূর-দূর করে খেদিয়ে দেবে না কি।

নিশ্চয় দেব।

তা হলে বুঝতে পারছ আমরা যে স্মহং ব্রত নিয়েছি তার সার্থকতা। আমরা শক্ত ডাঙার শাক্ত সন্তান, বেঙ্গুরমণ্ডে দীক্ষিত। আধমরা দেশের চিকিৎসায় প্রয়োগ করতে চাই চরম মুষ্টিযোগ। জাগরণ চাই, বল চাই। জাগরণ শুরু হয়েছে পাড়ায়; প্রতিবেশীদের বলিষ্ঠতা হুম্‌নাম্ শব্দে দুর্দাম হচ্ছে, পৃষ্ঠদেশে তার প্রমাণ পাচ্ছে আমার চেলারা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোতোয়ালরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, টনক নড়েছে শাসন-কর্তাদের।

তোমার গুরু বলছেন কী।

তিনি মহানন্দে মগ্ন। দিবাচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন, বেঙ্গুরের নবযুগ এসেছে সমস্ত জগতে। সভা জাতরা আজ বলছে, বেঙ্গুরটোতেই বাস্তব, শুভেই পুষ্পাভূত পৌরুষ, সুরের মেঘেনারুষিই দুর্বল করেছে সভ্যতা। সুরের শাসনকর্তা বলছে, ছোর চাই, খুঁটানি চাই নে। রাষ্ট্রবিপ্লিতে বেঙ্গুর চড়ে যাচ্ছে পদাধ পদায়। সেটা কি তোমার চোখে পড়ে নি, দাদা।

চোখে পড়বার দরকার কী, ভাই। পিঠে পড়ছে লম্বাক্ষর।

এ দিকে বেতালপত্রবিশিষ্ট চাপল সাহিত্যের দাড়ে। আনন্দ করো, বাংলাও ওদের পাছু দরেছে।

সে তো দেখছি। পাছু দরতে বাংলা কোনোদিন পিছপাও নয়।

এ দিকে গুরুর আদেশে বেঙ্গুরমণ্ডে মাদন করবার জন্তে আমরা চৈতন্যসংস্কার স্থাপন করেছি। দলে একজন কবি জুটেছে। তার চেতনা দেখে আশা হয়েছিল নবযুগ নুর্তিমান। রচনা দেখে ভুল ভাঙল, দেখি হোমারই চেলা। হাজার বার করে বলছি, ছন্দের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলো গলাঘাতে। বলছি, অর্থবনর্থং ভাববনিত্যম্। দুক্লিয়ে দিলেম, কথার মানেটাকে সম্মান করায় কেবল দাসবুদ্ধির গাঁঠিপড়া মনটাই দরা পড়ে। কল হচ্ছে না। বেচারার দোষ নেই— গলদদর্ম হয়ে এঠে, তবু ভুললোকি কাবোর হাঁদ ঘোচাতে পারে না। শুকে দেখেছি পদীক্ষারীনে। প্রথম নমুনা যেটা সমিতির কাছে দাখিল করেছে সেটা শুনিয়ে দিই। সুর দিয়ে শোনাতে পারব না।

সেই জন্তেই তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে সাহস হয়।

তবে অবধান করো—

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
 হৈহৈপাড়া ছেড়ে দূর দিয়ে বাইয়ে ।
 হেথা সা রে গা-মা পা'য়ে সুরাসুরে যুদ্ধ,
 শুক কোমলগুলো বেবাক অশুদ্ধ—
 অভৈদ রাগিণীরাগে ভগিনী ও ভাইয়ে ।
 তার-ছেঁড়া তদুরা, তাল-কাটা বাড়িয়ে—
 দিনরাত বেধে যায় কাঙ্ক্ষিয়ে ।
 কাপতালে দানরায় চৌতালে ধামারে
 এলোমেলো ঘা মারে—
 তেরে কেটে ঘেরে কেটে দাঁ দাঁ দাঁ দাঁ দাঁইয়ে ।

সভাশুদ্ধ একদাকো ব'লে উঠলুম, এ চলবে না । এমনো জাতের মায়া ছাড়তে
 পারে নি— শুচিদামগ্রস্ত, নাড়া দুর্বল । আমরা বেছন্দ চাই বেপরোয়া । কবির
 নেয়ার বাড়িয়ে নেওয়া গেল । বললুম, আরও একবার কোমর বেঁধে লাগো, বাঙালি
 ছেলেনের কানে জোরের কথা হাতুড়ি পিটিয়ে চালিয়ে দাও, মনে রেখো পিটুনির
 চোটে ঠেলা মেরে জোর চালানো আজ পৃথিবীর সর্বত্রই প্রচলিত— বাঙালি শুধু কি
 ঘুমায়ে রয় । দেখলুম, লোকটার অস্থিরতা পাক খেয়ে উঠেছে । বলে উঠল, নয় নয়,
 কখনোই নয় । কলমটাকে কানড়ে ধরে ছুটে গিয়ে বসল টেবিলে । করজোড়ে
 গবেশকে বললে, তোমার কলাবধুকে পাঠিয়ে দাও অস্থঃপুরে সিদ্ধিনাতা । লাগাও
 তোমার শুঁড়ের আঁচড় আমার মগজে, ভূমিকম্প লাগুক আমার মাতৃভাষায়, জোরের
 তপ্পন উৎসারিত হোক কলমের মুখে, হুঃখাবোর চোটে বাঙালির ছেলেকে দিক
 জাগিয়ে । কবি মিনিট পনেরো পরে বেরিয়ে চীৎকার করে আত্মসম্মতি শুরু করলে ।
 মুগ চোখ লাল, চুলগুলো উকোথুকো, দশা পাবার দশা ।—

মারু মারু মারু রবে মারু গাঁটো,
 মারহাটো, ওরে মারহাটো ।
 ছুটে আয় তুফাড,
 ভাঙ্ মাথা, ভাঙ্ হাড়,
 কোথা তোর বাসা আছে হাড়কাটা ।

আন্ ঘুঘো, আন্ কিল,
 আন্ ঢেলা, আন্ টিল,
 নাক মুখ থেঁতো ক'রে দিক ঠাট্টা।
 আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম
 ছম্‌দাম ধুম্‌ধুম,
 ভেঙে চূরে চূরনার হোক খাট্টা।
 ঘুম থাক, মারো কষে মান্‌সাট্টা।
 বাগিওলা চূপ রাও,
 টান মেরে উপ্‌ড়াও
 ধরা হতে ললিতলবঙ্গলতা।
 বেল জুই চম্পক
 দূরে দিক ঝম্পক,
 উপরনে ডমা হোক ডঙ্গলতা।

আমি অস্থির হয়ে ছই হাত তুলে বললুম, থানো থানো, আর নয়। ভয়নেদের
 ভূত এখনো কাঁধে বসে ছন্দের সার্কাস করছে, কানের দণ্ডল ছাড়ে নি। গগ্যধামে
 ঐ লেখাটার বদি পিণ্ডি দিতে চাও তবে ওর উপরে হানো মুমল, এটাকে ছিঁকুটে
 নাস্তানাবুদ ক'রে তার উপরে কুটকি বৃষ্টি করো। কবি হাত জোড় ক'রে বললে,
 আমি পারব না, তুমি হাত লাগাও। আমি বললুম, ঐ-বে মারহাট্টা শব্দটা তোনার
 মাথায় এসেছে, ঐটেতেই তোনার ভবিষ্যতের আশা। 'চলন্তিকা' থেকে কথাটাকে
 ছিঁড়ে ফেলেছ, অর্থের শিকড়টা রয়ে গেল মাটির নীচে। শুধু ডাটা বরে খাড়া
 রয়েছে ধ্বনির মারমূর্তি। এইবার সমস্তটাকে ছত্রছাড়া করে দিই— দেখো, কী মূর্তি
 বেরোয়—

হেঁ রে হেঁ মারহাট্টা

গালপাট্টা

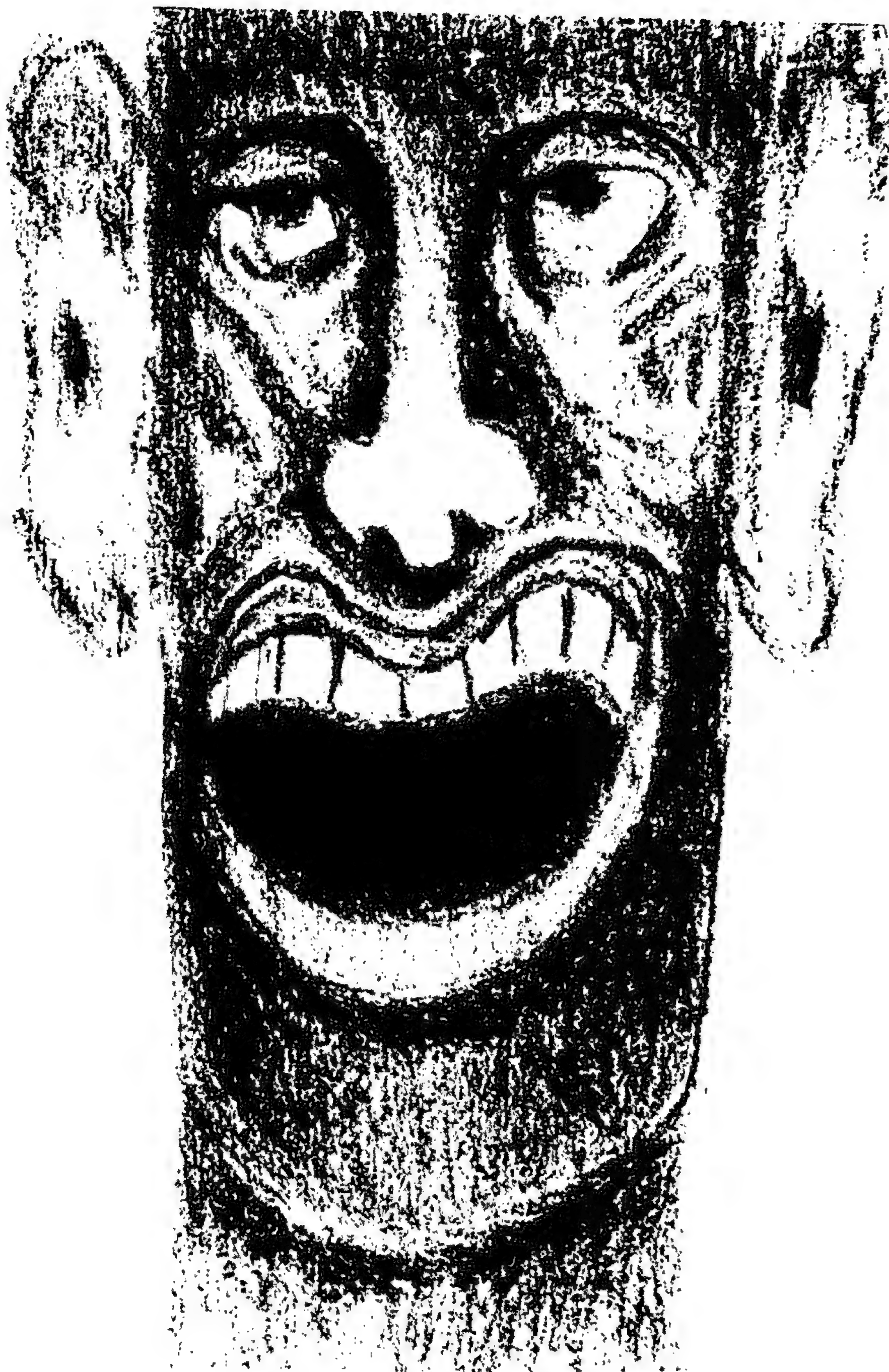
আঁটসাট্টা।

* * *

হাড়কাট্টা ক্যাঁ কৌ কৌচ,

গড়্‌গড়্‌ গড়্‌গড়্‌।.....

ডাড্‌দুদুদু ডুদাড



হৈ রে হৈ মারহাট্টা



ডাঙা

ধপাং

ঠাঙা

কম্পাউণ্ড ক্র্যাক্‌চার

* * *

মড়্‌মড়্‌, মড়্‌মড়্‌,

হুড়্‌ম্‌.....

হুড়্‌মুড়্‌, হুড়্‌মুড়্‌,

দেউকিনন্দন

কঙ্কন পাণ্ডে

কুন্দন গাড়েয়ায়ান

বাকৈ বিহারী

তড়্‌বড়্‌, তড়্‌বড়্‌, তড়্‌বড়্‌, তড়্‌বড়্‌,

বট্‌বট্‌ নস্‌নস্‌

মড়াধবড়

মড়্‌ফড়্‌, মড়্‌ফড়্‌,

হো হো হু হু হা হা—

ট ঠ ড ঢ ড় হঃ—

উনফর্নো হেডিস্‌ লিখে।

দাদা, তোমার নকল করি নি এই সার্টিফিকেট আয়াকে দিতে হবে।

খুশি হয়ে দেব।

নবযুগের মহাকাব্য তোমাকে লিখতে হবে দাদা।

যদি পারি। বিষয়টা কী।

বেহুয়-ছিড়িষের নিষিদ্ধয়।

পুপুদিককে জিগেস করলুম, কেমন লাগল।

পুপু বললে, ধাঁধা লাগল।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, সুরাসুরের যুদ্ধে অসুরের জয়টা কেন আমার তেমন খারাপ লাগল না, তাই ভাবছি। বিশী গোয়ারটার দিকেই রায় দিতে চাচ্ছে মন।

তার কারণ, তুমি স্বীজাতীয়। অত্যাচারের মোহ কাটে নি। মার খেয়ে আনন্দ পাও, মারবার শক্তিটাকে প্রত্যক্ষ দেখে।

অত্যাচারের আক্রমণ পছন্দসই তা বলতে পারি নে— কিন্তু বীভৎসমূর্তিতে যে পৌরুষ ঘুষি উচিয়ে দাঁড়ায় তাকে মনে হয় সারাইন।

আমার মতটা বলি। দুঃশাসনের আফালনটা পৌরুষ নয়, একেবারে উল্টো। আজ পর্বন্ত পুরুষই সৃষ্টি করেছে সুন্দর, লড়াই করেছে বেহুদের সঙ্গে। অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ। আজ পৃথিবীতে তারই প্রমাণ পাচ্ছি।

১৩

পুপুদিদির মনে হল, আমি ওর নথানাগানি করেছে। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। কেনারায় হেলান দিয়ে ও বসল আমার কাছে। অন্ধ দিকে মুগ করে বসলে, তুমি আনাকে নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কেবল ছেলেমাছুষি করছ, এতে তোমার কী সুখ।

আজকাল ওর কথা শুনে হাসতে সাহস হয় না। ভালোমানুষের মতো মুগ করেই বললুম, তোমার বরসে পাকা বুদ্ধির প্রমাণ দিতেই তোমাদের আগ্রহ, আমার বরসে ভাবতে ভালো লাগে যে মজ্জাটা এখনো আছে কাঁচা। সুযোগ পেলে মশগুল হয়ে ছেলেমাছুষি করি বানিয়ে, হয়তো মানানসই হয় না।

তাই ব'লে আগাগোড়াই বনি ছেলেমাছুষি কর, তা হলে সত্যিকার ছেলেমাছুষিই হয় না। ছেলে বরদের ভিতরে ভিতরে বড়ো বরদের মিশল থাকে।

দিদি, এটা একটা কথার মতো কথা বলেছ। শিশুর কোবল দেহেও শক্ত হাড়ের গোড়াপত্তন থাকে। এ কথাটা আমি ভুলেছিলুম না কি।

তোমার বন্ধুনি শুনে মনে হয়, যখন আমি ছোটো ছিলাম তখনকার দিনে এমন কিছুই ছিল না বা ব্যঙ্গ করবার নয় অগচ্ছ মজা করবার।

একটা উদাহরণ দেখাও।

মনে করো, আমাদের মাস্টারমশায়। তিনি অমৃত ছিলেন, কিন্তু খাঁটি অমৃত। তাই তাঁকে এত ভালো লাগত।

আচ্ছা, তাঁর কথাটা একটু ধরিয়ে দাও-না।

আজও তাঁর মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ে। ক্লাসে বসতেন যেন আলগোছে, বইগুলো ছিল কঠিন। উপরের দিকে তাকিয়ে পাঠ ব'লে যেতেন, কথাগুলো যেন সত্য করে পড়ছে আকাশ থেকে। আমরা ক্লাসে উপস্থিত থাকব, মন নিয়ে পড়া শুনব, সে গল্পটো সম্পূর্ণ আমাদেরই ব'লে তিনি মনে করতেন।

তিনি তোমাদের মুখ চেনবার স্বযোগ পান নি বোধ হয়।

চেষ্টাও করেন নি। একদিন ছুটির দরবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি শশবাস্ত হয়ে চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লেন; মনে করলেন, আমি বুদ্ধি থাকে বলে একজন রীতিমত মহিলা।

অননতরো অভাবনীয় ভুল করা তাঁর অভ্যাস ছিল।

ছিল বই-কি। তোমার দাড়ি দেখে কোনোদিন তোমাকে নবাব খাজেমার প্রাইভেট সেক্রেটারি ব'লে ভুল করেন নি তো? না, ঠাট্টা নয়, তিনি তো তোমার বন্ধু ছিলেন, বলো-না তাঁর কথা।

তাঁর শব্দ কেউ ছিল না, কিন্তু সমস্তটার বন্ধু ছিলুম একলা আমি। লোকে এখন তাঁর খাপখাপের কথা রটাত তিনি আশ্চর্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে এসে বললেন, সবাই বলছে, আমি ক্লাস পড়াই কিন্তু ক্লাসের দিকে তাকাই নে।

আমি বললুম, তোমার সাড়াংরা তোমার বিজ্ঞের দোষ ধরতে পারে না, তোমার বুদ্ধির দোষ ধরে। তারা বলে, তোমার পড়ানোর ভুল হয় না কিন্তু পড়াচ্ছ যে সেইটেই ভুলে যাও।

পড়াচ্ছি যদি না ভুলি তবে পড়াতে পারতুম না, নিছক মাস্টারিই করে যেতুম। পড়ানোটা নিঃশেষে হজম হয়ে গেছে, গুটা নিয়ে মনটা আইটাই করে না।

জলচর ডলে মীতাক নিলে টের পাওয়া যায় না, স্থলচর দিলে সেটা খুবই মালুম হয়। তুমি অধ্যাপন-সরোবরের গভীর জলের মাছ।

আমি যদি ছাত্রদের দিকেই তাকাই তবে ক্লাসের দিকে মন দেব কী ক'রে।

তোমার সেই ক্লাসটা আছে কোথায়।

কোথাও না, সেইজগ্রেই তো বাধা পাই নে। ছাত্ররাই যদি আমার চোখ জুড়ে বসে তা হলে ক্লাসের আত্মপুরুষটা আড়ালে পড়ে যে।

'পড়ো বাবা আত্মারাম' এই বুদ্ধি তোমার বুলি?

পড়াচ্ছি কই। আমার আশ্বাসকেই টহল দেওয়াচ্ছি।

তোমার প্রণালীটা কিরকম।

গঙ্গাবারার ব'হে যাবার প্রণালী যেরকম। তাইনে বায়ে কোথাও মক্ক, কোথাও ফসল, কোথাও শ্মশান, কোথাও শহর। এই নিয়ে গঙ্গামায়ীকে পদে পদে বিচার করতে যদি হত তা হলে আজ পর্যন্ত সগরসন্তানদের উদ্ধার হত না। যাদের যতটা হবার তাই হয়, বিবাতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তার চেয়ে বেশি হওয়াতে গেলেই চলা বন্ধ। আমার পড়ানো চলে মেঘের মতো শূন্য দিয়ে, বর্ষণ হয় নানা খেতে, ফসল ফলে খেত-অমুসারে। অসম্ভবকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করে সময় নষ্ট করি নে ব'লে হেডমাস্টার হন ক্ষাপা। ঐ হেডমাস্টারটিকেও অত্যন্ত সত্য ব'লে গণ্য করলে অত্যন্ত ভুল করা হয়।

পুপু বললে, ছাত্রীদের অনেকে মনে মনে খুঁখুঁ করত। তাদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন, এখানে যে মাস্টারটা আছে তাকে নেই ক'রে নির্যোত, তোমাদের নিজের মনকেই বেড়ে গুঠবার ভারগা করে দেবার জন্তেই। আর-একদিন তিনি বলেছিলেন, মাস্টারিতে আমি হচ্ছি ক্লাসিক, আর সিদ্দুদা বু রোমান্টিক। বল, বাইলা, মাস্টারমশায়ের কথাটা আনরা কিছুই বুঝতে পারি নি।

মানে হচ্ছে, মাস্টার মনগ্র ক্লাসকেই দিতেন উপরে তুলে, আর সিদ্দু ছাত্রদের একে একে নিজের কাঁধে চড়িয়ে গুঁতগাড়ি পার করত। বুঝেছ ?

না, বোঝবার দরকার নেই। তুমি তাঁর কথা বলে যাও, মজা লাগে শুনতে।

আমারও লাগে, কেননা লোকটাকে বুঝতে লাগে দেরি। একদিন চান-দার্শনিকের দোহাই দিয়ে মাস্টার আমাকে বললে, যে রাজ্যে রাজত্বটা নেই সেই রাজ্যই সকল রাজ্যের সেরা।

পুপে সগর্বে বললে, আমাদের ক্লাস সেরা ক্লাস ছিল সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, তার কারণ, প্রমাণ সবেও তোমার কম বুদ্ধির লক্ষণ মাস্টার লক্ষ্য করতেন না।

পুপে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, এটাকে কি গাল বলব না ঠাট্টা।

আমি বললুম, পাশ দিয়ে যেতে যেতে তোমার চুলটা টেনে দিই, এ ঠাট্টা সেই স্নিগ্ধ জাতের। এতে ক্যাগাস ব্যালাই অর্থাৎ 'অন্ত নৃক ব্রহ্ম ময়া'র ঘোষণা নেই।

পুপে বললে, মাস্টারমশায়ের ব্যবস্থা ছিল মজার স্বকমের। তিনি বলতেন,

তোমাদের নিজের খবর নিজেই রাখবে ; তোমাদের খবরদারি করবার কাজ আমার নয়। প্রতিদিনের পড়ার ফল নিজেরাই রাখতুম ; মার্ক দেবার নিয়ম জানা ছিল।

তার ফল কী হল।

মার্ক বরঞ্চ কম করেই দিতুম।

কখনো কি ঠকাতে না।

বাইরের কেউ মার্ক দেবার থাকলে তাকে ঠকাবার লোভ হতে পারত। নিজেকে ঠকানো বোকামি। বিশেষত তিনি তো দেখতেন না।

তার পরে ?

তার পরে প্রত্যেক তিন মাস অস্থির নিজেরাই হিসেব ক'রে জানতুম উঠছি কি না বসছি।

তোমাদের কি সত্যযুগের হাইস্কুল, অত্যন্ত হাই ? ফাঁকি দেবার লোকই বুঝি ছিল না ?

মান্দারমণায় ছিলেন অবিচলিত। তিনি বলতেন, সংসারে একদল লোক ফাঁকি দেবেই। কিন্তু, নিজের দায় বানের নিজের হাতে, ওরই মধ্যে তারাই কম ফাঁকি দেয়। আমাদের শাস্তিও ছিল ঐ জাতের। বাইরে থেকে না। একদিন হাজিরি নাম-ডাক উপলক্ষ্যে প্রিন্সিপাল পসেন্টেজ বাঁচাবার জগে মিন্দো কথা বলে ফেলেছিলেন। তিনি বললেন, অশুচি হয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত কোরো। তিনি জানতেও চাইতেন না করেছে কি না।

প্রায়শ্চিত্ত কি করেছিলে।

নিশ্চয়ই করেছিলেন।

অর্থাৎ, তোমার পাউডরের কোটোটা ঐ প্রিন্সিপালকে দান করেছিলে ?

আমি কখনো পাউডর মাগি নে।

বলতে চাও, তোমার ঐ মুখের রঙ তোমার খাস নিজেরই ?

আর ঘাই হোক তোমার কাছ থেকে ধার নিই নি, মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

ছি, আমাকে নিয়ে তোমার দৃষ্টিতে যদি ভেদবুদ্ধি দেখা দেয় তা হলে জাতে দোষ-রোপ ঘটে। আমরা যে সর্বর্ণ—বর্ণভেদের জো কী। হাতের কাছে কবি থাকলে বলতেন, তোমার গায়ের রঙ ফুটে বেরিয়েছে ব্রহ্মার হাসি থেকে।

আর তোমার রঙ তাঁর ঠাট্টার হাসি থেকে।

এ'কেই বলে অন্তোন্তস্তুতি, মুচুয়ল অ্যাড্‌মিরেশন। পিতামহের দুই জাতের হাসি

আছে—একটা দস্তা, একটা মুখু। আমাতে লেগেছে মুখু হাসি, ইংরেজিতে তাকে বলে উইট।

দাদামশায়, নিজের গুণগান তোমার মুখে কখনো বাধে না।

সেইটেই আমার প্রধান গুণ। আপনাকে যারা জানে আমি সেই অগামাগের দলে।

মুখ খুলে গেছে, কিন্তু আর নয়, এবার থামো। মাস্টারমশায়ের কথা হচ্ছিল, এখন উঠে পড়ল তোমার নিজের কথা।

তাতে দোষ হয়েছে কী। বিষয়টা তো উপাদেয়, যাকে বলে ইন্টারেস্টিং।

বিষয়টা সর্বদাই রয়েছে সামনে। তাকে তো স্বরণ করবার দরকার হয় না। তাকে যে ভোলাই শক্ত।

আচ্ছা, তা হলে মাস্টারের একটা বিশেষ পরিচয় দিই তোমাকে। এটা টুকে রাখবার যোগ্য। একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাস্টার জনকয়েক লোককে নেমস্তন্ন করেছিল। খবরটা তার মনে আছে কি না জানবার জন্যে সকাল-সকাল গেলুম তার বাড়িতে। সেবক কানাইয়ের সঙ্গে তার যে আলোচনাটা চলছিল, বলি সে কথাটা। কানাই বললে, জগদ্ধাত্রীপুজোর বাজারে গলদা চিংড়ির দাম চড়ে গেছে, তাই এনেছি ডিমডয়ালী কাঁকড়া।

মাস্টার ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলে, কাঁকড়া কী হবে।

ও বললে, লাউ দিয়ে কোল, সে তোফা হবে।

আমি বললুম, মাস্টার, গলদা চিংড়ির উপর তোমার লোভ ছিল?

মাস্টার বললে, ছিল বই-কি।

তা হলে তো লোভ সম্বরণ করতে হবে।

তা কেন। লোভটা প্রস্তুত হয়েই আছে, তাকে শাণ্ট্ ক'রে চালিয়ে দেব কাঁকড়ার লাইনে।

দেখছি, তোমাকে বিস্তর শাণ্ট্ করতে হয়।

মাস্টার বললে, কাঁকড়ার কোল তো খেয়েছি অনেকবার, সম্পূর্ণ মন দিই নি। এবার যখন দেখলুম কানাইয়ের ছিভে জল এসেছে, তখন তার সিক্ত রসনার নির্দেশে খাবার সময় মনটা খুঁকে পড়বে কাঁকড়ার দিকে, রসটা পাব বেশি ক'রে। কাঁকড়ার কোলটাকে ও যেন লাল পেন্সিলে আঙুরলাইন ক'রে দিলে; ওটাকে ভালো করে মুগস্থ করবার পক্ষে সুবিধে হল আমার।

মাস্টার জিগেস করলে, আঠি-বাধা ওটা কী এনেছিস।

কানাই বললে, সজনের ডাঁটা।

মাস্টার গগর্বে আমার দিকে চেয়ে বললে, এই দেখো মজা। ও বাজারে যাবার সময় আমার মনে ছিল লাউডগা। ও বাজার থেকে ফিরে এস, আমি পেয়ে গেলুম সজনের ডাঁটা। হকুম না করবার এই সুবিধে।

আমি বললুম, সজনের ডাঁটা না এনে ও যদি আনত চিচিঙ্গে ?

মাস্টার জবাব দিলেন, তা হলে ক্ষণকালের জন্যে ভাবনা করতে হত। নাম জিনিসটার প্রভাব আছে। চিচিঙ্গে শব্দটা লোভজনক নয়। কিন্তু, কানাই যদি ওটা বিশেষ ক'রে বাছাই করে আনত, তা হলে সংসার কাটাবার একটা উপলক্ষ হত। জীবনে সব-প্রথমে ভেবে দেখবার সুযোগ হত 'দেখাই থাক-না' ; হয়তো আবিষ্কার করতুম, ওটা মন্দ চলে না। চিচিঙ্গে পদার্থটার বিরুদ্ধে অন্ধ বিরাগ দূর হয়ে উপভোগ্যের সীমানা বেড়ে যেত। এমনি করেই কাব্যে কবিতা তো নিছের কচিতে আমাদের কচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিকে আওলাইন করাই তাঁদের কাজ।

তোমার কচির প্রসার বাড়াবার কাজে কানাইয়ের আরও এমন হাত আছে ?

আছে বই-কি। ও না থাকলে পিড়িং শাকে আমি কোনোদিন ননোবোগই দিতুম না। শব্দটা আমাকে মারত ধাক্কা। সংসারে সংসারমুক্তিই তো অধিকারদাপ্তি।

সেই মহৎ কাজে আছে তোমার কানাই।

তা মানতে হবে, ভাই। ওর ইচ্ছার যোগে আমার ইচ্ছার সংকীর্ণতা ঘুচে যায় প্রতিদিন। আমি একলা থাকলে এমনটা ঘটত না।

বুঝলুম, কিন্তু কানাইয়ের ইচ্ছার সীমানাটা—

বাড়িয়েছি বই-কি। পূর্ববঙ্গের লোক, কলাইয়ের ডালের নাম শুনতে পারত না। আজকাল ছিঙ দিয়ে কলাইয়ের ডাল ও খাচ্ছে বেশ।

এমন সময়ে কানাইয়ের পুনঃপ্রবেশ। বললে, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, আজ দইটা আনি নি। কবরেজমশায় বলেন, রাত্রে দইটা বারণ।

দইয়ের দাম চড়ে গেছে বললে বিরক্তি হয়, এইজন্তে কবরেজমশায়কে পাড়তে হল। সাহসনা দেবার জন্তে বললে, অল্প একটু আদার রস মিশিয়ে পাংলা চা বানিয়ে দেব, শীতের রাত্রে উপকার দেবে।

আমি জিগেস করলেম, কী বল হে মাস্টার, আদা দিয়ে চা সবাইকে খাওয়াবে না কি।

সবাইকার কথা বলব কী করে। যারা থাকে তারা থাকে। হতে পারে উপকার। যারা থাকে না তাদের অপকার হবে না।

আমি বললুম, মাস্টার, চীন-দার্শনিকের উপদেশমতে তোমার গেরস্থালিতে মনিব নেই বুঝি ?

না।

তা হলে চাকরই বা আছে কেন।

মনিব না থাকলেই চাকর স্বতই থাকে না।

তোমার এখানে চাকরে মনিবে বেমালুম মিশিয়ে গিয়ে একটা দৌগিক পদার্থ খাড়া হয়েছে বুঝি ?

মাস্টার হেসে বললে, অক্সিজেন হাইড্রোজেনের দাহ মেজাজ ঘুচে গিয়ে দৌহে মিলে একেবারে জল।

আমি বললুম, যদি বিয়ে করতে ভায়া, পাড়া ছেড়ে চীনের দর্শন দৌড় দিত। থেকেও থাকবে না, গিন্নি এমন নিবিশেষ পদার্থ নয়। মুখের উপর দোনটা টেনেও তোমার সংসারে সে হত অতিশয় স্পষ্ট। তার রাজ্যে রাজত্বটা তার কটাক্ষে পেরে দৌলা ; সর্বদা ধাক্কা লাগাত, কখনো পিঠে, কখনো বুকে।

মাস্টার বললে, তা হলে কতটা রিটার্ন টিকিট না কিনেই দৌড় মারত ডেরাগাঁড়ি-থায়, গিন্নিও অন্তর্দান করত ইন্টার্ন বেকল রেলের রাস্তা বেয়ে বাপের বাড়িতে।

মাস্টার মাঝে মাঝে হাসির কথা বলে, কিন্তু হাসে না।

পুপুদিদি বললে, আমাদের মাস্টারমশায়কে নিয়ে যদি গল্পের পালা বাদতে হয় কিরকম করে বাদ।

তা হলে দশ লক্ষ বছর বাদ দিষ্ট।

তার মানে, আজগুবি গল্প বানাতে, অথচ আজকের দিনের বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীর শক্তি থাকত না।

কোনো সাহিত্যওয়াল। কখনো সাক্ষীর ভয় করে না। আসল কথা, আমার গল্পটা ছুটে উঠতে যুগান্তরের দরকার করবে। কেন, সেইটে বুঝিয়ে বলি—পৃথিবী-সৃষ্টির গোড়াকার মালমসলা ছিল পাথর লোহা প্রভৃতি মোটা মোটা ভারী ভারী জিনিস। তারই ঢালাই পেটাই চলেছিল অনেককাল। কঠোরের বে-আকৃতা ছিল বহু যুগ ধরে। অবশেষে নরম মাটি পৃথিবীকে জ্বামল আশ্রয়ে ঢাকা দিয়ে সৃষ্টিকর্তার ঘেন লক্ষ্য

রক্ষা করলে। তখন জীবজন্তু আসরে নামল সুপাকার হাড়মাংসের বোকাই নিয়ে ; মোটা মোটা বর্ম প'রে তারা দুশো পাঁচশো মৌন অসভ্য লেজ টেনে টেনে বেড়াতে লাগল। তারা ছিল দর্শনধারী জীব। কিন্তু সেই মাংসবাহীর দল সৃষ্টিকর্তার পছন্দসই হল না। আবার চলল বহু যুগ ধরে নিষ্ঠুর পরীক্ষা। শেষকালে এল মনোবাহী মানুষ। লেজের বাহন্য গেল ঘুচে, হাড়মাংস হল পরিমিত, কড়া চামড়াটা নরম হয়ে এল ফকে। না রইল শিঙ, না রইল ক্ষুর, না রইল নখের জোর, চার পা এসে ঠেকল দুটিমাত্র পায়ে। বোকা গেল, বিদাতা তাঁর হাতিয়ার চালাচ্ছেন সৃষ্টির যুগটাকে ক্রমশ নৃশঙ্ক করে আনবার জন্তে। স্থলে সৃশ্বে জড়িয়ে আছে মানুষ। মনের সঙ্গে মাংসের চলেছে ঠেলাঠেলি, মারামারি। বিদাতা পুনশ্চ মাথা নাড়ছেন, উহ, হল না। লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এটাও টিকবে না ; এ আপনিই আপনাকে নিকেশ করে দেবে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে। যাবে কতক লক্ষ বছর কেটে। মাংস পড়বে করে, মন উঠবে একেশ্বর হয়ে। সেই বিস্তৃত মনের যুগে তোমার মাস্টারমশায় বসেছেন শরীররিক্ত ক্লাসে। মনে করে দেখো, তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালী হচ্ছে ছাত্রদের মনো নিজেই মেলাতে থাকা মনের উপর মন বিছিয়ে, বাইরের বাবা নেই বললেই হয়।

স্থল বুদ্ধির বাবাও নেই ?

সেটা না থাকলে বুদ্ধি মাত্রই হয়ে পড়ে বেকার। ভালো-মন্দ বোকা-বুদ্ধিমানের ভেদ আছেই। চরিত্র আছে নানা রকমের। ভাবের বৈচিত্র্য আছে, ইচ্ছার স্বাভাব্য আছে। এখন তিনিই ভালো মাস্টার যিনি সেই অনেকের মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন, শিক্ষা এখন অসুরে অসুরে।

দাদানশায়, ইদুলটা কোথায় আছে সেটা ঠিক মনে আনতে পারছি নে।

পৃথিবীতে তিনটে বাসা আছে— এক সমুদ্রতলে, আর-এক ভূতলে, আর আছে আকাশে যেখানে সূর্য হাওয়া আর সূর্যতর আলো। এইখানটা আজ আছে খালি আগামী যুগের জন্তে।

তা হলে তোমার ক্লাস চলেছে সেই হাওয়ায় সেই আলোয়। কিন্তু, ছাত্রদের চেহারাটা কিরকম।

বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাদের আকার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আকারের আধার নেই।

তা হলে বোধ হচ্ছে নানা রঙের আলোয় তারা গড়া।

সেইটেই সম্ভব। তোমাদের বিজ্ঞান-মাস্টার তো সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বজগতে সূর্য আলোর কণাই বহুরূপী হয়ে স্থল রূপের ভান করছে। সেদিন আলো আপন আদিম সূর্যরূপেই প্রকাশ পাবে। ক্লাসে তোমরা সবাই আলো করে বসবে।

সেদিন ওটিন-স্নো-ওয়ালারা একেবারে দেউলে হয়ে গেছে।

দেউলে কেন, আলো হয়ে গেছে।

দেউলে হয়ে যাওয়ার মানেই তো আলো হয়ে যাওয়া।

আমি কোন্ রঙের আলো হব, দাদামশায়।

সোনার রঙের।

আর তুমি ?

আমি একেবারে বিস্তৃত রেডিয়াম।

সেদিন আলোয় আলোয় লড়াই হবে না তো ? ইলেক্ট্রন নিয়ে হবে না কি কাড়াকাড়ি।

ভাবনা ধরিয়ে দিলে। লীগ অফ লাইট্‌স্‌এর দরকার হবে বোধ হচ্ছে। ইলেক্ট্রন নিয়ে টানাটানির গুজব এখনি শুনতে পাচ্ছি।

ভালোই তো দাদামশায়। বীররসের কবিতা তোমার ভাষায় উজ্জল বর্ণে বর্ণিত হবে। ঐ যাঃ, ভাষা থাকবে তো ?

শব্দের ভাষা নিছক ভাবের ভাষায় গিয়ে পৌঁছবে, ব্যাকরণ মুগ্ধ করতে হবে না।

আচ্ছা, গান ?

গান হবে রঙের সংগত। বড়ো সহজ হবে না। তান যখন ঠিকরে পড়তে থাকবে, বলক মারবে আকাশের দিকে দিকে। তখনকার তানসেনরা দিগন্তে অরোরা বোরিয়ালিস বানিয়ে দেবে।

আর, তোমার গদ্যকাব্য কী হবে বলে তো।

তাতে লোহার ইলেক্ট্রনও মিশবে, আবার সোনারও।

সেদিনকার দিদিমা পছন্দ করবে না।

আমার ভরসা আছে সেদিনকার আধুনিক নাংনিরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।

তা হলে সেই আলোর বুকে তোমার নাংনি হয়েই ভুগ্নাব। এবারকার মতো দেহ-ধারিণীর 'পরে নৈষ রক্ষা কোরো। এখন চলুন সিনেমায়।

কিসের পাল।

বৈদেহীর বনবাস।

১৪

পরদিন সকালবেলায় প্রাতরাশে আমার নির্দেশমত পুপেদিদি নিয়ে এল পাথরের পাতে ছোলাভিজ্ঞে এবং গুড়। বর্তমান যুগে পুরাকালীন গোড়ীয় বাস্তবিকের রেনেসাঁস-প্রবর্তনে লেগেছি। দিদিমণি জিগেস করলে, চা হবে কি।

আমি বললুম, না, খেজুর-রস।

দিদি বললে, আজ তোমার মুখখানা অমন দেখছি কেন। কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছ না কি।

আমি বললুম, স্বপ্নের ছায়া তো মনের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করেছে— স্বপ্নও মিলিয়ে যায়, ছায়ারও চিহ্ন থাকে না। আজ তোমার ছেলেমানুষির একটা কথা বারবার মনে পড়ছে, ইচ্ছে করছে বলি।

বলো-না।

সেদিন লেখা বন্ধ ক'রে বারান্দায় বসে ছিলাম। তুমি ছিলে, সুকুমারও ছিল। সঙ্গে হয়ে এল, রাস্তার বাতি জালিয়ে গেল, আমি বসে বসে সত্যযুগের কথা বানিয়ে বানিয়ে বলছিলাম।

বানিয়ে বলছিলে! তার মানে ওটাকে অসত্যযুগ ক'রে ভুলছিলে।

ওকে অসত্য বলে না। যে রশ্মি বেগ্নির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না। ব'লেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্নি-পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্ট্রা-ঐতিহাসিক।

আর তোমার ব্যাখ্যা করতে হবে না। কী বলছিলে বলো।

আমি তোমাদের বলছিলাম, সত্যযুগে মানুষ বই প'ড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।

কী মানে হল বুঝতে পারছি নে।

একটু মন দিয়ে শোনো বলি। বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান ?

দৃঢ় বিশ্বাস।

জান, কিন্তু সে জানার সাড়ে-পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হ'ত।

তা হলে তুমি বলতে চাও আমরা কিছুই জানি নে ?

জানিই নে তো। সবাই মিলে ধরে নিয়েছি যে জানি, সেই আপোষে ধরে নেওয়ার উপরেই আমাদের কারবার।

কারবার তো ভালোই চলছে।

চলছে, কিন্তু এ সত্যযুগের চলা নয়। সেই কথাই তোমাদের বলছিলুম— সত্যযুগে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

যেদের মন প্রত্যক্ষকে আঁকড়ে থাকে ; ভেবেছিলেন আমার কথাটা অত্যন্ত অবাস্তব ঠেকবে পুপুর কাছে, ভালোই লাগবে না। দেখলুম একটু ঔৎসুক্য হয়েছে। বললে, বেশ মজা।

একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেই বললে, আচ্ছা, দাদামশায়, আজকাল তো সাহায্যে অনেক বুজুর্গি করছে ; মরা মানুষের গান শোনাচ্ছে, দূরের মানুষের চেহারা দেখাচ্ছে, আবার শুনছি সিসেকে সোনা করছে— তেমনি একদিন হয়তো এমন একটা বিদ্রোহের খেলা খেলাবে যে ইচ্ছে করলে একজন আর-একজনের মধ্যে মিলে যেতে পারবে।

অসম্ভব নয়। কিন্তু, তুমি তা হলে কী করবে। কিছুই লুকোতে পারবে না।

সর্বনাশ ! সব মানুষেরই যে লুকোবার আছে অনেক।

লুকোনো আছে ব'লেই লুকোবার আছে। যদি কারও কিছুই লুকোনো না থাকত তা হলে দেখা-বিন্দি খেলার মতো সবার সব ক্ষেত্রেই লোকব্যবহার হ'ত।

কিন্তু, লজ্জার কথা যে অনেক আছে।

লজ্জার কথা সকলেরই প্রকাশ হলে লজ্জার ধার চলে যেত।

আচ্ছা, আনার কথা কী বলতে যাচ্ছিলে তুমি।

সেদিন আমি তোমাকে জিগেস করেছিলুম, তুমি যদি সত্যযুগে জন্মাতে তবে আপনাকে কী হয়ে দেখতে তোনার ইচ্ছে হত। তুমি ফস্ ক'রে বলে ফেললে, কাবুলি বেড়াল।

পুপে মস্ত ক্ষাপা হয়ে বলে উঠল, কথ'খনো না। তুমি বানিয়ে বলচ।

আনার সত্যযুগটা আমার বানানো হতে পারে কিন্তু তোমার যুগের কথাটা তোমারই। ওটা ফস্ করে আমি-ছেন বাচালও বানাতে পারতুম না।

এর থেকে তুমি কি মনে করেছিলে আমি খুব বোকা।

এই মনে করেছিলুম যে, কাবুলি বেড়ালের উপর অত্যন্ত লোভ করেছিলে অথচ কাবুলি বেড়াল পাবার পথ তোমার ছিল না, তোমার বাবা বেড়াল জন্তটাকে দেখতে

পারতেন না। আমার মতে সত্যযুগে বেড়াল কিনতেও হ'ত না, পেতেও হ'ত না, ইচ্ছে করলেই বেড়াল হতে পারা যেত।

মানুষ ছিলুম, বেড়াল হলুম— এতে কী সুবিধেটা হল। তার চেয়ে যে বেড়াল কেনাও ভালো, না কিনতে পারলে না পাওয়া ভালো।

ঐ দেখো, সত্যযুগের মহিমাটা মনে ধারণা করতে পারছ না। সত্যযুগের পুপে আপনার সীমানা বাড়িয়ে দিত বেড়ালের মধ্যে। সীমানা লোপ করত না। তুমি তুমিও থাকতে, বেড়ালও হতে।

তোমার এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

সত্যযুগের ভাষায় মানে আছে। সেদিন তো তোনাদের অধ্যাপক প্রমথবাবুর কাছে শুনেছিলে, আলোকের অণুপরমাণু বৃষ্টির মতো কণাবর্ষণও বটে আবার নদীর মতো তরঙ্গধারাও বটে। আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে নৃষি, হয় এটা নয় ওটা; কিন্তু বিজ্ঞানের বুদ্ধিতে একই কালে দুটোকেই মেনে নেয়। তেমনি একই কালে তুমি পুপও বটে, বেড়ালও বটে— এটা সত্যযুগের কথা।

দাদামশায়, যতই তোমার বয়স এগিয়ে চলছে ততই তোমার কথাগুলো অবোধ্য হয়ে উঠছে, তোমার কবিতারই মতো।

অংশেষে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যাব তারই পূর্বলক্ষণ।

সেদিনকার কথাটা কি ঐ কাবুলি বেড়ালের পরে আর এগোল না।

এগিয়েছিল। স্বকুমার এক কোণে বসে ছিল, সে স্বপ্নে কথা বলার মতো ব'লে উঠল, আনার ইচ্ছে করে শালগাছ হয়ে দেখতে।

স্বকুমারকে উপহাসিত করবার স্বযোগ পেলে তুমি খুশি হতে। ও শালগাছ হতে চায় শুনে তুমি তো হেসে অস্থির। ও চমকে উঠল লজ্জায়। কাজেই ও বেচারির পক্ষ নিয়ে আমি বললেম— দক্ষিণের হাওয়া দিল কোথা থেকে, গাছটার ডাল ছেয়ে গেল কুলে, ওর মজ্জার ভিতর দিয়ে কী মায়াময়ের অদৃশ্য প্রবাহ বয়ে যায় যাতে ঐ রূপের গন্ধের ভোজবাস্তি চলতে থাকে। ভিতরের থেকে সেই আবেগটা জানতে ইচ্ছা করে বই-কি! গাছ না হতে পারলে বসন্তে গাছের সেই অপরিমিত রোমাঞ্চ অনুভব করব কী করে।

আমার কথা শুনে স্বকুমার উৎসাহিত হয়ে উঠল; বললে, আমার শোবার ঘরের জানলা থেকে যে শালগাছটা দেখা যায়, বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার মাথাটা আমি দেখতে পাই; মনে হয়, ও স্বপ্ন দেখছে।

শালগাছ স্বপ্ন দেখছে শুনে বোধ হয় বলতে যাচ্ছিলে, কী বোকার মতো কথা।
বাধা দিয়ে ব'লে উঠলুম, শালগাছের সমস্ত জীবনটাই স্বপ্ন। ও স্বপ্নে চলে এসেছে
বীজের থেকে অঙ্কুরে, অঙ্কুর থেকে গাছে। পাতাগুলোই তো ওর স্বপ্নে-কওয়া কথা।

সুকুমারকে বললুম, সেদিন যখন সকালবেলায় ঘন মেঘ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছিল আমি
দেখলুম, তুমি উত্তরের বারান্দায় রেলিঙ ধ'রে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। কী ভাবছিলে
বলো দেখি।

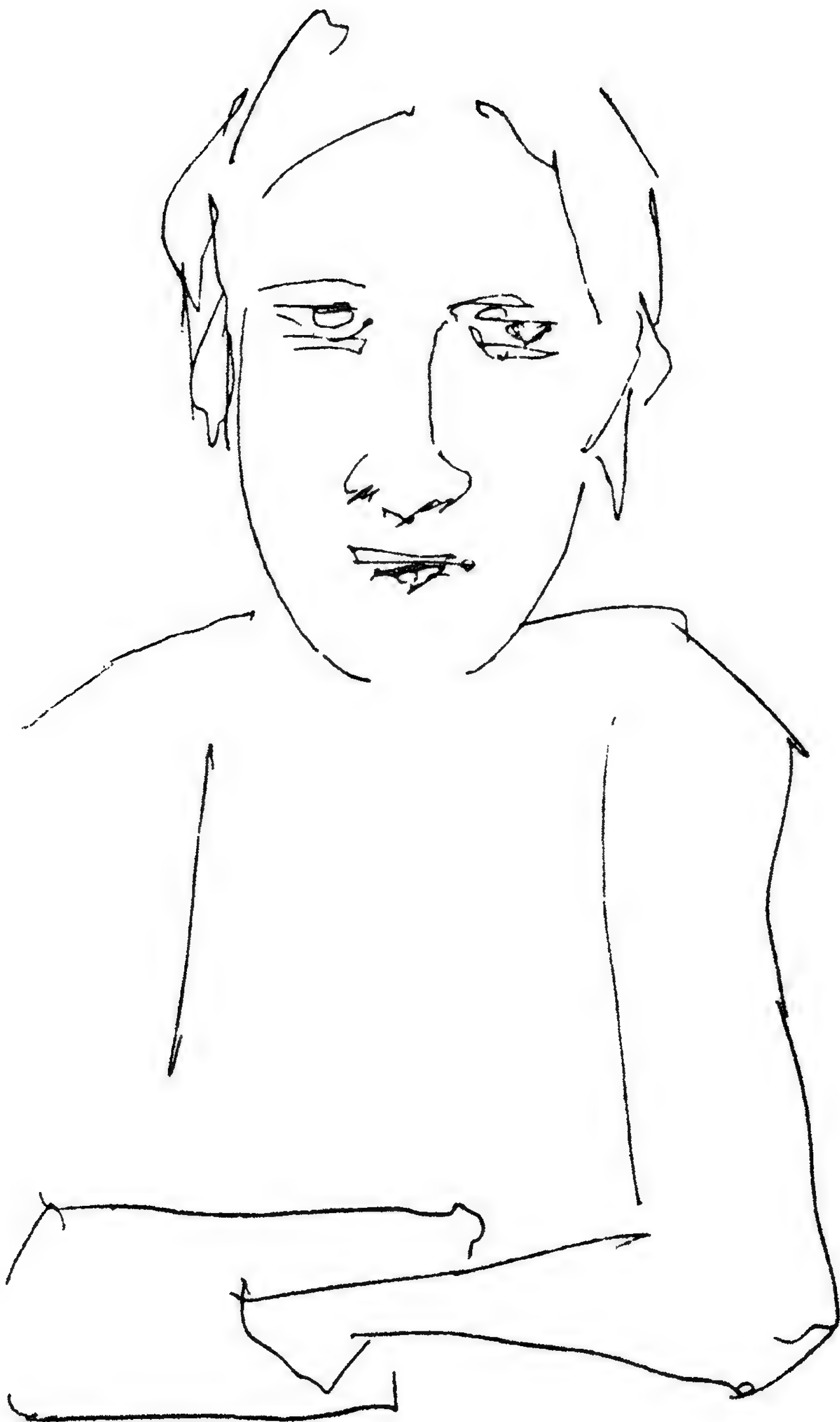
সুকুমার বললে, জানি নে তো কী ভাবছিলুম।

আমি বললুম, সেই না-জানা ভাবনায় ভ'রে গিয়েছিল তোমার সমস্ত মন মেঘে-
ভরা আকাশের মতো। সেইরকম গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে
যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনাই বর্ষায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়,
শীতের সকালের রোদে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায়
ওদের ডালে ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে ফুলের মঞ্জুরিতে।

আজও মনে পড়ে সুকুমারের চোখ দুটো কিরকম এতখানি হয়ে উঠল। সে বললে,
আমি যদি গাছ হতে পারতুম তা হলে সেই বকুনি দির্দৃষ্টি করে আমার সমস্ত গা বেয়ে
উঠত আকাশের মেঘের দিকে।

তুমি দেখলে সুকুমার আগরটা দখল করে নিচ্ছে। ওকে নেপথ্যে সরিয়ে তুমি
এলে সামনে। কথা পাড়লে, আচ্ছা, দাদামশায়, এখন যদি সত্যযুগ আসে তুমি কী
হতে চাও।

তোমার বিশ্বাস ছিল, আমি ম্যাস্টোডন কিম্বা মেগাথেরিয়াম হতে চাইব—
কেননা, জীব-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের প্রাণীদের সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে এর কিছুদিন
আগেই আলোচনা করেছি। তখন তরুণ পৃথিবীর হাড় ছিল কাঁচা, পাকা রকম ক'রে
জমাট হয়ে ওঠে নি তার মহাদেশ, গাছপালাগুলোর চেহারা ছিল বিশ্বকর্তার প্রথম
ভুলির টানের। সেইদিনকার আদিম অরণ্যে সেইদিনকার অনিশ্চিত শীত-গ্রীষ্মের
অধিকারে এই-সব ভীমকায় জন্তুগুলোর জীবযাত্রা চলছে কিরকম করে তা স্পষ্টরূপে
কল্পনা করতে পারছে না আজকের দিনের মানুষ, এই কথাটা তোমার শোনা ছিল
আমার মুখে। পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম অভিযানের সেই মহাকাব্য-যুগটাকে স্পষ্ট ক'রে
জানবার ব্যাকুলতা তুমি আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছিলে। তাই আমি যদি
হঠাৎ ব'লে উঠতুম 'সকালের রোঁয়াওয়ালা চার-পাত-ওয়ালা হাতি হওয়া আমার
ইচ্ছে', তা হলে তুমি খুশি হতে। তোমার কানুলি বেড়াল হওয়ার থেকে এই
ইচ্ছে বেশি দূরে পড়ত না, আমাকে তোমার দলে পেতে। হয়তো আমার মুখে



ঐ ইচ্ছেটাই বাজু হ'ত। কিন্তু, স্কুমারের কথাটা আমার মনকে টেনে নিয়েছিল
অন্য দিকে।

পুপে বলে উঠল, জানি, জানি, স্কুমারদা'র সঙ্গেই তোমার মনের মিল ছিল বেশি।
আমি বললুম, তার একমাত্র কারণ, ও ছিল ছেলে, আমিও ছেলে হয়েই জন্মেছিলুম
একদিন। ওর ভাবনার ছাঁচ ছিল আমারই শিশু ভাবনার ছাঁচে। তুমি সেদিন
তোমার খেলার হাঁড়িকুঁড়ি নিয়ে ভাবী গৃহস্থালির যে স্বপ্নলোক বানিয়ে তুলে খুশি হতে
সেটা দেখতে পেতুম একটু তফাত থেকে। তুমি তোমার খেলার খোঁকাকে
কোলে ক'রে যখন নাচাতে, তার স্নেহের রসটা ঘোলো আনা পাবার সাদ্য আমার
ছিল না।

পুপু বললে, আচ্ছা, সে কথা থাক, সেদিন তুমি কী হতে ইচ্ছে করছিলে বলে।

আমি হতে চেয়েছিলুম একগানা দৃশ্য অনেকখানি জায়গা জুড়ে। সকালবেলার
প্রথম প্রহর, মাঘের শেষে হাওয়া চড়েছে উতলা, পুরোনো অশ্রুগাছটা ঠকল হয়ে
উঠেছে ছেলেমানুষের মতো, নদীর জলে উঠেছে কলরব, উচুনিচু ডাডায় কাপ্সা
দেখাচ্ছে দলবঁধা গাছ। সমস্তটার পিছনে গোলা আকাশ; সেই আকাশে একটা
সুন্দরতা, মনে হচ্ছে যেন অনেক দূরের ও-পার থেকে একটা ঘন্টার ধ্বনি কানতম হয়ে
গেছে বাতাসে, যেন রোদ্দুরে নিশিয়ে দিয়েছে তার কথাটাকে : বেলা যায়।

তোমার মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, একগানা গাছ হওয়ার চেয়ে নদী বন আকাশ
নিয়ে একগানা সমগ্র ভূদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কল্পনা তোমার কাছে অনেক বেশি সৃষ্টিছাড়া
বোধ হল।

স্কুমার বললে, গাছপালা নদী সবটার উপরে তুমি ছড়িয়ে মিলিয়ে গেছ মনে
করতে আমার ভারি মজা লাগছে। আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।

বতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে
আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

স্কুমার বললে, তুমি যেটা বললে ওটা কি ছবিতে একেছ।

হ্যাঁ, একেছি।

আমিও একটা আঁকব।

স্কুমারের স্পর্শের কথা শুনে তুমি বলে উঠলে, পারবে না কি তুমি আঁকতে।

আমি বললুম, ঠিক পারবে। আঁকা হয়ে গেলে ভাই, তোমারটা আমি নেব, আমারটা তোমাকে দেব।

সেদিন এই পর্যন্ত হল আমাদের আলাপ।

এইবার আমাদের সেদিনকার আসরের শেষ কথাটা ব'লে নিই। তুমি চলে গেলে তোমার পাখরাকে ধান খাওয়াতে। স্বকুমার তখনো বসে বসে কী ভাবতে লাগল। আমি তাকে বললুম, তুমি কী ভাবছ বলব?

স্বকুমার বললে, বলো দেখি।

তুমি ভেবে দেখছ, আরও কী হয়ে যেতে পারলে ভালো হয়— হয়তো প্রথম-মেদ-করা আষাঢ়ের বৃষ্টি-ভেজা আকাশ, হয়তো পুছোর ছুটিতে ঘরমুখো পাল-তোলা পাল্লিনোকোথানি। এই উপলক্ষ্যে আমি তোমাকে আমার জীবনের একটা কথা বলি। তুমি জান ধীরকে আমি কত ভালোবাসতুম। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর পেলুম তার টাইফয়েড, সেই বিকেলেই চলে গেলুম মুল্লিগঞ্জে তাদের বাড়িতে। সাত দিন, সাত রাত কাটল। সেদিন ছিল অত্যন্ত গরম, রৌদ্র প্রখর। দূরে একটা কুকুর ককণ হরে আর্তনার করে উঠছিল; শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। বিকেলে রোদ পড়ে আসছে, পশ্চিম দিক থেকে ডুমুরগাছের ছায়া পড়েছে বারান্দার উপরে। পাড়ার গয়লানি এসে জিগেস করলে, তোমাদের পোকাবাবু কেমন আছে গা। আমি বললুম, মাথার কষ্ট, গা-জ্বালা আজ কমেছে। যারা সেবা করছিল তারা আজ কেউ কেউ ছুটি নেবার অবকাশ পেলে। দুজন ডাক্তার কুগি দেখে বেরিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ ক'রে কী পরামর্শ করলে; বুঝলেম, আশার লক্ষণ নয়। চুপ করে বসে রইলুম; মনে হল, কী হবে শুনে। সাদাফের ছায়া ঘনিয়ে এল। দেখা গেল সামনের মহানিমগাছের মাথার উপরে সন্ধ্যাতারা দেখা দিয়েছে। দূরের রাস্তায় পাট-বোঝাই গোরুর গাড়ির শব্দ আর শোনা যায় না। সমস্ত আকাশটা ঘেন ঝিম্ঝিম্ করছে। কী জানি কেন মনে মনে বলছি, পশ্চিম-আকাশ থেকে ঐ আসছে রাত্রিক্রপিলী শাস্তি, স্নিগ্ধ, কালো, শুক্ল। প্রতিদিনই তো আসে কিন্তু আজ এল বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে, স্পর্শ নিয়ে। চোখ বুজে সেই ধীরে-চলে-আসা রাত্রির আবির্ভাব আমার সমস্ত অঙ্গকে মনকে ঘেন আবৃত করে দিলে। মনে মনে বললুম, ওগো শাস্তি, ওগো রাত্রি, তুমি আমার দিদি, আমার অনাদি কালের দিদি। দিন-অবসানের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে টেনে নাও তোমার বুকের কাছে আমার ধীরভাইকে; তার সকল জ্বালা যাক জুড়িয়ে একেবারে।— দুই পहर পেরিয়ে গেল; একটা কান্নার ধনি উঠল রোগীর শিয়রের কাছ থেকে; নিশ্চয়

রাস্তা বেয়ে গেল চলে ডাক্তারের গাড়ি তার ঘরে ফিরে। সেদিন আমার সমস্ত-মন-ভরা একটি রাত্রির রূপ দেখেছি ; আমি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলুম, পৃথিবী যেমন তার স্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দেয় নিশীথের ধ্যানাবরণে।

কী জানি স্বকুমারের কী মনে হল ; সে অধীর হয়ে বলে উঠল, আমাকে কিন্তু তোমার ঐ দিদি অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অমন চুপিচুপি নিয়ে যাবে না। পুজোর ছুটির দিনে যেদিন সকালে দশটা বাজবে, কাউকে ইস্কুলে যেতে হবে না, ছেলেরা সবাই যেদিন গেছে রথতলার মাঠে ব্যাটবল খেলতে, সেইদিন আমি খেলার মতো করেই হঠাৎ মিলিয়ে যাব আকাশে ছুটির দিনের রোদহরে।

তুনে আমি চুপ করে রইলুম ; কিছু বললুম না।

পুপেদিদি বললে, কাল থেকে স্বকুমারদা'র কথা তুমি প্রায়ই বলছ। তার মনো আমার উপরে একটুখানি খোঁচা থাকে। তুমি কি মনে কর তোমার ভালোবাসার অংশ নিয়ে স্বকুমারদা'র সঙ্গে আমার ছেলেবেলাকার যে ঝগড়া ছিল সেটা এখনও আছে।

হয়তো একটুখানি আছে বা। সেইটেকে একেবারে ক্ষইয়ে দেব বলেই বারবার তার কথা তুলি। আরও একটুখানি কারণ আছে।

কী কারণ বলোই-না।

কিছুদিন আগে স্বকুমারের বাবা ডাক্তার নিতাই এসেছিলেন আমার কাছে বিদায় নিতে।

কেন, বিদায় নিতে কেন।

তোমাকে বলব মনে করেছিলুম, বলা হয় নি। আজ বলি। নিতাই চাইলে স্বকুমার আইন পড়ে, স্বকুমার চাইলে সে ছবি আঁকা শেখে নন্দলালবাবুর কাছে। নিতাই বললে, ছবি আঁকা বিজ্ঞেয় আঙুল চলে, পেট চলে না।

স্বকুমার বললে, আমার ছবির খিদে যত পেটের খিদে তত বেশি নয়।

নিতাই কিছু কড়া করে বললে, সে কথাটা তোমার প্রমাণ ক'রে দেবার দরকার হয় নি, পেট সহজেই চলে যাচ্ছে।

কথাটা বিস্ত্রী লাগল তার মনে, কিন্তু হেসে বললে, কথাটা সত্যি—এর প্রমাণ দেওয়া উচিত।

বাবা ভাবলে, এইবার ছেলে আইন পড়তে বসবে। স্বকুমারের বরিশালের মাতামহ খেপা গোছের মানুষ ; স্বকুমারের স্বভাবটা তাঁরই ছাঁচের, চেহারারও সাদৃশ্য আছে। দুজনের 'পরে দুজনের ভালোবাসা পরম বন্ধুর মতো। পরামর্শ হল দুজনে মিলে ; স্বকুমার টাকা পেল কিছু, কখন চলে গেল বিলেতে কেউ জানে না। বাবাকে চিঠি লিখে গেল, আপনি চান না আমি ছবি আঁকা শিখি, শিখব না। আপনি চান অর্থকরী বিজ্ঞা আয়ত্ত করব, তাই করতে চললুম। যখন সমাপ্ত হবে প্রণাম করতে আসব, আশীর্বাদ করবেন।

কোনু বিজ্ঞে শিখতে গেল কাউকে বলে নি। একটা ডায়ারি পাওয়া গেল তার ডেস্কে। তার থেকে বোঝা গেল, সে যুরোপে গেছে উড়ো জাহাজের মাঝিগিরি শিখতে। তার শেষ দিকটা কপি করে এনেছি। ও লিখেছে—

মনে আছে, একদিন আমার ছত্রপতি পক্ষীরাজে চড়ে পুপুদিদিকে চন্দ্রলোক থেকে উদ্ধার করতে যাত্রা করেছিলুম আমাদের ছাদের এক দার থেকে আর-এক দারে। এবার চলেছি কলের পক্ষীরাজকে বাগ মানাতে। যুরোপে চন্দ্রলোকে যাবার আয়োজন চলেছে। যদি সুবিধা পাই যাত্রীর দলে আমিও নাম লেখাব। আপাতত পৃথিবীর আকাশ-প্রদক্ষিণে হাত পাকিয়ে নিতে চাই। একদিন আমি তার দাদামশায়ের দেখাদেখি যে ছবি এঁকেছিলুম, দেখে পুপুদিদি হেসেছিল। সেই দিন থেকে দশ বছর ধরে ছবি আঁকা অভ্যাস করেছি, কাউকে দেখাই নি। এখনকার আঁকা দুখানা ছবি রেখে গেলুম পুপের দাদামশায়ের সন্তে। একটা ছবি জল-স্থল-আকাশের একতান সংগত নিয়ে, আর-একটা আমার বরিশালের দাদামশায়ের। পুপের দাদামশায় ছবি দুটো দেখিয়ে পুপেদিদির সেদিনকার হাসি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তো ভালোই, নইলে যেন ছিঁড়ে ফেলেন। আমার এবারকার যাত্রায় চন্দ্রলোকের মাঝপথেই পক্ষীরাজের পাখা ভাঙা অসম্ভব নয়। যদি ভাঙে তবে এক নিমেষে সত্যলোকে পৌঁছব, সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে একেবারে মিলে যাব পৃথিবীর সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, আকাশের খেয়া-পারাপারে যদি নৈপুণ্য ঘটে, তা হলে একদিন পুপুদিদিকে নিয়ে শূন্যপথে পাড়ি দিয়ে আসব, মনে এই ইচ্ছে রইল। সত্যযুগে বোধ হয় ইচ্ছে আর ঘটনা একই ছিল। চেষ্টা করব ধ্যানযোগে ইচ্ছেকেই ঘটনা ব'লে ধরে নিতে। ছেলেবেলা থেকে অকারণে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকাই আমার অভ্যাস। ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ। এই বিলীলমান ইচ্ছেগুলো বিশ্বসৃষ্টির কোন কাজে লাগে কী জানি। বেড়াক উড়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাসে উৎসারিত ইচ্ছেগুলো সেই আকাশেই যে আকাশে আজ আমি উড়তে চলেছি।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পুপুদিদি ব্যাকুল হয়ে উঠে জিগেস করলে, স্বকুমারদা'র এখনকার খবর কী।

আমি বললুম, সেইটেই পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তার বাবা বিলেতে সন্ধান করতে চলেছেন।

বিবর্ণ হয়ে গেল দিদির মুখ। আন্তে আন্তে উঠে ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলে।

আমি জানি, স্বকুমারের আঁকা সেই ছেলেমানুষি পুপুদিদি আপন ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছে।

আমি চশমাটা মুছে ফেলে চলে গেলুম স্বকুমারদের বাড়ির ছাদে। সেই ডাঙা ছাতাটা সেখানে নেই, নেই সেই আতসবাজির আধপোড়া কাঠি।

ଗଲ୍ଲସଲ୍ଲ



ସବିତ୍ରନାଥ ଓ ଘୋଷିନୀ ରମିତା

নন্দিতাকে

শেষ পারানির খেয়ায় তুমি
দিনশেষের নেয়ে
অনেক জ্ঞানার থেকে এলে
নূতন-জ্ঞান মেয়ে ।
ফেরাবে মুখ যাবে যখন
ঘাটের পারে আনি,
হয়তো হাতে দিয়ে যাবে
রাতের প্রদীপখানি ।

১২ মার্চ ১৯৪১

আমারে পড়েছে আঁধা ডাক,
কথা কিছু বলতেই হবে ।
বিশ্রাম করা পড়ে থাক,
পার যদি মন নাও তবে ।
ফিস্‌ফিস্‌ কর যদি ব'সে
থস্‌থস্‌ মেজতে পা ঘ'ষে—
অভ্যাগ হয়ে গেছে এ ব্যাঘাত ঘট,
ধেন কিছু হয় নাই থাকি এইমতো ।
গস্তীর হয়ে করি প্রফেটের ভান ;
শুনে যে ঘুমিয়ে পড়ে সে বুদ্ধিমান ।

আমাদের কাল থেকে ভাই,
এ কালটা আছে বহু দূরে—
মোটা মোটা কথাগুলো ভাই
ব'লে থাকি খুব মোটা সুরে
পিছনেতে লাগে নাকো ফেউ
বৃদ্ধের প্রতি সম্মানে,
যারতে আসে না ছুটে কেউ
কথা যদি নাও লয় কানে ।
বিধাতা পরিয়ে দিল আজ
নারদমুনির এই সাজ ।
ভাই তো নিয়েছি কাজ উপদেষ্টার ;
এ কাজটা সবচেয়ে কম চেষ্টার ।

তবে শোনো— মন্দ সে মন্দই,
হোক-না সে গুপিনাথ, হোক-না সে নন্দই ।
আর শোনো— ভালো যে সে ভালো,
চোখ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো
অন্ধ বা বললেয় দেখো তাই ভেবে,
পাছে ভুলে যাও তাই নোট লিখে নেবে ।
যদি বল, পুরাতন এই কথাগুলো—
আমিও যে পুরাতন সেটা নাহি ভুলো ।

৮ মার্চ ১২৪০

১৪০০



গল্পসল্প

বিজ্ঞানী

দাদামশায়, নীলমণিবাবুকে তোমার এত কেন ভালো লাগে আমি তো বুঝতে পারি নে।

এই প্রশ্নটা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্ত প্রশ্ন, এর ঠিক উত্তর কখন লোকে দিতে পারে।

তোমার হৈয়ালি রাখে। অমন এলোমেলো আলুথালু অগোছালো লোককে মেয়েরা দেখতে পারে না।

ওটা তো হল সার্টিফিকেট, অর্থাৎ লোকটা খাঁটি পুরুষমানুষ।

জান না তুমি, উনি কথায় কথায় কী রকম হলুদুল বাধিয়ে তোলেন। হাতের কাছে যেটা আছে সেটা ঠর হাতেই ঠেকে না। সেটা উনি খুঁজে বেড়ান পাড়ায় পাড়ায়।

ভক্তি হচ্ছে তো লোকটার উপরে।

কেন শুনি।

হাতের কাছের জিনিসটাই যে সবচেয়ে দূরের সে কখন লোক জানে, অথচ নিশ্চিত হয়ে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।

যেমন তুমি।

আমাকে তুমি খুঁজে পাও নি বুঝি?

খুঁজে পেলে যে রস মারা যেত, যত খুঁজছি তত অবাক হচ্ছি।

আবার তোমার হৈয়ালি।

উপায় নেই। দিদি, আমার কাছে আসও তুমি সহজ নও, নিতি নূতন।

কুসমি দাদামশায়ের গলা জড়িয়ে বললে, দাদামশায় এটা কিন্তু শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, ও কথা থাক। নীলবাবুর বাড়িতে কাল কী রকম হলুদুল বেধেছিল সে খবরটা বিধুমামার কাছে শোনো-না।

কী গো মামা, কী হয়েছিল শুনি।

অন্তত— বিধুমামা বললেন, পাড়ায় রব উঠল নীলুবাবুর কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না ;
খোঁজ পড়ে গেল মশারির চালে পৰ্বন্ত । ডেকে পাঠালে পাড়ার মাধুবাবুকে ।

বললে, ওহে মাধু, আমার কলমটা ?

মাধুবাবু বললেন, জানলে খবর দিতুম ।

ধোবাকে ডাক পড়ল, ডাক পড়ল হাক নাপিতকে । বাড়িহুঙ্ক সবাই যখন হাল ছেড়ে
দিয়েছে তখন তার ভায়ে এসে বললে, কলম যে তোমার কানেই আছে গোঁজা ।

যখন কোনো সন্দেহ রইল না তখন ভায়ের গালে এক চড় মেরে বললে, বোকা
কোথাকার, যে কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না সেটাই খুঁজছি ।

রামাধর থেকে স্ত্রী এল বেরিয়ে ; বললে, বাড়ি মাথায় করেছ যে ।

নীলু বললে, যে কলমটা চাই ঠিক সেই কলমটা খুঁজে পাচ্ছি না ।

বউদি বললে, যেটা পেয়েছ সেই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেও, যেটা পাও নি সেটা
কোথাও পাবে না ।

নীলু বললে, অন্তত সেটা পাওয়া যেতে পারে কুতূদের দোকানে ।

বউদি বললে, না গো, দোকানে সে মাল মেলে না ।

নীলু বললে, তা হলে সেটা চুরি গিয়েছে ।

তোমার সব জিনিসই তো চুরি গিয়েছে, যখন চোখে পাও না দেখতে । এখন
চূপচাপ করে এই কলম নিয়েই লেখো, আমাকেও কাজ করতে দাও । পাড়াহুঙ্ক
অস্থির করে তুলেছ ।

সানাত্ত একটা কলম পাব না কেন শুনি ।

বিনি পরসায় মেলে না ব'লে ।

দেব টাকা— ওরে ভুতো ।

আজ্ঞে—

টাকার খলিটা যে খুঁজে পাচ্ছি না ।

ভুতো বললে, সেটা যে ছিল আপনার জামার পকেটে ।

তাই নাকি ।

পকেট খুঁজে দেখলে খলি আছে, পলিতে টাকা নেই । টাকা কোথায় গেল ।

খুঁজতে বেরোল টাকা । ডেকে পাঠালে ধোবাকে ।

আমার পকেটের খলি থেকে টাকা গেল কোথায় ।

ধোবা বললে, আমি কী জানি । ও জামা আমি কাচি নি ।

ডাকল ওসমান দজ্জিকে ।

আমার খলি থেকে টাকা গেল কোথায়।

ওসমান য়েগে উঠে বললে, আছে আপনার লোহার সিন্দুকে।

জামাইবাড়ি থেকে স্ত্রী ফিরে এসে বললে, হয়েছে কী।

নীলমণি বললে, বাড়িতে ডাকাত পুঁতেছি। পকেট থেকে টাকা নিয়ে গেছে।

স্ত্রী বললে, হায় রে কপাল—সেদিন যে বাড়িওয়ালাকে বাড়িভাড়া শোধ করে দিলে ৩৫ টাকা।

তাই নাকি। বাড়িওয়ালা যে বাড়ি ছাড়বার জন্য আমাকে নোটিশ পাঠিয়েছিল।

তুমি ভাড়া শোধ করে দিয়েছিলে তার পরেই।

সে কী কথা। আমি যে বাহুড়বাগানে নিমচাঁদ হালদারের কাছে গিয়ে তার বাড়ি ভাড়া নিয়েছি।

স্ত্রী বললে, বাহুড়বাগান, সে আবার কোন্ চুলোয়।

নীলমণি বললে, রোসো, ভেবে দেখি। সে যে কোন্ গলিতে কোন্ নম্বরে তা তো মনে পড়ছে না। কিন্তু লোকটির সঙ্গে লেখাপড়া হয়ে গেছে—দেড় বছরের জন্য ভাড়া নিতে হবে।

স্ত্রী বললে, বেশ করেছে, এখন ছুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কে।

নীলমণি বললে, সেটা তো ভাবনার কথা নয়। আমি ভাবছি, কোন্ নম্বর, কোন্ গলি। আমার নোটবুকে বাহুড়বাগানের বাসা লেখা আছে। কিন্তু, মনে পড়ছে না, গলিটার নম্বর লেখা আছে কি না।

তা, তোমার নোটবইটা বের করো-না।

মুশকিল হয়েছে যে, তিন দিন ধরে নোটবইটা খুঁজে পাচ্ছি না।

ভায়ে বললে, বাবা, মনে নেই? সেটা যে তুমি দিদিকে দিয়েছিলে স্কুলের কপি লিখতে।

তোমার দিদি কোথায় গেল।

তিনি তো গেছেন এলাহাবাদে যেসোমশায়ের বাড়িতে।

মুশকিলে ফেললি দেখছি। এখন কোথায় খুঁজে পাই, কোন্ গলি, কোন্ নম্বর।

এমন সময়ে এসে পড়ল নিমচাঁদ হালদারের কেরানি। সে বললে, বাহুড়বাগানের বাড়ির ভাড়া চাইতে এসেছি।

কোন্ বাড়ি।

সেই যে ১৩ নম্বর শিবু সমাদারের গলি।

বাঁচা গেল, বাঁচা গেল। শুনছ, গিন্নি? ১৩ নম্বর শিবু সমাদারের গলি। আর ভাবনা নেই।

শুনে আমার মাখামুণ্ড হবে কী।

একটা ঠিকানা পাওয়া গেল।

সে তো পাওয়া গেল। এখন দুটো বাড়ির ভাড়া সামলাবে কেমন করে।

সে কথা পরে হবে। কিন্তু, বাড়ির নম্বর ১৩, গলির নাম শিবু সমাদারের গলি।

কেরানির হাত ধরে বললে, ভায়া, বাঁচালে আমাকে। তোমার নাম কী বলো, আমি নোটবইয়ে লিখে রাখি।

পকেট চাপড়ে বললে, ঐ যা। নোটবই আছে এলাহাবাদে। মুখস্থ করে রাখব— ১৩ নম্বর, শিবু সমাদারের গলি।

কুসমি বললে, এই কলম হারানো ব্যাপারটা তো সামান্য কথা। যেদিন ঠর একপাটি চটিছুতো পাওয়া যাচ্ছিল না, সেদিন নীলমণিবাবুর ঘরে কী দুকুমারই বেধে গিয়েছিল। ঠর স্বী পণ করলেন, তিনি বাপের বাড়ি চলে যাবেন। চাকর-বাকররা একজোট হয়ে বললে, যদি একপাটি চটিছুতো নিয়ে তাদের সন্দেহ করা হয় তবে তারা কাঞ্জে ইস্তফা দেবে— তার উপরে সে চটিতে তিন তালি দেওয়া।

আমি বললুম, ধবরটা আমারও কানে এসেছিল; দেখলেম ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গেলুম নীলুর বাড়িতে। বললুম, ভায়া, তোমার চটি হারিয়েছে?

সে বললে, দাদা, হারায় নি, চুরি গিয়েছে, আমি তার প্রমাণ দিতে পারি।

প্রমাণের কথা তুলতেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম। লোকটা বৈজ্ঞানিক; একটা দুটো তিনটে ক'রে যখন প্রমাণ বের করতে থাকবে আমার নাওয়া-খাওয়া যাবে ঘুচে। আমাকে বলতে হল, নিশ্চয় চুরি গিয়েছে। কিন্তু এমন আশ্চর্য চোরের আড্ডা কোথায় যে একপাটি চটি চুরি করে বেড়ায়, আমার জানতে ইচ্ছে করে।

নীলু বললে, ওইটেই হচ্ছে তর্কের বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, চামড়ার বাজার চড়ে গিয়েছে।

আমি দেখলুম, এর উপরে আর কথা চলবে না। বললুম, নীলুভাই, তুমি আসল কথাটি ধরতে পেরেছ। আজকালকার দিনে সবই বাজার নিয়ে। তাই আমি দেখেছি, মল্লিকদের দেউড়িতে পাঁচ-সাত দিন অস্তর মুচি আসে দরওয়ানজির নাগরা

জুতোয় স্বকতলা বসাবার ভান ক'রে। তার দৃষ্টি রাস্তার লোকদের পায়ে দিকে।

তখনকার মতো তাকে আমি ঠাণ্ডা করেছিলুম। তার পরে সেই চটি বেরোল বিছানার নীচে থেকে। নীলুর পেয়ারের কুকুর সেটা নিয়ে আনন্দে ছেঁড়াছেঁড়ি করেছে। নীলুর সবচেয়ে দুঃখ হল এই চটির সন্ধান পেয়ে, তার প্রমাণ গেল যারা।

কুসমি বললে, আচ্ছা, দাদাশশায়, মাহুষ এতবড়ো বোকা হয় কী ক'রে।

আমি বললুম, এমন কথা বোলো না দিদি, অকশাস্ত্রে ও পণ্ডিত। অঙ্ক ক'বে ক'বে ওর বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হয়েছে যে, সাধারণ লোকের চোখে পড়ে না।

কুসমি নাক তুলে বললে, ওর অঙ্ক নিয়ে কী করছেন উনি।

আমি বললুম, আবিষ্কার। চটি কেন হারায় সেটা উনি সব সময়ে খুঁজে পান না, কিন্তু চাঁদের গ্রহণ লাগায় সিকি সেকেণ্ড দেরি কেন হয়, এ তাঁর অঙ্কের ডগায় ধরা পড়বেই। আত্মকাল তিনি প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন যে, জগতে গ্রহ তারা কোনো জ্বিনিসই ঘুরছে না, তারা কেবলই লাফাচ্ছে। এ জগতে কোটি কোটি উচ্চিঃড়ে ছাড়া পেয়েছে। এর অকাটা প্রমাণ রয়েছে ওর খাতায়। আমি আর কথা কই নে, পাছে সেগুলো বের করতে থাকেন।

কুসমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, ওর কি সবই অনাস্থি। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে উচ্চিঃড়ের লাফ মেপে মেপে অঙ্ক কষছেন! এ না হলে ওর এমন দশা হবে কেন।

আমি বললুম, ওর ঘরকরা ঘুরতে ঘুরতে চলবে না, তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে লাফাতে চলবে।

কুসমি বললে, এতক্ষণে বুঝলুম, এ লোকটার কলমই বা হারায় কেন, একপাটি চটিই বা পাওয়া যায় না কেন, আর তুমিই বা কেন ওকে এত ভালোবাস। যত পাগলের উপরে তোমার ভালোবাসা, আর তারাই তোমার চার দিকে এসে জোটে।

দেখো দিদি, সবশেষে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি ভাবছ, নীলু লক্ষীছাড়াকে নিয়ে তোমার বউদি রেগেই আছেন। গোপনে তোমাকে জানাচ্ছি— একেবারে তার উল্টো। ওর এই এলোমেলো আলুখালু ভাব দেখেই তিনি মুগ্ধ। আমারও সেই দশা।

*

* *

পাঁচটা না বাজতেই ভুলুরাম শর্মা সে
 টেরিটিবাজারে গেল মনিবের ফরমাশে ।
 মরেছে অতুল মামা, আজি তারি আত্মের
 জোগাড় করতে হবে নানাবিধ খাণ্ডের ।
 বাবু বলে, ভুলো না হে, আরো চাই দরমা ।
 ভোলা কি সহজ কথা, বলে ভুলু শর্মা ।
 কাঁকরোল কিনে বসে কাঁচকলা কিনতে ।
 শাঁকআলু কচু কিনা পারে না সে চিনতে ।
 বকুনি খেয়েছে যেই মাছগুলো মিনুসের,
 তাড়াতাড়ি কিনে বসে কামরাঙা তিন সের ।
 বাবু বলে, কামরাঙা এতগুলো হবে কী ।
 ভুলু বলে, কানে আমি শুনি নাই তবে কি ।
 দেখলেম কিনছে যে ও পাড়ার সরকার,
 বুঝলেম নিশ্চয় আছে এর দরকার ।
 কানে শুঁজে নিয়ে তার হিসাবের লেখনী
 বাবু বলে, ফিরে দিয়ে এসো তুমি এখনি ।
 মনিবের হুকুমটা শুনল সে ইঁ ক'রে,
 ফিরে দিতে চ'লে গেল কিছু দেরি না ক'রে ।
 বললে সে, দোকানিকে যা করেছি ক্ষম—
 ফলগুলো ফিরে নিতে করে নি টুঁ শম ।
 বাবু কয় 'টাকা কই' টান দিয়ে তামাকে ।
 ভুলু বলে, সে কথাটা বল নি তো আমাকে ।
 এসেছি উজাড় ক'রে বাজারের বুড়িটা—
 দোকানির মাঁসি ছিল, হেসে খুন বুড়িটা ।

রাজার বাড়ি

কুমারি জিগেস করলে, দাদামশায়, ইকমাসির বোধ হয় খুব বুদ্ধি ছিল।

ছিল বই-কি, তোর চেয়ে বেশি ছিল।

থমকে গেল কুমারি। অল্প একটু দীর্ঘনিশ্বাস কেলে বললে, ওঃ, তাই বুঝি তোমাকে এত ক'রে বশ করেছিলেন?

তুই যে উন্টো কথা বললি, বুদ্ধি দিয়ে কেউ কাউকে বশ করে?

তবে?

করে অবুদ্ধি দিয়ে। সকলেরই মধ্যে এক জায়গায় বাসা ক'রে থাকে একটা বোকা, সেইখানে ভালো ক'রে বোকামি চালাতে পারলে মানুষকে বশ করা সহজ হয়। তাই তো ভালোবাসাকে বলে মন ভোলানো।

কেমন ক'রে করতে হয় বলো-না।

কিছু জানি নে, কী যে হয় সেই কথাই জানি, তাই তো বলতে যাচ্ছিলুম।

আচ্ছা, বলো।

আমার একটা কাঁচামি আছে, আমি সব-তাতেই অবাক হয়ে যাই; ইক ঐখানেই পেয়ে বসেছিল। সে আমাকে কথায় কথায় কেবল তাক লাগিয়ে দিত।

কিন্তু, ইকমাসি তো তোমার চেয়ে ছোটো ছিলেন।

অস্তুত বছর-খানেক ছোটো। কিন্তু আমি তার বয়সের নাগাল পেতুম না; এমন করে আমাকে চালাতো, যেন আমার দুধে-দাত ওঠে নি। তার কাছে আমি হা করেই থাকতুম।

ভারি মজা।

মজা বই-কি। তার কোনো-এক সাতমহল রাজবাড়ি নিয়ে সে আমাকে ছুটফুটিয়ে তুলেছিল। কোনো ঠিকানা পাই নি। একমাত্র সেই জানত রাজার বাড়ির সন্ধান। আমি পড়তুম খার্ড্‌নম্বর রীডার; মাস্টার মশায়কে জিগ্গেস করেছি, মাস্টার মশায় হেসে আমার কান ধ'রে টেনে দিয়েছেন।

জিগ্গেস করেছি ইককে, রাজবাড়িটা কোথায় বলো-না।

সে চোখ দুটো এতখানি ক'রে বলত, এই বাড়িতেই।

আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম ই। ক'রে ; বলতুম, এই বাড়িতেই !—
কোনখানে আমাকে দেখিয়ে দাও-না।

সে বলত, মস্তুর না জানলে দেখবে কী করে।

আমি বলতুম, মস্তুর আমাকে ব'লে দাও-না। আমি তোমাকে আমার কাঁচা-
আম-কাটা কিছুকটা দেব।

সে বলত, মস্তুর বলে দিতে মানা আছে।

আমি জিগ্গেস করতুম, ব'লে দিলে কী হয়।

সে কেবল বলত, ও বাবা !

কী যে হয় জানাই হল না।—তার ভঙ্গী দেখে গা শিউরে উঠত। ঠিক
করেছিলুম, একদিন যখন ইক রাজবাড়িতে যাবে আমি যাব লুকিয়ে লুকিয়ে তার
পিছনে পিছনে। কিন্তু সে যেত রাজবাড়িতে আমি যখন যেতুম ইস্কুলে। একদিন
জিগ্গেস করেছিলুম, অল্প সময়ে গেলে কী হয়। আবার সেই 'ও বাবা'। পীড়াপীড়ি
করতে সাহসে কুলোত না।

আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে নিজেকে ইক খুব একটা-কিছু মনে করত। হঠাৎ
একদিন ইস্কুল থেকে আসতেই সে ব'লে উঠেছে, উঃ, সে কী পেলায় কাণ্ড।

বাস্তব হয়ে জিগেস করেছি, কী কাণ্ড।

সে বলেছে, বলব না।

ভালোই করত—কানে শুনতুম কী একটা কাণ্ড, মনে বরাবর রয়ে যেত পেলায়
কাণ্ড।

ইক গিয়েছে হস্তদস্তর মাঠে, যখন আমি ঘুমোতুম। সেখানে পক্ষীরাজ ঘোড়া
চ'রে বেড়ায়, মানুষকে কাছে পেলেই সে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায় মেঘের মতো।

আমি হাততালি দিয়ে ব'লে উঠতুম, সে তো বেশ মজা।

সে বলত, মজা বই-কি ! ও বাবা !

কী বিপদ ঘটতে পারত শোনা হয় নি, চূপ করে গেছি মুখের ভঙ্গী দেখে। ইক
দেখেছে পরীদের ঘরকন্না—সে বেশি দূরে নয়। আমাদের পুকুরের পূর্ব পাড়িতে যে
চীনেবট আছে তারই মোটা মোটা শিকড়গুলোর অঙ্ককার ফাঁকে ফাঁকে। তাদের
ফুল তুলে দিয়ে সে বণ করেছিল। তারা ফুলের মধু ছাড়া আর কিছু খায় না।
ইকর পরী-বাড়ি যাবার একমাত্র সময় ছিল দক্ষিণের বারান্দায় যখন নীলকমল মাষ্টারের
কাছে আমাদের পড়া করতে বসতে হত।

ইককে জিগ্গেস করতুম, অল্প সময়ে গেলে কী হয়।

ইক বলত, পরীয়া প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়।

আরও অনেক কিছু ছিল তার অবাক-করা বুলিতে। কিন্তু, সবচেয়ে চমক লাগাতো সেই না-দেখা রাজবাড়িটা। সে যে একেবারে আমাদের বাড়িতেই, হয়তো আমার শোবার ঘরের পাশেই। কিন্তু, মস্তুর জানি নে যে। ছুটির দিনে ছপ্পর বেলায় ইকর সঙ্গে গেছি আমতলার, কাঁচা আম পেড়ে দিয়েছি, দিয়েছি তাকে আমার বহুমূল্য ঘসা ঝিহুক। সে খোশা ছাড়িয়ে শুলপো শাক দিয়ে বসে বসে খেয়েছে কাঁচা আম, কিন্তু মস্তুরের কথা পাড়লেই বলে উঠেছে, ও বাবা!

তার পরে মস্তুর গেল কোথায়, ইক গেল খন্তরবাড়িতে, আমারও রাজবাড়ি খোঁজ করবার বয়স গেল পেরিয়ে—ঐ বাড়িটা রয়ে গেল গর-ঠিকানা। দূরের রাজবাড়ি অনেক দেখেছি, কিন্তু ঘরের কাছেই রাজবাড়ি—ও বাবা!



খেলনা পোকাক হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো।

মা বলে, দেখ, ঐ আকাশে আছে লুকোনো।

পোকা শুধায়, ঘরের থেকে গেল কী ক'রে।

মা বলে যে, ঐ তো মেঘের থলিটা ভ'রে

নিয়ে গেছে ইজলোকের শাগন-ছেঁড়া ছেলে।

পোকা বলে, কখন এল, কখন খবর পেল।

মা বললে, ওরা এল যখন সবাই মিলি

চৌধুরীদের আমবাগানে লুকিয়ে গিয়েছিলি,

যখন ওদের ফলগুলো সব করলি বেবাক নষ্ট।

মেঘলা দিনে আলো তখন ছিল নাকো পট—

গাছের ছায়ায় চামর দিয়ে এসেছে মুখ ঢেকে,

কেউ আমরা জানি নে ভো কখন তারা কে কে।

কুকুরটাও ঘুমোচ্ছিল লেজেরে মুখ শুঁজে,

সেই স্বযোগে চুপিচুপি গিয়েছে ঘর খুঁজে।

আমরা ভাবি, বাতাস বুঝি লাগল বাতাসের ডালে,

কাঠবেড়ালি ছুটছে বুঝি আটচালাটার চালে।

তখন দিঘির বাধ ছাপিয়ে ছুটছে মাঠে জল,
 মাছ ধরতে হোঁ হোঁ রবে জুটছে মেয়ের দল ।
 তালের আগা ঝড়ের তাড়ায় শূন্যে মাথা কোটে,
 মেঘের ডাকে জানলাগুলো খড়্‌খড়িয়ে ওঠে ।
 ভেবেছিলুম, শাস্ত হয়ে পড়ছ ক্লাসে তুমি,
 জানি নে তো কখন এমন শিখেছ দুষ্টুমি ।
 খোকা বলে, ঐ যে তোমার ইচ্ছালোকের ছেলে—
 তাদের কেন এমনতরো দুষ্টুমিতে পেল ।
 ওরা যখন নেমে আসে আমবাগানের 'পরে—
 ডাল ভাঙে আর ফল ছেঁড়ে আর কী কাণ্ডটাই করে ।
 আসল কথা, বাদল যেদিন বনে লাগায় দোল,
 ডালে-পালায় লতায়-পাতায় বাধায় গুণ্‌গোল—
 সেদিন ওরা পড়াশুনোর মন দিতে কি পারে,
 সেদিন ছুটির যাতন লাগায় অভয়নদীর ধারে ।
 তার পরে সব শাস্ত হলে ফেরে আপন দেশে,
 মা তাহাদের বকুনি দেয়, গল্প শোনায় শেষে ।

বড়ো খবর

কুসমি বললে, তুমি যে বললে এখনকার কালের বড়ো বড়ো সব পবন তুমি
 আমাকে শোনাবে, নইলে আমার শিক্কা হবে কী রকম ক'রে দাদামশায় ।

দাদামশায় বললে, বড়ো খবরের খুলি বয়ে বেড়াবে কে বলো, তার মতো যে বিস্তর
 রাবিশ ।

সেগুলো বাদ দাও-না ।

বাদ দিলে খুব অল্প একটু বাকি থাকবে, তখন তোমার মনে হবে ছোটো খবর ।
 কিন্তু আসলে সে'ই খাটি পবন ।

আমাকে খাটি পবনই দাও ।

তাই দেব । তোমাকে যদি বি-এ পাশ করতে হ'ত, সব রাবিশই তোমায় টেবিলে
 উঠু করতে হত ; অনেক বাজে কথা, অনেক মিথো কথা, টেনে বেড়াতে হত খাতা

বোঝাই ক'রে।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, এখনকার কালের একটা খুব বড়ো খবর দাও দেখি খুব ছোটো ক'রে, দেখি তোমার কেমন ক্মতা।

আচ্ছা শোনো।

শাস্তিতে কাজ চলছিল।

মহাজনি নৌকায় ঘোরতর ঝগড়া চলছে পালে আর দাঁড়ে। দাঁড়ের দল ঠক্কাক করতে করতে মাঝির বিচারসভায় এসে উপস্থিত, বললে, এ তো আর সহ হয় না। ঐ যে তোমার অহংকরে পাল, বুক ফুলিয়ে বলে আমাদের ছোটোলোক। কেননা, আমরা দিনে রাতে নীচের পাটাতনে বাঁধা থেকে ঝল ঠেলে ঠেলে চলি। আর উনি চলেন খেয়ালে, কারও হাতের ঠেলার তোয়াক্কা রাখেন না। সেইজন্যেই উনি হলেন বড়োলোক। তুমি ঠিক করে দাও কার কদর বেশি। আমরা যদি ছোটো লোক হই তবে ছোট বেঁধে কাজে ইস্তফা দেব, দেখি তুমি নৌকো চালাও কী ক'রে।

মাঝি দেখলে বিপদ, দাঁড় ক'টাকে আড়ালে টেনে নিয়ে চুপিচুপি বললে, ওর কথায় কান দিয়ো না ভায়া। নিতান্ত ফাঁপা ভাষায় ও কথা ব'লে থাকে। তোমরা ছোয়ানরা সব মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল। আর, ঐ পাল করেন ফাঁকা বাবুয়ানা উপরের মহলে। একটু ঝোড়ো হাওয়া দিয়েছে কি উনি কাজ বন্ধ করে গুটিহুটি নেয়ে পড়ে থাকেন নৌকার চালের উপরে। তখন ফড়ফড়ানি বন্ধ, সাফাই পাওয়া যায় না। কিন্তু, সুখে-দুঃখে বিপদে-আপদে হাটে-ঘাটে তোমরাই আছ আমার ভরসা। ঐ নবাবির বোঝাটাকে যখন-তখন তোমাদের টেনে নিয়ে বেড়াতে হয়। কে বলে তোমাদের ছোটোলোক।

মাঝির ভয় হল, কথাগুলো পালের কানে উঠল বুঝি। সে এসে কানে কানে বললে, পাল-মশায়, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কে বলে যে তুমি নৌকো চালাও, সে তো মজুরের কর্ম। তুমি আপন ক্ষতিতে চল আর তোমার ইয়ারবন্দির তোমার ইশারায় পিছন-পিছন চলে। আবার ঝুলে পড় একটু যদি হাঁপ ধরে। ঐ দাঁড়গুলোর ঈশ্বরমিতে তুমি কান দিয়ো না ভায়া, ওদের এমনি ক'বে বেঁধে রেখেছি যে যতই ওদের ঝপঝপানি থাক-না কাজ না করে উপায় নেই।

ওনে পাল উঠল ফুলে। মেঘের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাই তুলতে লাগল।

কিন্তু, লক্ষণ ভালো নয়। দাঁড়গুলোর মজবুত হাড়, এখন কাত হয়ে আছে, কোন দিন ঝাড়া হয়ে দাঁড়াবে, লাগাবে ঝাপটা, চৌচির হয়ে যাবে পালের গুমর। ধরা পড়বে

দাঁড়েই চালায় নৌকো— ঝড় হোক, ঝাপট হোক, উজান হোক, ভাঁটা হোক

কুসমি বললে, তোমার বড়ো খবর এইটুকু বই নয় ? তুমি ঠাট্টা করছ ।

দাদামশায় বললে, ঠাট্টার মতন এখন শোনাচ্ছে । দেখতে দেখতে একদিন বড়ো খবর বড়ো হয়েই উঠবে ।

তখন ?

তখন তোমার দাদামশায় ঐ দাঁড়গুলোর সঙ্গে তাল মেলানো অভ্যাস করতে বসবে ।

আর, আমি ?

যেখানে দাঁড় বড়ো বেশি কচ্কচ্ করে সেখানে দেবে একটু তেল ।

দাদামশায় বললেন, খাঁটি খবর ছোটো হয়েই থাকে, যেমন দীড় । ভালপালা নিয়ে বড়ো গাছ আসে পরে । এখন বুঝেছ তো ?

কুসমি বললে, হ্যাঁ, বুঝেছি ।

মুখ দেখে বোঝা গেল, বোঝে নি । কিন্তু কুসমির একটা গুণ আছে, দাদামশায়ের কাছে ও সহজে মানতে চায় না যে ও কিছু বোঝে নি । ওর ইচ্ছাসির চেয়ে ও বুদ্ধিতে যে কম, এ কথাটা চাপা থাকাই ভালো ।

•

•

পালের সঙ্গে দাঁড়ের বুঝি গোপন রেবারেষি,

মনে মনে তর্ক করে কার সমাদর বেশি ।

দাঁড় ভাবে যে, পাঁচ-ছকনা গোলাম তাহার পাছে,

একলা কেবল বড়ো মাঝি পালের তবে আছে ।

পাল ভাবে যে, জলের সঙ্গে দাঁড়ের নিভা বৈরি,

বাতাসকে ভো বন্ধে নিতে আমি সদাই তৈরি ;

আমার খাতির মিতার সঙ্গে ভালোবাসার জোরে,

ওরা মরে ঝেঁকে ঝেঁকেই শুধু লড়াই ক'রে—

ওঠে পড়ে পরের খেয়ে তাড়া,

আমি চলি আকাশ থেকে যখনি পাই সাড়া ।

চণ্ডী

দিদি, তুমি বোধ হয় ও পাড়ার চণ্ডীবাবুকে জান ?
জানি নে ! তিনি যে ডাকসাইটে নিদ্রুক ।

বিধাতার কারখানায় খাটি জিনিস তৈরি হয় না, মিশল থাকেই । দৈবাৎ এক-
একজন উৎরে যায় । চণ্ডী তারই সেরা নমুনা । ওর নিদ্রুকতার ভেজাল নেই । জান
তো, আমি আর্টিস্ট-মানুষ । সেইজন্যে এরকম খাটি জিনিস আমার দরবারে জুটিয়ে
আনি । একেবারে লোকটা জীনিয়স বললেই হয় । একটা এড়িয়ে গেলে আর খুঁজে
পাওয়া যাবে না । একদিন দেখি, অধ্যাপক অনিলের দরজায় কান দিয়ে কী শুনছে ।
আমি তাকে বললুম, অমন করে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছ কাকে হে ।

সেটাই যদি জানতুম তা হলে তো কথাই ছিল না । চার দিকে চোখ কান খুলে
রাখতে হয়, কাউকে বিশ্বাস করবার জো নেই— চোর-ছ্যাচড়ে দেশ ভরে গেল ।

বলো কী হে ।

শুনে অবাক হবেন, এই সেইদিন অমন আমার চাপার রঙের গামছাখানা আলনার
উপর থেকে বেনালুম গায়েব হয়ে গেল ।

বলো কী হে, গামছা !

আজ্ঞে হ্যা, গামছা বই-কি । কোণটাতে একটুখানি ছেঁড়া ছিল, তা সেলাই
করিয়ে নিয়েছিলুম ।

তুমি অনিলবাবুর দরজার কাছে অমন ঘুর-ঘুর করছিলে কেন । পরের ছেঁড়া
গামছা জোগাড় করবার যোগে তাঁকে ধরেছে নাকি ।

আরে ছি ছি, ঠাৱা হলেন বড়োলোক, গামছা কখনো চক্ষেও দেখেন নি । টাকিস
তোয়ালে না হলে ঠাৱ এক পা চলে না ।

তা হলে ?

আমি ভাবছিলুম, ঠাৱ পাওনা তো বেশি নয় । অথচ, এত বাবুজানা চলে
কী ক'রে ।

বোধ হয় ধার ক'রে !

আজকালকার বাজারে ধার তো সহজ নয়, তার চেয়ে সহজ ফাঁকি ।

আচ্ছা, তুমি পুলিশে খবর দিয়েছিলে নাকি ।

না, তার দরকার হয় নি। সেটা বেরোল আমার স্ত্রীর ময়লা কাপড়ের ঝড়ির ভিতর থেকে। কাউকেই বিশ্বাস করবার জো নেই।

কী বল তুমি, ওটা ঠিক জায়গাতেই তো ছিল।

আপনি সাদা লোক, আসল কথাটাই বুঝতে পারছেন না। আপনি জানেন তো আমার খালা কোচলুকে। কী রকম সে গায়ে ফুঁ দিবে বেড়ায়। পয়সা ছোট্ট কোথা থেকে। কাজটি করছেন তিনি, আর গিল্লি সেটাকে বেমানুম চাপা দিয়েছেন।

তুমি জানলে কী ক'রে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কি জানতে বাকি থাকে।

কখনো তাকে নিতে দেখেছ?

যে এমন কাজ করে সে কি দেখিয়ে দেখিয়ে করে। এ দিকে দেখুন-না, পুলিশ আছে চোখ বুজে, তারা যে বধরা নিয়ে থাকে। এই-সব উৎপাত আরম্ভ হয়েছে যখন থেকে দেখা দিয়েছেন ঐ আপনাদের গান্ধিমহারাজ।

এর মধ্যে তিনি আবার এলেন কোথেকে।

ঐ যে তাঁর অহিংস নীতি। দড়াধড় না পিটলে চোদ্দের চুরি রোগ কখনো সারে? তিনি নিজে থাকেন কপ্পি প'রে। এক পয়সা সম্বল নেই। এ-সব লম্বাচ ওড়া বুলি তাঁকেই সাড়ে। আমরা গেরস্থ মানুষ, শুনে চক্ষু স্থির হয়ে যায়। এ দিকে আর-এক নতুন ফন্দি বেরিয়েছে জানেন তো? ঐ যে ঘাকে আপনারা বলেন চাঁদা। তার মুনকা কম নয়। কিন্তু সেটা তলিয়ে যায় কোথায় তার হিসেব রাখে কে। মশায়, সেদিন আমারই ঘরে এসে উপস্থিত অনাথ-হাসপাতালের চাঁদা চাইতে। লজ্জা হয়, কী আর বলব। খাতা হাতে যিনি এসেছিলেন আপনারা সবাই তাঁকে জানেন। ডাক্তার—আর নাম করে কাজ নেই, কে আবার তাঁর কানে ওঠাবে। তিনি যে মাঝে মাঝে আসেন আমাদের ঘরে নাড়ী টিপতে। সিকি পয়সা দিতে হয় না বটে, তেমনি সিকি পয়সার ফলও পাই নে। তবু হাজার হোক, এম-বি তো বটে। এমনি হাল আমাদের তাঁর চিকিৎসা যে রোগীরা তাঁর কাছে ঘেঁষে না। কাজেই টাকার টানাটানি হয় বই-কি।

ছি ছি, কী বলছ তুমি।

তা মশায়, আমি মুখকোড় মানুষ। সত্যিকথা আমার বাধে না। ঔর মুখের সামনেই শুনিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু কী বলব, আমার ছেলেটাকে আমাদের কাজে রেখে আমার মুখ বন্ধ করেছেন। তার কাছ থেকেও মাঝে মাঝে ইশারা পাই। দক্ষিণহস্ত বেশ চলছে ভালো। বুঝছেন তো? আমাদের দেশে আজকালকার

ইংরমি যে কী রকম অসহ্য, তার আর-একটা নমুনা আপনাকে শোনাই।

কী রকম।

আমাদের পাড়ায় আছে একটা গোমুখা যাকে ওরা নাম দিয়েছে কবির। তাকে দিয়ে দেখুন আমার নামে কী লিখিয়েছে। ঘোর লাইবেল। নিন্দুকেরা দল পাঁকিয়েছে। পাড়ায় কান পাতবার জো নেই। থ্যাকশিয়ালি ব'লে চোঁচাচ্ছে আমার পিছনে পিছনে। এত সাহস হত না যদি না এদের পিছনে থাকত নামজাদা মুকুন্দ সব গাঙ্কিঙ্গির চেলা।

দেখি দেখি কী লিখেছে। মন্দ হয় নি তো। লোকটার হাত দোরস্ত আছে।—

আলো যার মিটমিটে,

স্বভাবটা খিটখিটে,

বড়োকে করিতে চায় ছোটো,

সব ছবি ভুষো মেজে

কালো ক'রে নিজেকে যে

মনে করে শুস্তাদ পোটো,

বিদাতার অভিশাপে

ঘুরে মরে ঝোপে ঝাপে,

স্বভাবটা যার বন্থেয়ালি,

থ্যাক থ্যাক করে মিছে

সব তাতে দাঁত খিঁচে

তারে নাম দিব থ্যাকশিয়ালি।

ও কী ও, আপনার দরজায় পুলিশ যে।

ব্যাপারটা কী।

চণ্ডীবাবুর ছেলের নামে কেস এসেছে।

হ্যাঁ, কিসের কেস।

অনাথ-হাগপাতালের চাঁদার টাকা তিনি ভেঙে বসেছেন।

মিথো কথা। আগাগোড়া পুলিশের সাজানো। আপনি তো জানেন, আমার ছেলে একসময় আহার নিদ্রা ছেড়ে গাঙ্কির নামে দরজায় দরজায় চাঁদা ভিক্ষে করে বেড়িয়েছিল, সেই অবধি বরাবর তার উপর পুলিশের নজর লেগে আছে। কিছু না, এটা পলিটিক্যাল মামলা।

দাদামশায়, তোমার এই গল্পটা আমার একটুও ভালো লাগল না

*

* *

যেমন পাঞ্জি তেমনি বোকা,

গোবর-ভরা মাথা,

লোকটা কে-যে ভেবে পাচ্ছি না তা ।

কবে যে কী বলেছিল ঠিক তা মনে নাই,

আচ্ছা ক'রে মুখের মতো জবাব দিতে চাই ;

কী যে জবাব, কার যে জবাব যদি মনে পড়ে—

প্রাণ ফিরে পাই ধড়ে ।

হাতে পেল দেওয়াই নাকে খত,

স্বীর ছিঁড়ে দিই নথ ।

রাফেল সে, পাঞ্জির অসম, শরতান মিটমিটে ;

দিনরাত্রির ইচ্ছে করে, ঘুঘু চরাই ভিটেঘ ।

বহুমানকে শিক্ষা দেব— অসহ এই ইচ্ছে

মনকে নাড়া দিচ্ছে ।

লোকটা কে-যে পষ্ট তা নয়, এই কথাটাষ্ট পষ্ট—

অতি খারাপ, নিতানুই সে নষ্ট ।

পপের মোড়ে বনি পেতেম দেখা

মনের কালটা কেড়ে নিতেম বনি থাকত একা ।

বুকটা ভ'রে অকথা সব জমে উঠছে ঢের,

লক্ষ্য মনে না পড়ে তো কাগজ করব বের,

যেখানে পাঠ নাম একটা করব নির্বাচন—

খালি পাবে মন ।

২

কাল তোমার ভালো লাগে নি চণ্ডীকে নিয়ে বকুনি। ও একটা ছবি মাত্র।
কড়া কড়া লাইনে আঁকা, ওতে রস নাই। আজ তোমাকে কিছু বলব, সে সত্যিকার
গল্প।

কুমমি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলো। তুমি তো সেদিন বললে,
বরাবর মানুষ সত্যি খবর দিয়ে এসেছে গল্পের মধ্যে মূড়ে। একেবারে ময়দার দোকান
বানিয়ে রেখেছে। সন্দেহের মধ্যে ছানাকে চেনাই যায় না।

দাদামশায় বললে, এ না হলে মানুষের দিন কাটত না। কত আদর-উপঢ়াস,
পারশ-উপঢ়াস, পঞ্চতন্ত্র, কত কী গাফানো হয়ে গেল। মানুষ অনেকখানি ছেলেমানুষ,
তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়। আর ভূমিকার কাজ নেই। এবার শুরু করা
যাক।—

এক যে ছিল রাজা, তাঁর ছিল না রাজধানী। রাজকন্টার সন্ধানে দূত গেল অন্ধ
বন কলিঙ্গ মগধ কোশল কাঙ্কী। তারা এসে খবর দেয় যে, মহারাজ, সে কী দেখলুম ;
কাক চোখের জলে মুক্তো করে, কাক হাসিতে থ'সে পড়ে মানিক ! কাক দেহ চাঁদের
আলোয় গড়া, সে যেন পূর্ণিমারাত্রের স্বপ্ন।

রাজা শুনেই বুঝলেন, কথাগুলি বাড়িয়ে বলা, রাজার ভাগ্যে সত্য কথা জোটে না
অশুচরদের মুখের থেকে। তিনি বললেন, আমি নিজে যাব দেখতে।

সেনাপতি বললেন, তবে ফৌজ ডাকি ?

রাজা বললেন, লড়াই করতে যাচ্ছি নে।

মন্ত্রী বললেন, তবে পাত্রমিত্রদের খবর দিই ?

রাজা বললেন, পাত্রমিত্রদের পছন্দ নিয়ে কস্তা দেখার কাজ চলে না।

তা হলে রাজহস্তী তৈরি করতে বলে দিই ?

রাজা বললেন, আমার একজোড়া পা আছে।

সঙ্গে কয়জন যাবে পেয়াদা ?

রাজা বললেন, যাবে আমার ছায়াটা।

আচ্ছা, তা হলে রাজবেশ পকন—চুনিপান্নার ছায়া, মানিক-লাগানো মুকুট, হীরে-
লাগানো কাঁকন আর গজমোতির কানবালা।

রাজা বললেন, আমি রাজার সঙ সেজেই থাকি, এবার সাজব সন্ন্যাসির সঙ।

মাথায় লাগালেন জটা, পরলেন কপনি, গায়ে মাখলেন ছাই, কপালে আঁকলেন তিলক আর হাতে নিলেন কমণ্ডলু আর বেলকাঠের দণ্ড। ‘বোম্ বোম্ মহাদেব’ ব’লে বেরিয়ে পড়লেন পথে। দেশে দেশে রটে গেল—বাবা পিনাকীশ্বর নেমে এসেছেন হিমালয়ের গুহা থেকে, তাঁর একশো-পঁচিশ বছরের তপস্শা শেষ হল।

রাজা প্রথমে গেলেন অঙ্গদেশে। রাজকন্যা খবর পেয়ে বললেন, ডাকো আমার কাছে।

কন্যার গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামল, চুলের রঙ যেন ফিঙের পালক, চোখ দুটিতে হরিণের চমকে-ওঠা চাহনি। তিনি বসে বসে সাজ করছেন। কোনো বাদি নিয়ে এল স্বর্ণচন্দন বাটা, তাতে মুখের রঙ হবে যেন চাঁপাফুলের মতো। কেউ বা আনল ভুঙ্গলাঙ্গন তেল, তাতে চুল হবে যেন পম্পাসরোবরের ঢেউ। কেউ বা আনল মাকড়সাজাল শাড়ি। কেউ বা আনল হাওয়াহাঙ্গা শুড়না। এই করতে করতে দিনের তিনটে প্রহর যায় কেটে। কিছুতেই কিছু মনের মতো হয় না। সন্ন্যাসিকে বললেন, বাবা, আমাকে এমন চোখ-ভোলানো সাজের সন্ধান বলে দাও, যাতে রাজরাজেশ্বরের লেগে যায় ধাঁধা, কাজকর্ম যায় ঘুচে, কেবল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দিনরাত্রি কাটে।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছুই চাই না?

রাজকন্যা বললেন, না, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, আচ্ছা, আমি তবে চললুম, সন্ধান মিললে নাইয় আবার দেখা দেব।

রাজা সেখান থেকে গেলেন বঙ্গদেশে। রাজকন্যা শুনলেন সন্ন্যাসীর নামডাক। প্রণাম করে বললেন, বাবা, আমাকে এমন কণ্ঠ দাও, যাতে আমার মুখের কথায় রাজরাজেশ্বরের কান যায় ভরে, মাথা যায় ঘুরে, মন হয় উতলা। আমার ছাড়া আর কারও কথা যেন তাঁর কানে না যায়। আমি যা বলাই তাই বলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই মন্ত্র আমি সন্ধান করতে বেরলুম। যদি পাই তবে ফিরে এসে দেখা হবে।

ব’লে তিনি গেলেন চলে।

গেলেন কলিঙ্গে। সেখানে আর-এক হাওয়া অন্তরমহলে। রাজকন্যা মন্ত্রণা করছেন কী ক’রে কাঞ্চী জয় ক’রে তাঁর সেনাপতি সেখানকার মহিষীর মাথা হেঁট করে দিতে পারে, আর কোশলের গুমরও তাঁর সহ হয় না। তার রাজলক্ষ্মীকে বাদি ক’রে

তীর পায়ে তেল দিতে লাগিয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীর খবর পেয়ে ডেকে পাঠালেন। বললেন, বাবা, শুনেছি সহস্ররী অস্ত্র আছে শ্বেতদ্বীপে যার তেজে নগর গ্রাম সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি বাক্যে বিশ্বাস করব, আমি চাই তীর পায়ের কাছে বড়ো বড়ো রাজবন্দীরা হাত জোড় করে থাকবে, আর রাজার মেয়েরা বন্দিনী হয়ে কেউ বা চামর দোলাবে, কেউ বা ছত্র ধরে থাকবে, আর কেউ বা আনবে তীর পানের বাটা।

সন্ন্যাসী বললেন, আর-কিছু চাই নে তোমার ?

রাজকন্যা বললেন, আর-কিছুই না।

সন্ন্যাসী বললেন, সেই দেশ-জালানো অস্ত্রের সন্ধানে চললুম।

সন্ন্যাসী গেলেন চলে। বললেন, দিক্।

চলতে চলতে এসে পড়লেন এক বনে। খুলে ফেললেন জুটাজুট। ঝরনার জলে স্নান ক'রে গায়ে ছাই ফেললেন ধুয়ে। তখন বেলা প্রায় তিনপ্রহর। প্রখর রোন, শরীর শ্রান্ত, ক্ষুধা প্রবল। আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে দেখলেন একটি পাতার ছাউনি। সেখানে একটি ছোটো চুলা বানিয়ে একটি মেয়ে শাকপাতা চড়িয়ে দিয়েছে রাঁধবার জন্ত। সে ছাগল চরায় বনে, সে মধু জড়ো করে রাজবাড়িতে জোগান দিতে। বেলা কেটে গেছে এই কাজে। এখন শুকনো কাঠ জালিয়ে শুরু করেছে রান্না। তার পরনের কাপড়খানি দাগপড়া, তার দুই হাতে দুটি শাখা, কানে লাগিয়ে রেখেছে একটি ধানের শিষ। চোখ দুটি তার ভোমরার মতো কালো। স্নান ক'রে সে ভিক্ষে চুল পিঠে মেল দিয়েছে যেন বাদলশেষের রাস্তির।

রাজা বললেন, বড়ো খিদে পেয়েছে।

মেয়েটি বললে, একটু সবুজ করুন, আমি অন্ন চড়িয়েছি, এখনি তৈরি হবে আপনার জন্ত।

রাজা বললেন, আর, তুমি কী খাবে তা হলে।

সে বললে, আমি বনের মেয়ে, জানি কোথায় ফলমূল কুড়িয়ে পাওয়া যায়। সেই আমার হবে ঢের। অতিথিকে অন্ন দিয়ে যে পুণ্য হয় গরিবের ভাগ্যে তা তো সহজে জোটে না।

রাজা বললেন, তোমার আর কে আছে।

মেয়েটি বললে, আছেন আমার বুড়ো বাপ, বনের বাইরে তীর কুঁড়েঘর। আমি ছাড়া তীর আর কেউ নেই। কাজ শেষ ক'রে কিছু খাবার নিয়ে বাই তীর কাছে। আমার জন্ত তিনি পথ চেয়ে আছেন।

রাজা বললেন, তুমি অন্ন নিয়ে চলো, আর আমাকে দেখিয়ে দাও সেই-সব ফলমূল
যা তুমি নিজের জুড়ো করে খাও।

কন্যা বললে, আমার যে অপরাধ হবে।

রাজা বললেন, তুমি দেবতার আশীর্বাদ পাবে। তোমার কোনো ভয় নেই।
আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বাপের অন্ত তৈরি অন্নের খালি সে মাথায় নিয়ে চলল। ফলমূল সংগ্রহ ক'রে
দুজনে তাই ধেয়ে নিলে। রাজা গিয়ে দেখলেন, বুড়ো বাপ কুঁড়েঘরের দরোজায়
ব'সে।

সে বললে, মা, আজ দেরি হল কেন।

কন্যা বললে, বাবা, অতিথি এনেছি তোমার ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, আমার গরিবের ঘর, কী দিয়ে আমি অতিথিসেবা করব।

রাজা বললেন, আমি তো আর কিছুই চাই নে, পেয়েছি তোমার কন্যার হাতের
সেবা। আজ আমি বিদায় নিলেম। আর-একদিন আসব।

সাত দিন সাত রাত্রি চলে গেল, এবার রাজা এলেন রাজবেশে। তাঁর অশ্ব রথ
সমস্ত রইল বনের বাইরে। বৃদ্ধের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন;
বললেন, আমি বিজয়পত্নের রাজা। রানী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে।
এতদিন পরে পেয়েছি— যদি তুমি আমায় দান কর, আর যদি কন্যা থাকেন রাজি।

বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে গেল। এল রাজহস্তী— কাঠকুড়ানি মেয়েকে পাশে নিয়ে
রাজা ফিরে গেলেন রাজধানীতে।

অন্ধ বন্ধ কলিঙ্গের রাজকন্যারা শুনে বললে, ছি !



আসিল দিয়াড়ি হাতে রাজার বিষারি

খিড়কির আড়িনায়, নামটি পিয়ারি।

আমি শুধালেম তারে, এসেছ কী লাগি।

সে কহিল চূপে চূপে, কিছু নাহি মাগি।

আমি চাই ভালো ক'রে চিনে রাখো ঘোরে,

আমার এ আলোটিতে মন লহো ভ'রে।

আমি যে তোমার ঘারে করি আসাযাওয়া,
 তাই হেথা বকুলের বনে দেয় হাওয়া।
 যখন ফুটিয়া ওঠে যুথী বননময়
 আমার আঁচলে আনি তার পরিচয়।
 যেথা যত ফুল আছে বনে বনে ফোটে
 আমার পরশ পেলে খুশি হয়ে ওঠে।
 শুকভারা ওঠে ভোরে, তুমি থাক একা,
 আমিই দেখাই তারে ঠিকমতো দেখা।
 যখন আমার শোনে নৃপূরের ধ্বনি
 ঘাসে ঘাসে শিহরণ জাগে-যে তখনি।
 তোমার বাগানে সাজে ফুলের কেয়ারি,
 কানাকানি করে তারা, এসেছে পিয়ারি।
 অকপের আভা লাগে সকালের মেঘে,
 'এসেছে পিয়ারি' ব'লে বন ওঠে ভেগে।
 পূর্ণিমারাতে আসে ফাগুনের দোল,
 'পিয়ারি পিয়ারি' হবে ওঠে উত্তরোল।
 আমার মুকুলে হাওয়া মেতে ওঠে গ্রামে,
 চারি দিকে বাঁশি বাজে পিয়ারির নামে।
 শরতে ভরিয়া উঠে যমুনার বারি,
 কূলে কূলে গেয়ে চলে 'পিয়ারি পিয়ারি'।

মুনশি

আচ্ছা দাদামশায়, তোমাদের সেই মুনশিজি এখন কোথায় আছেন।
 এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারব তার সময়টা বুঝি কাছে এসেছে, তবু হয়তো কিছুদিন
 সবুয় করতে হবে।

ফের অমন কথা যদি তুমি বল, তা হলে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ করব।

সর্বনাশ, তার চেয়ে যে মিথো কথা বলাও ভালো। তোমার দাদামশায় যখন
 মূল-পালানে ছেলে ছিল তখন মুনশিজি ছিলেন ঠিক কত বয়েস তা বলা শক্ত।

তিনি বুঝি পাগল ছিলেন ?

হা, যেমন পাগল আমি ।

তুমি আবার পাগল ? কী-যে বল তার ঠিক নেই ।

তঁার পাগলামির লক্ষণ শুনলে বুঝতে পারবে, আমার সঙ্গে তাঁর আশ্চর্য মিল ।

কী রকম শুনি ।

যেমন তিনি বলতেন, জগতে তিনি অদ্বিতীয় । আমিও তাই বলি ।

তুমি যা বল সে তো সত্যি কথা । কিন্তু, তিনি যা বলতেন তা যে মিথ্যে ।

দেখো দিদি, সত্য কখনো সত্যই হয় না যদি সকলের সম্বন্ধেই সে না খাটে ।

বিধাতা লক্ষকোটি মানুষ বানিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই অদ্বিতীয় । তাঁদের ছাঁচ ভেঙে ফেলেছেন । অধিকাংশ লোকে নিজেকে পাঁচজনের সমান মনে ক'রে আরাম বোধ করে । দৈবাৎ এক-একজন লোককে পাওয়া যায় যারা জানে, তাদের জুড়ি নেই । মুনশি ছিলেন সেই জাতের মানুষ ।

দাদামশায়, তুমি একটু স্পষ্ট ক'রে তাঁর কথা বলো-না, তোমার অর্ধেক কথা আমি বুঝতে পারি নে ।

ক্রমে ক্রমে বলছি, একটু ধৈর্য ধরো ।—

আমাদের বাড়িতে ছিলেন মুনশি, দাদাকে ফার্সি পড়াতে । কাঠানোটা তাঁর বানিয়ে তুলতে মাংসের পড়েছিল টানাটানি । হাড় কথানার উপরে একটা চামড়া ছিল লেগে, যেন মোমজামার মতো । দেখে কেউ আন্দাজ করতে পারত না তাঁর ক্ষমতা কত । না পারবার হেতু এই যে, ক্ষমতার কথাটা জানতেন কেবল তিনি নিজে । পৃথিবীতে বড়ো বড়ো সব পালোয়ান কখনো জেতে কখনো হারে । কিন্তু, যে তালিম নিয়ে মুনশির ছিল গুয়ার তাতে তিনি কখনো কারও কাছে হটেন নি । তাঁর বিজ্ঞেতে কারও কাছে তিনি যে ছিলেন কন্মতি সেটার নজির বাইরে পাকতে পারে, ছিল না তাঁর মনে । যদি হত ফার্সি পড়া বিজ্ঞে তা হলে কথাটা সহজে মেনে নিতে রাজি ছিল লোকে । কিন্তু, ফার্সির কথা পাড়লেই বলতেন, আরে ও কি একটা বিজ্ঞে । কিন্তু, তাঁর বিশ্বাস ছিল আপনার গানে । অথচ তাঁর গলায় যে আওয়াজ বেরোত সেটা চৈচানি কিংবা কাঁহুনির জাতের, পাড়ার লোকে ছুটে আসত বাড়িতে কিছু বিপদ ঘটেছে মনে ক'রে । আমাদের বাড়িতে নামজাদা গাইয়ে ছিলেন বিষ্ণু তিনি কপাল চাপুড়িয়ে বলতেন, মুনশিজি আমার কটি মারলেন দেখছি । বিষ্ণুর এই হতাল ভাবখানা দেখে মুনশি বিশেষ হুঃখিত হতেন না— একটু মুচকে হাসতেন মাত্র । সবাই বলত,

মুনশি, কী গলাই ভগবান আপনাকে দিয়েছেন। খোশনামটা মুনশি নিজের পাওনা বলেই টেকে গুলুজতেন। এই তো গেল গান।

আরও একটা বিদ্যে মুনশির দখলে ছিল। তারও সমজদার পাওয়া যেত না। ইংরেজি ভাষায় কোনো হাড়পাকা ইংরেজও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। একবার বক্তৃতার আসরে নাবলে স্বরেন্দ্র বাঁড়ুজেকে দেশছাড়া করতে পারতেন কেবল যদি ইচ্ছে করতেন। কোনোদিন তিনি ইচ্ছে করেন নি। বিয়ুর কুটি বেঁচে গেল, স্বরেন্দ্রনাথের নামও। কেবল কথাটা উঠলে মুনশি একটু মুচকে হাসতেন।

কিন্তু, মুনশির ইংরেজি ভাষায় দখল নিয়ে আমাদের একটা পাপকর্মের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। কথাটা খুলে বলি। তখন আমরা পড়তুম বেঙ্গল একাডেমিতে, ডিক্‌রুজ সাহেব ছিলেন ইস্কুলের মালিক। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন, আমাদের পড়াশুনা কোনোকালেই হবে না। কিন্তু, ভাবনা কী। আমাদের বিদ্যেও চাই নে, বুদ্ধিও চাই নে, আমাদের আছে পৈতৃক সম্পত্তি। তবুও তাঁর ইস্কুল থেকে ছুটি চুরি করে নিতে হলে তার চলতি নিয়মটা মানতে হত। কর্তাদের চিঠিতে ছুটির দাবির কারণ দেখাতে হত। সে চিঠি যত বড়ো জালই হোক, ডিক্‌রুজ সাহেব চোখ বুজে দিতেন ছুটি। মাইনের পাওনাতে লোকসান না ঘটলে তাঁর ভাবনা ছিল না। মুনশিকে জানাতুম ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। মুনশি মুখ টিপে হাসতেন। হবে না? বাস্ রে, তাঁর ইংরেজি ভাষায় কী জোর। সে ইংরেজি কেবল ব্যাকরণের ঠেলায় হাইকোর্টের জজের রায় ঘুরিয়ে দিতে পারত। আমরা বলতুম, নিশ্চয়! হাইকোর্টের জজের কাছে কোনোদিন তাঁকে কলম পেশ করতে হয় নি।

কিন্তু, সবচেয়ে তাঁর জাঁক ছিল লাঠি-খেলার কারুদানি নিয়ে। আমাদের বাড়ির উঠোনে রোদ্‌দুর পড়লেই তাঁর খেলা শুরু হত। সে খেলা ছিল নিজের ছায়াটার সঙ্গে। হুংকার দিয়ে ঘা লাগাতেন কখনো ছায়াটার পায়ে, কখনো তার ঘাড়, কখনো তার মাথায়। আর, মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখতেন চার দিকে ঘারা জড়ো হত তাদের দিকে। সবাই বলত, সাবাস্! বলত, ছায়াটা যে বতিয়ে আছে সে ছায়ার বাপের ডাগিয়া। এই থেকে একটা কথা শেখা যায় যে, ছায়ার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখনো হার হয় না। আর-একটা কথা এই যে, নিজের মনে যদি জানি 'জিতেছি' তা হলে সে জিত কেউ কেড়ে নিতে পারে না। শেষ দিন পর্যন্ত মুনশিজির জিত রইল। সবাই বলত 'সাবাস্', আর মুনশি মুখ টিপে হাসতেন।

মিদি, এখন বুঝতে পারছ, গুর পাগলামির সঙ্গে আমার মিল কোথায়। আমিও

ছায়ায় সঙ্গে লড়াই করি ! সে লড়াইয়ে আমি যে জিতি তার কোনো সন্দেহ থাকে না । ইতিহাসে ছায়ায় লড়াইকে সত্যি লড়াই ব'লে বর্ণনা করে ।

*

* *

ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের,
 সতুর মনটা ছিল নেপোলিয়নের ।
 ইংরেজ ফৌজের সাথে ঘর কধে
 দু-বেলা লড়াই হত দুই চোখ মুদে ।
 ঘোড়া টগুবগ্ ছোট্টে, ধুলা যায় উড়ে,
 বাঙালি সৈন্যদল চলে মাঠ জুড়ে ।
 ইংরেজ দুন্দাড় কোথা দেয় ছুট,
 কোন্ দূরে মস্‌মস্ করে তার বুট ।
 বিছানায় শুয়ে শুয়ে শোনে বারে বারে,
 দেশে তার জয়রব ওঠে চারি ধারে ।
 যখন হাত-পা নেড়ে করে বক্রতা
 কী যে ইংরেজি ফোটে বলা যায় কি তা ।
 ক্লাসে কথা বেরোয় না, গলা তার ভাঙা,
 প্রস্র শুধালে মুখ হয়ে ওঠে রাঙা ।
 কাহিল চেহারা তার, অতি মুখচোরা—
 রোজ পেন্সিল তার কেড়ে নেয় গোরা ।
 খবরের কাগজের ছেঁড়া ছবি কেটে
 খাতা সে বানিয়েছিল আঠা দিয়ে এঁটে ।
 রোজ তার পাতাগুলি দেখত সে নেড়ে,
 হুহু একদিন সেটা নিয়ে গেল কেড়ে ।
 কালি দিয়ে গাধা লিখে পিঠে দিয়ে ছাপ
 হাততালি দিতে দিতে চ্যাচার প্রতাপ ।
 বাহিরের ব্যবহারে হারে সে সদাই,
 ভিতরের ছবিটাতে জিত ছাড়া নাই ।

ম্যাজিশিয়ান

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, শুনেছি এক সময়ে তুমি বড়ো বড়ো কথা নিয়ে খুব বড়ো বড়ো বই লিখেছিলেন।

জীবনে অনেক দুর্ভিক্ষ করেছি, তা কবুল করতে হবে। ভারতচন্দ্র বলেছেন, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

আমার ভালো লাগে না মনে করতে যে, আমি তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি।

ভাগ্যবান মানুষেরই যোগ্য লোক জোটে সময় নষ্ট ক'রে দেবার।

আমি বুঝি তোমার সেই যোগ্য লোক?

আমার কপালক্রমে পেয়েছি, খুঁজলে পাওয়া যায় না।

তোমাকে খুব ছেলেমানুষি করাই?

দেখো, অনেকদিন ধ'রে আমি গম্ভীর পোশাকি সাজ প'রে এতদিন কাটিয়েছি, সেলাম পেয়েছি অনেক। এখন তোমার দরবারে এসে ছেলেমানুষির ঢিলে কাপড় প'রে হাঁপ ছেড়েছি। সময় নষ্ট করার কথা বলছি, দিদি—এক সময় তার হুকুম ছিল না। তখন ছিলুম সময়ের গোলাম। আজ আমি গোলামিতে ইস্তফা দিয়েছি। শেষের ক'টা দিন আরামে কাটবে। ছেলেমানুষির দোসর পেয়ে লম্বা কেনারায় পা ছড়িয়ে বসেছি। যা খুশি বলে যাব, মাথা চুলকে কারও কাছে কৈকিয়ত দিতে হবে না।

তোমার এই ছেলেমানুষির নেশাতেই তুমি যা খুশি তাই বানিয়ে বলছ।

কী বানিয়েছি বলো।

যেমন তোমাদের ঐ হ. চ. হ.; অননভরো অদ্ভুত খাপাটে মানুষ তো আমি দেখি নি।

দেখো দিদি, এক-একটা জীব জন্মায় যার কাঠামোটা হঠাৎ যায় বেকে। সে হয় মিউজিয়মের মাল। ঐ হ. চ. হ. আমার মিউজিয়মে দিয়েছেন ধরা।

ওকে পেয়ে তুমি খুব খুশি হয়েছিলে?

তা হয়েছিলুম। কেননা তখন তোমার ইক্সাসি গিয়েছেন চলে খণ্ডরবাড়ি। আমাকে অবাক ক'রে দেবার লোকের অভাব ঘটেছিল। ঠিক সেই সময় এসেছিলেন হরিশচন্দ্র হালদার একমাথা টাক নিয়ে। তাঁর তাক লাগিয়ে দেবার রকমটা ছিল

আলাদা, তোমার ইকুমাসির উল্টো। সেদিন তোমার ইকুমাসি শুরু করেছিল জটাইবুড়ির কথা। ঐ জটাইবুড়ির সঙ্গে অমাবস্তার রাত্রে আলাপ পরিচয় হ'ত। সে বুড়িটার কাজ ছিল চাঁদে বসে চরকা কাটা। সে চরকা বেশিদিন আর চলল না। ঠিক এমন সময় পালা জমাতে এলেন প্রোফেসার হরীশ হালদার। নামের গোড়ার পদবীটা তাঁর নিজের হাতেই লাগানো। তাঁর ছিল ম্যাজিক-দেখানো হাত। একদিন বাদলা দিনের সঙ্গেবেলায় চায়ের সঙ্গে চিঁড়েভাজা খাওয়ার পর তিনি বলে বসলেন, এমন ম্যাজিক আছে যাতে সামনের ওই দেয়ালগুলো হয়ে যাবে ফাঁকা।

পঞ্চানন দাদা টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, এ বিত্তে ছিল বটে ঋষিদের জানা।

তুনে প্রোফেসার রেগে টেবিল চাপড়ে বললেন, আরে রেখে দিন আপনার মুনি ঋষি, দৈত্য দানা, ভূত প্রেত।

পঞ্চানন দাদা বললেন, আপনি তবে কী মানেন।

হরীশ একটিমাত্র ছোটো কথায় বলে দিলেন, দ্রব্যগুণ।

আমরা ব্যস্ত হয়ে বললুম, সে জিনিসটা কী।

প্রোফেসার বলে উঠলেন, আর যাই হোক, বানানো কথা নয়, মস্তুর নয়, তস্তুর নয়, বোকা-ভুলোনো আজগুবি কথা নয়।

আমরা ধরে পড়লুম, তবে সেই দ্রব্যগুণটা কী।

প্রোফেসার বললেন, বুঝিয়ে বলি। আগুন জিনিসটা একটা আশ্চর্য জিনিস, কিন্তু তোমাদের ঐসব ঋষিমুনির কথায় জলে না। দরকার হয় জালানি কাঠের। আমার ম্যাজিকও তাই। সাত বছর হর্তকি খেয়ে তপস্যা করতে হয় না। ভেনে নিতে হয় দ্রব্যগুণ। জানবা মাত্র তুমিও পার আমিও পারি।

কী বলেন প্রোফেসার, আমিও পারি ঐ দেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতে ?

পার বই-কি। হিড়িংফিড়িং দরকার হয় না, দরকার হয় মাল-মসলার।

আমি বললেম, বলে দিন-না কী চাই।

দিচ্ছি। কিছু না—কিছু না, কেবল একটা বিলিতি আমড়ার আঁঠি আর শিলনোড়ার শিল।

আমি বললুম, এ তো খুবই সহজ। আমড়ার আঁঠি আর শিল আনিয়ে দেব, তুমি দেয়ালটাকে উড়িয়ে দাও।

আমড়ার গাছটা হওয়া চাই ঠিক আট বছর সাত মাসের। কৃষ্ণদ্বারদ্বার চাঁদ ষষ্ঠবার এক দণ্ড আগে তার অঙ্গুরটা সবে দেখা দিয়েছে। সেই তিথিটা পড়া চাই

শুক্লাবাসে রাত্রির এক প্রহর থাকতে। আবাস শুক্ল বারটা অগ্রহায়ণের উনিশে তারিখে না হলে চলবে না। ভেবে দেখো বাবা, এতে কাকি কিছুই নেই। দিনখন তারিখ সমস্ত পাকা ক'রে বেঁধে দেওয়া।

আমরা ভাবলুম, কথাটা পোনাচ্ছে অত্যন্ত বেশি খাটি। বুড়ো মালীটাকে সন্ধান করতে লাগিয়ে দেব।

এখনো সামান্য কিছু বাকি আছে। ঐ শিলটা তিক্ততের লামারা কালিম্পাঙের হাটে বেচতে নিয়ে আসে ধবলেশ্বর পাহাড় থেকে।

পঞ্চানন দাদা এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, এটা কিছু শক্ত ঠেকছে।

প্রোফেসার বললেন, শক্ত কিছুই নয়। সন্ধান করলেই পাওয়া যাবে।

মনে মনে ভাবলুম, সন্ধান করাই চাই, ছাড়া হবে না— তার পরে শিল নিয়ে কী করতে হবে।

রোসো, অল্প একটু বাকি আছে। একটা দক্ষিণাবর্ত শব্দ চাই।

পঞ্চানন দাদা বললেন, সে শব্দ পাওয়া তো সহজ নয়। যে পায় সে যে রাজা হয়।

হ্যাঁ, রাজা হয় না মাথা হয়। শব্দ জিনিসটা শব্দ। যাকে বাংলায় বলে শাঁখ। সেই শব্দটা আমড়ার আঁঠি দিয়ে, শিলের উপর রেখে, ঘষতে হবে। ঘষতে ঘষতে আঁঠির চিহ্ন থাকবে না, শব্দ যাবে ক'রে। আর, শিলটা যাবে কাদা হয়ে। এইবার এই পিণ্ডটা নিয়ে দাও বুলিয়ে দেয়ালের গায়। বাস্। এ'কেই বলে দ্রব্যগুণ। দ্রব্যগুণেই দেয়ালটা দেয়াল হয়েছে। মস্তুরে হয় নি। আর দ্রব্যগুণেই সেটা হয়ে যাবে ধোঁয়া, এতে আশ্চর্য কী।

আমি বললুম, তাই তো, কথাটা খুব সত্যি পোনাচ্ছে।

পঞ্চানন দাদা মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন ব'সে ব'সে, বা হাতে হ'কোটা ধ'রে।

আমাদের সন্ধানের ক্রটিতে এই সামান্য কথাটার প্রমাণ হলই না। এতদিন পরে ইকর মস্তুর তন্তুর রাজবাড়ি, মনে হল, সব বাজে। কিন্তু, অধ্যাপকের দ্রব্যগুণের মধ্যে কোনোখানেই তো কাকি নেই। দেয়াল রইল নিরেট হয়ে। অধ্যাপকের 'পরে আমাদের ভক্তিও রইল অটল হয়ে। কিন্তু, একবার দৈবাৎ কী মনের ভুলে দ্রব্যগুণটাকে নাগালের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, কলের আঁঠি মাটিতে পুঁতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছও পাওয়া যাবে, ফলও পাওয়া যাবে।

আমরা বললুম, আশ্চর্য।

হ. চ. হ. বললেন, কিছু আশ্চর্য নয়, দ্রব্যগুণ। ঐ আঠিতে মনসাসিঞ্জের আঠা একুশবার লাগিয়ে একুশবার শুকোতে হবে। তার পরে পোঁতো মাটিতে আর দেখো কী হয়।

উঠে-প'ড়ে জোগাড় করতে লাগলুম। মাস দুয়েক লাগল আঠা মাখাতে আর শুকোতে। কী আশ্চর্য, গাছও হল ফলও ধরল, কিন্তু সাত বছরে। এখন বুঝেছি কাকে বলে দ্রব্যগুণ। হ. চ. হ. বললেন, ঠিক আঠা লাগানো হয় নি।

বুঝলেম, ঐ ঠিক আঠাটা ছনিয়ার কোথাও পাওয়া যায় না। বুঝতে সময় লেগেছে।



যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই—
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।
নিয়মের বেড়াটাতে ভেঙে গেলে খুঁটি
জগতের ইস্কুলে তবে পাই ছুটি।
অঙ্কর কেলাসেতে অঙ্কই কষি—
সেখায় সংখ্যাগুলো যদি পড়ে খসি,
বোর্ডের 'পরে যদি হঠাৎ নাম্তা
বোকার মতন করে আম্তা-আম্তা,
দুইয়ে দুইয়ে চার যদি কোনো উচ্ছ্বাসে
একেবারে চ'ড়ে বসে উনপঞ্চাশে,
ভুল ভবু নিরুভুল ম্যাজিক তো সেই ;
'পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ'এ কোনো মজা নেই।
মিথোটা সত্যই আছে কোনোখানে,
কবির গুনেছি তারি রাস্তাটা জানে—
তাদের ম্যাজিকওলা গ্যাপা পঙ্কের
দোকানেতে তাই এত ছোটো খন্ডের।

পরী

কুসমি বললে, তুমি বড় বানিয়ে কথা বল। একটা সত্যিকার গল্প শোনাও-না।

আমি বললুম, জগতে ছয়কম পদার্থ আছে। এক হচ্ছে সত্য, আর হচ্ছে—
আরও-সত্য। আমার কারবার আরও-সত্যকে নিয়ে।

দাদামশায়, সবাই বলে, তুমি কী যে বল কিছু বোঝাই যায় না।

আমি বললুম, কথাটা সত্য, কিন্তু যারা বোঝে না সেটা তাদেরই দোষ।

আরও-সত্যি কাকে বলছ একটু বুঝিয়ে বলো-না।

আমি বললুম, এই যেমন তোমাকে সবাই কুসমি বলে জানে। এই কথাটা খুবই সত্য ; তার হাক্কার প্রমাণ আছে। আমি কিন্তু সন্ধান পেয়েছি যে, তুমি পরীস্থানের পরী। এটা হল আরও-সত্য।

খুশি হল কুসমি। বলল, আচ্ছা, সন্ধান পেলে কী করে।

আমি বললুম, তোমার ছিল একজামিন, বিছানার উপরে বসে বসে ভূগোলবৃত্তাস্ত মুগ্ধ করছিলেন, কখন তোমার মাথা ঠেকল বালিশে, পড়লে ঘুমিয়ে। সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত্রি। জানলার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ল তোমার মুখের উপরে, তোমার আসমানি রঙের শাড়ির উপরে। আমি সেদিন স্নাই দেখতে পেলুম, পরীস্থানের রাজা চর পাঠিয়েছে তাদের পলাতক পরীর খবর নিতে। সে এসেছিল আমার জানলার কাছে, তার সাদা চাদরটা উড়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। চর দেখল তোমাকে আগাগোড়া, ভেবে পেল না তুমি তাদের সেই পালিয়ে-আসা পরী কি না। তুমি এই পৃথিবীর পরী বলে তার সন্দেহ হল। তোমাকে মাটির কোল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হবে না। এত তার সইবে না। ক্রমে চাদ উপরে উঠে গেল, ঘরের মধ্যে ছায়া পড়ল, চর শিশুগাছের ছায়ায় মাথা নেড়ে চলে গেল। সেদিন আমি খবর পেলুম, তুমি পরীস্থানের পরী, পৃথিবীর মাটির ভারে বাধা পড়ে গেছ।

কুসমি বললে, আচ্ছা দাদামশায়, আমি পরীস্থান থেকে এলুম কী করে।

আমি বললুম, সেখানে একদিন তুমি পারিজাতের বনে প্রজাপতির পিঠে চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলে, হঠাৎ তোমার চোখে পড়ল দিগন্তের ঘাটে এসে ঠেকেছে একটা খেয়ানোকো। সেটা সাদা মেঘ দিয়ে গড়া, হাওয়া লেগে চলছে। তোমার কী মনে হল, তুমি উঠে পড়লে সেই নোকোর। নোকো চলল ভেসে, ঠেকল এসে পৃথিবীর

ঘাটে, তোমার মা নিলেন কুড়িয়ে ।

কুসমি ভারি খুলি হসে বললে হাততালি দিয়ে, দাদামশায়, আচ্ছা, এ কি সত্যি ।

আমি বললুম, ঐ দেখো, কে বললে সত্যি । আমি কি সত্যিকে মানি । এ হল আরও-সত্যি ।

কুসমি বললে, আচ্ছা, আমি কি পরীক্ষানে ফিরে যেতে পারব না ।

আমি বললুম, পারতেও পার, যদি তোমার স্বপ্নের পালে পরীক্ষানের হাওয়া এসে লাগে ।

আচ্ছা, যদি হাওয়া লাগে তবে কোন্ রাস্তায় কোথা দিয়ে কোথায় যাব । সে কি অনে—ক দূরে ।

আমি বললুম, সে খুব কাছে ।

কত কাছে ।

যত কাছে তুমি আছ আর আমি আছি । ঐ বিছানার বাইরে যেতে হবে না । আর-একদিন জানলা দিয়ে পড়ুক এসে জ্যোৎস্না ; এবার যখন তুমি তাকিয়ে দেখবে বাইরে, তোমার আর সন্দেহ হবে না । তুমি দেখবে জ্যোৎস্নার শ্রোত বেয়ে মেঘের খেয়ানোকো এসে পৌঁছেছে । কিন্তু, তুমি যে এখন পৃথিবীর পরী হয়েছ, ও নোকোয় তোমার কুলোবে না । এখন তুমি তোমার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে যাবে, কেবল তোমার মন থাকবে তোমার সাথি । তোমার সত্য থাকবে এই পৃথিবীতে প'ড়ে আর তোমার আরও-সত্য যাবে কোথায় ভেসে, আমরা কেউ তার নাগাল পাব না ।

কুসমি বললে, আচ্ছা, এবারে পূর্ণিমারাত এলে আমি ঐ আকাশের পানে তাকিয়ে থাকব । দাদামশায়, তুমি কি আমার হাত ধরে যাবে ।

আমি বললুম, আমি এইখানে বসে বসে পথ দেখিয়ে দিতে পারব । আমার সেই ক্ষমতা আছে— কেননা আমি সেই আরও-সত্যের কারবারি ।



যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা সেটাই আমার পেয়ার,
বাপ মা তোমায় যে নাম দিল খোড়াই করি কেয়ার ।
সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরী,
আমি ছাড়া কজন জানে তুমি যে অপসরী ।

কেটে দেব বাধা নামের বন্দীর শৃঙ্খল,
সেই কাজেতেই লেগে গেছি আমরা কবির দল—
কোনো নামেই কোনো কালে কুলোর নাকো ধারে
তাহার নামের ইশারা দেই ছন্দের ঝংকারে ।

আরও-সত্য

দাদামশায়, সেদিন তুমি যে আরও-সত্যের কথা বলছিলে, সে কি কেবল পরীক্ষানেই দেখা যায় ।

আমি বললুম, তা নয় গো, এ পৃথিবীতেও তার অভাব নেই । তাকিয়ে দেখলেই হয় । তবে কিনা সেই দেখার চাউনি থাকে চাই ।

তা, তুমি দেখতে পাও ?

আমার ঐ গুণটাই আছে, যা না দেখবার তাই হঠাৎ দেখে ফেলি । তুমি যখন বসে বসে ভূগোল-বিবরণ মুখস্থ কর তখন মনে পড়ে যায় আমার ভূগোল পড়া । তোমার ঐ ইয়াংসিকিয়াং নদীর কথা পড়লে চোখের সামনে যে জ্যোগ্রাফি খুলে যেত তাকে নিয়ে একজামিন পাশ করা চলে না । আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সারি সারি উট চলেছে রেশমের বস্তা নিয়ে । একটা উটের পিঠে আমি পেয়েছিলুম জায়গা ।

সে কী কথা দাদামশায় । আমি জানি, তুমি কোনোদিন উটে চড় নি ।

ঐ দেখো দিদি, তুমি বড়ো বেশি প্রশ্ন কর ।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও । তার পরে ? উট পেলে তুমি কোথা থেকে ।

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন । উট পাই বা না পাই, আমি চ'ড়ে বসি । কোনো দেশে যাই বা না যাই, আমার ভ্রমণ করতে বাধে না । ওটা আমার স্বভাব ।

তার পরে কী হল ।

তার পরে কত শহর গেলেম পেরিয়ে—কুচুং, ছাংচাও, চুংকুং ; কত মরুভূমির ভিতর দিয়ে গিয়েছি রাস্তার বেলায় তারা দেখে রাস্তা চিনে চিনে । গেলুম উসখুস পাহাড়ের ওরাইয়ে । জলপাইয়ের বন দিয়ে, আড়ুয়ের খেত দিয়ে, পাইন গাছের ছায়া দিয়ে । পড়েছিলুম তাকাভের হাতে, সাদা ডালুক সামনে ঝড়িয়েছিল ছই থায়া ফুলে ।

আচ্ছা, এত যে তুমি ঘুরে বেড়ালে, সময় পেলে কখন।

যখন ক্লান্ত হয়ে ছেলে খাতা নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল।

তুমি পরীক্ষায় পাশ করলে তা হলে কী করে।

ওর সহজ উত্তর হচ্ছে— আমি পাশ করি নি।

আচ্ছা, তুমি বলে যাও।

এর কিছুদিন আগে আমি আরব্য উপন্যাসে চীনদেশের রাজকন্যার কথা পড়েছি, বড়ো সুন্দরী তিনি। আশ্চর্যের কথা কী আর বলব, সেই রাজকন্যার সঙ্গেই আমার হল দেখা। সেটা ঘটেছিল ফুচাও নদীর ঘাটে। সাদা পাথর দিয়ে বাধানো ঘাট, উপরে নীল পাথরের মণ্ডপ। দুই ধারে দুই চাপা গাছ, তার তলায় দুই পাথরের সিংহের মূর্তি। পাশে সোনার ধুতুচি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ধোয়া। একজন দাসী পাখা করছিল, একজন চামর দোলাচ্ছিল, একজন দিচ্ছিল চুল বেঁধে। আমি কেমন করে পড়ে গেলুম তাঁর সামনে। রাজকন্যা তখন তাঁর হৃদয়ের মতো সাদা ময়ুরকে দাড়িমের দানা খাওয়াচ্ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, কে তুমি।

সেই মুহূর্তেই ফস করে আমার মনে পড়ে গেল যে, আমি বাংলাদেশের রাজপুত্র।

সে কী কথা। তুমি তো—

ঐ দেখো, আবার প্রশ্ন? আমি বলছি, সেদিন ছিলুম বাংলাদেশের রাজপুত্র, তাই তো বেঁচে গেলুম। নইলে সে তো দূর করে তাড়িয়ে দিত আমাকে। তা না করে দিলে সোনার পেরালায় চা খেতে। চন্দ্রমল্লিকার সঙ্গে যেোনো সেই চা, গন্ধে আকুল করে দেয়।

তা হলে কি তোমাকে বিয়ে করল নাকি।

দেখো, ওটা বড়ো গোপন কথা। আজ পর্যন্ত কেউ জানে না।

কুসমি হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়েছিল, খুব ঘটা করে হয়েছিল।

দেখলুম বিয়েটা না হলে ও বড়ো দুঃখিত হবে।—শেষকালে হল বিয়ে। ছাংচাও শহরের আশ্বেক রাজত্ব আর ক্রীমতী আংচনী দেবীকে লাভ করলুম। ক'রে—

করে কী হল। আবার বুঝি সেই উটে চড়ে বসলে?

নইলে এখানে ফিরে এসে দাদামশায় হলেম কী করে। ই্যা, চড়েছিলুম— সে উট কোথাও যায় না। মাথার উপর দিয়ে ফুহুং পাখি গান গেয়ে চলে গেল।

ফুহুং পাখি ? সে কোথায় থাকে।

কোথাও থাকে না ; কিন্তু তার লেজ নীল, তার ডানা বাসন্তী, তার ঘাড়ের কাছে বাদামি, ওরা দলে দলে উড়ে গিয়ে বসল হাচাং গাছে।

হাচাং গাছের তো আমি নাম শুনি নি।

আমিও শুনি নি, তোমাকে বলতে বলতে এইমাত্র মনে পড়ল। আমার ঐ দশা, আমি আগে থাকতে তৈরি হই নে। তখনি তখনি দেখি, তখনি তখনি বলি। আজ আমার ফুহুং পাখি উড়ে চলে গেছে সমুদ্রের আর-এক পারে। অনেকদিন তার কোনো খবর নেই।

কিন্তু, তোমার বিষের কী হল। সেই রাজকন্যা ?

দেখো, চূপ করে যাও। আমি কোনো জবাব দেব না। আর তা ছাড়া, তুমি দুঃখ কোরো না, তখনও তুমি জন্মাও নি — সে কথা মনে রেখো।



আমি যখন ছোটো ছিলাম, ছিলুম তখন ছোটো ;
আমার ছুটির সঙ্গী ছিল ছবি আঁকার পোটো।
বাড়িটা তার ছিল বুঝি শতাব্দী নদীর মোড়ে,
নাগকন্যা আসত ঘাটে শাঁখের নৌকো চ'ড়ে।
চাপার মতো আঙুল দিয়ে বেগীর বাধন ঝুলে
ঘন কালো চুলের গুচ্ছে কী ঢেউ দিত তুলে।
রৌদ্র-আলোর ঝলক দিয়ে বিন্দুবারির মতো
মাটির 'পরে পড়ত ঝরে মুক্তা মানিক কত।
নাগকেশরের তলায় ব'সে পদ্মফুলের কুঁড়ি
দূরের থেকে কে দিত তার পায়ে তলায় ছুঁড়ি।
একদিন সেই নাগকুমারী ব'লে উঠল, কে ও।
জবাব পেলে, দয়া ক'রে আমার বাড়ি বেয়ে।

রাজপ্রাসাদের দেউড়ি সেখায় শ্বেত পাথরে গাঁথা,
 মণ্ডপে তার মুক্তাঝালর দোলায় রাজার ছাতা ।
 ঘোড়সওয়ারি সৈন্ত সেখায় চলে পথে পথে,
 রক্তবরন ধ্বজা ওড়ে তিরিশঘোড়ার রথে ।
 আমি থাকি মালকেতে রাজবাগানের মালী,
 সেইখানেতে যুথীর বনে সজ্জা-প্রদীপ জালি ।
 রাজকুমারীর তরে সাজাই কনকচাপার ডালা,
 বেণীর বাধন-তরে গাঁথি শ্বেতকরবীর মালা ।
 মাধবীতে ধরল কুঁড়ি, আর হবে না দেবি—
 তুমি যদি এস তবে ফুটবে তোমায় ঘেরি ।
 উঠবে জেগে রঙনগুচ্ছ পায়ের আসনটিতে,
 সামনে তোমার করবে নৃত্য ময়ূর-ময়ূরীতে ।
 বনের পথে সারি সারি রজনীগন্ধায়
 বাতাস দেবে আকুল ক'রে ফাগুনি সজ্জায় ।
 বলতে বলতে মাথার উপর উড়ল হাসের দল,
 নাগকুমারী মুগের 'পরে টানল নীলাঞ্চল ।
 ধীরে ধীরে নদীর 'পরে নামল নীরব পায়ে,
 ছায়া হয়ে গেল কখন চাপাগাছের ছায়ে ।
 সজ্জামেষের সোনার আভা মিলিয়ে গেল জলে ।
 পাতল রাত্রি তারা-গাঁথা আসন শূন্যতলে ।

ম্যানেজারবারু

আশ্র তোমাকে যে গল্পটা বলব মনে করেছি সেটা তোমার ভালো লাগবে না ।
 তুমি বললেও ভালো লাগবে না কেন ।
 যে লোকটার কথা বলব সে চিতোর থেকে আসে নি কোনো রানা-মহারানার
 দল ছেড়ে—
 চিতোর থেকে না এলে বুঝি গল্প হয় না ?
 হয় বই-কি— সেইটাই তো প্রমাণ করা চাই । এই মাহুঘটা ছিল সামান্য একজন

জমিদারের সামান্য পাইক। এমন-কি, তার নামটাই ভুলে গেছি। ধরে নেওয়া যাক সুজনলাল মিশির। একটু নাঘের গোলমাল হলে ইতিহাসের কোনো পণ্ডিত তা নিয়ে কোনো ভর্ক করবে না।

সেদিন ছিল যাকে বলে জমিদারি সেরেস্তার ‘পূণ্যাহ’, খাজনা-আদায়ের প্রথম দিন। কাজটা নিতান্তই বিষয়-কাজ। কিন্তু, জমিদারি মহলে সেটা হয়ে উঠেছে একটা পার্বণ। সবাই খুশি—যে খাজনা দেয় সেও, আর যে খাজনা বাস্তুতে ভর্তুকি করে সেও। এর মধ্যে হিসেব মিলিয়ে দেখবার গছ ছিল না। যে যা দিতে পারে তাই দেয়, প্রাপ্য নিয়ে কোনো তক্কার করা হয় না। খুব ধুমধাম, পাড়ারগৈয়ে সানাই অত্যন্ত বেহুঁরে আকাশ মাতিয়ে তোলে। নতুন কাপড় প’রে প্রজারা কাছারিতে সেলাম দিতে আসে। সেই পূণ্যাহের দিনে ঢাক ঢোল সানাইয়ের শব্দে জেগে উঠে ম্যানেজারবাবু ঠিক করলেন, তিনি শ্রান করবেন দুধে। চারি দিকে সমারোহ দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হল, তিনি তো সামান্য লোক নন। সামান্য জলে তাঁর অভিষেক কী করে হবে। ঘড়া ঘড়া দুধ এল গোয়াল। প্রজাদের কাছ থেকে। হল তাঁর শ্রান। নাম বেরিয়ে গেল চারি দিকে; সেদিন তিনি সন্ধ্যাবেলায় খুশিমনে বাসার রোয়াকে ব’সে গুড়গুড়ি টানছেন, এমন সময় মিশির সর্দার, ব্রাহ্মণের ছেলে লাঠিখেলা নিয়ে খুব নাম করেছে, বললে, হজুর আপনার নিমক তো খেয়েছি অনেককাল, কিন্তু অনেক-দিন বসে আছি, আমাকে তো কাজে লাগালেন না। যদি কিছু করবার থাকে তো হকুম করুন।

ম্যানেজার গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল একটা কাজের কথা। জসিম মণ্ডল চর মহলের প্রজা, তার খেত ছিল পাশের জমিদারের সীমানা-ঘেঁষা। ফসল জন্মালেই প্রতিবেশী জমিদার লোকজন নিয়ে প্রজাকে আটকাত। দায়ে পড়ে জসিমের দুই জমিদারেরই খাতায় আর দু জায়গাতেই খাজনা দিয়ে ফসল সামলাতে হত। যে ম্যানেজার দুধে শ্রান করেন এটা তাঁর ভালো লাগে নি। এ বছরের জলিধানের ফসল কাটবার সময় আসছে—এটা চরের বিশেষ ফসল। চরের জমির ফসল নেমে গেলেই কৃষাণ পলিমাটিতে বীজ ছিটিয়ে দেয়, জীবন ভাত্র মাসে ফসল গোলায় তোলে। এ বছরটা ছিল ভালো; ধানের শিষে সমস্ত মাঠ হি হি করছে। এবারকার ফসল বেদখল হলে ভারি লোকশান।

ম্যানেজার বললেন, সর্দার, একটা কাজ আছে। জসিমের জমিতে তোমাকে ধান আগলাতে হবে। একা তোমারই উপরে ভার। দেখব কেমন মরদ ভূমি।

ম্যানেজার তখনও দুধের স্নানের গুমোর হজম করে উঠতে পারেন নি। মিশিরকে হুকুম দিয়ে গুড়গুড়ি টানতে লাগলেন।

ধান কাটার সময় এল। দিন নেই, রাত নেই, মিশির জসিমের খেতে পাহারা দেয়।

একদিন ভরা খেতে অন্য পক্ষের লোক হস্তা ক'রে এল, মিশির বুক ফুলিয়ে বললে, বাবা-সকল, আমি থাকতে এ ধান তোমাদের ঘরে উঠবে না। সেলাম ঠুকে চলে যাও।

মিশির যত বড়ো সর্দার হোক, সেদিন সে একলা। যখন তাকে ঘেরাও করলে সে গুটিগুটি মেরে ব'সে সবাইকে আটকাতে লাগল।

অপর পক্ষের লোক বললে, দাদা, পারবে না। কেন প্রাণ দেবে।

মিশির বললে, নিমক খেয়েছি, প্রাণ যায় যাক ; নিমকের মান রাখতেই হবে।

চলল দাঙ্গা— শুধু লাঠির মার হলে হয়তো মিশির ঠেকাতেও পারত। অপর পক্ষ শড়কি চালানো। একটা এসে বিঁধল মিশিরের পায়ে।

অপর পক্ষ আবার তাকে সতর্ক করে বললে, আর কেন। এবার ক্ষান্ত দে ভাই।

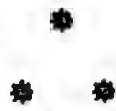
মিশির বললে, মিশির সর্দার প্রাণের ভয় করে না, ভয় করে বেইমানির।

শেষকালে একটা শড়কি এসে বিঁধল তার পেটে। এটা হল মরণের মার। পুলিশের হাতে পড়বার ভয়ে অপর পক্ষ পালাবার পথ দেখলে। মিশির শড়কি টেনে উপড়ে, পেটে চাদর জড়িয়ে ছুটল তাদের পিছন-পিছন। বেশি দূরে যেতে পারলে না। পড়ে গেল মাটিতে।

পুলিশ এল। মিশির জমিদারকে বাঁচাবার জন্য, তাঁর নামও করলে না। বললে, আমি জসিমের চাকরি নিয়ে তার ধান আগলাচ্ছিলুম।

ম্যানেজার সব খবর পেলেন। গুড়গুড়ি লাগলেন টানতে।

তাঁর দুধের স্নানের ব্যাভি—এ তো যে-সে লোকের কর্ম নয়। কিন্তু, নিমক খেয়েছে যখন তখন প্রাণ দেওয়া—এটা এতই কী আশ্চর্য। এমন তো ঘটেই থাকে। কিন্তু, দুধে স্নান!



তুমি ভাবো এই-যে বোটা

কিছুই বৃষ্টি নয়কো ওটা,

ফুলের গুমোর সবার চেয়ে বড়ো—

বিমুখ হয়ে আজ যদি ও

আলগা করে বাধন স্বীয়

তখনি ফুল হয় যে পড়ো-পড়ো ।

বোটারে ওকে হাওয়ায় নাচায়,

অপমানের থেকে বাচায়,

ধরে রাখে সূর্যালোকের ভোজে ;

বুক ফুলিয়ে দেয় না দেখা,

গোপনে রয় একা একা,

নিচু হয়ে সবার উপর ও যে ।

বনের ও তো আতুরে নয়,

শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়,

গায়েতে ওর নাইকো অলংকার ;

রস জোগায় সে চূপে চূপে,

থাকে নিজে নীরস রূপে,

আপন জোরে বহে আপন ভার ।

কাটা ঘন উচিয়ে থাকে

অহিংস কেউ কর না তাকে—

ষড়ই কিছু করুক-না বদনায়,

পত্র কামড় থেকে ধারে

দাঁড়িয়ে রাখে ধারে ধারে

সেই তো জানে কাটার কত দাম ।

বাচস্পতি

দাদামশায়, তুমি তোমার চার দিকে যেসব পাগলের দল জমিয়েছিলে, গুণ হিসেব ক'রে তাদের বুদ্ধি সব নম্বর দিয়ে রেখেছিলে ?

হ্যাঁ, তা করতে হয়েছে বই-কি । কম তো জমে নি ।

তোমার পয়লা নম্বর ছিলেন বাচস্পতি মশায়, তাঁকে আমার ভারি মজা লাগে ।

আমার শুধু মজা লাগে না, আশ্চর্য লাগে । কারণ বলি— কবিতা লিখে থাকি । কথা বাকানো-চোরানো আমাদের ব্যাবসা । যে শব্দের কোনো সাদা মানে আছে তাকে আমরা ধ্বনি লাগিয়ে তার চেহারা বদল করি । সে এক রকমের জাদুবিদ্যা বললেই হয় । কাজটা সহজ নয় । আমাদের বাচস্পতি আমাদের আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন যখন দেখলুম তিনি একেবারে গোড়াগুড়ি ভাষা বানিয়েছেন । কান দিয়ে ধ্বনির রাস্তায় তার মানের রাস্তা খুঁজতে হয় । আমাদের কাজটাও অনেকটা তাই, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত নয় । আমরা তবু ব্যাকরণ অভিধান মেনে চলি । বাচস্পতির ভাষা চলত সে-সমস্তই ডিঙিয়ে । সুনলে মনে হত যেন কী একটি মানে আছে !— মানে ছিল বই-কি । কিন্তু, সেটা কানের সঙ্গে ধ্বনি মিলিয়ে আন্দাজ করতে হত । আমার ‘অদ্ভুত-রত্নাকর’ সভার প্রধান পণ্ডিত ছিলেন বাচস্পতি মশায় । প্রথম বয়সে পড়াশুনা করেছিলেন বিস্তর, তাতে মনের তলা পর্যন্ত গিয়েছিল ঘুলিয়ে । হঠাৎ এক সময়ে তাঁর মনে হল, ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে । এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিঘুগে । সত্যঘুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে । সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে । তিনি বলতেন, শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে । একদিন একটা নমুনা শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিলেন । বললেন, আমার নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে ‘দিন রাত তোমার ঐ হিদ্‌হিদ্‌ হিদ্‌কারে আমার পাজরুরিতে তিড়িত লাগে’, তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয় নি । যেমন পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না ।

সভাপতি একদিন বিষয়টা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, ওহে বাচস্পতি, সেই ছেলেটার কী দশা হল ।

বাচস্পতি বললেন, সে ছেলেটার বুঝকিন্ গোড়া থেকেই ছিল বুঝতুইল গোছের ।

তার নাম দিয়েছিলাম বিচ্ছুম্ভুর।

যথুরবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও নামটা কেন।

বাচম্পতি বললেন, সে যে একেবারেই বিচ্ছুম্ভুর। পাঠশালার পেডেঙাকে দেখলেই তার আনতারা যেত ফুস্কলিয়ে। বুকের ভিতরে করতে থাকত কুড়ু কুড়ু কুড়ু কুড়ু। এমন ছেলেকে বেশি পড়ালে সে একেবারেই ফুস্কে যাবে, এ কথাটা বলেছিল পাড়ার সবচেয়ে যে ছিল পেড়াম্বর হুড়ুম্ভুকি। একটু রহুন—বুঝিয়ে বলি। পেডেঙা কথাটা বালিঘীপের কাছে পেয়েছি। তাদের মুখের পণ্ডিত শব্দটা আপনিই হয়ে উঠেছে পেডেঙা। ভেবে দেখুন, কত বড়ো ওজন, ওর বিস্তার বোঝা ঠেলে নিয়ে যেতে দশবিশ জন ডিগ্রিধারী জোয়ানের দরকার হয়। আর পণ্ডিত—ছোঃ, তুড়ি দিয়ে তুড়তুড়ুং ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

অটলদা বললেন, বাচম্পতি, তোমার আজকেরকার বর্ণনাটা যে একেবারেই চলতি গ্রাম্যভাষায়। এ তোমাকে মানায় না। সেই সেদিন যে সাধুভাষা বেরিয়েছিল তোমার মুখ দিয়ে, যার সম্বন্ধস্থানিত হার্নিকো বৃন্দবুধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি ক'রে ওঠে, সেই ভাষার একটু নমুনা আজ এদের শুনিবে দাও। যে ভাষায় ভারতের ইতিহাসটি গেঁথেছ, যার গুরুভার হিসেব ক'রে বলেছিলে ডুগ্ধস্থানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই। শুনে এদের সকলের আনতারা কাঁচকলিয়ে থাক।

বাচম্পতি মশায় শুরু করলেন, সম্বন্ধম্বরট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেতটাকুট স্বরিংত্রমাস্ত পৰ্ব্গাসন উখ্ঃসিত—

একজন সভাসদ বললেন, বাচম্পতি মশায়, উখ্ঃসিত কথাটা শোনাচ্ছে ভালো, ওর মানেটা বুঝিয়ে দিন।

পণ্ডিতজি বললেন, ওর মানে উখ্ঃসিত।

তার মানে?

তার মানে উখ্ঃসিত।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, তার মানে হতেই পারে না। যেহেতু একটা মানে দিতেও পারি।

কী রকম।

ভিন্নত্রিঃগট।

আর বলতে হবে না, স্পষ্ট বুঝেছি, ব'লে যান।

বাচম্পতি আবার শুরু করে দিলেন, সম্বন্ধম্বরট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেতটাকুট স্বরিংত্রমাস্ত পৰ্ব্গাসন উখ্ঃসিত নিয়ংকরালের সহিত—

মথুরাবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কেমন মশায়, বুঝেছেন তো নিরংকরাল—

একেবারে জলের মতো। ওর চেয়ে বেশি বুঝতে চাই নে—মুশকিল হবে।

বাচম্পতি আবার ধরলেন, নিরংকরালের সহিত অজাতশত্রু অপরিপর্ষ্যম্মিত গর্গরায়ণকে পরমস্তুি শয়নে সমুদগারিত করিয়াছিল।

এই পর্ষস্ত ব'লে বাচম্পতি মশায় একবার সভাস্থ সকলের মুখের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। বললেন, দেখুন একবার, সহজ কাকে বলে। অভিধানের প্রয়োজনই হয় না।

সভার লোকেরা বললে, প্রয়োজন হলেই বা পাব কোথায়।

বাচম্পতি মশায় একটু চোখ টিপে বললেন, ভাবখানা বুঝেছেন তো?

মথুরাবাবু বললেন, বুঝেছি বই-কি। সমুদ্রগুপ্ত অজাতশত্রুকে আচ্ছা করে পিটিয়ে দিয়েছিলেন। আহা, বাচম্পতি মশায়, লোকটাকে একেবারে সমুদগারিত করে দিলে গো—একেবারে পরমস্তুি শয়নে।

বাচম্পতি বললেন, ছোটোলাট একবার এসেছিলেন আমাদের পাড়ার স্থলে বুটের ধুলো দিয়ে যেতে। তখন আমি তাঁকে এই বুগবুলবুলি ভাষার একটা ইংরেজি তর্জমা শুনিয়েছিলুম।

সভাস্থ সকলেই বললেন, ইংরেজিটা শোনা যাক।

বাচম্পতি পড়ে গেলেন, দি হান্সারজুয়াস ইন্ফ্যাচুয়েশন অব আকবর ডর্বেণ্ডিক্যালি ল্যাসেরটাইজট্ দি গর্ব্যাণ্ডিজম্ অফ হুমায়ুন।—শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলেন; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুস্কায়িত। হেড পেডেগোর টিকির চার ধারে ভেরেণ্ডম্ লেগে গেল, সেক্রেটারি চৌকি থেকে তড়তং করে উৎখিয়ে উঠলেন। ছেলেগুলোর উজবুখুখো ফুড়ফুড়োমি দেপে মনে হল, তারা যেন সব ফিরিচুক্ষুসের একেবারে চিক্চাকস্ আমদানি। গতিক দেখে আমি চংচটকা দিলুম।

সভাপতি বললেন, বাচম্পতি, এইখানেই কাস্ত দাও হে, আর বেশিক্ষণ চললে পরাগগলিত হয়ে যাব। এখনি মাথাটার মধ্যে তাক্সিম্ তাক্সিম্ করছে।

বাচম্পতি আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে সভাপতির ভাষা এতদিনে ওঁদের মুখবুদবুদী শব্দে রকম্ গরম্ করে উঠত।

*

* *

যার ষত নাম আছে সব গড়া-পেটা,

যে নাম সহজে আসে দেওয়া যাক সেটা।

এই ব'লে কাউকে সে ডাকে বুজ্জুস,
 আদরম ডাকত সে যে ছিল অতুল।
 মোতিরাম দাস নিল নাম মুচকুস,
 কাশিরাম মিত্তির হল পুচকুস।
 পাশগাড়ি নাম নিল পাঁচকড়ি ঘোষ,
 আজ হতে বাজ্জু-রাই হল আশুতোষ।
 ভূষকড়ি রায় হল শ্রীমজুমদার,
 কুর্দম হয়ে গেল যে ছিল কেমদার।
 যেদিন যুথীরে নাম দিল ভূজকুশি,
 সেদিন স্বামীর সাথে হল ঘুঘোঘুঘি।
 পিচকিনি নাম দিল যবে ললিতারে
 দাদা এসে রাস্কেল ব'লে গেল তারে।
 মিঠে মিঠে নাম যত যানে দিয়ে ঘেরা,
 সে বলত, ভাবীকালে হবে না তো এরা—
 পিস্ত নাশিবে নাম যদি হয় তিতো,
 ভূজকালি নাম দেখো আমি নিয়েছি তো।
 পাড়ার লোকেরা বলে ঘিরে তার বাড়ি,
 ভাবীকালে পৌছিয়ে দিব তবে গাড়ি।
 বেচারী গতিক দেখে দিল মুখ ঢাকা,
 পিছে পিছে তাড়া করে মেসো আর কাকা।
 দিয়েছিল যে মেয়ের নাম উজ্জকড়ি,
 সঙ্গে উকিল নিয়ে এল তার খুড়ি।
 শুনলে সে কেস্ হবে ডিকামেশনের,
 ছেড়ে দিলে কাজ নাম-পরিবেশনের।

পান্নালাল

দাদামশায়, তোমার পাগলের দলের মধ্যে পান্নালাল ছিল খুব নতুন রকমের।
 জান, দিদি? পাগলরা প্রত্যেকেই নতুন, কারও সঙ্গে কারও মিল হয় না।
 যেমন তোমার দাদামশায়। বিধাতার নতুন পরীক্ষা। ছাঁচ তিনি ভেঙে ফেলেন।

সাধারণ লোকের বুদ্ধিতে মিল হয়, অসাধারণ পাগলের মিল হয় না। তোমাকে একটা উদাহরণ দেখাই।—

আমার দলে একজন পাগল ছিল, তার নাম জিলোচন দাস। সে তিন ক্রোশ পথ না ঘুরে কখনো বাড়ি যেত না।

জিজ্ঞাসা করলে বলত, বাবা, ঘরের চর চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ফাঁকি দিতে না পারলে রক্ষে নাই। জান তো, আমার বাবা ছিলেন কী রকম একগুঁয়ে মানুষ? পাগল বললেই হয়। কোনোমতেই আমার পরামর্শ মানতেন না। বরাবর তিনি সিধে রাস্তায় বাড়ি গিয়েছেন— তার পরে জান তো? আজ তিনি কোথায়। আর, আমি আজ সাত বছর ধরে পশ্চিমমুখো রাস্তা ধরে আমার পূর্বের দিকের বাড়িতে যাই। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, ভোজুগুলের বাড়িতে আমার পুজোর নেমস্তম্ভ।

জগতে যত বুদ্ধিমান আছে সকলেই সিধে রাস্তায় বাড়ি যায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল একজন আছে যে বাড়ি যেতে তিন ক্রোশ পথ বেকে যায়।

আমার হুইনঘরের কথা শোনো; সে বাচম্পতির কথা শুনে বলত, আহা, লোকটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। আর, বাচম্পতি তার কথা শুনে মুখ টিপে হাসতেন; বলতেন, এই লোকটার মগজে আছে বুদ্ধগুণের বাসা।

প্রেসিডেন্ট বললেন, কী হে হাজরা, তোমার বাড়ির হয়েছিল কী।

এতকালের পৈতৃক ঘরটা পথের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলে। এমন দৌড় মারলে, কোনো চিহ্ন রাখলে না কোথাও।

বল কী।—

আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। কলকাতায় হয়েছি মানুষ, বাবার মৃত্যুর পর কিছু টাকা এল হাতে। ঠিক করলেম, পৈতৃক ভিটেটা একবার দেখে আসা দরকার। সেই ভিটের কথা এইটুকু মাত্র জানতুম— পাঁচকুণ্ড গ্রামে ছিল তার ভিত্ত, ভোজুঘাটার সাড়ে সাত ক্রোশ তফাতে। শুভদিন দেখে নৌকো করে পৌছলাম ভোজুঘাটায়। কেউ ঠিকানা বলতে পারলে না। চললেম খুঁজে বের করতে, মন্দির দোকান থেকে চিঁড়ে মুড়কি নিলুম বেঁধে। সাত ক্রোশ পার হতে বাজল রাত্তির ন'টা। চার দিকে পোড়ো জমি, আগাছায় জঙ্গল, ভিটের কোনো চিহ্ন নাই। বারবার যাওয়া-আসা করেছি, ভিটে খুঁজে পাই নে। রাস্তার দোকানি আমাকে দেখে কী ভাবলে কে

জানেন, ছন্দার কথা শুনে আমার কাছে। বললে, এক কাজ করো বাপু, বোড়ো-গ্রামে বিখ্যাত গণকায় মধুসূদন জ্যোতিষী কুঠি-দেখে তোমার ভিটের খবর দিতে পারবেন।

কোথা থেকে তিনি খবর পেয়েছেন আমার হাতে কিছু মাল আছে। খুব কৃতি করে গণনায় বসে গেলেন। অনেক আঁকজাঁক কেটে শেষকালে বললেন, আপনার ঘরের সঙ্গে রাস্তার ঘোরতর মন-কষাকষি হয়ে গেছে; একেবারে মূগ-দেখাদেখি বস্তু; ভিটে রেগে দৌড় ঘেঁরেছে মাসির বাড়িতে।

বাস্তব হয়ে বললেন, মাসির বাড়িটা কোথায়।

শুনে বিশ্বাস করবেন না, একেবারে সাত হাত মাটির নীচে। ঐখানে মাঝুস হয়েছিল, ঐখানেই মূগ লুকিয়েছে।

তা হলে এখন উপায়?

আছে উপায়। আপনি যান কলকাতায় ফিরে, উপযুক্ত-মতো কিছু টাকা রেখে যান। ঠিক সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে আসবেন। মাসিকে খুশি ক'রে আপনার পৈতৃক বাড়ি ফিরিয়ে আনব। কিন্তু, কিছু দক্ষিণা লাগবে।

আমি বললেন, তা বস্তু লাগে লাগুক, আপনি ভাববেন না। পৈতৃক ভিটে আমার চাই।

আশ্চর্য জ্যোতিষীর বাহাদুরি। সাড়ে সাত মাস পরে ফিরে এসে ভোজুঘাটার থেকে যেপে ঠিক সাড়ে সাত কোশ পেরুলুম। যেখানে কিছু ছিল না সেখানে বাসাটা উঠেছে মাথা তুলে। আমি বললুম, কিন্তু গণকঠাকুর, বাসাটা যে ঠেকছে একেবারে চাছাপোছা নতুন?

গণকঠাকুর বললেন, হবে না? মাসির বাড়িতে খেয়েদেয়ে একেবারে চিক্‌চিকিয়ে উঠেছে!

আপনার হাসাহাসি করছেন, কিন্তু এ একেবারে আমার স্বচক্ষে দেখা। আমকাঠের দরজাজানালা আর ভালকাঠের কড়িবরগা। আমার কলেক্তি বন্ধুরা কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আমার বালুকডাঙার বিখ্যাত পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকে ডাকিয়ে আনলুম বিধান দিতে। তিনি বললেন, সংসারে সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে পথের সঙ্গে ঘরের আড়াআড়ি নিয়ে।

এর বেশি আর একটিও কথা বলতে চাইলেন না। আমি কলকাতার বন্ধুদের তৈলা দিয়ে বললুম, কেশন!

পাল্লাপালের গল্পটা শুনে বাচস্পতি মুচকে হেসে বললেন, ভোরভোল

*
* *

মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি,
আবার গড়িতে তারে দিনরাত খাটি ।
একই মসলায় তারে ভাঙে আর গড়ে,
পুরোনোটা বারে বারে নূতনেতে চড়ে ।
গেছে বাহা তাও আছে, এই বিশ্বাসে
ফাঁকা যেথা সেথা মন ফিরে ফিরে আসে ।

চন্দনী

জানোই তো সেদিন কী কাণ্ড । একেবারে তলিয়ে গিয়েছিলেম আর-কি, কিন্তু তলায় কোথায় যে ফুটো হয়েছে তার কোনো খবর পাওয়া যায় নি । না মাথা ধরা, না গাথা ঘোরা, না গায়ে কোথাও ব্যথা, না পেটের মধ্যে একটুও খোঁচাখুঁচির তাগিদ । যমরাজার চরগুলি খবর আসার সব দরজাগুলো বন্ধ করে ফিস্ ফিস্ ক'রে যত্নপা করছিল । এমন সুবিধে আর হয় না ! ডাক্তারেরা কলকাতায় নব্বই মাইল দূরে । সেদিনকার এই অবস্থা ।

সঙ্গে হয়ে এসেছে । বারান্দায় বসে আছি । ঘন মেঘ ক'রে এল । বৃষ্টি হবে বুঝি । আমার সভাসদ্রা বললে, ঠাকুরদা, একসময় শুনেছি তুমি মুখে মুখে গল্প ব'লে শোনাতে, এখন শোনাও না কেন ।

আর-একটু হলেই বলতে বাচ্ছিলুম, ক্ষমতায় ভাঁটা পড়েছে ব'লে ।

এমনসময় একটি বুদ্ধিমতী বলে উঠলেন, আত্মকাল আর বুঝি তুমি পার না ?

এটা সহ্য করা শক্ত । এ যেন হাতির মাথায় অঙ্কন । আমি বুঝলুম, আজ আমার আর নিস্তার নেই । বললুম, পারি নে তা নয়— পারি । তবে কিনা—

বাকিটা আর বলা হল না । মনে মনে তখন রাজপুতনা থেকে গল্প তলপ করিতে আরম্ভ করেছি । খানিকটা কাশলুম । একবার বললুম, রোসো, একবার একটুখানি দেখে আসি, কে যেন এল ।

কেউ আসে নি। শেষকালে বসতে হল।

যমদূতগুলো মোটের উপরে ইদা। একটু নড়তে গেলেই ধূপধাপ ক'রে শব্দ করে, আর তাদের শেলশুল-ছুরিছোরাগুলো ঝন্ঝনিয়ে ওঠে। সেদিন কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ।—

সন্ধ্যা হয়েছে, পথিক চলেছেন গোকুর গাড়িতে ক'রে। পরদিন সকালে রাজমহলে পৌছলে নৌকো নিয়ে তিনি যাত্রা করবেন পশ্চিমে। তিনি রাজপুত্র, তাঁর নাম অরিন্দ্রসিংহ। বাংলাদেশে ছোটো কোনো রাজ্যের ঘরে সেনাপতির কাজ করতেন। ছুটি নিয়ে চলেছেন রাজপুত্রনায়। রাত্রি হয়ে এসেছে। গাড়িতে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ একসময় জেগে উঠে দেখলেন, গাড়ি চলেছে বনের মধ্যে। গাড়োয়ানকে বললেন, ঘাটের রাস্তা ছেড়ে এখানে কেন।

গাড়োয়ান বললে, আমাকে চিনলেই বুঝবেন কেন।

তাঁর পাগড়িটা অনেকখানি আড় ক'রে পরা ছিল। সোজা ক'রে পরতেই অরিন্দ্র বললেন, চিনেছি। ডাকাতেঁর সর্দার পরাক্রমসিংহের চর ভূমি। অনেক-বার তোমার হাতে পড়েছিলুম, এড়িয়ে এসেছি।

সে বললে, ঠিক ঠাওরেছেন, এবার এড়াতে পারছেন না। চলুন আমার মনিবের কাছে।

অরিন্দ্র বললেন, উপায় নেই, যেতেই হবে। কিন্তু, তোমাদের ইচ্ছে পূর্ণ হবে না।

গাড়ি চলল বনের মধ্যে। এর আগের কথাটা এবার খুলে বলা যাক।—

অরিন্দ্র বড়ো ঘরের ছেলে। মোগল সম্রাট তাঁর রাজ্য নিলে কেড়ে, তিনি এলেন বাংলাদেশে পালিয়ে। এখান থেকে তৈরি হয়ে একদিন তাঁর রাজ্য ফিরে নেবেন, এই ছিল তাঁর পণ। এ দিকে পরাক্রমসিং মুসলমানদের হাতে তাঁর বিষয়সম্পত্তি হারিয়ে ডাকাতেঁর দল বানিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছে; অরিন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হয়, এই ছিল তাঁর চেষ্টা। কিন্তু, জাতিতে তিনি অরিন্দ্রের সমান দরের ছিলেন না, তাঁর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করতে অরিন্দ্র রাজি নন।

রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে। তাঁকে পরাক্রমের দরবারে এনে দাঁড় করালে পরাক্রম বললেন, ভালো সময়েই এসেছ, বিষের লগ্ন পড়বে আর দু দিন পরে। তোমার জন্ত বয়সজ্ঞা সব তৈরি।

অরিন্দ্র বললেন, অন্ধ্যা করবেন না। সকলেই জানে, আপনার গুপ্তিতে মুসলমান

রক্তের মিশল ঘটেছে।

পরাক্রম বললেন, কথাটা সত্য হতেও পারে, সেইজন্মেই তোমার মতো উচ্চ কুলের রক্ত মিশল ক'রে আমার বংশের রক্ত শুধরে নেবার জন্মে এতদিন চেষ্টা করেছি। আজ সুযোগ এল। তোমার মানহানি করব না। বন্দী করে রাখতে চাই নে, ছাড়া থাকবে। একটা কথা মনে রেখো, এই বন থেকে বেরোবার রাস্তা না জানলে কারোর সাধা নেই এখান থেকে পালায়। মিছে চেষ্টা কোরো না, আর যা ইচ্ছা করতে পার।

রাজি অনেক হয়েছে। অরিজিতের ঘুম নেই, বসেছেন এসে কাশিনী নদীর ঘাটে বটগাছের তলায়। এমনসময় একটি মেয়ে, মুখ ঘোমটার ঢাকা, তাঁকে এসে বললে, আমার প্রণাম নিন। আমি এখানকার সর্দারের মেয়ে। আমার নাম রত্নকুমারী। আমাকে সবাই চন্দনী ব'লে ডাকে। আপনার সঙ্গে পিতাজি আমার বিবাহ অনেক দিন থেকে ইচ্ছা করেছেন। শুনলেম, আপনি রাজি হচ্ছেেন না। কারণ কী বলুন আমাকে। আপনি কি মনে করেন আমি অস্পৃশ্য।

অরিজিত বললেন, কোনো মেয়ে কখনো অস্পৃশ্য হয় না, শাস্ত্রে বলেছে।

তবে কি আমাকে দেখতে ভালো নয় ব'লে আপনার ধারণা।

তাও নয়, আপনার রূপের সুনাম আমি দূর থেকে শুনেছি।

তবে আপনি কেন কথা দিচ্ছেন না।

অরিজিত বললেন, কারণটা খুলে বলি। করঞ্জরের রাজকন্যা নির্মলকুমারী আমার বহুদূর-সম্পর্কের আত্মীয়। তাঁর সঙ্গে ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি। তিনি আজ বিপদে পড়েছেন। মুগলমান নবাব তাঁর পিতার কাছে তাঁর জন্মে দূত পাঠিয়েছিলেন। পিতা কন্যা দিতে রাজি না হওয়াতে যুদ্ধ বেধে গেল। আমি তাঁকে বাচিয়ে আনব, ঠিক করেছি। তার আগে আর-কোথাও আমার বিবাহ হতে পারবে না, এই আমার পণ। করঞ্জর রাজ্যটি ছোটো, রাজার শক্তি অল্প। বেশি দিন যুদ্ধ চলবে না জানি, তার আগেই আমাকে যেতে হবে। চলেছিলেম সেই রাস্তায়, পথের মধ্যে তোমার পিতা আমাকে ঠেকিয়ে রাখলেন। কী করা যায় তাই ভাবছি।

মেয়েটি বললে, আপনি ভাববেন না। এখান থেকে আপনার পালাবার বাধা হবে না, আমি রাস্তা জানি। আজ রাত্রেই আপনাকে বনের বাহিরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। কিছু মনে করবেন না, আপনার চোখ বেঁধে নিয়ে যেতে হবে, কেননা এ বনের পথের সংকেত বাইরের লোককে জানতে দিতে চণ্ডেশ্বরীদেবীর মানা আছে; তা ছাড়া আপনার হাতে পরাব শিকল। তার যে কী দরকার পথেই জানতে পারবেন।

অরিজিৎ চোখবীধা হাতবীধা অবস্থায় ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চন্দ্রনীর পিছন-পিছন চললেন। সে রাতে ডাকাতির দল সবাই ভাঙ খেয়ে বেহোশ। কেবল পাহারায় যে সর্দার ছিল সেই ছিল জেগে। সে বললে, চন্দ্রনী, কোথায় চলেছ।

চন্দ্রনী বললে, দেবীর মন্দিরে।

ওই বন্দীটি কে।

বিদেশী, ওকে দেবীর কাছে বলি দেব। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

সে বললে, একলা কেন।

দেবীর আদেশ, আর-কাউকে সঙ্গে নেওয়া নিষেধ।

ওরা বনের বাইরে গিয়ে পৌঁছল, তখন রাত্রি প্রায় হয়েছে ভোর। চন্দ্রনী অরিজিৎকে প্রণাম করে বললে, আপনার আর ভয় নেই। এই আমার কঙ্কণ, নিয়ে যান, দরকার হলে পথের মধ্যে কাজে লাগতে পারে।

অরিজিৎ চললেন দূরপথে। নানা বিষয় কাটিয়ে যতই দিন যাচ্ছে ভয় হতে লাগল, সময়মত হয়তো পৌঁছতে পারবেন না। বহুকষ্টে করঞ্জর রাজ্যের যখন কাছাকাছি গিয়েছেন খবর পেলেন, যুদ্ধের ফল ভালো নয়। দুর্গ বাঁচাতে পারবে না। আত্ম হোক, কাল হোক, মুসলমানেরা দখল করে নিতে পারবে তাতে সন্দেহ নেই। অরিজিৎ আহারনিত্রা ছেড়ে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন দুর্গের কাছাকাছি গিয়েছেন, দেখলেন, সেখানে আগুন জলে উঠেছে। বুঝলেন মেঘেরা জ্বরব্রত নিয়েছে। হার হয়েছে তাই সকলে চিতা জালিয়েছে মরবার জন্তে। অরিজিৎ কোনোমতে দুর্গে পৌঁছলেন। তখন সমস্ত শেষ হয়ে গিয়েছে। মেঘেরা আর কেউ নেই। পুরুষরা তাদের শেষ লড়াই লড়ছে। নির্মলকুমারী রক্ষা পেল কিন্তু সে যত্নায় হাতে, তাঁর হাতে নয় এই দুঃখ। তখন ঘনে পড়ল চন্দ্রনী তাঁকে বলেছিল, তোমার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর তোমাকে এখানেই ফিরে আসতে হবে; সেজন্তে, যতদিন হোক, আমি পথ চেয়ে থাকব।

তার পর দুই মাস চলে গেল। ফাস্তনের শুরুপক্ষে অরিজিৎ সেই বনের মধ্যে পৌঁছলেন। শাঁখ বেজে উঠল, সানাই বাজল, সবাই পরল নতুন পাগড়ি লাল রঙের, গায়ে ওড়াল বাগদীরঙের চাদর। শুভলগ্নে অরিজিৎদের সঙ্গে চন্দ্রনীর বিবাহ হয়ে গেল।

এই পর্যন্ত হল আমার গল্প। তার পরে বরাবরকার অভ্যাসমত শোবার ঘরের কেদারায় গিয়ে বসলুম। বায়লার হাওয়া বইছিল। ঝুঁটি হবে-হবে করছে। সুখাকান্ত দেখতে এলেন, দয়াজা আনালা ঠিকমতো বন্ধ আছে কি না। এসে দেখলেন, আমি কেদারায় বসে আছি। ডাকলেন, কোনো উত্তর নেই। স্পর্শ করে বললেন, ঠাণ্ডা

হাওয়া দিচ্ছে, চলুন বিছানায় ।

কোনো সাড়া নেই । তার পরে চৌষটি ঘণ্টা কাটল অচেতনে

*

* *

দিন-খাটুনির শেষে

বৈকালে ঘরে এসে

আরামকেদারা যদি মেলে,

গল্পটি মনগড়া,

কিছু বা কবিতা পড়া,

সময়টা যায় হেসেখেলে ।

হেথায় শিমুলবন,

পাখি গায় সারাধন,

ফুল থেকে মধু খেতে আসে ।

ঝোপে ঘুঘু বাসা বেঁধে

সারাদিন স্তর সেধে

আদো ঘুম ছড়ায় বাতাসে ।

গোয়ালপাড়ার গ্রামে

মেঘেরা নদীতে নায়ে,

কলরব আসে দূর হতে ।

চারি দিকে ঢেউ তোলে,

বটছায়া জলে দোলে,

বালিকা ভাসিয়া চলে স্রোতে ।

দিয়ে জুঁই বেল জ্বা

সাজানো সুন্দরতা,

আলাপপ্রলাপ আগে ওঠে—

ঠিক সুরে তার বীধা,

মূলতানে তান সাধা,

গল্প শোনার ছেলে জোটে ।

ধ্বংস

দ্বিদি, তোমাকে একটা হালের খবর বলি।—

প্যারিস শহরের অল্প একটু দূরে ছিল তাঁর ছোটো বাসাটি। বাড়ির কর্তার নাম পিয়ের শোপ্যা। তাঁর সারা জীবনের শখ ছিল গাছপালার জোড় মিলিয়ে, রেণু মিলিয়ে, তাদের চেহারা, তাদের রঙ, তাদের স্বাদ বদল ক'রে নতুন রকমের সৃষ্টি তৈরি করতে। তাতে কম সময় লাগত না। এক-একটি ফুলের ফলের স্বভাব বদলাতে বছরের পর বছর কেটে যেত। এ কাজে যেমন ছিল তাঁর আনন্দ তেমনি ছিল তাঁর ধৈর্য। বাগান নিয়ে তিনি যেন জাদু করতেন। লাল হত নীল, সাদা হত আলতার রঙ, আঁটি যেত উড়ে, খোঁষা যেত খ'সে। যেটা ফলতে লাগে ছ মাস তার মেয়াদ কমে হত দু মাস। ছিলেন গরিব, ব্যাবসায়ে সুবিধা করতে পারতেন না। যে করত তাঁর হাতের কাজের তারিক তাকে দামি মাল অমনি দিতেন বিলিয়ে। যার স্বভাব ছিল দাম ফাঁকি দিতে সে এসে বলত, কী ফুল ফুটেছে আপনার সেই গাছটাতে, চার দিক থেকে লোক আসছে দেখতে, একেবারে তাক লেগে যাচ্ছে।

তিনি দাম চাইতে ভুলে যেতেন।

তাঁর জীবনের খুব বড়ো শখ ছিল তাঁর মেয়েটি। তার নাম ছিল ক্যামিল। সে ছিল তাঁর দিনরাত্তির আনন্দ, তাঁর কাজকর্মের সাহিনী। তাকে তিনি তাঁর বাগানের কাজে পাকা করে তুলেছিলেন। ঠিকমতো বুদ্ধি করে কলমের জোড় লাগাতে সে তাঁর বাপের চেয়ে কম ছিল না। বাগানে সে মালী রাখতে দেয় নি। সে নিজের হাতে মাটি গুঁড়তে, বীজ বুনতে, আগাছা নিড়োতে, বাপের সঙ্গে সমান পরিশ্রম করত। এ ছাড়া রেঁধেবেড়ে বাপকে খাওয়ানো, কাপড় শেলাই ক'রে দেওয়া, তাঁর হয়ে চিঠির জবাব দেওয়া—সব কাজের ভার নিয়েছিল নিজে। চেস্টনাট গাছের তলায় ওদের ছোট্ট এই বরটি সেবার শান্তিতে ছিল মধুমাখা। ওদের বাগানের ছায়ায় চা খেতে খেতে পাড়ার লোক সে কথা জানিয়ে যেত। ওরা জবাবে বলত, অনেক দামের আমাদের এই বাসা, রাজার মণিমানিক দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি হয়েছে ছুটি প্রাণীর ডালোবাসা দিয়ে, আর-কোথাও এ পাওয়া যাবে না।

যে ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহের কথা ছিল সেই জ্যাক মাঝে মাঝে কাজে যোগ দিতে আসত; কানে কানে জিগ্গেস করত, শুভদিন আসবে কবে। ক্যামিল কেবলই দিন পিছিয়ে দিত; বাপকে ছেড়ে সে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইত না।

জরমানির সঙ্গে যুদ্ধ বাধল ক্রান্তির। রাজ্যের কড়া নিয়ম, পিয়েরকে যুদ্ধে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামিল চোখের জল লুকিয়ে বাপকে বললে, কিছু ভয় কোরো না, বাবা। আমাদের এই বাগানকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখব।

মেয়েটি তখন হলদে রক্তনীগন্ধা তৈরি করে তোলবার পরধ করছিল। বাপ বলেছিলেন, হবে না; মেয়ে বলেছিল, হবে। তার কথা যদি খাটে তা হলে যুদ্ধ থেকে বাপ ফিরে এলে তাঁকে অবাক করে দেবে, এই ছিল তার পণ।

ইতিমধ্যে জ্যাক এসেছিল দু দিনের ছুটিতে রণক্ষেত্র থেকে খবর দিতে যে, পিয়ের পেয়েছে সেনানায়কের তক্ষা। নিজের না আসতে পেরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে এই স্তম্ভবর দিতে। জ্যাক এসে দেখলে, সেইদিন সকালেই গোলা এসে পড়েছিল ফুলবাগানে। যে তাকে প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল তার প্রাণহত্ব নিয়ে চারখার হয়ে গেল বাগানটি। এর মধ্যে দয়ার হাত ছিল এইটুকু, ক্যামিল ছিল না বেঁচে।

সকলের আশ্চর্য লেগেছিল সভ্যতার জোর হিসাব করে। লড়া দৌড়ের কামানের গোলা এসে পড়েছিল পঁচিশ মাইল তফাত থেকে। একে বলে কালের উন্নতি।

সভ্যতার কত যে জোর, আর-এক দেশে আর-একবার তার পরীক্ষা হয়েছে। তার প্রমাণ রয়ে গেছে ধুলার মধ্যে, আর-কোথাও নয়। সে চীনদেশে। তাকে লড়াতে হয়েছিল বড়ো বড়ো দুই সভ্য জাতির সঙ্গে। পিকিন শহরে ছিল আশ্চর্য এক রাজবাড়ি। তার মধ্যে ছিল বহু-কালের-জড়ো-করা মন-মাতানো শিল্পের কাজ। মানুষের হাতের তেমন গুণপনা আর-কখনো হয় নি, হবে না। যুদ্ধে চীনের হার হল; হার হবার কথা, কেননা মার-জখমের কারুদানিতে সভ্যতার অদ্ভুত বাহাদুরি। কিন্তু, হার যে আশ্চর্য শিল্প, অনেক কালের গুণীদের ধ্যানের ধন, সভ্যতার অল্প কালের আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়েমিড়ে গেল কোথায়। পিকিনে একদিন গিয়েছিলুম বেড়াতে, নিজের চোখে দেখে এসেছি। বেশি কিছু বলতে মন যায় না।

*

* *

মানুষ সবার বড়ো জগতের ঘটনা,
মনে হ'ত, মিছে না এ শাস্ত্রের ঘটনা
তখন এ জীবনকে পবিত্র মেনেছি
যখন মানুষ বলে মানুষকে জেনেছি।

ভোরবেলা জানালায় পাখিগুলো আগালে
 ভাবিতাম, আছি যেন স্বর্গের নাগালে ।
 মনে হ'ত, পাকা ধানে বাণি যেন বাজানো,
 মাঝের আঁচল-ভরা দান যেন সাজানো ।
 তরী যেত নীলাকাশে সাদা পাল মেলিয়া,
 প্রাণে যেত অজানার ছায়াখানি ফেলিয়া ।
 বুনো ইঁস নদীপারে মেলে যেত পাখা সে,
 উতলা ভাবনা মোর নিয়ে যেত আকাশে ।
 নদীর শুনেছি ধ্বনি কত রাতদুপুরে,
 অপরী যেত যেন তাল রেখে নৃপুরে ।
 পূজার বেজেছে বাণি ঘুম হতে উঠিতেই,
 পূজার পাড়ার হাওয়া ভরে যেত ছুটিতেই ।
 বন্ধুরা জুটিতাম কত নব বরষে,
 সুধার ভরিত প্রাণ সুহৃদের পরশে ।
 পশ্চিমে হেনকালে পথে কাটা বিছিয়ে
 সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে ।
 সভ্যতা করে বলে ভেবেছিছু জানি তা—
 আজ দেখি কী অন্তি, কী যে অপমানিতা ।
 কলবল সঞ্চল সিঁড়িলাইজেশনের,
 তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের ।
 মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অস্থরে,
 আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে ।
 মানুষকে ভুল ক'রে গড়েছেন বিধাতা,
 কত মাঝে এত বাঁকা হতে পারে সিঁধা তা ।
 দয়া কি হয়েছে তাঁর হত্যাশেষ রোদনে,
 তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে ।
 আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে
 মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে ।

ভালোমানুষ

ছিঃ, আমি নেহাত ভালোমানুষ ।

কুমি বললে, কী যে তুমি বল তার ঠিক নেই । তুমি যে ভালোমানুষ সেও কি বলতে হবে । কে না জানে, তুমি ও পাড়ার লোটনগুটার দলের সর্দার নও । ভালোমানুষ তুমি বল কাকে ।

এইবার ঠিক প্রশ্নটা এসেছে তোমার মুখে । ভালোমানুষ তাকেই বলে যে অস্ত্রাঘের কাছেও নিজের দখল ছেড়ে দেয়, দরাজ হাতের গুণে নয়, মনের জোর নেই বলেই ।

যেমন ?

যেমন আজই ঘটেছিল সকালে । বেশ একটুখানি শুছিয়ে নিয়ে লিখতে বসেছিলুম, এমনসময় এসে হাজির পাঁচকড়ি । একেবারে সাহারা থেকে সিমুম হাওয়া বয়ে গেল, শুকিয়ে গেল মনের মধ্যে যা-কিছু ছিল তাড়া । ঐ একটি প্রাণী বিধাতার কারখানা থেকে বাঁকা হয়ে বেরিয়েছিল, কোনো মানুষের সঙ্গে কোনোখানেই জোড় মেলে না । এক সময়ে ক্যালকাটাকে উচ্চারণ করেছিল কালকুটো, সেই অবধি সবাই ওকে ডাকত কালোকুত্তা । শুনতে শুনতে সেটা ওর কানে সয়ে গিয়েছিল । ইস্কুলে কেউ ওকে দেখতে পারত না । একদিন আমাদের রমেন 'রাষ্ট্রেল' ব'লে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘুষিয়ে ওর নাক ঝুকিয়ে দিয়েছিল ; ব'লে রেখেছিল, এর পরের বারে কান দেবে ঝাঁক ক'রে ।

এসেই সে বসল আমার লেখাপড়া করার চৌকিটাতে । ভালোমানুষের মুখ দিয়ে বেরোল না, ওখানে আমি কাজ করব । ডেস্কের উপর খুঁকে যেন অস্ত্রমানে এটা ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল । বললে দোষ হত না যে, ওগুলো দরকারি জিনিস, ঘাঁটাঘাঁটি করো না । কিন্তু—কী আর বলব । বললে, অনেককাল দেখা সাক্ষাৎ হয় নি । শুরু করলে, আহা আমাদের সেই ইস্কুলের দিন ছিল কী সুখের । গল্প লাগালে খোঁড়া গোবিন্দ ময়রার । দেখি, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে আমার সোনা-বাধানো ফাউন্টেন-পেনটা, চাদরের আড়ালে ওর পকেটের দিকে । বললেই হত, ভুল করছ, কলমটা তোমার নয়, ওটা আমার । কিন্তু, আমি যে ভালোমানুষ, ভদ্রলোকের ছেলে—এতবড়ো লজ্জার কথা ওকে বলি কী ক'রে । ওর চুরিকরা হাতটার দিকে চাইতেই পারলুম না । সন্দেহ করছি লোকটা ব'লে বসবে, আজ এখানেই থাক । বলতে পারব না, না, সে হবে না । ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছি । হঠাৎ

মাথায় বুদ্ধি এল ; ব'লে বসলুম, রমেনের ওখানে আমাকে এখনি যেতে হবে ।

কালকুত্তা বললে, ভালো হল, তোমার সঙ্গে একত্রেই যাওয়া যাক । ইস্কুল ছেড়ে অবধি তার সঙ্গে একবারও দেখা হয় নি ।

কী মুশকিল । খপ্ করে বসে পড়লুম । বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, কুষ্টি পড়ছে দেখছি ।

ও বললে, তাতে হয়েছে কী । আমার ছাতা নেই, কিন্তু তোমার সঙ্গে এক ছাতাতেই যেতে পারব ।

আর কেউ হলে জোর করেই বলত, সে হবে না । কিন্তু, আমার উপায় নেই । তা, ভালোমাসুখ হলোও বিপদে পড়লে আমার মাথাতেও বুদ্ধি জোগায় । আমি বললুম, অত অসুবিধা করবার দরকার কী । তার চেয়ে বরঞ্চ ছাতাটা তুমি নিয়ে যাও, যখন সুযোগ হবে ফিরিয়ে দিলেই হবে ।

আর সে তিলমাত্র দেরি করল না । বললে, প্র্যান্টা পোনাচ্ছে ভালো ।

ছাতাটা বগলে ক'রে চটপট সরে পড়ল । ভয় ছিল, ফাউন্টেন-পেনের খোঁজ উঠে পড়ে । ছাতা ফেরাবার সুযোগ কোনোদিনই হবে না । হায় রে, আমার পনেরো টাকা দামের গিঙ্কের ছাতাটা । ছাতা ফিরবে না, ফাউন্টেন-পেনও ফিরবে না, কিন্তু সবচেয়ে আরামের কথা হচ্ছে— সেও ফিরবে না ।

কী বল, দাদামশায় ! তোমার সেই ফাউন্টেন-পেন, সেই ছাতা, তুমি ফিরে পাবে না ?

ভদ্র বিধান-মতে ফিরে পাবার আশা নেই ।

আর, অভদ্র বিধান-মতে ?

ভালোমাসুখের কুষ্টিতে সে লেখে না ।

আমি তো ভালোমাসুখ নই, আমি তাকে চিঠি লিখব— তোমার সে কথা জানবার দরকার হবে না ।

আরে ছিছি, না না, সে কি হয় । আর, লিখে হবেই বা কী । সে বলবে, আমি নিই নি ।

জানি, ও তাই বলবে । কিন্তু, আমরা যে জেনেছি ও চুরি করেছে, সেইটেই ওকে আমি জানাতে চাই ।

সর্বনাশ ! ঠিক সেইটেই ওকে জানাতে চাই নে— ভদ্রলোকের ছেলে চুরি করেছে— ছিছি, কতখড়ো লজ্জার কথা । আমার এমন কত গেছে, তুমি তখন সন্ধ্যাও

নি। তখন ব্রাউনিঙের কবিতার আদর নতুন বেড়েছে। খুব আগ্রহ করে পড়ছিলাম। আমার সাহিত্যিক বন্ধুকে উৎসাহ করে একটা কবিতা পড়ে শোনালুম। তিনি বললেন, এ বইটা আমার নিশ্চয় পড়া চাই, তিন দিন পরেই ফিরিয়ে দেব। আমার মুখ শুকিয়ে গেল। বললুম, এটা আমি এখন পড়ছি। এতই ভালোমাসুষের স্মরে বলেছিলাম যে বইটা রাখতে পারা গেল না। দিনকয়েক পরে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি গেছেন একটা মকদ্দমার তদ্বির করতে বহরমপুরে। ফিরতে দেরি হবে। আমার জানা হকারকে ব'লে দিলুম, ব্রাউনিঙের বড়ো এডিশনটা যদি পাওয়া যায় আমাকে যেন জানায়। কিছুদিন পরে খবর পেলাম, পাওয়া গেছে। বইটা বের করে দেখালে, আমারই সেই বই। যে পাতাখানায় আমার নাম লেখা ছিল সেই পাতাটা ছেঁড়া। কিনে নিলুম। তার পর থেকে সেই বইখানা লুকিয়ে রাখতে হল, যেন আমিই চোর। আমার লাইব্রেরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পাচ্ছে বইখানা তাঁর হাতে ঠেকে। আমার কাছে তাঁর বিচ্ছেদ ঘরা পড়েছে, এ কথাটা পাচ্ছে তিনি জানতে পান। আহা, হাজার হোক, ভদ্রলোক।

আর বলতে হবে না, দাদামশায়, পষ্ট বুঝেছি কাকে বলে ভালোমাসুষ।



মণিরাম সত্যই স্মারনা,
বাহিরের খাড়া সে নেয় না।
বেশি ক'রে আপনারে দেখাতে
চায় যেন কোনোমতে ঠেকাতে।
যোগ্যতা থাকে যদি থাক-না,
টাকে তারে চাপা দিয়ে ঢাকনা।
আপনারে ঠেলে রেখে কোণেতে
ভবে সে আরাম পায় যনেতে।
যেথা তারে নিতে চায় আগ্নেয়ে
দূরে থাকে সে সত্য না গিয়ে।
বলে না সে, আরো দে বা খুবই দে ;
ঠেলা নাহি মায়ে পেলে স্তব্ধে।

যদি দেখে টানাটানি খাবারে
 বলে, কী যে পেট ভার, বাবা রে !
 বাঙনে ছুন নেই, খাবে তা ;
 মুখ দেখে বোঝা নাহি যাবে তা ।
 যদি পোনে, যা তা বলে লোকরা
 বলে, আছা, ওরা ছেলে-ছোকরা ।
 পাঁচু বই নিয়ে গেল না ব'লে ;
 বলে, খোঁটা দিয়ে নাকো তা ব'লে ।
 বন্ধু ঠকায় যদি, সহাবে ;
 বলে, হিসাবের ভুল দৈবে ।
 ধার নিয়ে যায় কোনো গাড়া নেই
 বলে তারে, বিশেষ তো তাড়া নেই ।
 যত কেন যায় তারে ঘা মারি
 বলে, দোষ ছিল বুঝি আমারি ।

যুক্তকুন্তলা

আমার খুদে বন্ধুরা এসে হাজির তাদের নালিশ নিয়ে। বললে, দাদামশায় তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ মনে কর।

তা, ভাই, ঐ ভুলটাই তো করেছিলুম। আজকাল নিজেরই বয়েসটার ভুল হিসেব করতে শুরু করেছি।

রূপকথা আমাদের চলবে না, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে।

আমি বললুম, ভায়া, রূপকথার কথাটা তো কিছুই নয়। ওর রূপটাই হল আসল। সেটা সব বয়েসেই চলে। আচ্ছা, ভালো, যদি পছন্দ না হয় তবে দেখি খুঁজে-পেতে। নিজের বয়েসটাতে ডুব মেরে তোমাদের বয়েসটাকে মনে আনতে চেষ্টা করছি। তার ধলি থেকে রূপকথা নাহয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান। সেও চলবে না। তোমরা নতুন যুগের ছেলে, খাটি খবর চাও ; যস্ করে জিজ্ঞেস করে বসবে, লেজা যদি হয় যাচ্ছে, মুড়ো কী করে হবে মাহুঘের। রোসো, তবে ডেবে দেখি। তোমাদের বয়েসে, এমন-কি তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি বয়েসে আমরা ম্যাজিকওয়াল। হরীশ হালদারকে পেয়ে বসেছিলুম। শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত

ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুলঝুলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল মুক্তকুন্তলা। এমন নাম কার মাথায় আসতে পারে! কোথায় লাগে স্বর্ঘমুখী, কুম্ভনন্দিনী। তার পর তার মধ্যে যা সব লম্বা চালের কথাবার্তা, তার বুলিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাজনার দাপট কী! আর, দেশ-উদ্ধারের তাল চৌকা! নাটকের রাজপুত্রটি ছিলেন স্বয়ং পুরুষোত্তমের ভায়ে; নাম ছিল রণধূর্ধ্ব সিং। এও একটা নাম ঝটে, মুক্তকুন্তলার নামের সঙ্গে সমান পায়তারা করতে পারে। আমাদের তাক লেগে গেল।—

আলেকজান্ডার এসেছিলেন ভারত জয় করতে। রণধূর্ধ্ব বিদায় নিতে এলেন মুক্তকুন্তলার কাছে। মুক্তকুন্তলা বললেন, যাও বীরবর, যুদ্ধে জয়লাভ করে এসো, আলেকজান্ডারের মুকুট এনে দেওয়া চাই আমার পায়ের তলায়। যুদ্ধে মারা পড়লেও পাবে তুমি স্বর্গলোক, আর যদি বেঁচে ফিরে এস তো স্বয়ং আছি আমি।

উঃ, কতবড়ো চটাপট হাততালির জায়গা একবার ভেবে দেখো। আমি রাজি হলেম মুক্তকুন্তলা সাজতে, কেননা আমার গলার আওয়াজটা ছিল মিহি।

আমাদের দালানের পিছন দিকে খানিকটা পোড়ো জমি ছিল, তাকে বলা হত গোলাবাড়ি। সত্যিকার ছেলেমানুষের পক্ষে সেই জায়গাটা ছিল ছুটির স্বর্গ। সেই গোলাবাড়ির একটা ধারে আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘর, লোহার গরাদে দেওয়া; সেই গরাদের মধ্যে হাত গলিয়ে বস্তার ফাঁকের থেকে ডাল চাল কুড়িয়ে আনতুম। ইটের উত্থন পেতে কাঠকোট জোগাড় করে চড়িয়ে দিতুম ছেলেমানুষি পিচুড়ি। তাতে না ছিল হুন, না ছিল ঘি, না ছিল কোনোপ্রকার মসলার বালাই। কোনোমতে আধসিদ্ধ হলে খেতে লেগে যেতুম। মনে হয় নি ভোজের মধ্যে নিন্দার কিছু ছিল। এই গোলাবাড়ির পাঁচিল ঘেঁষে গোটাকতক বাথারি জোগাড় করে হ. চ. হ., আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার, নানা আয়তনের খবরের কাগজ পুরেজুড়ে একটা স্টেজ খাড়া করেছিলেন। স্টেজ শব্দটা মনে করেই আমাদের বুক ফুলে উঠত। এই স্টেজে আমাকে সাজতে হবে মুক্তকুন্তলা। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই, কিন্তু হতভাগিনী মুক্তকুন্তলার দুঃখের দশা কিছু কিছু মনে পড়ে। এইটুকু জানি, তিনি তলোয়ার হাতে বীরপুরুষের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন ঘোড়ায় চড়ে। কিন্তু, ঘোড়াটা যে কার সাজবার কথা ছিল সে ঠিক মনে আনতে পারছি নে। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে বীরললনা যে স্বদেশের জন্তে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর বৃকে যখন বর্ণা (পাতকাঠি) বিদ্ধ হল, যখন মাটিতে তাঁর মুক্তকুন্তল লুটিয়ে পড়ছে, রণধূর্ধ্ব পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বীরাঙ্গনা বললেন, বীরবর, আমাকে এখন বিদায় দাও, হয়তো স্বর্গে গিয়ে দেখা হবে।
আহা, আবার হাততালির পালা।

অভিনয়ের জোগাড়বস্ত্র মোটামুটি একরকম হয়ে এসেছিল। হরীশচন্দ্র কোথা থেকে এনেছিলেন নানা রকমের পরচুলো গৌড়দাড়ি। বউদিদির হাতে পায়ে ধরে দুটো-একটা শাড়িও জোগাড় করেছিলেন। তাঁর কোটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথের পরবার সময় কোনো ভাবনা মনে আসে নি। স্কুলে যাবার সময় ভুলেছিলেন তার দাগ মুছতে। ছেলেদের মধ্যে মস্ত হাসি উঠেছিল। কিছুদিন আমার ক্লাসে মুখ দেখাবার জো রইল না। নাটকের অভিনয়ে সবচেয়ে কল দেখা গেল এই হাসিতে। আর, বাকিটুকু হয়ে গেল একেবারে ফাঁকি। যেখানে আমাদের স্টেজের বাথারি পোতা হয়েছিল ঠিক সেই জায়গায় সেজদাদা কুস্তির আখড়া পত্তন করলেন। মুক্ত-কুস্তিগার সবচেয়ে দুঃখের দশা হল মুক্তকোষে নয়, এই কুস্তির আড্ডায়। রণদুর্ধ্বকে মিহি গলায় বলবার সুযোগ পেলেন না, হে বীরবর, স্বর্গে তোমার সঙ্গে হয়তো দেখা হবে। তার বদলে বলতে হল, গাড়ে নটা বাজল, স্কুলের গাড়ি তৈরি।

এর থেকেই বুঝবে, আমরা যখন ছেলেমানুষ ছিলাম সে ছিলেম খাঁটি ছেলেমানুষ।

*

* *

‘দাদা হব’ ছিল বিষম শব্দ—

তখন বয়স বারো হবে,

কড়া হয় নি ত্বক।

স্টেজ বেঁধেছি ঘরের কোণে,

বুক ফুলিয়ে ক্ষণে ক্ষণে

হয়েছিল দাদার অভিনয় ;

কাঠের তরবারি ঘেরে

দাড়ি-পরা বিপক্ষে

বারে বারেই করেছিলেন জয়।

আজ খসেছে মুখোষটা সে,

আরেক লড়াই চারি পাশে—

মারছি কিছু অনেক খাচ্ছি মার।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দিন চলেছে অবিরত,

ভাবনা মনে জ্বলেছে কত,

যোলো-আনা নয় সে অহংকার ।

দেখছে নতুন পালার দাঙ্গা

হাত দুটো তার পড়ছে বাঁধা

এ সংসারের হাজার গোলামিতে ।

ভবুও সব হয় নি ফাঁকি,

তহবিলে রয় যা বাকি

কাজ চলছে দিতে এবং নিতে ।

সাজ হয়ে এল পালা,

নাট্যশেষের দীপের মালা

নিতে নিতে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে ।

রঙিন ছবির দৃশ্য রেখা

ঝাপস : চোখে যায় না দেখা,

আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জ'মে ।

সময় হয়ে এল এবার

স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,

নেবে আসছে আঁধার-ঘবনিকা ।

খাতা হাতে এখন বুদ্ধি

আসছে কানে কলম স্তম্ভি

কর্ম বাহার চরম হিসাব লিখা ।

চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা

ভোলা মনকে তুলিয়ে রাখা

কোনোমতেই চলবে না তো আর ।

অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে

পড়বে ধরা শেষ গণিতে

জিত হয়েছে কিংবা হাল হার ।

প্রবন্ধ

বাংলাভাষা-পরিচয়

উৎসর্গ

ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

করকমলে

ভূমিকা

ছাত্রপাঠকদের প্রতি

ভাষার আশ্চর্য রহস্য চিন্তা ক'রে বিস্মিত হই। আজ যে বাংলা ভাষা বহুলক্ষ মানুষের মন-চলাচলের হাজার হাজার রাস্তায় গলিতে আলো ফেলে সহজ করেছে পরম্পরের প্রতি মুহূর্তের বোঝাপড়া, আলাপ-পরিচয়, এর দীপ্তির পথরেখা অনুসরণ করে চললে কালের কোন্ দূরত্বগম্য দিগন্তে গিয়ে পৌছব। তারা কোন্ যাযাবর মানুষ, যারা অজানা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রায় দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের পথিক ছিল, যারা এই ভাষার প্রথম কম্পমান অম্পষ্ট শিখার প্রদীপ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিল অখ্যাত জন্মভূমি থেকে সুদীর্ঘ বন্ধুর বাধাজটিল পথে। সেই আদিম দীপালোক এক যুগের থেকে আর-এক যুগের বাতির মুখে জ্বলতে জ্বলতে আজ আমার এই কলমের আগায় আপন আত্মীয়তার পরিচয় নিয়ে এল। ইতিহাসের যে বিপুল পরিবর্তনের শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে আদিযাত্রীরা চলে এসেছে তারই প্রভাবে সেই শ্বেতকায় পিঙ্গলকেশ বিপুলশক্তি আরণ্যকদের সঙ্গে এই শ্যামলবর্ণ ক্ষীণ-আয়ু শহরবাসী ইংরেজ রাজত্বের প্রজার সাদৃশ্য ধূসর হয়েছে কালের ধূলিক্ষেপে। কেবল মিল চলে এসেছে একটি নিরবচ্ছিন্ন ভাষার প্রাচীন সূত্রে। সে ভাষায় মাঝে মাঝে নতুন সূত্রের জোড় লেগেছে, কোথাও কোথাও ছিন্ন হয়ে তাতে বেঁধেছে পরবর্তী কালের গ্রন্থি, কোথাও কোথাও অনার্য হাতের ব্যবহারে তার সাদা রঙ মলিন হয়েছে, কিন্তু তার ধারায় ছেদ পড়ে নি। এই ভাষা আজও আপন অঙ্গুলি নির্দেশ করছে বহুদূর পশ্চিমের সেই এক আদিজন্মভূমির দিকে যার নিশ্চিত ঠিকানা কেউ জানে না।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অম্পষ্ট ইতিবৃত্তের প্রাকৃত লোকেরা যে ভাষায় কথা কইত, দুই প্রধান শাখায় তা বিভক্ত ছিল— শৌরসেনী ও মাগধী। শৌরসেনী ছিল পাশ্চাত্য হিন্দির মূলে, মাগধী অথবা প্রাচ্যা ছিল প্রাচ্য হিন্দির আদিতে। আর ছিল ওড়ী, ওড়িয়া; গোড়ী, বাংলা। আসামীর

উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু অনতিপ্রাচীন যুগে আসামীতে গড় ভাষার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এত বাংলায় পাই নে। সেই-সব দৃষ্টান্তে যে ভাষার পরিচয় পাই তার সঙ্গে বাংলার প্রভেদ নেই বললেই হয়।

মাগধী এবং শৌরসেনীর মধ্যে মাগধীই প্রাচীনতর। হর্নলে সাহেবের মতে এই সময়ে ভারতবর্ষে মাগধীই একমাত্র প্রাকৃত ভাষা ছিল। এই ভাষা পশ্চিম থেকে ক্রমে পূর্বের দিকে এসেছে। আর দ্বিতীয় ভাষাপ্রবাহ শৌরসেনী ভারতবর্ষে প্রবেশ ক'রে পশ্চিম দেশ অধিকার করেছিল। হর্নলের মতে আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল দুইবার পরে পরে। উভয়ের ভাষায় মূলগত ঐক্য থাকলেও কিছু কিছু প্রভেদ আছে।

নদী যেমন অতিদূর পর্বতের শিখর থেকে ঝরনায় ঝরনায় ঝরে ঝরে নানা দেশের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পৌছয়, তেমনি এই দূর কালের মাগধী ভাষা আর্য জনসাধারণের বাণীধারায় বয়ে এসে সুদূর যুগান্তরে ভারতের সুদূর প্রান্তে বাংলাদেশের হৃদয়কে আজ ধ্বনিত করেছে, উর্বরা করেছে তার চিত্তভূমিকে। আজও শেষ হল না তার প্রকাশ-লীলা। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে সে বিস্তৃত হয়েছে, মিশ্রিত হয়েছে, গভীর হয়েছে তার প্রবাহ, দেশের সীমা ছাড়িয়ে সর্বদেশের আবেষ্টনের সঙ্গে এসে মিলেছে। সেই দূর কালের সঙ্গে আর আমাদের এই বর্তমান কালের, বহু দেশের অজানা চিস্তার সঙ্গে আর বাংলাদেশের নবজাগৃত চিস্তার মিলনের দোতা নিয়ে চলেছে এই অতিপুরাতন এবং এই অতি-আধুনিক বাক্যস্রোত, এই কথা ভাবে এর রহস্যে বিম্বিত হয়ে আছি। সেই বিশ্বয়ের প্রকাশ আমার এই বইটিতে।

ভাষা জিনিসটা আমরা অত্যন্ত সহজে ব্যবহার করি, কিন্তু তার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখা একটুও সহজ নয়। যে নিয়মের ঐক্য ধরে পরিচয় সহজ হয় ভাষার ইতিহাসে একটা তার অবিচ্ছিন্ন সূত্রও থাকে, আবার তার বদলও চলে পদে পদে। কেন বদল হয় তার ভালো কৈফিয়ত সব সময়ে পাওয়া যায় না। সে-সমস্ত কঠিন সমস্যার বিচার নিয়ে এ বই লিখছি নে। ভাষার ক্ষেত্রে চলতে চলতে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে,

আশ্চর্য করেছে, তারই কৌতূহলের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হল। বিষয়টাকে ধারা ফলাও করে দেখছেন ও তলিয়ে বুঝছেন, এ লেখায় তাঁদের কাছে ছোটো-চারটে খুঁত বেরোবেই। কিন্তু তা নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাত এই— তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী। নানা দেশের শব্দমহলের, এমন-কি তার প্রেতলোকের হাটহদ্দ জানেন তিনি, প্রমাণে অনুমানে মিলিয়ে তার খবর দিতে পারেন সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে। চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি বকে যাব। তাতে ক'রে মনে তোমরা সেই চলে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে। তোমাদের জন্মে বিশ্বপরিচয় বইখানা লিখেছিলুম এই ভাবেই। বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সক্ষম জন্ম হয় নি তাগারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হয়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে। ছোটোখাটো অপরাধ যদি ঘটে থাকে সেই খুশির ভোগে অনেকটা তার খণ্ডন হতে পারে। জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল বলেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও। সেই শখটা তোমাদের মনে যদি জাগাতে পারি তা হলে আমার যতটুকু শক্তি সেই অনুসারে ফল পাওয়া গেল মনে করে আশ্বস্ত হব।

মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিষয়ে অভিভূত করে তারই ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি। তার পরে, এই বইয়ে যে ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, তাকে বলে বাংলার চলিত ভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে। এদেরই মধ্যে একটা বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে। এই প্রাকৃতেরই স্বভাব বিচার করেছি এই বইয়ে। লেখকের পক্ষে একটা মুশকিল আছে। চলতি বাংলা চলতি

রবীন্দ্র-রচনাবলী

বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়। হয়তো উচ্চারণে এবং বাক্যব্যবহারে একজনের সঙ্গে আর-একজনের সকল বিষয়ে মিল এখনও পাকা হতে পারে নি। কিন্তু যে ভাষা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। এখন থেকে বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই। এই গ্রন্থে রইল তার প্রথম চেষ্টা। ক্রমে ক্রমে নানা লোকের অধ্যবসায়ে এই ভাষার দ্বিধাগ্রস্ত প্রথাগুলি বিধিবদ্ধ হতে পারবে। এই গ্রন্থে সমর্থিত কোনো উচ্চারণ বা ভাষারীতি কারও কারও অভ্যস্ত নয়। সুতরাং ব্যবহারে পরম্পরের পার্থক্য আছে। সেই অবস্থায় রাশীকরণের প্রণালীতে অর্থাৎ অধিকাংশ লোকের সাংখ্যিক তুলনায় তার বিচার স্থির হতে পারবে।

শাস্তিনিকেতন

৭ কাতিক, ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলাভাষা-পরিচয়

জীবের মধ্যে সবচেয়ে সম্পূর্ণতা মানুষের। কিন্তু সবচেয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে সে জন্মগ্রহণ করে। বাঘ ভালুক তার জীবনযাত্রার পনেরো আনা মূলধন নিয়ে আসে প্রকৃতির মালখানা থেকে। জীবরক্তভূমিতে মানুষ এসে দেখা দেয় দুই শূন্য হাতে মুঠো বেঁধে।

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযন্ত্রে প্রকৃতির ভূরিবায়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে ফলে ফলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আত্মশয়ের পরাভব অনিবার্য। পরীক্ষায় এটাও স্থির হয়ে গেল যে, প্রজন্মের পরিমাণ যত বেশি হয় দুর্বলতার বোঝাও তত দুবছ হয়ে ওঠে। নূতন পবে প্রকৃতি যথাসম্ভব মানুষের বরাদ্দ কম করে দিয়ে নিজে রইল নেপথ্যে।

মানুষকে দেখতে হল খুব ছোটো, কিন্তু সেটা একটা কোণল মাত্র। এবারকার জীবযাত্রার পালায় বিপুলতাকে করা হল বহুলতার পরিণত। মহাকাশ জন্তু ছিল প্রকাণ্ড একলা, মানুষ হল দূরপ্রসারিত অনেক।

মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি।

কখনো কখনো শোনা গেছে, বনের জন্তু মানুষের শিককে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। কিছুকাল পরে লোকালয়ে যখন তাকে ফিরে পাওয়া গেছে তখন দেখা গেল জন্তুর মতোই তার ব্যবহার। অথচ সিংহের বাচ্চাকে জন্মকাল থেকে মানুষের কাছে রেখে পুষলে সে নরসিংহ হয় না।

এর মানে, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মানবসত্তার মানুষই হয় না, অথচ তখন তার জন্তু হতে বাধা নেই। এর কারণ বহু যুগের বহু কোটি লোকের দেহ মন মিলিয়ে মানুষের সত্তা। সেই বৃহৎ সত্তার সঙ্গে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য ঘটে ব্যক্তিগত মানুষ সেই পরিমাণে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে। সেই সত্তাকে নাম দেওয়া যেতে পারে মহামানুষ।

এই বৃহৎ সত্তার মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো বিভাগ আছে। তাকে বলা যেতে পারে জাতিক সত্তা। ধারাবাহিক বহু কোটি লোক পুরুষপরম্পরায় মিলে এক-একটা সীমানার বাধা পড়ে।

এদের চেহারার একটা বিশেষত্ব আছে। এদের মনের গড়নটাও কিছু বিশেষ ধরণের। এই বিশেষত্বের লক্ষণ অমুসারে দলের লোক পরস্পরকে বিশেষ আত্মীয় বলে অনুভব করে। মানুষ আপনাকে সত্য বলে পায় এই আত্মীয়তার সূত্রে গোঁথা বহুদূরব্যাপী বৃহৎ ঐক্যজালে।

মানুষকে মানুষ কর্তে তোলবার ভার এই জাতিক সত্তার উপরে। সেইজন্তে মানুষের সবচেয়ে বড়ো আত্মরক্ষা এই জাতিক সত্তাকে রক্ষা করা। এই তার বৃহৎ দেহ, তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের মধ্যে দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ। জাতির নিবিড় সম্মিলিত শক্তি তাদের পোষণ করে না, রক্ষা করে না। তারা পরস্পর বিস্মিষ্ট হয়ে থাকে, এই বিস্মিষ্টতা মানবধর্মের বিরোধী। বিস্মিষ্ট মানুষ পদে পদে পরাস্ত হইয়া, কেননা তারা সম্পূর্ণ মানুষ নয়।

যেহেতু মানুষ সম্মিলিত জীব এইজন্তে শিশুকাল থেকে মানুষের সবচেয়ে প্রধান শিক্ষা— পরস্পর মেলবার পথে চলবার সাধনা। যেখানে তার মধ্যে জঙ্ঘর ধর্ম প্রবল সেখানে স্বৈচ্ছা এবং স্বার্থের টানে তাকে স্বতন্ত্র করে, ভালোমত মিলতে দেয় বাধা; তখন সমষ্টির মধ্যে যে ইচ্ছা, যে শিক্ষা, যে প্রবর্তনা দীর্ঘকাল ধরে জমে আছে সে জোর ক'রে বলে, 'তোমাকে মানুষ হতে হবে কষ্ট ক'রে; তোমার জঙ্ঘরধর্মের উন্টো পথে গিয়ে।' জাতিক সত্তার অন্তর্গত প্রত্যেকের মধ্যে নিয়ত এই ক্রিয়া চলছে ব'লে একটা বৃহৎ সীমানার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁদের মনুষ্যসংঘ তৈরি হয়ে উঠছে। একটা বিশেষ জাতিক নামের ঐক্যে তারা পরস্পর পরস্পরকে চেনে, তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিশেষ অবস্থায় বিশেষ আচরণ নিশ্চিন্ত মনে প্রত্যাশা করতে পারে। মানুষ জন্মায় জঙ্ঘর হয়ে, কিন্তু এই সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার মধ্যে অনেক দুঃখ করে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

এই-যে বহুকালক্রমাগত ব্যবস্থা যাকে আমরা সমাজ নাম দিয়ে থাকি, যা মনুষ্যত্বের প্রেরণিতা, তাকেও সৃষ্টি করে চলেছে মানুষ প্রতিনিয়ত— প্রাণ দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে, কালে কালে তার সংস্কার ক'রে। এই অবিজ্ঞান দেওয়া-নেওয়ার দ্বারাই সে প্রাণবান হয়ে ওঠে, নইলে সে জড়যন্ত্র হয়ে থাকত এবং তার দ্বারা পালিত এবং চালিত মানুষ হত কলের পুতুলের মতো; সেই-সব যান্ত্রিক নিয়মে বাধা মানুষের মধ্যে নতুন উদ্ভাবনা থাকত না, তাদের মধ্যে অগ্রসরগতি হত অবরুদ্ধ।

সমাজ এবং সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায়স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে প্রথম যে সৃষ্টি সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক করে তুলেছে; নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন, এমন-সব নক্ষত্র আছে যারা দীপ্তিহারা, তাদের প্রকাশ নেই, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তারা অখ্যাত। জীবজগতে মানুষ জ্যোতিষ্কজাতীয়। মানুষ দীপ্ত নক্ষত্রের মতো কেবলই আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে।

জ্যোতিষ্কনক্ষত্রের মধ্যে পরিচয়ের বৈচিত্র্য আছে ; কারও দীপ্তি বেশি, কারও দীপ্তি ম্লান, কারও দীপ্তি বাধাগ্রস্ত। মানবলোকেও তাই। কোথাও ভাষার উজ্জলতা আছে, কোথাও নেই। এই প্রকাশবান নানা জাতির মানুষ ইতিহাসের আকাশে আলোক বিস্তীর্ণ করে আছে। যাবার কাদেরও বা আলো নিবে গিয়েছে, আজ তাদের ভাষা লুপ্ত।

জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই-যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে, এ আমাদের বিশ্বিত করে না, যেমন বিশ্বিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি—যে চোখের দ্বারা দিয়ে নিত্যনিয়ত আমাদের পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে। কিন্তু একদিন ভাষার সৃষ্টিশক্তিকে মানুষ দৈবশক্তি বলে অনুভব করেছে সে কথা আমরা বুঝতে পারি যখন দেখি যিহুদি পুরাণে বলেছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল বাক্য ; যখন শুনি ঋগ্বেদে বাগ্‌দেবতা আপন মহিমা ঘোষণা ক'রে বলছেন—

আমি রাজ্ঞী। আমার উপাসকদের আমি ধনসমূহ দিয়ে থাকি। পূজনীয়াদের মধ্যে আমি প্রথমা। দেবতারা আমাকে বহু স্থানে প্রবেশ করতে দিয়েছেন।

প্রত্যেক মানুষ, দার দৃষ্টি আছে, প্রাণ আছে, জ্ঞতি আছে, আমার কাছ থেকেই সে অন্ন গ্রহণ করে। যারা আমাকে জানে না তারা ক্ষীণ হয়ে যায়।

আমি স্বয়ং বা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষদের দ্বারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি তাকে বলবান করি, সৃষ্টিকর্তা করি, ধর্মি করি, প্রজ্ঞাবান করি।

২

কোঠাবাড়ির প্রধান মসলা ইট, তার পরে চুন-স্বর্কির নানা বাধন। ধান দিয়ে আঁটবাঁধা শব্দই ভাষার ইট, বাংলার তাকে বলি 'কথা'। নানারকম শব্দচিহ্নের গ্রন্থি দিয়ে এই কথাগুলোকে গাঁথে গাঁথে হয় ভাষা।

মাটির তাল নিয়ে চাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুমোর গ'ড়ে তোলে হাড়িকুঁড়ি, নানা খেলনা, নানা মূর্তি। মানুষ সেইরকম গলার আঞ্জাটাকে ঠোঁটে দাঁতে জিভে

টাকরায় নাকের গর্তে খুরিয়ে ধ্বনির পুঞ্জ গড়ে তুলেছে ; মানুষের মনের কোঁক, হৃদয়ের আবেগ সেইগুলোকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে নানা আকার দিচ্ছে ।

দোয়েল-কোকিলরাও ধ্বনি দিয়ে ভাব প্রকাশ করে । মানুষের ভাষার ধ্বনি তেমন সহজ নয় । মানুষের অণু নানা আচরণের মতো প্রত্যেক শিশুকে নতুন ক'রে শুরু করতে হয়েছে ভাষার অভ্যাস, জাগিয়ে রাখতে হয়েছে এর কোশল । সেইজন্মে মানুষের ভাষা বাধা পড়ে যায় না একই অচল ঠাটে ।

আন্তে আন্তে বদল তার চলেইছে, দু-তিন শো বছর আগেকার ভাষার সঙ্গে পরের ভাষার তফাত ঘটে আসছেই । তবু বিশেষ জাতের ভাষার মূল স্বভাবটা থেকে যায়, কেবল তার আচারের কিছু কিছু বদল হয়ে চলে । সেইজন্মেই প্রাচীন বাংলাভাষা বদল হতে হতে আধুনিক বাংলায় এসে দাঁড়িয়েছে, অমিল আছে যথেষ্ট, তবু তার স্বভাবের কাঠামোটাকে নিয়ে আছে তার ঐক্য ।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এই কাঠামোর বিচার ক'রে ভাষার জাত নির্ণয় করেন ।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সমস্ত শব্দেরই এক-একটা মূল ধাতু আন্দাজ করা হয়েছে । সব আন্দাজগুলিই সম্পূর্ণ সত্য হোক বা না হোক, এর গোড়াকার তত্ত্বটাকে মানি । প্রাণজগতে প্রাণীসৃষ্টির আরম্ভে দেখা দেয় একটি একটি ক'রে জীবকোষ, তার পরে তাদেরই সমবায়ে ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে অবয়বধারী জীব । এক-একটি জীব এক-একটি বিশেষ কাঠামো নিয়ে তাদের স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস অনুসরণ করে । জীববিজ্ঞানীরা তাদের সেই কাঠামোর ঐক্য থেকে নানা পরিবর্তনের ভিতরেও তাদের শ্রেণী নির্ণয় করেন ।

ভারতবর্ষের কতকগুলি বিশেষ ভাষাকে ভাষাবিজ্ঞানী গোড়ীয় ভাষা নাম দিয়ে তাদের মেলবন্ধন করেছেন । আমি বাঙালী, মারাঠি ভাষা শুনে তার অর্থ বুঝতে পারি নে ; কিন্তু দুটো ভাষাই যে এক জাতের, ভাষাবিজ্ঞানীরা সেটা ধরতে পেরেছেন তাদের কাঠামো থেকে । পুষ্কু ভাষায় কথা কয় পাঠানেরা, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমানা পেরিয়ে ; পূর্ব সীমানায় আমরা বলি বাংলা । কিন্তু দুই ভাষারই কঙ্কাল-সংস্থানের মধ্যে যে ঐক্য আছে তার থেকে বোঝা যায় এরা আত্মীয় । এই দুই ভাষাতেই বহুসংখ্যক ধ্বনি গড়ে উঠেছে শব্দ হয়ে । একটা মূলস্বভাব তাদের ঐক্য দিয়েছে । শব্দগুলো বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে সেই স্বভাবটা ধরা পড়ে । এর থেকে বোঝা যায়, এক-এক জাতির ভাষা তার স্বতন্ত্র খেয়ালের সৃষ্টি নয় । কতকগুলি মূল ধ্বনিসংকেত নিয়ে যারা ভাষার কারবার আরম্ভ করেছিল, তারা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দেশে । কিন্তু ধ্বনিসংকেতের আত্মীয়তা ধরা পড়ে তাদের কাছে, ভাষাদৃষ্টির অভিজ্ঞতা

যাঁদের আছে। প্রাচীন যুগের ঘোড়া আর এখনকার ঘোড়ার প্রভেদ আছে বিস্তর, কিন্তু তাদের কঙ্কালের ছাঁদ দেখলে বোঝা যায়, তারা এক বংশের। ভাষার মধ্যেও সেই কঙ্কালের ছাঁদের মিল পেলেই তাদের একজাতীয়তা ধরা পড়ে।

ভাষা বানিয়েছে মানুষ, এ কথা কিছু সত্য আবার অনেকখানি সত্য নয়। ভাষা যদি ব্যক্তিসংগত কোনো মানুষের বা দলের কৃতকার্য হত তা হলে তাকে বানানো বলতুম; কিন্তু ভাষা একটা সমগ্র জাতের লোকের মন থেকে, মুখ থেকে, ক্রমশই গড়ে উঠেছে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ক্ষমিতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গাছপালা যেমন অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, ভাষার মূলপ্রকৃতিও তেমনি। মানুষের বাগ্মন্ত্র যদিও সব জাতের মধ্যেই একই ছাঁদের তবু তাদের চেহারাও তফাত আছে, এও তেমনি। বাগ্মন্ত্রের একটা-কিছু সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাতেই উচ্চারণের গড়ন যায় বদলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতের মুখে স্বরবর্ণ-বাক্যনবর্ণের মিশ্রণ ঘটবার রাস্তায় তফাত দেখতে পাওয়া যায়। তার পরে তাদের চিন্তার আছে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচ, তাতে শব্দ জোড়বার ধরণ ও ভাষার প্রকৃতি আলাদা ক'রে দেয়। ভাষা প্রথমে আবৃত্ত হয় নানারকম দৈবাৎ শব্দসংঘাতে, তার পরে মানুষের দেহমনের স্বভাব অনুসরণ করে সেই-সব সংকেতের দ্বারা সে ভরে উঠতে থাকে। পথহীন মাঠের মধ্যে দিগে যখন একজন বা দু-চারজন মানুষ কোনো-এক সময়ে চলে গেছে, তখন তাদের পায়ের চাপে মাটি ও ঘাস চাপা প'ড়ে একটা আকস্মিক সংকেত তৈরি হয়েছে। পরবর্তী পথিকেরা পায়ের তলায় তারই আশ্রয় পায়। এমনি করে পদক্ষেপের প্রবাহে এ পথ চিহ্নিত হতে থাকে। যদি পরিশ্রম বাঁচাবার জন্তে মানুষ এ পথ বানাতে বিশেষ চেষ্টা করত তা হলে রাস্তা হত সিধে; কিন্তু দেখতে পাই, যেঠো পথ চলেছে বেঁকেচুরে। তাতে রাস্তা দীর্ঘ হয়েছে কি না সে কথা কেউ বিচার করে নি।

ভাষার আকস্মিক সংকেত এমনি ক'রে অলক্ষ্যে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথে সেটা আকাবাঁকা পথ। হিসেব ক'রে তৈরি হয় নি, হয়েছে ইশারা থেকে ইশারায়। পুরোনো রাস্তা কিছু কিছু জীর্ণ হয়েছে, আবার তার উপরে নতুন সংস্কারেরও হাত পড়েছে। অনেক খুঁত আছে তার মধ্যে, নানা স্থানেই সে যুক্তিসংগত নয়। না হোক, তবু সে প্রাণের জিনিস, সমস্ত জাতের প্রাণমনের সঙ্গে সে গেছে এক হয়ে।

৩

মানুষের একটা জ্ঞান এই যে সে প্রতিমূর্তি গড়ে; তা সে পটে হোক, পাথরে হোক, মাটিতে খাতুতে হোক। অর্থাৎ একটি বস্তুর অল্পরূপে আর-একটিকে বানাতে সে আনন্দ

পায়। তার আর-একটি গুণ প্রতীক তৈরি করা, খেলার আনন্দে বা কাজের সুবিধের জন্তে। প্রতীক কোনো-কিছুর অল্পরূপ হবে, এমন কথা নেই। মুখোষ প'রে বড়োলাটসাহেবের পক্ষে অবিকল রাজার চেহারার নকল করা অনাবশ্যক। ভারতবর্ষের গদিতে তিনি রাজার স্থান দখল করে কাজ চালান—তিনি রাজার প্রতীক বা প্রতিনিধি। প্রতীকটা মেনে নেওয়ার ব্যাপার। ছেলেবেলায় মাস্টারি খেলা খেলবার সময় মেনে নিয়েছিলুম বারান্দার রেলিংগুলো আমার ছাত্র। মাস্টারি শাসনের নিষ্ঠুর গৌরব অল্পভব করবার জন্তে সত্যিকার ছেলে সংগ্রহ করবার দরকার হয় নি। এক টুকরো কাগজের সঙ্গে দশ টাকার চেহারার কোনো মিল নেই, কিন্তু সবাই মিলে মেনে নিয়েছে দশ টাকা তার দাম, দশ টাকার সে প্রতীক। এতে দলের লোকের দেনাপাওনাকে সোজা ক'রে দেওয়া হল।

ভাষা নিয়ে মানুষের প্রতীকের কারবার। বাঘের খবর আলোচনা করবার উপলক্ষ্যে স্বয়ং বাঘকে হাজির করা সহজও নয়, নিরাপদও নয়। বাঘে মানুষকে থায়, এই সংবাদটাকে প্রত্যক্ষ করানোর চেষ্টা নানা কারণেই অসংগত। 'বাঘ' ব'লে একটা শব্দকে মানুষ বানিয়েছে বাঘ জন্তুর প্রতীক। বাঘের চরিত্রে জানবার বিষয় থাকতে পারে বিস্তর, সে-সমস্তই ব্যবহার করা এবং জমা করা যায় ভাষার প্রতীক দিয়ে। মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে এই তার একটি বিরাট প্রতীকের জগৎ। এই প্রতীকের জালে ভুল স্থল আকাশ থেকে অসংখ্য সত্য সে আকর্ষণ করছে, এবং সঞ্চারণ করতে পারছে দূর দেশে ও দূর কালে। ভাষা গড়ে তোলা মানুষের পক্ষে সহজ হয়েছে যে প্রতীকরচনার শক্তিতে, প্রকৃতির কাছ থেকে সেই দানটাই মানুষের সকল দানের সেরা।

ধ্বনিতে গড়া বিশেষ বিশেষ প্রতীক কেবল যে বিশেষ বিশেষ বস্তুর নামধারী হয়ে কাজ চালাচ্ছে তা নয়, আরও অনেক সূক্ষ্ম তার কাজ। ভাষাকে ভাল রেখে চলতে হয় মনের সঙ্গে। সেই মনের গতি কেবল তো চোখের দেখার সীমানার মধ্যে সংকীর্ণ নয়। যাদের দেখা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, কেবলমাত্র ভাষা যায়, মানুষের সবচেয়ে বড়ো দেনাপাওনা তাদেরই নিয়ে। খুব একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

বলতে চাই, তিনটে সাদা গোক। ঐ 'তিন' শব্দটা সহজ নয়, আর 'সাদা' শব্দটাও যে খুব সাদা অর্থাৎ সরল তা বলতে পারি নে। পৃথিবীতে তিন-জন মানুষ, তিন-তলা বাড়ি, তিন-সের দুধ প্রভৃতি তিনের পরিমাণওয়াল। তিনিস বিস্তর আছে, কিন্তু তিনিসমাত্রই নেই অথচ তিন ব'লে একটা সংখ্যা আছে এ অসম্ভব। এ যদি ভাবতে যাই তা হলে হয়তো তিন সংখ্যার একটা অক্ষর ভাবি, সেই অক্ষরটাকে মুখে বলি তিন ;

কিন্তু অক্ষর তো তিন নয়। ঐ তিন অক্ষর এবং তিন শব্দের মধ্যে নিঃশব্দে লুকোনো রয়েছে অগণ্য তিন-সংখ্যক জিনিসের নির্দেশ। তাদের নাম করতে হয় না। ভাষার এই সুবিধা নিয়ে মানুষ সংখ্যা বোঝাবার শব্দ বানিয়েছে বিস্তর। তিনটে তিন সংখ্যার গোরু একত্র করলে ৯টা গোরু হয়, এ কথা স্মরণ করাবার জন্যে গোয়ালঘরে টেনে নিয়ে যেতে হয় না। গোরু প্রভৃতি সব-কিছু বাদ দিয়ে মানুষ ভাষার একটা কোশল বানিয়ে দিলে, বললে তিন-ত্রিক্বে নয়। ও একটা ফাঁদ। তাতে ধরা পড়তে লাগল কেবল গোরু নয় তিন-সংখ্যা-বাঁধা যে-কোনো তিন জিনিসের পরিমাপ। ভাষা যার নেই এই সহজ কথাটা ধরে রাখবার উপায় তার হাতে নেই।

এই উপলক্ষ্যে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ল। ইন্সুলে-পড়া একটি ছোটো মেয়ের কাছে আমার নামতার অজ্ঞতা প্রমাণ করবার জন্যে পরিহাস ক'রে বলেছিলুম, তিন-পাঁচে পাঁচ।

চোখদুটো এত বড়ো ক'রে সে বললে, 'আপনি কি জানেন না তিন-পাঁচে পনেরো?' আমি বললুম, 'কেমন করে জানব বলো, সব তিনই কি এক মাপের। তিনটে হাতিকে পাঁচগুণ করলেও পনেরো, তিনটে টিকটিকিকেও?' শুনে তার মনে বিষম দ্বিধার উপস্থিত হল, বললে, 'তিন যে তিনটে একক, হাতি-টিকটিকির কথা তোলেন কেন।' শুনে আমার আশ্চর্য বোধ হল। যে একক সৰুও নয় মোটাও নয়, ভারিও নয় হাফাও নয়, যে আছে কেবল ভাষা আঁকড়িয়ে, সেই নিশ্চয় একক ওর কাছে এত সহজ হয়ে গেছে যে, আস্ত হাতি-টিকটিকিকেও বাদ দিয়ে ফেলতে তার বাধে না। এই তো ভাষার গুণ।

'সাদা' কথাটাও এইরকম সৃষ্টিছাড়া। সে একটা বিশেষণ, বিশেষ্য নইলে একেবারে নিরর্থক। সাদা বস্ত্র থেকে তাকে ছাড়িয়ে নিলে ভ্রগতে কোথাও তাকে রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, এক ঐ ভাষার শব্দটাতে ছাড়া। এই তো গেল গুণের কথা, এখন বস্তুর কথা।

মনে আছে আমার বয়স যখন অল্প আমার একজন মাস্টার বলেছিলেন, এই টেবিলের গুণগুলি সব বাদ দিলে হয়ে যাবে শূন্য। শুনে মন মানতেই চাইল না। টেবিলের গায়ে যেমন বানি লাগানো হয় তেমনি টেবিলের সঙ্গে তার গুণগুলো লেগে থাকে, এই রকমের একটা ধারণা বোধ করি আমার মনে ছিল। যেন টেবিলটাকে বাদ দিতে গেলে মুটে ডাকার দরকার, কিন্তু গুণগুলো ধুয়ে মুছে ফেলা সহজ। সেদিন এই কথা নিয়ে ইঁ করে অনেকক্ষণ ভেবেছিলুম। অথচ মানুষের ভাষা গুণহীনকে নিয়ে অনেক বড়ো বড়ো কায়দার করেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

আমাদের ভাষায় একটা সরকারি শব্দ আছে, 'পদার্থ'। বলা বাহুল্য, জগতে পদার্থ ব'লে কোনো জিনিস নেই ; জল মাটি পাথর লোহা আছে। এমনতরো অনির্দিষ্ট ভাবনাকে মানুষ তার ভাষায় বাঁধে কেন। জরুরি দরকার আছে বলেই বাঁধে।

বিজ্ঞানের গোড়াতেই এ কথাটা বলা চাই যে, পদার্থ মাত্রই কিছু না কিছু জায়গা জোড়ে। ঐ একটা শব্দ দিয়ে কোটি কোটি শব্দ বাঁচানো গেল। অভ্যাস হয়ে গেছে ব'লে এ সৃষ্টির মূল্য ভুলে আছি। কিন্তু ভাষার মধ্যে এই-সব অভাবনীয়কে ধরা মানুষের একটা মস্ত কীতি।

বোঝা-হাঝা-করা এই-সব সরকারি শব্দ দিয়ে বিজ্ঞান দর্শন ভরা। সাহিত্যেও তার কমতি নেই। এই মনে করো, 'হৃদয়' শব্দটা বলি অত্যন্ত সহজেই। কারও হৃদয় আছে বা হৃদয় নেই, যত সহজে বলি তত সহজে ব্যাখ্যা করতে পারি নে। কারও 'মহুগুহ' আছে বলতে কী আছে তা সমস্তটা স্পষ্ট করে বলা অসাধ্য। এ ক্ষেত্রে ধ্বনির প্রতীক না দিয়ে অন্তরকম প্রতীকও দেওয়া যেতে পারে। মহুগুহ ব'লে একটা আকারহীন পদার্থকে কোনো-একটা মূর্তি দিয়ে বলাও চলে। কিন্তু মূর্তিতে জায়গা জোড়ে, তার ভার আছে, তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তা ছাড়া তাকে বৈচিত্র্য দেওয়া যায় না। শব্দের প্রতীক আমাদের মনের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থের বিস্তার হতেও বাধা ঘটে না।

এ কথাটা ভেবে রাখা ভালো যে, এই-সব ভার-লাদব-করা সরকারি অর্থের শব্দগুলিকে ইংরেজিতে বলে অ্যাবস্ট্রাক্ট শব্দ। বাংলায়, এর একটা নতুন প্রতিশব্দের দরকার। বোধ করি 'নির্বন্ধক' বললে কাজ চলতে পারে। বন্ধ থেকে গুণকে নিষ্কাশ করে নেওয়া যে ভাবমাত্র তাকে বলবার ও বোঝাবার ক্ষেত্রে নির্বন্ধক শব্দটা হয়তো ব্যবহারের যোগ্য। এই অ্যাবস্ট্রাক্ট শব্দগুলোকে আশ্রয় করে মানুষের মন এত দূরে চলে যেতে পেরেছে যত দূরে তার ইন্দ্রিয়শক্তি যেতে পারে না, যত দূরে তার কোনো যানবাহন পৌঁছয় না।

৪

মানুষ যেমন জানবার জিনিস ভাষা দিয়ে জানায় তেমনি তাকে জানাতে হয় সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা - মন্দ লাগা, নিন্দা-প্রশংসার সংবাদ। ভাবে ভঙ্গীতে, ভাষাহীন আশ্রয়ে, চাহনিতে, হাসিতে, চোখের জলে এই-সব অমুভূতির অনেকখানি বোঝানো যেতে পারে। এইগুলি হল মানুষের প্রকৃতিদত্ত বোঝার ভাষা, এ ভাষায় মানুষের ভাবপ্রকাশ প্রত্যক্ষ। কিন্তু সুখ দুঃখ ভালোবাসার বোধ অনেক শূন্যে যায়, উর্ধ্বে যায় ;

তখন তাকে ইশারায় আনা যায় না, বর্ণনায় পাওয়া যায় না, কেবল ভাষার নৈপুণ্যে যত দূর সম্ভব নানা ইচ্ছিতে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভাষা হৃদয়বোধের গভীরে নিয়ে যেতে পেরেছে বলেই মানুষের হৃদয়বেগের উপলব্ধি উৎকর্ষ লাভ করেছে। সংস্কৃতিমানদের বোধশক্তির রূঢ়তা যায় কম হয়ে, তাঁদের অল্পভূতির মধ্যে সূক্ষ্ম সুসুমার ভাবের প্রবেশ ঘটে সহজে। গোয়ার হৃদয় হচ্ছে অপিক্ত হৃদয়। অবশ্য স্বভাবদোষে ক্রটি ও অল্পভূতির পঙ্কষতা যাদের মজ্জাগত তাদের আশা ছেড়ে দিতে হয়। জ্ঞানের শক্তি নিয়েও এ কথা খাটে। স্বাভাবিক মূঢ়তা যাদের চূর্ভেদ, জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় তাদের বুদ্ধিকে বেশি দূর পর্যন্ত সাধকতা দিতে পারে না।

মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষায় অনেক তকাত। জ্ঞানের ভাষা যত দূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্য সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। কিন্তু ভাবের ভাষা কিছু যদি অস্পষ্ট থাকে, যদি সোজা ক'রে না বলা হয়, যদি তাতে অলংকার থাকে উপযুক্তমত, তাতেই কাজ দেয় বেশি। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অর্থ বাকা ক'রে দিয়ে।

ভালো লাগা বোঝাতে কবি বললেন, 'পাষণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে'। বললেন, 'ঢল ঢল কাঁচা শব্দের লাবণি অবনি বহিষা যায়'। এখানে কথাগুলোর ঠিক মানে নিলে পাগলামি হয়ে দাঁড়াবে। কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের বইয়ে থাকত তা হলে বুঝতুম, বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটি দৈহিক হাওয়া যার রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাথর কঠিন থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য। কিংবা কোনো মানুষের শরীরে এমন একটি রশ্মি পাওয়া গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, পৃথিবীর টানে যার বিকিরণ মাটির উপর দিগ্বে ছড়িয়ে যেতে থাকে। শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস করলে এইরকম একটা ব্যাখ্যা ছাড়া উপায় থাকে না। কিন্তু এ-যে প্রাকৃত ঘটনার কথা নয়, এ-যে মনে-হয়-যেন'র কথা। শব্দ তৈরি হয়েছে ঠিকটা-কী জানাবার জন্মে; সেইজন্মে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাকাতে হয়। ঠিক-যেন-কী'র ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কোণলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব। বস্তুত কবিত্ব এত বড়ো জায়গা পেয়েছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদা অর্থ দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে পারে না। তাই কবি লাবণ্য শব্দের বার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ক'রে বানিয়ে বললেন, যেন লাবণ্য একটা স্নরনা, শরীর থেকে ক'রে পড়ে মাটিতে। কথার

অর্থটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট ক'রে দিয়ে এ হল ব্যাকুলতা ; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে 'বলতে পারছি নে'। এই অনির্বচনীয়তার সুযোগ নিয়ে নানা কবি নানারকম অত্যাঙ্কির চেষ্টা করে। সুযোগ নয় তো কী ; যাকে বলা যায় না তাকে বলবার সুযোগই কবির সৌভাগ্য। এই সুযোগেই কেউ লাবণ্যকে ফুলের গন্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, কেউ বা নিঃশব্দ বীণাধরির সঙ্গে—অসংগতিকে আরও বহু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে। লাবণ্যকে কবি যে লাবণি বলেছেন সেও একটা অধীরতা। প্রচলিত শব্দকে অপ্রচলিতের চেহারা দিয়ে ভাষার আভিধানিক সীমানাকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হল।

হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিরে আছে সেই বেড়া ভাঙার কাজ। এইজন্তেই মাতার সন্তানকে যা নয় তাই ব'লে এককে আর ক'রে জানায়। বলে চাঁদ, বলে মানিক, বলে সোনা। এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর-এক দিকে অস্পষ্ট কথারও। এক দিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষাসীমার প্রত্যন্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেতচিহ্নে ; আর-এক দিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দূরপ্রান্তে পৌঁছিয়ে অবশেষে আপন বাঁধা অর্থের অন্তথা করেই ভাবের ইশারা তৈরি করতে বসেছে।

৫

জানার কথাকে জানানো আর হৃদয়ের কথাকে বোঝে জাগানো, এ ছাড়া ভাষার আর-একটা খুব বড়ো কাজ আছে। সে হচ্ছে কল্পনাকে রূপ দেওয়া। এক দিকে এইটেই সবচেয়ে অনরকারি কাজ, আর-এক দিকে এইটেতেই মানুষের সবচেয়ে আনন্দ। প্রাণলোকে সৃষ্টিব্যাপারে জীবিকার প্রয়োজন যত বড়ো জায়গাই নিক-না, অলংকরণের আয়োজন বড়ো কম নয়। গাছপালা থেকে আরম্ভ ক'রে পশুপক্ষী পর্যন্ত সবজন্মই রঙে রেশম প্রসাদনের বিভাগ একটা মস্ত বিভাগ। পাশ্চাত্য মহাদেশে যে ধর্মনীতি প্রচলিত, পশুরা তাতে অসম্মানের জায়গা পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, সেই কারণেই যুরোপের বিজ্ঞানীবুদ্ধি জীবমহলে সৌন্দর্যকে একান্তই কেজো আদর্শে বিচার করে এসেছে। প্রকৃতিদত্ত সাজে সজ্জায় ওদের বোধশক্তি প্রাণিক প্রয়োজনের বেশি দূরে যে যায়, এ কথা যুরোপে সহজে স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সৌন্দর্য একমাত্র মানুষের কাছেই প্রয়োজনের অতীত আনন্দের দূত হয়ে এসেছে আর পশুপক্ষীর সুখবোধ

একান্তভাবে কেবল প্রাণধারণের ব্যবসাবে সীমাবদ্ধ, এমন কথা মানতেই হবে তার কোনো কারণ নেই।

যাই হোক, সৌন্দর্যকে মানুষ অহেতুক বলে মেনে নিয়েছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা মানুষকে টানে প্রাণযাত্রার গরজে; সৌন্দর্যও টানে, কিন্তু তাতে প্রয়োজনের তাগিদ নেই। প্রয়োজনের সামগ্রীর সঙ্গে আমরা সৌন্দর্যকে জড়িয়ে রাখি, সে কেবল প্রয়োজনের একান্ত ভারাকর্ষণ থেকে মনকে উপরে তোলবার জন্তে। প্রাণিক শাসনকেন্দ্রের মাঝখানে সৌন্দর্যের একটি মহল আছে যেখানে মানুষ মুক্ত, তাই সেখানেই মানুষ পায় বিত্তময় আনন্দ।

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে। তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটো বিভাগ আছে—একটা তার গরজের; আর-একটা তার খুশির, তার খেয়ালের। আশ্চর্যের কথা এই যে, ভাষার জগতে এই খুশির এলেকায় মানুষের যত সম্পদ সম্বন্ধে সজ্ঞিত এমন আর-কোনো অংশে নয়। এইখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন।

সৃষ্টি বলতে বোঝায় সেই রচনা যার মুখ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ। মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে। বিশেষ বস্তু আমরা এমন-কিছুকে পাই যা রূপে রসে নিরতিশয়ভাবে তার সত্যকে আমাদের চেতনার কাছে উজ্জ্বল করে তোলে, যাকে আমরা স্বীকার না করে থাকতে পারি নে, যার কাছ থেকে অন্য কোনো লাভ আমরা প্রত্যাশাই করি নে, আপন আনন্দের দ্বারা তাকেই আমরা আত্মপ্রকাশের চরম মূল্য দিই। ভাষায় মানুষের সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি সাহিত্য। এই সৃষ্টিতে যেটি প্রকাশ পেয়েছে তাকে বস্তু চরম বলেই মেনে নিই তখন সে হয় আমার কাছে তেমনি সত্য যেমন সত্য ঐ বটগাছ। সে যদি এমন-কিছু হয় সচরাচরের সঙ্গে যার মিল না থাকে, অথচ যাকে নিশ্চিত প্রতীতির সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে বলি ‘এই যে তুমি’, তা হলে সেও সত্য হয়েই সাহিত্যে স্থান পায়, প্রাকৃত জগতে যেমন সত্যরূপে স্থান পেয়েছে পর্বত নদী। মহাভারতের অনেক-কিছুই আমার কাছে সত্য; তার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক, এমন-কি প্রাকৃতিক কোনো প্রমাণ না থাকতে পারে, এবং কোনো প্রমাণ আমি উল্লেখ করতেই চাই নে, তাকে সত্য বলে অনুভব করেছি এই বথেষ্ট। আমরা বস্তু নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে বেরোই তখন সেখানে নিজ অস্ত্যাসে আমাদের চৈতন্য মলিন হয় নি বলেই সেখানকার অতি সাধারণ দৃশ্য সম্বন্ধেও আমাদের অনুভূতি স্পষ্ট থাকে; এই স্পষ্ট অনুভূতিতে যা দেখি তার সত্যতা উজ্জ্বল, তাই সে আমাদের আনন্দ দেয়। তেমনি সেই সাহিত্যকেই

আমরা খ্রীষ্ট বলি যা রসজ্ঞদের অনুভূতির কাছে আপন রচিত রসকে রূপকে অবশ্যস্বীকার করে তোলে। এমনি করে ভাষার জিনিসকে মানুষের মনের কাছে সত্য করে তোলবার নৈপুণ্য যে কী, তা রচয়িতা স্বয়ং হয়তো বলতে পারেন না।

প্রাকৃতিক জগতে অনেক-কিছুই আছে যা অকিঞ্চিৎকর বলে আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু অনেক আছে যা বিশেষভাবে স্মরণ, যা মহীয়ান, যা বিশেষ কোনো ভাবস্বতির সঙ্গে জড়িত। লক্ষ লক্ষ জিনিসের মধ্যে তাই সে বাস্তবরূপে বিশেষভাবে আমাদের মনকে টেনে নেয়। মানুষের রচিত সাহিত্যজগতে সেই বাস্তবের বাছাই করা হতে থাকে। মানুষের মন যাকে বরণ করে নেয় সব-কিছুর মধ্যে থেকে সেই সত্যের সৃষ্টি চলছে সাহিত্যে; অনেক নষ্ট হচ্ছে, অনেক থেকে যাচ্ছে। এই সাহিত্য মানুষের আনন্দলোক, তার বাস্তব জগৎ। বাস্তব বলছি এই অর্থে যে, সত্য এখানে আছে বলেই সত্য নয়, অর্থাৎ এ বৈজ্ঞানিক সত্য নয়—সাহিত্যের সত্যকে মানুষের মন নিশ্চিত মনে নিয়েছে বলেই সে সত্য।

মানুষ জানে, জানায়; মানুষ বোধ করে, বোধ জাগায়। মানুষের মন কল্পজগতে সঞ্চার করে, সৃষ্টি করে কল্পরূপ; এই কাজে ভাষা তার যত সহায়তা করে ততই উত্তরোত্তর তেজস্বী হয়ে উঠতে থাকে।

সাহিত্যে যে স্বতঃপ্রকাশ সে আমাদের নিজের স্বভাবের। তার মধ্যে মানুষের অন্তরতর পরিচয় আপনিই প্রতিফলিত হয়। কেন হয় তার একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

যে সত্য আমাদের ভালো লাগে - মন্দ লাগার অপেক্ষা করে না, অস্তিত্ব ছাড়া যার অন্য কোনো মূল্য নেই, সে হল বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু যা-কিছু আমাদের স্বধ্বংস-বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব। কোন্টো আমাদের অনুভূতিতে প্রবল করে সাড়া দেবে, আমাদের কাছে দেখা দেবে নিশ্চিত রূপ ধরে, সেটা নির্ভর করে আমাদের শিক্ষাদীক্ষার, আমাদের স্বভাবের, আমাদের অবস্থার বিশেষত্বের উপরে। আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারও প্রশস্ত, কারও সংকীর্ণ। কারও দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে, বিশ্বের ছোটো বড়ো অনেক-কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ অনুবীক্ষণ-শক্তি। আমার কারও কারও জগতে আন্তরিক কারণে বা বাহিরের অবস্থাবশত বেশি ক'রে ভালো পড়ে বিশেষ কোনো সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে। তাই মানুষের বাস্তববোধের বিশেষত্ব ও

আমাদেরই যথার্থ তার পরিচয়। সে যদি কবি হয় তবে তার কাব্যে ধরা পড়ে তার মন এবং তার মনের দেখা বিশ্ব। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে ইংরেজ কবিদের দৃষ্টিক্ষেত্রের আলো বদল হয়ে গেছে, এ কথা সকলেই জানে। প্রবল আঘাতে তাদের মানসিক পথযাত্রার রথ পূর্বকার বাধা লাইন থেকে সরে সরে পড়েছে। তার পর থেকে পথ চলেছে অন্য দিকে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পুরোনো সাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্তের আলোচনা করা যেতে পারে।

মঙ্গলকাব্যের কুমিকাতেই দেখি, কবি চলেছেন দেশ ছেড়ে। রাজ্যে কোনো ব্যবস্থা নেই, শাসনকর্তারা যথেষ্টাচারী। নিজের জীবনে মুহুম্মদরায় রাষ্ট্রশক্তির যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে তিনি সবচেয়ে প্রবল করে অনুভব করেছেন অশ্রাব্যের উচ্ছৃঙ্খলতা; বিদেশে উপবাসের পর দ্বান করে তিনি যখন ঘুমোলেন, দেবী স্বপ্নে তাঁকে আদেশ করলেন দেবীর মহিমাগান রচনা করবার জন্তে। সেই মহিমাকীর্তন ক্ষমাহীন স্মারধর্মহীন ঈর্ষাপরাধন জ্বরতার জ্বরকীর্তন। কাব্যে জানালেন, যে শিবকে কল্যাণময় বলে ভক্তি করা যায় তিনি নিশ্চেষ্ট, তাঁর ভক্তদের পদে পদে পরাভব। ভক্তের অপমানের বিষয় এই যে, অশ্রাব্যকারিণী শক্তির কাছে সে ভয়ে মাথা করেছে নত, সেই সঙ্গে নিজের আরাধ্য দেবতাকে করেছে অশ্রদ্ধেয়। শিবশক্তিকে সে মেনে নিয়েছে অশক্তি বলেই।

মনসামঙ্গলের মধ্যেও এই একই কথা। দেবতা নিষ্ঠুর, স্মারধর্মের দোহাই মানে না, নিজের পূজা-প্রচারের অহংকারে সব দুর্মর্মে সে করতে পারে। নির্মম দেবতার কাছে নিজেকে হীন ক'রে, ধর্মকে অস্বীকার ক'রে, তবেই ভীকর পরিজ্ঞান, বিশ্বের এই বিধানই কবির কাছে ছিল প্রবলভাবে বাস্তব।

অপর দিকে আমাদের পুরাণকথাসাহিত্যে দেখা প্রহ্লাদচরিত্র। যারা এই চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন তাঁরা উৎপীড়নের কাছে মানুষের আত্মপরাভবকেই বাস্তব বলে মানেন নি। সংসারে সচরাচর ঘটে সেই দীনতাই, কিন্তু সংখ্যা গণনা করে তাঁরা মানবসত্যকে বিচার করেন নি। মানুষের চরিত্রে যেটা সত্য হওয়া উচিত তাঁদের কাছে সেইটেই হয়েছে প্রত্যক্ষ বাস্তব, যেটা সর্বদাই ঘটে এর কাছে সেটা ছায়া। যে কালের মন থেকে এ রচনা জেগেছিল সে কালের কাছে বীরবান দৃঢ়চিত্ততার মূল্য যে কতখানি, এই সাহিত্য থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

আর-এক কবিকে দেখা, শেলি। তাঁর কাব্যে অত্যাচারী দেবতার কাছে মানুষ বন্দী। কিন্তু পরাভব এর পরিণাম নয়। অসহ্য পীড়নের তাড়নাতেও অশ্রাব্য শক্তির

কাছে মানুষ অভিভূত হয় নি। এই কবির কাছে অত্যাচারীর পীড়নশক্তির দুর্জয়তাই সবচেয়ে বড়ো সত্য হয়ে প্রকাশ পায় না, তাঁর কাছে তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে অত্যাচারিতের অপরাজিত বীৰ্য।

সাহিত্যের জগৎকে আমি বলছি বাস্তবের জগৎ, এই কথাটার তাৎপর্য আরও একটু ভালো করে বুঝে দেখা দরকার। এ তর্ক প্রায় মাঝে মাঝে উঠেছে যে, প্রাকৃত জগতে যা অপ্রিয় যা দুঃখজনক, যাকে আমরা বর্জন করতে ইচ্ছা করি, সাহিত্যে তাকে কেন আদর করে স্থান দেওয়া হয়, এমন-কি বিরহাস্তক নাটক কেন মিলনাস্তক নাটকের চেয়ে বেশি মূল্য পেয়ে থাকে।

যা আমাদের মনে জোরে ছাপ দেয়, বাস্তবতার হিসাবে তারই প্রভাব আমাদের কাছে প্রবল। দুঃখের ধাক্কায় আমরা একটুও উদাসীন থাকতে পারি নে। এ কথা সত্য হলেও তর্ক উঠবে, দুঃখ যখন অপ্রিয় তখন সাহিত্যে তাকে উপভোগ্য বলে স্বীকার করি কেন। এর সহজ উত্তর এই— দুঃখ অপ্রিয় নয়, সাহিত্যেই তার প্রমাণ। যা-কিছু আমরা বিশেষ করে অনুভব করি তাতে আমরা বিশেষ করে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতে আনন্দ। চার দিকে আমাদের অনুভবের বিষয় যদি কিছু না থাকে তা হলে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু; কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্বভাবত আমাদের ঐশ্বর্যের অভাব বা ক্ষীণতা তা হলে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে করে আমাদের আপনাকে অনুভব করাটা সচেতন হয়ে ওঠে না। দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি চেতিয়ে রাখে; কিন্তু সংসারে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, সেইজন্যে আমাদের প্রাণপুরুষ দুঃখের সম্ভাবনার কুণ্ঠিত হয়। জীবনযাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই বলেই বিস্তৃত অনুভবটুকু ভোগ করতে পারি। গল্পে ভূতের ভয়ের অনুভূতিতে ছেলেরা পুলকিত হয়, কেননা তাদের মনে এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা পায় বিনা দুঃখের মূল্যে। কাল্পনিক ভয়ের আঘাতে ভুত তাদের কাছে নিবিড়ভাবে বাস্তব হয়ে ওঠে, আর এই বাস্তবের অনুভূতি ভয়ের যোগেই আনন্দজনক। যারা সাহসী তারা বিপদের সম্ভাবনাকে ঘেঁচে ভেঁকে আনে, ভয়ানকে আনন্দ আছে বলেই। তারা এভারেস্টের চূড়া লঙ্ঘন করতে যায় অকারণে। তাদের মনে ভয় নেই বলেই ভয়ের কারণ-সম্ভাবনার তাদের নিবিড় আনন্দ। আমার মনে ভয় আছে, তাই আমি দুর্গম পর্বতে চড়তে বাই নে, কিন্তু দুর্গমযাত্রীদের বিবরণ ঘরে বসে পড়তে ভালোবাসি; কেননা তাতে বিপদের স্বাদ পাই অথচ বিপদের আশঙ্কা থাকে না। যে ভ্রমণবৃত্তান্তে বিপদ যথেষ্ট ভীষণ নয় তা পড়তে শুভ ভালো লাগে না। বস্তুর প্রবল অনুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেননা সেই অনুভূতি-দ্বারা প্রবলরূপে

আমরা আপনাকে জানি। সাহিত্য বহু বিচিত্রভাবে আমাদের আপনাকে জানার জগৎ, অথচ সে জগতে আমাদের কোনো দাবিদ্ব নেই।

সাহিত্যে মানুষের আত্মপরিচয়ের হাজার হাজার স্বরনা বয়ে চলেছে— কোনোটা পঙ্খিল, কোনোটা স্বচ্ছ, কোনোটা ক্ষীণ, কোনোটা পরিপূর্ণপ্রায়। কোনোটা মানুষের মরবার সময়ের লক্ষণ জানায়, কোনোটা জানায় তার নবজাগরণের।

বিচার করলে দেখা যায়, মানুষের সাহিত্যরচনা তার দুটো পদার্থ নিয়ে। এক হচ্ছে যা তার চোখে অত্যন্ত করে পড়েছে, বিশেষ করে মনে ছাপ দিয়েছে। তা হাতকর হতে পারে, অঙ্কিত হতে পারে, সাংসারিক আবশ্যকতা অনুসারে অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তার মূল্য এই যে, তাকে মনে এনেছি একটা স্পষ্ট ছবিরূপে, ঘটনারূপে; অর্থাৎ সে আমাদের অশুভৃতিকে অধিকার করেছে বিশেষ করে, ছিনিয়ে নিয়ে চেতনার ক্ষীণতা থেকে। সে হয়তো অবজ্ঞা বা ক্রোধ উদ্বেক করে, কিন্তু সে স্পষ্ট। যেমন ময়ূর বা ডাঙুদস্ত। দৈনিক ব্যবহারে তার সঙ্গ আমরা বর্জন করে থাকি। কিন্তু সাহিত্যে যখন তার ছবি দেখি তখন হেসে কিংবা কোনো রকমে উত্তেজিত হয়ে ব'লে উঠি, 'ঠিক বটে!' এইরকম কোনো চরিত্রকে বা ঘটনাকে নিশ্চিত স্বীকার করাতে আমাদের আনন্দ আছে। নিঃসতই বহু লক্ষ পদার্থ এবং অসংখ্য ব্যাপার যা আমাদের জীবনমনের কেন্দ্র দিয়ে চলেছে তা প্রবলরূপে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হয় না। কিন্তু যা-কিছু স্বভাবত কিংবা বিশেষ কারণে আমাদের চৈতন্যকে উদ্বিগ্ন করে আলোড়িত করে সেই-সব অভিজ্ঞতার উপকরণ আমাদের মনের ভাগারে জমা হতে থাকে, তারা বিচিত্রভাবে আমাদের স্বভাবকে পূর্ণ করে। মানুষের সাহিত্য মানুষের সেই সম্ভাবিত, সম্ভবপর, অসংখ্য অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ। জাভাতে দেখে এলুম আশ্চর্য নৃত্যকৌশলের সঙ্গে হুহুমান্নে ইচ্ছাজিতে লড়াইয়ের নাট্যাভিনয়। এই দুই পৌরাণিক চরিত্র এমন অন্তরঙ্গভাবে তাদের অভিজ্ঞতার জিনিস হয়ে উঠেছে যে, চার দিকের অনেক পরিচিত মানুষের এবং প্রত্যক্ষ ব্যাপারের চেয়ে এদের সত্তা এবং আচরণ তাদের কাছে প্রবলতররূপে স্থনিশ্চিত হয়ে গেছে। এই স্থনিশ্চিত অভিজ্ঞতার আনন্দ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের নাচে গানে।

সাহিত্যের আর-একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ বা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। সংসার অসম্পূর্ণ; তার ভালোর সঙ্গে মন্দ জড়ানো, সেখানে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ভরপুর মেটে না। সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষা-পূর্ণতার জগৎসৃষ্টি করে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে বা হুওয়া উচিত ছিল, যা হয় নি, তাকে স্মৃতিমান করে মেটাচ্ছে সে

আপন কোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার নিজের সংসাররচনার চরিত্ররচনার কাজ করছে। মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো ক'রে তুলছে, তাকে মানুষ যুগে যুগে সম্মান দিয়ে এসেছে।

এইসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক আদর্শের ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাতে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় তার শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর নিখিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজরুর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য। শুক্তির মধ্যে মুক্তা দেখা দেয় তার ব্যাধিরূপে। শীতের দেশে শরৎকালের বনভূমিতে যখন মৃত্যুর হাওয়া লাগে তখন পাতায় পাতায় রঙিন তার বিকাশ বিচিত্র হয়ে ওঠে, সে তাদের বিনাশের উপক্রমণিকা। সেইরকম কোনো জাতির চরিত্রকে যখন আত্মঘাতী রিপূর দুর্বলতায় জড়িয়ে ধরে তখন তার সাহিত্যে, তার শিল্পে, কখনো কখনো মোহনীয়তা দেখা দিতে পারে। তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত করে তোলে।

মানুষ যে কেবল ভোগরসের সম্বলদার হয়ে আত্মপ্লাবী করে বেড়াবে তা নয়; তাকে পরিপূর্ণ করে বাঁচতে হবে, অগ্রমস্ত পৌরুষে বীৰ্যবান হয়ে সকলপ্রকার অসম্বলের সঙ্গে লড়াই করবার জন্তে প্রস্তুত হতে হবে। স্বজাতির সমাধির উপরে ফুলবাগান নাহর নাই তৈরি হল।

৬

সমুদ্রের মধ্যে হাজার হাজার প্রবাল আপন দেহের আবরণ মোচন করতে করতে কখন এক সময়ে দ্বীপ বানিয়ে তোলে। তেমনি বহুসংখ্যক মন আপনার অংশ দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলেছে আপনার ভাবাদ্বীপ।

মানুষ বানিয়েছে আপনার গানের কাপড়। বয়স বাড়তে বাড়তে তার দেহের মাপের বদল হয়। বারবার পুরোনো কাপড় কেলে দিয়ে নতুন কাপড় না বানালে তার চলে না। জাতির মন কখনো বাড়ে, আবার কণী উপবাসীর ঘেরকর দশা হয় তেমনি

কখনো বা সে কমেও বটে। কিন্তু পুরোনো আমার মতো ভাষাটাকে কেলে দিয়ে দর্জির দোকানে নতুন ভাষার কর্মশালা দিতে হয় না। মনের গড়নের সঙ্গেই চলেছে তার গড়ন, মনের বাড়নের সঙ্গেই তার বাড়। আমার এই প্রায় আশি বছর বয়সে নিজেরই ভিতর থেকে দেখতে পাই, সস্তর বছর পূর্বের বাঙালির মন আর এখনকার মনে তফাত বিস্তর। দেখতে পাচ্ছি এই তার মনের বদল ভাষার মধ্যেও ভিতরে-ভিতরে কাজ করছে। সস্তর বছর আগেকার ভাষা এখন নেই। এর উপরে লেগেছে অনেক মনের নব নব স্পর্শ ও প্রবর্তনা। কিন্তু সে কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো এক-একজন বিশেষ মনোবীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাত্যস্ত জড়তা থেকে; দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বক্ষিষচ্ছ। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার ঘেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আস্থানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে চেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুত বেগে, আর তখনি তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।

৭

আমরা যাকে দেশ বলি, বাইরে থেকে দেখতে সে ভূগোলের এক অংশ। কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন আছে তার বায়ুমণ্ডল, যেখানে বয় তার প্রাণের নিশ্বাস, যেখানে ওঠে তার গানের ধ্বনি, যার মধ্যে দিয়ে আসে তার আকাশের আলো, যেমনি একটা মনোমণ্ডল স্তরে স্তরে এই ভূভাগকে অদৃশ্য আবেষ্টনে ঘিরে কেলেছে—সমস্ত দেশকে সেই দেয় অস্তরের ঐক্য।

পৃথিবীর আবহ-আস্তরণের মতোই তার সব কাজ সব দান সকলকে নিয়ে। যা ভূখণ্ড এ তাকেই করে তুলেছে দেশ। ধারাবাহিক বৃহৎ আত্মীয়তার ঐক্যবেষ্টনে প্রাকৃতিককে আচ্ছন্ন করে দিয়ে তাকে করেছে মানবিক। এই সীমার মধ্যে অনেক যুগের যা তার ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়িয়েছে একই ভাষার গান গেয়ে, সন্ধ্যাবেলার তাদের কোলে টেনে এনে বলেছে রূপকথা একই ভাষায়। পূজা করেছে এরা এক ভাষার মন্ত্রে, স্ত্রী পুরুষ একই ভাষায় পরস্পর ভালোবাসার আলাপ করেছে; তার ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে গেছে প্রাণের সঙ্গে। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো তুলচুক হয়েছে, শব্দতানি

বুদ্ধি পরম্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ এনেছে, হানাহানি বাধিয়েছে, সমস্ত দলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা খুঁচিয়ে তুলেছে। কিন্তু সেটাই সমস্ত দেশের প্রকৃতিতে সবচেয়ে সত্য আকার ধরে মুখ্য স্থান নেয় নি, তাই দেশের লোক দেশকে বলেছে মাতৃভূমি। এখানে উন্মেষিত হয়েছে এমন একটা মানবিকতার নিবিড় ঐক্য যা সমস্ত জাতকে রক্ষা করে, প্রবল করে, জ্ঞান দেয়, আনন্দিত করে সৌন্দর্যময়ীতে। যে দেশে এইরকম ঐক্যের মহৎরূপ অপূর্ণতা থেকে ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, বারবার উদ্ধার করেছে সমস্ত জাতকে বিপ্লববিপদ থেকে বীৰ্য ও শুভবুদ্ধির জোরে, সেই দেশকেই মানুষ একান্তভাবে আপনার মধ্যে পেয়েছে, ভালোবেসেছে, সত্যি করে তাকে বলতে পেরেছে মাতৃভূমি।

এ কথা হয়তো আমরা অনেক জানি নে যে, বাংলাদেশের বা ভারতবর্ষের মাতৃভূমি নাম আমাদের দেওয়া নয়। ঐ শব্দটাকে আমরা তর্জমা করে নিয়েছি ইংরেজি মাদারল্যাণ্ড থেকে। আমার বিশ্বাস এক সময়ে ভারতবর্ষে একটি উদ্‌বোধনের বিশেষ যুগ এসেছিল যখন ভরতরাজবংশকে স্মৃতির কেন্দ্রস্থলে রেখে ভারতের আৰ্যজাতীয়েরা নিজের ঐক্য উপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেই যুগেই বেদ পুরাণ দর্শনশাস্ত্র, লোকপ্রচলিত কথা ও কাহিনী, সংগ্রহ করবার উন্মোচন এ দেশে জেগে উঠেছিল। সে অনেক দিনের কথা।

কিন্তু স্বাভাৱিক ঐক্য হ্রাস হয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। বহুবিভক্ত ভারত ছোটো ছোটো রাজ্যে উপরাজ্যে পরম্পর কেবলই কাড়াকাড়ি হানাহানি করেছে, সাধারণ শত্রু যখন দ্বারে এসেছে সকলে এক হয়ে বিদেশীর আক্রমণ ঠেকাতে পারে নি।

এই শোচনীয় আত্মবিচ্ছেদ ও বহির্বিপ্লবের সময়ে ভারতবর্ষে একটিমাত্র ঐক্যের মহাকর্ষণশক্তি ছিল, সে তার সংস্কৃতভাষা। এই ভাষাই ধর্ম কর্মে কাব্য-ইতিহাস-পুরাণ-চর্চায় তার সভ্যতাকে রেখেছিল বাঁদ বেঁধে। এই ভাষাই পিতৃপুরুষের চিন্তাশক্তি দিয়ে সমস্ত দেশের দেহে ব্যাপ্ত করেছিল ঐক্যবোধের নাড়ির জাল। দেশের যে মাতৃশক্তি হৃদয়ের আত্মীয়তায় দেশের নানা জাতিকে এক সম্মতিমুদ্রে বাঁধতে পারত তার উৎস ছিল না এর মাটিতে। কিন্তু যে পিতৃশক্তি চিন্তোৎকর্ষের পথ দিয়ে ভাবী বংশকে জ্ঞানসম্পদে সম্মানিত করেছে তা আমরা পেয়েছি একটি আশ্চর্য ভাষার দোতায় হতে।

ভারতবর্ষের নাম মাতার নাম নয়, কেননা ভারতবর্ষ বথার্থই পিতৃভূমি। তাই ভারতবর্ষের দেশ জুড়ে ব্যাপ্ত ঋষিদের নাম, আর রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষদের চরিত-বৃত্তান্ত। তাই পরকালে পিতৃলোকের পথকে সম্মতির পথ বলে জানি।

এ কথা বনে রাখা উচিত যে, দেশবাসী সকলকে আমরা এক নাম দিয়ে পরিচিত

করি নি। মহাভারতে আমরা কানী কাকি মগধ কোশল প্রভৃতি প্রদেশের কথা শুনেছি, কিন্তু তাদের সমস্তকে নিয়ে এক দেশের কথা শুনি নি। আজ আমরা যে হিন্দু নাম দিয়ে নিজেকে ধর্ম ও আচার-গত একটা বিশেষ ঐক্যের পরিচয় দিয়ে থাকি, সে নামকরণ আমাদের নিজস্ব নহ। বাইরে থেকে মুসলমান আমাদের এই নাম দিয়েছিল। হিন্দুহান নাম মুসলমানদের কাছ থেকে পাওয়া। আর যে একটি নামে আমাদের দেশ জগতের কাছে এক দেশ বলে খ্যাত সে হচ্ছে ইণ্ডিয়া, সে নামও বিদেশী। বস্তুত ভারতবাসী বোঝাবার কোনো নামকে যদি ষথার্থ স্থানাল বলা যায়, অর্থাৎ যে নামে ভারতের সকল জাতিকে বর্ণধর্ম-আচার-নির্বিশেষে এক বলে ধরা হয়েছে, সে ইণ্ডিয়ান। আমাদের ভাষায় আমাদের স্বাদেশিক নাম নেই।

বাংলাদেশের ইতিহাস পণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজেরও মিল ছিল না। তবু এর মধ্যে যে ঐক্যের ধারা চলে এসেছে সে ভাষার ঐক্য নিয়ে। এককাল আমাদের যে বাঙালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি। শাসনকর্তারা বাংলাপ্রদেশের অংশ-প্রভাংশ অন্য প্রদেশে জুড়ে দিয়েছেন, কিন্তু সরকারী দফতরের কাঁচিতে তার ভাষাটাকে ছেঁটে ফেলতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে স্বাদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব। দেখেছি এই সম্পর্কে এদের প্রেম, আত্মত্যাগ, জনহিতব্রত। ইংরেজের এই দৃষ্টান্ত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, অধিকার করেছে আমাদের সাহিত্যকে। আজ আমরা দেশের নামে গৌরব স্থাপন করতে চাই মানুষের ইতিহাসে।

এই-যে আমাদের দেশ আজ আমাদের মনকে টানছে, এর সঙ্গে সঙ্গেই জেগেছে আমাদের ভাষার প্রতি টান। মাতৃভাষা নামটা আজকাল আমরা ব্যবহার করে থাকি, এ নামও পেয়েছি আমাদের নতুন শিক্ষা থেকে। ইংরেজিতে আপন ভাষাকে বলে মাদার টাংক, মাতৃভাষা তারই তর্জমা। এমন দিন ছিল যখন বাঙালি বিদেশে গিয়ে আপন ভাষাকে অনায়াসেই পুরোনো কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলতে পারত; বিলেতে গিয়ে ভাষাকে সে দিয়ে আসত সমুদ্রে জলাঞ্জলি, ইংরেজভাষিনী অমুচরীদের সঙ্গে রেখে ছেলেমেয়েদের মুখে বাংলা চাপা দিয়ে তার উপরে ইংরেজির জয়পতাকা দিত সগর্বে উড়িয়ে। আজ আমাদের ভাষা এই অপমান থেকে উদ্ধার পেয়েছে, তার গৌরব আজ সমস্ত বাংলাভাষীকে মাহাত্ম্য দিয়েছে। বৎসরে বৎসরে জেলায় জেলায় সাহিত্যসম্মেলন বাঙালির একটা পার্বণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এ নিয়ে তাকে চেতিয়ে তুলতে হয় নি, হয়েছে স্বভাবতই।

বাংলাভাষা ভারতবর্ষের প্রায় পাঁচ কোটি লোকের ভাষা। হিন্দি বা হিন্দুস্থানি বাদে যথার্থ ঘরের ভাষা, শিক্ষা-করা ভাষা নয়, স্বনীতিকুমার দেখিয়েছেন, তাদের সংখ্যা চার কোটি বারো লক্ষের কাছাকাছি। এর উপরে আছে আট কোটি আটালি লক্ষ লোক যারা তাদের খাঁটি মাতৃভাষা বর্জন ক'রে সাহিত্যে সভাসমিতিতে ইঙ্গুলে আদালতে হিন্দুস্থানির শরণাপন্ন হয়। তাই হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি। কিন্তু ভাষার একটা অকৃত্রিম প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজন কোনো কাজ চালাবার ক্ষেত্রে নয়, আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে।

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমৃদ্ধ করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে যুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ নিম্নতই অমূল বদল করেছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় বয়ে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী, যুরোপীয় চিত্ত জরী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে শিখা করলে চলবে না। মধ্যযুগে যুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাতিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ করেই যুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে সেই দিন যুরোপের বড়োদিন। আমাদের দেশেও সেই বড়োদিনের অপেক্ষা করব— সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

বাংলাভাষাকে চিনতে হবে ভালো ক'রে; কোথায় তার শক্তি, কোথায় তার দুর্বলতা, দুইই আমাদের জানা চাই।

রূপকথায় বলে, এক-যে ছিল রাজা, তার দুই ছিল রানী, সুয়োরানী আর দুয়োরানী। তেমনি বাংলাবাক্যধীপেরও আছে দুই রানী— একটাকে আদর করে

নাম দেওয়া হয়েছে সাধু ভাষা ; আর-একটাকে কথা ভাষা, কেউ বলে চলতি ভাষা, আমার কোনো কোনো লেখায় আমি বলেছি প্রাকৃত বাংলা । সাধু ভাষা রাজাঘরা, সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধান থেকে ধার করা অলংকারে সাজিয়ে তোলা । চলতি ভাষার আটপোরে সাজ নিজের চরকার কাটা সূতো দিয়ে বোনা । অলংকারের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর কালিদাসের একটা লাইন তুলে দিলে তার জবাব হবে ; কবি বলেন : কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকুতীনাম্ । যার মধুর আছে সে যা পরে তাতেই তার শোভা । রূপকথায় শুনেছি সুয়োরানী ঠাই দেয় দুয়োরানীকে গোয়ালঘরে । কিন্তু গল্পের পরিণামের দিকে দেখি সুয়োরানী যার নির্বাসনে, টিংকে থাকে একলা দুয়োরানী রানীর পদে । বাংলার চলতি ভাষা বহু কাল ধরে জায়গা পেয়েছে সাধারণ মাটির ঘরে, হৈশেলের সঙ্গে, গোয়ালের ধারে, গোবর-নিকোনো আড়িনার পাশে যেখানে সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালানো হয় তুলসীতলায় আর বোষ্টমী এসে নাম শুনিবে যার ভোরবেলাতে । গল্পের শেষ অংশটা এখনো সম্পূর্ণ আসে নি, কিন্তু আমার বিশ্বাস সুয়োরানী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরানী বসবেন রাজাসনে ।

চলতি ভাষার চলার বিরাম নেই, তার চলবার শক্তি আড়ষ্ট হবার সময় পায় না ।

আমাদের মুখরিত দিনরাত্রির সব কথা করে পড়ছে তার মাটিতে, তার সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে তার প্রকাশের শক্তিকে করছে উর্বরা ।

তবু একটা কথা মানতে হবে যে, মানুষের বলবার কথা সবই যে সহজ তা নয় ; এমন কথা আছে যা ভালো করে ঐটে না বললে বলাই হয় না । সেই-সব বিচার-করা কথা কিংবা সাজিয়ে-বলা কথা চলে না দিনরাত্রির ব্যবহারে, যেমন চলে না দরবারি পোশাক কিংবা বেনারসি শাড়ি । আমরা সর্বদা মুখের কথায় বিজ্ঞান আওড়াই নে । শুধু কথাও পণ্ডিতসভায়, তার আলোচনায় বিশেষ বিস্তার দরকার করে । তাই তর্ক ওঠে, এদের জন্তে চলতি ভাষার বাইরে একটা পাকা গাঁধুনির ভাষা বানানো নেহাত দরকার ; সাধু ভাষার এরকম মহলের পত্তন সহজ, কেননা, ও ভাষাটাই বানানো ।

কথাটা একটু বিচার করে দেখা যাক । আমরা লিখিয়ে-পড়িয়ের দলে চলতি ভাষাকে অনেক কাল থেকে জাতে ঠেলেছি । সাহিত্যের আসরে তাকে পা বাড়াতে দেখলেই বিরোধান এসেছে তাড়া করে । সেইজন্তেই খিড়কির দয়াজায় পথ চলার অভ্যাসটাই ওর হয়ে গেছে স্বাভাবিক । অক্ষরমহলে যে যেয়েরা অভ্যস্ত তাদের ব্যবহার সহজ হয় পরিচিত আত্মীয়দের মধ্যেই, বাইরের লোকদের সামনে তাদের মুখ দিয়ে কথা সরে না । তার কারণ এ নয় যে তাদের শক্তি নেই, কিন্তু সংকুচিত হয়েছে তাদের শক্তি । পান্চাত্য জাতিদের ভাষায় এই সদর-অঙ্গরের বিচার নেই । তাই

সেখানে সাহিত্য পেয়েছে চলনশীল প্রাণ, আর চলতি ভাষা পেয়েছে মননশীলতার ঐশ্বর্য। আমাদের ঘোমটা টানার দেশে সেটা তেমন করে প্রচলিত হয় নি; কিন্তু হবার বাধা বাইরের শাসনে, স্বভাবের মধ্যে নয়।

সে অনেক দিনের কথা। তখন রামচন্দ্র মিত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলার অধ্যাপক। তাঁর একজন ছাত্রের কাছে শুনেছি, পরীক্ষা দিতে যাবার পূর্বে বাংলা রচনা সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, ‘বাবা, সুলীতলসমীরণ লিখতে গিয়ে বড়ে গড়ে কিংবা হুস্থ দীর্ঘ স্বরে যদি ধাঁধা লাগিয়ে দেয় তা হলে লিখে দিয়ে ‘ঠাণ্ডা হাওয়া’।’ সেদিনকার দিনে এটি সোজা কথা ছিল না। তখনকার সাধু বাংলা ঠাণ্ডা হাওয়া কিছুতেই সহিতে পারত না, তখনকার কগীরা যেমন ঠাণ্ডা জল খেতে পেত না তৃষ্ণায় ছাতি কেটে গেলেও।

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাতটা ক্রিয়াপদের চেহারার তফাত নিয়ে। ‘হচ্ছে’ ‘করছে’কে যদি জলচল করে নেওয়া যায় তা হলে জাতঠেলাঠেলি অনেকটা পরিমাণে ঘোচে। উত্তরের গুরুদক্ষিণ। আনবার সময় তক্ষক বিয় ঘটিয়েছিল, এইটে থেকেই সর্পবংশধ্বংসের উৎপত্তি : এর ক্রিয়াক’টাকে অল্প একটু মোচড় দিয়ে সাধু ভাষার ভঙ্গী দিলেই কালীসিংহের মহাভারতের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। তাঁর কাছে ও কথার অসংগতি : মুখের ভাষাতেও এটা বলা চলে, আবার এও বলা যায় ‘তাঁর কাছে কথায় মিল নেই’। ‘বাহুকি ভীমকে আলিঙ্গন করলেন’ এ কথাটা মুখের ভাষায় অশুচি হয় না, আবার ‘বাহুকি ভীমের সঙ্গে কোলাকুলি করলেন’ এটাতেও বোধ হয় নিন্দার কারণ ঘটে না। বিজ্ঞানে দুর্বোধ তথ্য আছে, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের সাধু ভাষাও গলদঘর্ম হয়, আবার চলতি ভাষারও চোখে অঙ্ককার ঠেকে। বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের দেশে যখন ছড়িয়ে পড়বে তখন উভয় ভাষাতেই তার পথ প্রশস্ত হতে থাকবে। নতুন-বানানো পারিভাষিকে উভয় পক্ষেই হবে সমান স্বত্ব।

এইখানে এ কথা স্বীকার করতেই হবে, সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি করেই গ্রীক-লাটিনের বশ মানতে হয়। তার পারিভাষিক শব্দগুলো গ্রীক লাটিন থেকে ধার নেওয়া কিংবা তারই উপাদান নিয়ে তারই ছাঁচে

ঢালা। ইংরেজি ভাষায় দেখা যায়, তার পুরাতন পরিচিত দ্রব্যের নামগুলি শ্রাক্সন এবং কেন্ট্। এগুলি সব আদিম আতির আদিম অবস্থার সম্পত্তি। সেই পুরাতন কাল থেকে যতই দূরে চলে এসেছে ততই তার ভাষাকে অধিকার করেছে গ্রীক ও লাতিন। আমাদেরও সেই দশা। খাঁটি বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ বোলো-আনা চলা অসম্ভব।

অভিধান দেখলে টের পাওয়া যাবে ইংরেজি ভাষার অনেকখানিই গ্রীক-লাটিনে গড়া। বস্তুত তার হাড়ে মাস লেগেছে ঐ ভাষায়। কোনো বিশেষ লেখার রচনারীতি হয়তো গ্রীক-লাটিন-ঘেঁষা, কোনোটার বা অ্যাংলো-শ্রাক্সনের ছাঁদ। তাই বলে ইংরেজি ভাষা দুটো দল পাকিয়ে তোলে নি। কৃত্রিম ছাঁচে ঢালাই করা একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা খাড়া ক'রে তাই নিয়ে কোনো সম্প্রদায় কৌলীন্তের বড়াই করে না। নানা বন্দর থেকে নানা শব্দসম্পদের আমদানি ক'রে কথার ও লেখার একই তহবিল তারা ভর্তি করে তুলেছে। ওদের ভাষার খিড়কির দরজায় একতারা-বাজিয়ের আর সদর দরজায় বীণার ওস্তাদের ভিড় হয় না।

আমাদের ভাষাও সেই এক বড়ো রাস্তার পথেই চলেছে। কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় বে-সব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুখের বাক্য তাদের চলাকেরা চলছে অনায়াসেই। মনে তো আছে, আমার অল্প বয়সে বাড়ির কোনো চাকর যখন এসে জানালে 'একজন বাবু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন', মনিবদের আসরে চার দিক থেকে হাসি ছিটকে পড়ল। যদি সে বলত 'অপিক্কে' তা হলে সেটা মাননসই হ'ত। আবার অল্পকিছুদিন আগে আমার কোনো ভৃত্য মাংসের তুলনায় মাছ খাওয়ার অপদার্থতা জানিয়ে যখন আমাকে বললে 'মাছের দেহে সামর্থ্য কতটুকুই বা আছে', আমার সন্দেহ হয় নি যে সে উচ্চ প্রাইয়ারি স্কুলে পরীক্ষা পাশ করেছে। আজ সমাজের উপরতলার নীচের তলায় ভাষাব্যবহারে আর্ধ-অনার্ধের মিশ্রণ চলছে। মনে করো সাধারণ আলাপে আজ যদি এমন কথা কেউ বলে যে 'সভ্যজগতে অর্থনীতির সঙ্গে গ্রহি পাকিয়ে রাষ্ট্রনীতির অটলতা যতই বেড়ে উঠছে শাস্তির সম্ভাবনা যাচ্ছে দূরে', তা হলে এই মাত্র সন্দেহ করব, লোকটা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মেশাবার বিকল্পে। কিন্তু এই বাক্যকে গ্রহসনে উদ্ভূত কয়বার ঘোণা বলে কেউ মনে করবে না। নিঃসন্দেহ এর শব্দগুলো হয়ে উঠেছে সাহিত্যিক, কেননা বিষয়টাই তাই। পঞ্চাশ বছর আগে এরকম বিষয় নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা হত না, এখন তা হয়ে থাকে, কাজেই কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না। সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে

গুরুচণ্ডালী অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।

এটা হতে পেরেছে তার কারণ, সীমাসরহদ নিয়ে মামলা করে না চলতি ভাষা। স্বদেশী বিদেশী হাঙ্গা ভারী সব শব্দই ঘেঁষাঘেঁষি করতে পারে তার আঙিনায়। সাধু ভাষায় তাদের পাসপোর্ট মেলার শক্তি। পার্সি আরবি কথা চলতি ভাষা বহুল পরিমাণে অসংকোচে হজম করে নিয়েছে। তারা এমন আতিথ্য পেয়েছে যে তারা যে ঘরের নয় সে কথা ভুলেই গেছি। ‘বিদায়’ কথাটা সংস্কৃতসাহিত্যে কোথাও মেলে না। সেটা আরবি ভাষা থেকে এসে দিবি সংস্কৃত পোশাক পরে বসেছে। ‘হয়রান করে দিয়েছে’ বললে ক্লান্তি ও অসহতা মিশিয়ে যে ভাবটা মানে আসে কোনো সংস্কৃতের আমদানি শব্দে তা হয় না। অমূকের কণ্ঠে গানে ‘দরদ’ লাগে না, বললে ঠিক কথাটি বলা হয়, ও ছাড়া আর-কোনো কথাই নেই। গুরুচণ্ডালীর শাসনকর্তা যদি দরদের বদলে ‘সংবেদনা’ শব্দ চালাবার হুকুম করেন তবে সে হুকুম অমান্য করলে অপরাধ হবে না।

ভাষার অবিমিশ্র কোলীন্ত নিয়ে খুঁতখুঁত করেন এমন গোঁড়া লোক আজও আছেন। কিন্তু ভাষাকে দুইমুখো ক’রে তার দুই বাণী বাঁচিয়ে চলার চেষ্টাকে অসাধু বলাই উচিত। ভাষায় এরকম কৃত্রিম বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখে আচারের গুচিতা বানিয়ে তোলা পুণ্যকর্ম নয়, এখন আর এটা সম্ভবও হবে না।

স্বনীতিকুমার বলেন খৃস্টীয় দশম শতকের কোনো-এক সময়ে পুরাতন বাংলার জন্ম। কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এই ‘জন্ম’ কথাটা খাটে না। যে জিনিস অনতিব্যক্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ব্যক্ত হয়েছে তার আরম্ভসীমা নির্দেশ করা কঠিন। দশম শতকের বাংলাকে বিংশ শতকের বাঙালি আপন ভাষা বলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ। শতকে শতকে ভাষা ক্রমশ ফুটে উঠেছে, আধুনিক কালেও চলছে তার পরিণতি। নতুন নতুন জ্ঞানের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, রীতির সঙ্গে, আমাদের পরিচয় যত বেড়ে চলেছে, আমাদের ভাষার প্রকাশ ততই হচ্ছে ব্যাপক। গত ষাট বছরে যা ঘটেছে দু-তিন শতকেও তা ঘটে নি।

বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে ক্রিয়া-ব্যবহার সম্বন্ধে ভাষার সংকোচ। সস্ত-ভিষ-ভাঙা পাখির বাচ্চার দেখা যায় ডানার কীপতা। ক্রিয়াপদের মধ্যেই থাকে ভাষার চলবার শক্তি। রূপগোষ্ঠার লেখা কারিকা থেকে পুরোনো বাংলা গণ্ডের একটু নমুনা দেখলেই এ কথা বুঝতে পারা যাবে—

এথম শ্রীকৃষ্ণ ভল নির্ণয়। শব্দভণ্ড শব্দভণ্ড রূপভণ্ড রূপভণ্ড স্পর্শভণ্ড এই পাঁচভণ্ড। এই পঞ্চভণ্ড শ্রীমতি

রাখিকাভেও বসে ।... পূর্বরাগের মূল দুই হটাৎ প্রকণ অকস্মাৎ প্রকণ ।’

ক্রিয়াপদ-ব্যবহার যদি পাকা হত, তা হলে উড়ে চলার বদলে ভাবার এরকম লাফ দিয়ে দিয়ে চলা সম্ভব হত না । সেই সময়কেই বাংলা ভাষার পরিণতির যুগ বলব যখন থেকে তার ক্রিয়াপদের যথোচিত প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য ঘটেছে । পুরাতন গল্পের বিস্তৃত নমুনা যদি পাওয়া যেত তা হলে ক্রিয়াপদ-অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার অভিব্যক্তির ধারা নির্ণয় করা সহজ হত ।

রায়মোহন রায় যখন গল্প লিখতে বসেছিলেন তখন তাঁকে নিয়ম হেঁকে হেঁকে, কোদাল হাতে, রাস্তা বানাতে হয়েছিল । ঈশ্বর গুপ্তের আমলে বঙ্কিমের কলমে যে গল্প দেখা দিয়েছিল তাতে যতটা ছিল পিণ্ডতা, আকৃতি ততটা ছিল না । যেন ময়দা নিয়ে তাল পাকানো হচ্ছিল, লুচি বেলা হয় নি ।

সম্বনীকান্ত দাসের প্রবন্ধ থেকে তার একটা নমুনা দিই—

গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনী উপরে কম্পারমানা লক্ষ্মী সন্ধান করিক জীবনের অস্তিত্বের প্রিয় হওন্ত যুচ মানবমণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিবার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে । পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিজন প্রমদা প্রেম প্রমত্ত রহিয়াছে । অব্যবস্থাপন জীবনে চন্দ্রার্ক সর্বদা চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ক্রমেও ভাবনা করে না যে সেসব উৎসব শেষ হইলে কি হইবে ।’

তার পরে বিজ্ঞানাগর এই কাঁচা ভাষায় চেহারার স্ত্রী ছুটিয়ে তুললেন । আবার মনে হয় তখন থেকে বাংলা গল্পভাষার রূপের আবির্ভাব হল ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যিনি ঈশ্বর গুপ্তের আসরে প্রথম হাত পাকাছিলেন অত্যন্ত আড়ষ্ট বাংলা ভাষায়, সেই ভাষায়ই বন্ধন মোচন করেছিলেন সেই বঙ্কিম । তিনিই তাকে দিয়েছিলেন চলবার স্বাধীনতা ।

আমরা পুরাতন সাহিত্যে পেয়েছি পঞ্চ, সেইটেই বনেদি । কিন্তু এ কথা বলা ঠিক হবে না, সাধু ভাষার আদর্শ ছিল তার মধ্যে । ভাষাকে ছন্দে-ওজন-করা পদে বিভক্ত করতে গেলে তার মধ্যে স্বাভাবিক কথা বলার নিয়ম খাটে না, ক্রমে তার একটা বিশেষ রীতি বেঁধে যায় । প্রথমত কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াপদের সহজ পর্যায় রক্ষা হতেই পারে না । তার পরে তার মধ্যে কতকগুলি পুরোনো শব্দ ও রীতি থেকে যায়, ছন্দের আশ্রয় পেয়ে যারা কালের বদল মানে না । চারটে লাইন পঞ্চ বানিয়ে তার দৃষ্টান্ত

১ সাহিত্যপরিবৎ-পত্রিকায় জীবন্ত সম্বনীকান্ত দাস -লিখিত ‘বাংলা গল্পের প্রথম যুগ’ প্রবন্ধ থেকে তুলে দেওয়া হল । —সাহিত্য পরিবৎ পত্রিকা, ৪৫৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৫, পৃ ৪৬

২ সংবাদপ্রকাশক, ২০ এপ্রিল, ১৮৫২ । —বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর দ্বিতীয় সাহিত্যপরিবৎ কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্কিম-সংস্কৃতিক সংস্করণ, বিবিধ খণ্ড, পৃ ৬৮

দেখানো থাক—

কার সনে নাহি জানি করে বসি কানাকানি,
সাঁঝবেলা দিগ্‌বধু কাননে মর্যরে ।
আঁচলে কুড়ায়ে তারা কী লাগি আপনহারা,
মানিকের বরমালা গাঁথে কার তরে ।

এই কটা লাইনকে সাধুভাষায় ঢালাই করতে গেলে হবে এইরকম— সন্ধ্যাকালে দিগ্‌বধু অরণ্যমর্যরধ্বনিতে কাহার সহিত বিশ্রান্তালাপে প্রবৃত্ত তাহা জানি না। জানি না কী কারণে ও কাহার জন্ত আত্মবিস্মল অবস্থায় সে আপন বস্ত্রাঞ্চলে নক্ষত্রসংগ্রহপূর্বক মানিকোর বরমালা গ্রহন করিতেছে।

‘সনে’ কথাটা এখন আর বলি নে, প্রাচীন পদাবলীতে ঐ অর্থে ‘সঙে’ কথা সর্বদা পাওয়া যায়। ‘নাহি জানি’ কথাটার ‘নাহি’ শব্দটা এখনকার নিয়মে ‘জানি’র সঙ্গে মিলতে পারে না। ‘নাহি’ শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ ‘নাস্তি’, চলিত কথায় ‘নেই’। ‘জানি’র সঙ্গে ‘নেই’ ছোড়া যায় না, বলি ‘জানি নে’। ‘সাঁঝবেলা’ গ্রাম্যভাষায় এখনো চলে, কিন্তু যাদের জন্তে ঐ শ্লোকটা লেখা তাদের সঙ্গে আলাপে ‘সাঁঝবেলা’ শব্দটা বেখাপ। ‘বসিয়া’র জায়গায় ‘বসি’ আমরা বলি নে। যে শ্রেণীর লোকের ভাষায় ‘লেগে’ শব্দের ব্যবহার চলে তাদের খুশি করবার জন্তে দিগ্‌বধু কখনো তারার মালা গাঁথেই না। ‘জন্তে’র পরিবর্তে ‘লাগি’ বা ‘লাগিয়া’ কিংবা ‘তরে’ শব্দটা ছন্দের মধ্যস্থতায় ছাড়া ভঙ্গনামধারীদের রসনায় প্রবেশ পায় না। যেমতি তেমতি নেহারো উড়িলা হেরো মোরে পানে যবে হেথা সেথা নারে তারে প্রভৃতি শব্দ পড়ের ফরমাশি।

যদি বর্ষার দিনে বন্ধু এসে কথা জুড়ে দেয় ‘হেরো ঐ পূব দিকের পানে, রহি রহি বিজুলি চমক দেয়, মোর ডর লাগে, নাহি জানি কী লাগি সাধ যায় তোমা সনে একা বসি মনের কথা করি কানাকানি’, তবে এটাকে মধুরালাপের ভূমিকা বলে কেউ মনে করবে না, বন্ধুর জন্তে উদ্‌বিগ্ন হবে।

তবু মন ভোলাবার ব্যবসাতে পণ্ড যদি সাদা ভাষার বাজে মালমশলা মেশায় তবে তাকে মাপ করা যায়, কিন্তু চলতি ব্যবহারে গন্ত যদি হঠাৎ সাধু হয়ে ওঠে তবে মহাপণ্ডিতেরাও মনে করবে, বিক্রপ করা হচ্ছে। কারও মাসির ‘পরে বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্তে কেউ যদি বিশুদ্ধ সাধু ভাষায় বলে ‘আপনকার মাতৃস্বসা আশা করি দুঃসাধ্য অতিসার ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন’, তবে বোনপো ইংরেজের মুখে শুনলে মনে মনে হাসবে, বাঙালির মুখে শুনলে উচ্ছ্বাস ক’রে উঠবে।

তর্ক ওঠে, বাংলাদেশে কোন্ প্রদেশের ভাষাকে সাহিত্যিক কথাভাষা বলে মেনে নেবে। উত্তর এই যে, কোনো বিশেষ কারণে বিশেষ প্রদেশের ভাষা স্বতই সর্বজনীনতার মর্যাদা পায়। যে-সকল সৌভাগ্যবান দেশে কোনো একমাত্র ভাষা বিনা তর্কে সর্বদেশের বাণীরূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও নানা প্রাদেশিক উপভাষা আছে। বিশেষ কারণে টস্কানি প্রদেশের উপভাষা সমস্ত ইটালির এক ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। তেমনি কলকাতা শহরের নিকটবর্তী চার দিকের ভাষা স্বভাবতই বাংলাদেশের সকলদেশী ভাষা বলে গণ্য হয়েছে। এই এক ভাষার সর্বজনীনতা বাংলাদেশের কল্যাণের বিষয় বলেই মনে করা উচিত। এই ভাষায় ক্রমে পূর্ববঙ্গেরও হাত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, তার একটা প্রমাণ এই যে, আমরা দক্ষিণের লোকেরা ‘সাথে’ শব্দটা কবিতায় ছাড়া সাহিত্যে বা মুণ্ডের আলাপে ব্যবহার করি নে। আমরা বলি ‘সঙ্গে’। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কানে যেমনি লাগুক, ‘সঙ্গে’ কথাটা ‘সাথে’র কাছে হার মেনে আসছে। আরও একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। মাত্র চারজন লোক : এমন প্রয়োগ আজকাল প্রায় শুনি। বরাবর বলে এসেছি ‘চারজনমাত্র লোক’, অর্থাৎ চারজনের দ্বারা মাত্রা-পাওয়া, পরিমিত-হওয়া লোক। অবশ্য ‘মাত্র’ শব্দ গোড়ায় বসলে কথাটাতে জোর দেবার সুবিধে হয়। ভাষা সব সময়ে যুক্তি মানে না।

যা হোক, যে দক্ষিণী বাংলা লোকমুখে এবং সাহিত্যে চলে যাচ্ছে তাকেই আমরা বাংলা ভাষা বলে গণ্য করব। এবং আশা করব, সাধু ভাষা তাকেই আসন ছেড়ে দিয়ে ঐতিহাসিক কবরস্থানে বিশ্রামলাভ করবে। সেই কবরস্থান তীর্থস্থান হবে, এবং অলংকৃত হবে তার স্মৃতিশিলাপট।

১১

মাসুমের উদ্ভাবনী প্রতিভার একটা কীর্তি হল চাকা বানানো। চাকার সঙ্গে একটা নতুন চলৎশক্তি এল তার সংসারে। বস্তুর বোঝা সহজে নড়ে না, তাকে পরস্পরের মধ্যে চালাচালি করতে ছুঃখ পেতে হয়। চাকা সেই জড়ত্বের মধ্যে প্রাণ এনে দিলে। আদানপ্রদানের কাজ চলল বেগে।

ভাষার দেশে সেই চাকা এসেছে ছন্দের রূপে। সহজ হল মোট-বাঁধা কথাগুলিকে চালিয়ে দেওয়া। মুখে মুখে চলল ভাষার দেনা-পাওনা।

কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েছেও শেষ হয় না। গল্পে যখন বলি ‘একদিন প্রাণের রাজ্যে বৃষ্টি পড়েছিল’, তখন এই বলার মধ্যে এই খবরটা

ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন—

রজনী পাণ্ডনঘন ঘন দেয়াগরজন

স্বিৎ স্বিৎ শব্দে বরষে—

তখন কথা খেমে গেলেও বলা থাকে না।

এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আবৃত্তি কোনো দিনকণের মধ্যে বন্ধ হয়ে এ বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলা সৃষ্টি করে দেয় সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

অণু পরমাণু থেকে আরম্ভ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত সর্বত্রই নিরন্তর গতিবেগের মধ্যে ছন্দ রয়েছে। বস্তুত এই ছন্দই রূপ। উপাদানকে ছন্দের মধ্যে তরঙ্গিত করলেই সৃষ্টি রূপ ধারণ করে। ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য। বাতাস যখন ছন্দে কাঁপে তখনি সে সুর হয়ে ওঠে। ভাবকে কথাকে ছন্দের মধ্যে জাগিয়ে তুললেই তা কবিতা হয়। সেই ছন্দ থেকে ছাড়িয়ে নিলেই সে হয় সংবাদ; সেই সংবাদে প্রাণ নেই, নিত্যতা নেই।

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখো। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, গড়ে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাত এই যে, রামগিরি অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে। কারণ, মেঘদূতের মন্দাকিনী ছন্দের মধ্যে বিশ্বের গতি নৃত্য করছে। তাই এই কাব্য চিরকালের সজীব বস্তু। গতিচাক্ষুর ভিতরকার কথা হচ্ছে, ‘আমি আছি’ এই সত্যটির বিচিত্র অল্পভূতি। ‘আমি আছি’ এই অল্পভূতিটা তো বন্ধ নয়, এ-যে সহস্র রূপে চলায় ফেরায় আপনাকে জানা। যতদিন পর্যন্ত আমার সত্তা স্পন্দিত নন্দিত হচ্ছে ততদিন ‘আমি আছি’র বেগের সঙ্গে সৃষ্টির সকল বস্তু বলছে, ‘তুমি যেমন আছ আমিও তেমনি আছি।’ ‘আমি আছি’ এই সত্যটি কেবলই প্রকাশিত হচ্ছে ‘আমি চলছি’র দ্বারা। চলাটি যখন বাধাহীন হয়, চার দিকের সঙ্গে যখন সুসংগত হয়, সুন্দর হয়, তখনি আনন্দ। ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দরূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।

একদা ছিল না ছাপাখানা, অক্ষরের ব্যবহার হয় ছিল না নয় ছিল অল্প। অথচ মানুষ যে-সব কথা সকলকে জানাবার যোগ্য মনে করেছে দলের প্রতি প্রকাশ, তাকে বেঁধে রাখতে চেয়েছে এবং চালিয়ে দিতে চেয়েছে পরম্পরের কাছে।

এক শ্রেণীর কথা ছিল রেগুলো সামাজিক উপদেশ। আর ছিল চাষবাসের পরামর্শ,

শুভ-অশুভের লক্ষণ, লগ্নের ভালোমন্দ ফল। এই-সমস্ত পরীক্ষিত এবং কল্পিত কথাগুলোকে সংক্ষেপ করে বলতে হয়েছে, ছন্দে বাঁধতে হয়েছে, স্থায়িত্ব দেবার জন্যে। দেবতার স্তুতি, পৌরাণিক আখ্যান বহন করেছে ছন্দ। ছন্দ তাদের রক্ষা করেছে যেন পেটিকার মধ্যে। সাহিত্যের প্রথম পর্বে ছন্দ মাহুকের শুধু খেলার নয়, প্রয়োজনের একটা বড়ো সৃষ্টি; আধুনিক কালে যেমন সৃষ্টি তার ছাপাখানা। ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার সৃষ্টির ভাণ্ডারী।

চলতি ভাষার অভাব রক্ষা ক'রে বাংলা ছন্দে কবিতা বা লেখা হয়েছে সে আমাদের লোকগাথার, বাউলের গানে, ছেলে ভোলাবার ও ঘুম পাড়াবার ছড়ায়, ব্রতকথায়। সাধুভাষী সাহিত্যমহলের বাইরে তাদের বসতি। তারা যে সমস্তই প্রাচীন তা নয়। লক্ষণ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, তাদের অনেক আছে যারা আমাদের সমান বয়সেরই আধুনিক, এমন-কি ছন্দে মিলে ভাবে আমাদেরই শাক্রেদি সন্দেহ করি। একটা দৃষ্টান্ত দেখাই—

অচীন ডাকে নদীর বাক

ডাক যে শোনা যায়।

অকূল পাড়ি, ধাক্কাতে নারি,

সদাই ধারা ধায়।

ধারার টানে ভরী চলে,

ডাকের চোটে ঘন যে টলে,

টানাটানি ঘুচাও জগার

হল বিষয় দায়।

এর মিল, এর মাজাঘষা ছাঁদ ও শব্দবিন্যাস আধুনিক। তবুও যেটা লক্ষ্য করবার বিষয় সে হচ্ছে এর চলতি ভাষা। চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসঙ্করূপ যেনে নিয়েছে। হসঙ্ক শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়, তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চলতি ভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ। উপরের ঐ কবিতাকে সাধু ভাষার ছন্দে ঢালাই করলে তার চেহারা হয় নিম্নলিখিত-মতো—

অচিনের ডাকে নদীটির বাক

ডাক যেন শোনা যায়।

কূলহীন পাড়ি, ধাক্কাতে না পারি,

নিশিদিন ধারা ধায়।

সে ধারার টানে গুরীখানি চলে
সেই ডাক শুনে মন মোর টলে,
এই টানাটানি ঘুচাও জগার
হুয়েছে বিষম দার।

যদি উচ্চারণ মেনে বানান করা যেত তা হলে বাউলের গানের চেহারা হত—

অচিণ্ডকে নদীধাঁকে ডাক্বে শোনা যায়।

সাধু ভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসঙ্গরীতি যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি ঘেঁষাঘেঁষি করতে দেওয়া হয় না। বাউলের গানে আছে ‘ডাকের চোটে মন যে টলে’। এখানে ‘ডাকের’ আর ‘চোটে’, ‘মন’ আর ‘যে’, এদের মধ্যে উচ্চারণের কোনো ফাঁক থাকে না। কিন্তু সাধু ভাষার গানে ‘মন’ আর ‘মোর’ হসঙ্গ শব্দ হলেও হসঙ্গ শব্দের স্বভাব রক্ষা করে না, সন্ধির নিয়মে পরস্পর ঝুটে যায় না।

বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো ছন্দ পয়ারের ছাঁদের, অর্থাৎ দুই সংখ্যার ওজনে। যেমন—

খনা ডেকে ব’লে ধান
রোমে ধান ছায়ায় পান।
দিনে রোম রাতে জল
জান্তে বাড়ে ধানের বল।

এমনি ক’রে হতে হতে ছন্দের মধ্যে এসে পড়ে তিনের মাত্রা। যেমন—

আনহি বসন্ত আনহি চাব,
বলে ডাক তাহার কিনা।

কিংবা—

আবাড়ে কাড়ান নাথকে,
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে,
ভাদরে কাড়ান শিমকে,
আগিনে কাড়ান কিসকে।

এর অর্থ বোঝাবার দায়িত্ব নিতে পারব না।

দুই মাত্রার ছড়ার ছন্দ পরিণত রূপ নিয়েছে পয়ারে। বাঙালি বহুকাল ধরে এই ছন্দে গেয়ে এসেছে রামায়ণ মহাভারত একটানা করে। এই ছন্দে প্রবাহিত প্রাদেশিক পুরাণকাহিনী রঙিয়েছে বাঙালির হৃদয়কে। দারিদ্র্য ছিল তার জীবন-মাত্রায়, তার ভাগ্যদেবতা ছিল অত্যাচারপরায়ণ, সে এমন নৌকোর ভাসছিল যার হাল

ছিল না তার নিজের হাতে ; যখন তার আকাশ থাকত শান্ত তখন গ্রামের এ ঘাটে ও ঘাটে চলত তার আনাগোনা সামান্ত কারবার নিয়ে, কখনো বা দিনের পর দিন দুর্ধোগ লেগেই থাকত, ভাগ্যের অনিশ্চয়তার হঠাৎ কে কোথায় পৌঁছয় তার ঠিক ছিল না, হঠাৎ নৌকোস্থল হত ভরাডুবি। এরা ছড়া বাঁধে নি নিজের কোনো স্বরণীয় ইতিহাস নিয়ে। এরা গান বাঁধে নি ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখবেদনায়। এরা নিঃসন্দেহই ভালোবেসেছে, কিন্তু নিজের অবানিতে প্রকাশ করে নি তার হাসিকান্না। দেবতার চরিত্র-বৃত্তান্তে এরা ঢেলেছে এদের অন্তরের আবেগ ; হরপার্বতীর লীলায় এরা নিজের গৃহস্থালির রূপ ফুটিয়েছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে এরা সেই প্রেমের কল্পনাকে মনের মধ্যে ঢেউ লাগিয়েছে যে প্রেম সমাজবন্ধনে বন্দী নয়, যে প্রেম শ্রেয়োবুদ্ধি-বিচারের বাইরে। একমাত্র কাহিনী ছিল রামায়ণ-মহাভারতকে অবলম্বন করে যা মানবচরিত্রের নতোরতকে নিয়ে হিমালয়ের মতো ছিল দিক থেকে দিগন্তরে প্রসারিত। কিন্তু সে হিমালয় বাংলাদেশের উত্তরতম সীমার দূর গিরিমালার মতোই ; তার অভভেদী মহত্বের কঠিন মূর্তি সমতল বাংলার রসাতলষোর সঙ্গে মেলেনা। তা বিশেষভাবে বাংলার নয়, তা সনাতন ভারতের। অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে, কবিকঙ্কণের সঙ্গে, রামায়ণ-মহাভারতের তুলনা করলে উভয়ের পার্থক্য বোঝা যাবে। অন্নদামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল বাংলার ; তাতে মহুড়ত্বের বীৰ্য প্রকাশ পায় নি, প্রকাশ পেয়েছে অকিঞ্চিৎকর প্রাত্যহিকতার অল্পজ্বল জীবনযাত্রা।

এই কাব্যের পণ্য ভেসেছিল পয়ার ছন্দে। ডাঙাচোরা ছিল এর পদবিভাগ। গানের সুর দিয়ে এর অসমানতা মিলিয়ে দেওয়া হত, দরকার হত না অক্ষর সাজাবার কাজে সতর্ক হবার। পুরানো কাব্যের পুঁথি দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। অত্যন্ত উচুনিচু তার পথ। ভারতচন্দ্রই প্রথম ছন্দকে সৌম্যমোর নিয়মে বেঁধেছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত ও পারসিক ভাষার পণ্ডিত। ভাষাবিশ্বাসে ছন্দে প্রাদেশিকতার শৈথিল্য তিনি মানতে পারেন নি।

পয়ার ছন্দের একেশ্বরত্ব ছাড়িয়ে গিয়ে বিচিত্র হয়েছে ছন্দ বৈক্য পদাবলীতে। তার একটা কারণ, এগুলি একটানা গল্প নয়। এই পদগুলিতে বিচিত্র হৃদয়াবেগের সংঘাত লেগেছে। দোলায়িত হয়েছে সেই আবেগ তিনমাত্রার ছন্দে। ত্রৈমাত্রিক এবং ত্রৈমাত্রিক ছন্দে বাংলা কাব্যের আরম্ভ। এখনো পর্যন্ত ঐ দুই জাতের মাত্রাকে নানা প্রকারে সাজিয়ে বাংলার ছন্দের লীলা চলছে। আর আছে দুই এবং তিনের জোড় বিজোড় সংখ্যা মিলিয়ে পাঁচ কিংবা নব্বের অসম মাত্রার ছন্দ।

ষোট কথা বলা যায়, দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে। তার

রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে, এবং নানা ওজনের পংক্তিবিন্যাসে। এই-রকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পংক্তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলই বেড়ে চলেছে।

এক সময়ে শ্রেণীবদ্ধ যাত্রা শুধে ছন্দ নির্ণয় হত। বালকবয়সে একদিন সেই চোদ্দ অক্ষর মিলিয়ে ছেলেমানুষি পয়ার রচনা ক'রে নিজের কৃতিত্বে বিন্মিত হয়েছিলুম। তার পরে দেখা গেল, কেবল অক্ষর গণনা ক'রে যে ছন্দ তৈরি হয় তার শিল্পকলা আদিম জাতের। পদের নানা ভাগ আর যাত্রার নানা সংখ্যা দিয়ে ছন্দের বিচিত্র অলংকৃতি। অনেক সময়ে ছন্দের নৈপুণ্য কাব্যের মর্যাদা ছাড়িয়ে যায়।

চলতি ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্তসংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। সেটা পয়ার হলেও অক্ষর-গোনা পয়ার হবে না, সে হবে যাত্রা-গোনা পয়ার। কিন্তু কথাটা ঠিক হল না, বস্তুত সাধু ভাষার পয়ারও যাত্রা-গোনা। সাহিত্যিক কবুলতি পত্রে সাধু ভাষায় অক্ষর এবং যাত্রা এক পরিমাণের বলে গণ্য হয়েছে। এইমাত্র রক্ষা হয়েছে যে সাধু ভাষার পদ্য-উচ্চারণকালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না; অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।—

সন্তত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে,

জুড়াই এ কান আমি জাস্তির হলনে।

চলতি বাংলায় 'নদ' আর 'তুমি', 'মোর' আর 'মনে' হসন্তের বাধনে বাধা। এই পয়ারে ঐ শব্দগুলিকে হসন্ত বলে যে মানা হয় নি তা নয়, কিন্তু ওর বাধন আলাগা করে দেওয়া হয়েছে। 'কান' আর 'আমি', 'জাস্তির' আর 'হলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্ত শব্দ; কিন্তু সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাধতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

একটা খাঁটি ছড়ার নমুনা দেখা যাক—

এ পার পদ্মা ও পার পদ্মা মধ্যখানে চর,

তারই মধ্যে বসে আছেলিখু সঙ্গার।

এটা পয়ার কিন্তু চোদ্দ অক্ষরের সীমানা পেরিয়ে গেছে। তবু উচ্চারণ মিলিয়ে বানান করলে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না—

এপার্পদ্মা ওপার্পদ্মা মধ্যখানে চর,

তারি মধ্যে বসে আছেলিখু সঙ্গার।

ছড়ার প্রায় দেখা যায় যাত্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বেশি। আবৃত্তিকারের

উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝাঁক আছে তার তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজনমত স্বর বাড়ায় কমায়।—

শিবু ঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কস্তে দান।

এখানে ‘বিয়ে হবে’ শব্দে যাত্রা ঢিলে হয়ে গেছে। যদি থাকত ‘শিবু ঠাকুরের বিয়ের সভায় তিন কস্তে দান’, তা হলে যাত্রা পুরো হত। কিন্তু বাংলাদেশে ছেলে বুড়ো এমন কেউ নেই যে আপনিই ‘বিয়ে— হবে—’ স্বরে টান না দেয়।

বক বলো, বক বলো, বলো রাজহংস,

ভাষার অধিক বলো কস্তে ভাষার হাতের শব্দ।

ছোটো লাইনের যাত্রার কমি-বেশি স্পষ্ট; কিন্তু ভয়ের কারণ নেই, স্বতই আবৃত্তির টানে ছোটো লাইনের ওজন মিলে যায়। ছন্দে চলতি ভাষা আইন জারি না করেও আইন মানিয়ে নিতে পারে।

ছেলে ভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করা হয় নি। যুক্তিবাদন-ছেঁড়া ছবিগুলো ছন্দের ঢেউয়ের উপর টগবগ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর-একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অল্পপ্রাসে হোক বা আর-কোনো অনির্দিষ্ট কারণে হোক, আর-একটা শব্দ রবাহুত এসে পড়ছে। আধুনিক যুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিন্তের এই-সমস্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্বের যান্ত্রিক মনোচিত্তের সক্রিয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতন্যের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃস্ফটিকে কাব্যে উদ্ধার ক’রে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই। নীচের ছড়াটির মতো এই জাতের রচনা কোনো আধুনিক কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছে কি না জানি নে। ধবর বা পেয়েছি তাতে জানা যায়, এর চেয়ে অসংলগ্ন কাব্যের অভ্যাস হয়েছে।—

মোটন মোটন পারশাগুলি মোটন রেখেছে,

কড়া সাহেবের বিবিগুলি বাইতে এসেছে।

হু পারে হুই হুই কাংলা ভেসে উঠেছে,

দাদার হাতে কলম ছিল দুঁড়ে মেয়েছে।

ও পারেতে দুটি মেয়ে বাইতে নেবেছে,

হুহু হুহু চুলগাহটি বাড়তে মেয়েছে।

কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে।

আজ দাদার ঢোলা কেলা, কাল দাদার যে।

দাদা বাবে কোন্‌খান দে, বকুলজলা দে ।
 বকুল ফুল কুড়োতে কুড়োতে পেরে পেলুম মালা ।
 রামধনুকে বাদি বাজে সীতেনাথের খেলা ।
 সীতেনাথ বলে রে ভাই, চালকড়াই খাও ।
 চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ,
 হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ ।
 চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্‌ করে,
 চাঁদমুখে রোদ নেমে রক্ত কেটে পড়ে ।

হৃদয় কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে ; ছন্দে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে । সেইজন্তে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয় বেড়ে চলেছে । এর ছন্দের ঢাকা ঘুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে ।

আদিম কালের মানুষ তার ভাষাকে ছন্দের দোল লাগিয়ে নিরর্থক নাচাতে কুণ্ঠিত হয় নি । নাচের নেশা আছে তার রক্তে । বুদ্ধি যখন তার চেতনায় একাধিপত্য করতে আরম্ভ করেছে, তখন সে নেশা কাটিয়ে উঠে মেনেছে শব্দের সঙ্গে অর্থের একান্ত যোগ । আদিম মানুষ মস্ত বানিয়েছে, সে মস্তের সঙ্গে অর্থের শাসন নেই অথবা আছে সামান্য । তার মন ছন্দে দোলায়িত ধ্বনির রহস্যে ছিল অভিভূত । তার মনে ধ্বনির এই-যে সন্মোহনপ্রভাব, দেবতার উপরে, প্রাকৃতিক শক্তির উপরেও তার ক্রিয়া সে কল্পনা করত । তাই সীতাল প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক গানের শেষে অর্থ হয়েছে গৌণ ; অর্থের যে আভাস আছে সে কেবল ধ্বনির গুণে মনের মধ্যে মোহ বিস্তার করে, অর্থাৎ কোনো স্পষ্ট বার্তার জন্তে তার আদর নয়, বাঙ্গনার অনির্দেশ্যতাই তাকে প্রবলতা দেয় । যা তার ছেলেকে নাচাচ্ছে—

ধেনা নাচন ধেনা,
 বট পাকুড়ের ধেনা ।
 বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো দান,
 সোনার জাহ্নবী জন্তে যারে নাচ'না কিনে আন ।

এর মধ্যে ধানিকটা অর্থহীন ধ্বনি, ধানিকটা অর্থহীন ছবির টুকরো নিয়ে যে ছড়া বানানো হয়েছে তাতে আছে সেই নাচন যে নাচন স্বপ্নলোকে কিনতে পাওয়া যায় ।

এই-যে ধ্বনিতে অর্থ মিলে মনের মধ্যে মোহাবেশ জাগিয়ে তোলা, এটা সকল যুগের কবিতার মধ্য দিয়েই কমবেশি প্রকাশ পায় ; তাই অর্থের প্রবলতা বেড়ে উঠলে কবিতার সন্মোহন যায় কমে । ধ্বনির ইশারা দিয়ে যা নিজেকে অভাবনীয় রূপে

সার্থক করে তোলে, শিল্পকের ব্যাখ্যার দ্বারা তা যখন সমর্থনের অপেক্ষা করে তখন কবিতার মন্ত্রশক্তি হারায় তার গুণ। ছন্দ আছে আত্মর কাজে, খেরাল গেলে বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করতে সে সাহস করে।

সাহিত্যের মধ্যে কারুকাষ, কাব্যে যার প্রাধান্য, তার একটা দিক হচ্ছে শব্দের বাছাই-সাজাই করা। কালে কালে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ভাষার শব্দ জমে যায় বিস্তর। তার মধ্যে থেকে বেছে নিতে হয় এমন শব্দ যা কল্পনার ঠিক করমাশটি মানতে পারে পুরো পরিমাণে।

রামপ্রসাদ বলেছেন : আমি করি দুখের বড়াই। ‘বড়াই’-বর্গের অনেক ভারী ভারী কথা ছিল : গর্ব করি, গৌরব করি, মাহাত্ম্য বোধ করি। কিন্তু ‘দুঃখকেই বড়ো ক’রে নিয়েছি’ বলবার জন্তে এমন নিতান্ত সহজ অর্থাৎ ঠিক কথাটি বাংলাভাষার আর নেই।

যেমন আছে শব্দের বাছাই তেমনি আছে ভাবপ্রকাশের বাছাইয়ের কাজ।

বাউল বলতে চেয়েছে, চার দিকে অচিন্তনীয় অপরিমিত রহস্য, তারই মধ্যে চলেছে জীবনযাত্রা। সে বললে—

পরান আমার শ্রোতের দীয়া

(আমার ভাসাইলা কোন্ ঘাটে)।

আগে আত্মার পাছে আত্মার, আত্মার নিহুইৎ-চালা।

আত্মারমূখে কেবল যাজে লহরেরই মালা।

তার সলন্তে কেবল চলে নিহুইৎ রাতের ধারা,

সাধের সাধি চলে বাতি, নাই গো কুলকিনারা।

নানা রহস্যে একলা-জীবনের গতি, যেন চার দিকের নিহুৎ অঙ্ককারে শ্রোতে-ভাগানো প্রদীপের যতো—এমন সহজ উপমা মিলবে কোথায়। একটা শব্দ-বাছাই লক্ষ্য করা যাক : লহরেরই মালা। উষ্মি নয়, তরঙ্গ নয়, ঢেউ নয়, শব্দ জাগাচ্ছে অলে ছোটো ছোটো চাকলা, ইংরেজিতে যাকে বলে ripples। অঙ্ককারের তলায় তলায় স্রাবির ধারা চলেছে, এ ভাবটা মনে হয় যেন আধুনিক কবির ছোয়াচ-লাগা। স্রাবি স্তব্ধ হয়ে আছে, এইটেই সাধারণত মুখে আসে। তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্লক্ষ্য শ্রোতের মতো বয়ে চলেছে, এ উপমাটার হালের টাঁকশালের ছাপ লেগেছে বলেই মনে হয়।

শব্দ-বাছাই ভাব-বাছাইয়ের শিল্পকাজ চলেছে পৃথিবীর সাহিত্য জুড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে চলেছে অনির কাজ। সেটা গড়ে চলে অলক্ষ্য, পড়ে চলে প্রত্যক্ষ।

মুখে মুখে প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষায় কলাকৌশলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ দলবীধা জীব। একলার ব্যবহারে সে আটপোরে, দলের ব্যবহারে সুসজ্জিত। সকলের সঙ্গে আচরণে মানুষের যে সৌজন্য সেই তার ব্যবহারের শিল্পকার্য। তাতে যত্নপূর্বক বাছাই সাজাই আছে। সর্বজনীন ব্যবহারে ব্যক্তিগত খেয়ালের যথেষ্টাচার নিষ্পত্তীয়। এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেকে ও অন্যকে একটা চিরন্তন আদর্শের দ্বারা সম্মান দেয়। সাহিত্যকে কদাচিৎ ত্রিভ্রষ্ট সৌজন্যভ্রষ্ট করায় প্রকাশ পায় সমাজের বিকৃতি, প্রকাশ পায় কোনো সাময়িক বা মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ।

ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। সাধারণত সে মিলন নিকটের এবং প্রত্যাহের। সাহিত্য এসেছে মানুষের মনকে সকল কালের সকল দেশের মনের সঙ্গে মুখোমুখি করবার কাজে। প্রাকৃত জগৎ সকল কালের সকল স্থানের সকল তথ্য নিয়ে, সাহিত্যজগৎ সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষের কল্পনা-প্রবণ মন নিয়ে। এই জগৎ-সৃষ্টিতে যে-সকল বড়ো বড়ো রূপকার আপন বিশ্বজনীন প্রতিভা খাটিয়েছেন সেই-সব সৃষ্টিকর্তাদেরকে মানুষ চিরস্মরণীয় বলে স্বীকার করেছে। বলেছে তাঁরা অমর। পঞ্জিকার গণনা অনুসারে অমর নয়। মাহেজদারের ভয়াবশেষ যখন দেখি তখন বোঝা যায়, তারই মতো এমন অনেক সভ্যতা মাটির তলায় লুপ্ত হয়ে গেছে। সেদিনকার বিলুপ্ত সভ্যতাকে ধারা একদিন বাণীরূপ দিয়েছিলেন তাঁদের সেই বাণীও নেই, সেই স্মৃতিও নেই। কিন্তু যখন তাঁরা বর্তমান ছিলেন তখন তাঁদের কীর্তির যে মূল্য ছিল সে কেবল উপস্থিত কালের নয়, সে নিত্যকালের। সকল কালের সকল মানুষের চিন্তামিলনবেদিকায় উৎসর্গ করা তাঁদের দান সেদিন অমরতার স্বাক্ষর পেয়েছিল, আমরা সে সংবাদ জানি আর নাই জানি।

১২

সাধু ভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান প্রভেদ ক্রিয়াপদের চেহারায়। যেমন সাধুভাষার 'করিতেছি' হয়েছে চলতি ভাষায় 'করছি'।

এরও মূল কথাটা হচ্ছে আমাদের ভাষাটা হসন্তবর্ণের শব্দ যুগ্মে আটবীধ। 'করিতেছি' এলানো শব্দ, পিও পাকিয়ে হয়েছে 'করছি'।

এই ভাষার একটা অভ্যাস দেখা যায়, তিন বা ততোধিক অক্ষর-ব্যানী শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে হসন্ত লাগিয়ে শেষ অক্ষরে একটা স্বরবর্ণ জুড়ে শব্দটাকে তাল পাকিয়ে দেওয়া। যথা ক্রিয়াপদে : ছিটকে পড়া, কাৎরে ওঠা, বাৎলে দেওয়া, গাৎরে বাওয়া,

ইহ্নিয়ে চলা, বদলিয়ে দেওয়া, বিগড়িয়ে যাওয়া।

বিশেষপদে : কাংলা ভেটকি কাঁকড়া লাম্বা শাকড়া চাম্চে নিম্‌কি চিম্‌টে টুকরি কুনকে আধলা কাঁচকলা স্‌কড়ি দেপ্লাই চাম্‌ড়া মাটুকোঠা পাগ্লা পল্‌তা চাল্‌তে গাম্‌লা আম্‌লা।

বিশেষণ, যেমন : পুঁচকে বোটকা আল্‌গা ছুটকো হাল্‌কা বিধ্‌কুটে পাংলা ডান্‌পিটে শুটকো পান্‌সা চিম্‌সে।

এই হসন্তবর্ণের প্রভাবে আমাদের চলতি ভাষার যুক্তবর্ণের ধনিরই প্রাধান্য ঘটেছে।

আরও গোড়ায় গেলে দেখতে পাই, এটা ঘটতে পেরেছে অকারের প্রতি ভাষার উপেক্ষাবশত।

সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণ মিলিয়ে দেখলে প্রথমেই কানে ঠেকে অ স্বরবর্ণ নিয়ে। সংস্কৃত আ স্বরের হ্রস্বরূপ সংস্কৃত অ। বাংলার এই হ্রস্ব আ অর্থাৎ অ আমাদের উচ্চারণে আ নাম নিয়েই আছে; যেমন : চালা কাঁচা রাজা। এ-সব আ এক যাত্রার চেয়ে প্রশস্ত নয়। সংস্কৃত আ'কারযুক্ত শব্দ আমরা হ্রস্বযাত্রাতেই উচ্চারণ করি, যেমন 'কামনা'।

বাংলা বর্ণমালার অ সংস্কৃত স্বরবর্ণের কোঠায় নেই। ইংরেজি star শব্দের a সংস্কৃত আ, ইংরেজি stir শব্দের i সংস্কৃত অ। ইংরেজি ball শব্দের a বাংলা অ। বাংলার 'অল্পসল্প'র বানান বাই হোক, ওর চারটে বর্ণেই সংস্কৃত অ নেই। হিন্দিতে সংস্কৃত অ আছে, বাংলা অ নেই। এই নিয়েই হিন্দুস্থানি ওস্তাদের বাঙালি শাকরেন্দ্রা উচ্চ অঙ্কের সংগীতে বাংলা ভাষাকে অম্পৃক্ত বলে গণ্য করেন।

বাংলা অ যদিও বাংলাভাষার বিশেষ সম্পত্তি তবু এ ভাষার তার অধিকার খুবই সংকীর্ণ। শব্দের আরম্ভে যখন সে স্থান পায় তখন সে টিকে থাকতে পারে। 'কলম' শব্দের প্রথম বর্ণে অ আছে, দ্বিতীয় বর্ণে সে 'ও' হয়ে গেছে, তৃতীয় বর্ণে সে একেবারে লুপ্ত। ঐ আদিবর্ণের মর্যাদা যদি সে অব্যাহাতে পেত তা হলেও চলত, কিন্তু পদে পদে আক্রমণ সহ্যেতে হয়, আর তখনি পরাস্ত হয়ে থাকে। 'কলম' যেই হল 'কল্মি', অমনি প্রথম বর্ণের অকার বিগড়িয়ে হল ও। শব্দের প্রথমস্থিত অকারের এই কতি বারে বারে নানো রূপেই ঘটছে, বথা : মন বন ধন বন্ধ হরি যধু বহুণ। এই শব্দগুলিতে আশ্রয় অকার 'ও' স্বরকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। দেখা গেছে, ন বর্ণের পূর্বে তার এই হ্রস্বিতি, ক বা ঙ কলার পূর্বেও তাই। তা ছাড়া দুটি স্বরবর্ণ আছে ওর শব্দ, ই আর উ। তারা পিছনে থেকে ঐ আশ্রয় অ'কে করে দেয় ও, যেমন : গতি কণী বধু

যহু। য কলার পূর্বেও অকারের এই দশা, যেমন : কল্য মন্ত পণ্য বন্ত। যদি বলা যায় এইটেই স্বাভাবিক তা হলে আবার বলতে হয়, এ স্বভাবটা সর্বজনীন নয়। পূর্ববঙ্গের রসনায় অকারের এ বিপদ ঘটে না। তা হলেই দেখা যাচ্ছে, অকারকে বাংলা বর্ণমালায় স্বীকার করে নিয়ে পদে পদে তাকে অঙ্গীকার করা হয়েছে বাংলাদেশের বিশেষ অংশে। শব্দের শেষে হসন্ত তাকে খেদিয়েছে, শব্দের আরম্ভে সে কেবলই তাড়া খেতে থাকে। শব্দের মাঝখানেও অকারের মুখোষ প'রে ওকারের একাধিপত্য, যথা : খড়ম বালক আদর বাদর কিরণ টোপর চাকর বাগন বাদল বছর শিকড় আগল মঙ্গল সহজ। বিপদে ওর একমাত্র রক্ষা সংস্কৃত ভাষার করক্ষেপে, যেমন : অ-মল বি-জ্ঞন নী-রস কু-রস স-বল দুব-বল অনু-উপম প্রতি-পদ। এই আশ্রয়ের জোরও সর্বত্র খাটে নি, যথা : বিপদ বিষম সকল।

মধ্যবর্ণের অকার রক্ষা পায় য বর্ণের পূর্বে, যথা : সময় মলয় আশয় বিষয়।

মধ্যবর্ণের অকার ওকার হয়, সে-যে কেবল হসন্ত শব্দে তা নয়। আকারান্ত এবং যুক্তবর্ণের পূর্বেও এই নিয়ম, যথা : বসন্ত আলস্ত লবঙ্গ সহস্র বিলম্ব স্বতন্ত্র রচনা রটনা যোজনা কল্পনা বঞ্চনা।

ইকার আর উকার পদে পদে অকারকে অপদস্থ করে থাকে তার আরও প্রমাণ আছে।

সংস্কৃত ভাষার ঈষ প্রত্যয়ের যোগে 'জল' হয় 'জলীষ'। চলতি বাংলায় ওখানে আসে উষা প্রত্যয় : জল + উষা = জলুষা। এইটে হল প্রথম রূপ।

কিন্তু উ স্বরবর্ণ শব্দটাকে স্থির থাকতে দেয় না। তার বাঁ দিকে আছে বাংলা অ, ডান দিকে আছে আ, এই দুটোর সঙ্গে মিশে দুই দিকে দুই ওকার লাগিয়ে দিল, হয়ে দাঁড়ালো 'জোলো'।

অকারে বা অযুক্ত বর্ণে যে-সব শব্দের শেষ সেই-সব শব্দের প্রান্তে অ বাসা পায় না, তার দৃষ্টান্ত পূর্বে দিয়েছি। ব্যতিক্রম আছে ত প্রত্যয়-ওলা শব্দে, যেমন : গত হত কত। আর কতকগুলি সর্বনাম ও অব্যয় শব্দে, যেমন : যত তত কত যেন কেন হেন। আর 'এক শো' অর্থের 'শত' শব্দে। কিন্তু এ কথাটাও ভুল হল। বানানের ছলনা দেখে মনে হয় অস্তুত ঐ কটা জায়গায় অ বুঝি টিকে আছে। কিন্তু সে ছাপার অক্ষরে আপনার মান বাঁচিয়ে মুখের উচ্চারণে ওকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, হয়েছে : নতো শতো গতো ক্যানো।

অকারের অত্যন্ত অনাদর ঘটেছে বাংলার বিশেষণ শব্দে। বাংলাভাষায় দুই

অক্ষরের বিশেষণ শব্দ প্রায়ই অকার্যকর হয় না, তাদের শেষে থাকে আকার একার বা ওকার। এর ব্যতিক্রম অতি অল্পই। প্রথমে সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যতগুলি মনে পড়ে দেওয়া যাক। রঙ বোঝায় যে শব্দে, যেমন : লাল নীল স্ত্রাম। স্বাদ বোঝায় যে শব্দে, যেমন : টক ঝাল। সংখ্যাবাচক শব্দ : এক থেকে দশ ; তার পরে, বিশ ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যিক। এইরকম সংখ্যাবাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে খাটে, যেমন : একজন দশঘর দুইমুখো তিনহস্তা। কিন্তু বিশেষ্য পদের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে ব্যবহার করতে গেলেই ওদের সঙ্গে 'টি' বা 'টা', 'খানা' বা 'খানি' যোগ করা যায়, এর অন্তর্থা হয় না। কখনো কখনো বা বিশেষ্য অর্থে ই প্রত্যয় জোড়া হয়, যেমন : একই লোক, দুইই বোকা। কিন্তু এই প্রত্যয় আর বেশি দূর চালাতে গেলে 'জন' শব্দের সহায়তা দরকার হয়, যেমন : পাঁচজনই দশজনেই। 'জন' ছাড়া অন্য বিশেষ্য চলে না ; 'পাঁচ গোকুই' 'দশ চৌকিই' অবৈধ, ওদের ব্যবহার করা দরকার হলে সংখ্যাশব্দের পরে টি টা খানি খানা জুড়তে হবে, যথা : দশটা গোকুই, পাঁচখানি তক্তাই। এক দুই-এর বর্গ ছাড়া আরও দুটি দুই অক্ষরের সংখ্যাবাচক শব্দ আছে, যেমন : আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও বিশেষ্যশব্দ-সহযোগে সমাসে চলে, যেমন : আধমোন দেড়পোওয়া। সমাস ছাড়া বিশেষণ রূপ : দেড়া আধা। সমাসসংশ্লিষ্ট একটা শব্দের দৃষ্টান্ত দেখাই : জোড়হাত। সমাগ ছাড়ালে হবে 'জোড়া হাত'। 'হেঁট' বিশেষণ শব্দটি ক্রিয়াপদের বোলে অথবা সমাসে চলে : হেঁটমুণ্ড, কিংবা হেঁট-করা, হেঁট-হওয়া। সাধারণ বিশেষণ অর্থে শুধু ব্যবহার করি নে, বলি নে 'হেঁট মানুষ'। বস্তুত 'হেঁট হওয়া' 'হেঁট করা' জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। 'মাক' শব্দটাও এই জাতের, বলি : মাকখানে মাকদরিয়া। এ হল সমাস। আর বলি : মাক থেকে। এখানে 'থেকে' অপাদানের চিহ্ন, অতএব 'মাক-থেকে' শব্দটা জোড়া শব্দ। বলি নে : মাক পোক, মাক ঘর। এই মাক শব্দটা খাটি বিশেষণ রূপ নিলে হয় 'মেকো'।

দুই অক্ষরের হ্রস্ব বাংলা বিশেষণের দৃষ্টান্ত ভেবে ভেবে আরও কিছু মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু অনেকটা ভাবতে হয়। অপর পক্ষে বেশি খুঁজতে হয় না, যেমন : বড়ো ছোটো মেঝো লেজো ভালো কালো ধলো রাঙা সাদা ফিকে খাটো রোগা মোটা ধেঁটে কুঁজো বাক্য সিঁধে কানা খোঁড়া বোঁচা ছলো স্ত্রাকা খাঁদা টারাকটা গোটা স্ত্রাড়া খ্যাপা মিঠে ডাঁসা কষা বাসা ভোকা কাঁচা পাকা খাটি মেকি কড়া চোখা মোখা ভিজে হাজা শুকো শুঁড়ো বুড়ো ওঁচা খেলো ছানো খুঁটো ভীতু উঁচু নিচু কালো হায়া বোকা চ্যাড়া ধেঁটে থুঁটো বনো।

বাংলা বর্ণমালায় ই আর উ সবচেয়ে উচ্চশব্দ স্বরবর্ণ। সাগায়নিক মহলে অক্লিষ্টে গ্যাস নানা পদার্থের সঙ্গে নানা বিকার ঘটিয়ে দিয়ে নিজেকে রূপান্তরিত করে, ই স্বরবর্ণটা সেইরকম। অস্তুত আ'কে বিগড়িয়ে দেবার জন্তে তার খুব উচ্চম, যেমন : থলি+আ=থ'লে, করি+আ=ক'রে। ইআ প্রত্যয়ের ই পূর্ববর্তী একটা বর্ণকে ডিঙিয়ে শব্দের আদি ও অন্তে বিকার ঘটায়, তার দৃষ্টান্ত : জাল+ইআ=জ'লে, বালি+ইআ=বেলে, মাটি+ইআ=মেটে, লাঠি+ইআ=লেঠে।

পরে যেখানে আকার আছে ই সেখানে আ'এ হাত না দিয়ে নিজেকেই বদলে ফেলেছে, তার দৃষ্টান্ত যথা : মিঠাই=মেঠাই, বিড়াল=বেড়াল, শিয়াল=শেয়াল, কিতাব=কেতাব, খিতাব=খেতাব।

আবার নিজেকে বজায় রেখে আকারটাকে বিগড়িয়ে দিয়েছে, তার দৃষ্টান্ত দেখো : হিসাব=হিসেব, নিশান=নিশেন, বিকাল=বিকেল, বিলাত=বিলেত। ই কোনো উৎপাত করে নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, সে বেশি নয়, অল্পই, যেমন : বিচার নিবাস কৃষাণ পিশাচ।

একদা বাংলা ক্রিয়াপদে আ স্বরবর্ণের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। করিলা চলিলা করিবা যাইবা : এইটেই নিয়ম ছিল। ইতিমধ্যে ই উপদ্রব বাধিয়ে দিলে। নিরীহ আকারকে সে শাস্তিতে থাকতে দেয় না ; 'দিলা'কে করে তুলল 'দিলে', 'করিবা' হল 'করবে'।

বাংলা ক্রিয়াপদের স্ত-অতীতে ইল প্রত্যয়ে বিকল্পে ও এবং এ লাগে, যেমন : করলো করলে। 'করিল' হয়েছে 'করলো', ইকারের সঙ্গে সঙ্কট ছিন্ন ক'রে। 'করিলা' থেকে 'করলে' হয়েছে ইকারের শাশন মেনেই, অর্থাৎ আ'কে নিকটে পেয়ে ই তার যোগে একটা এ ঘটিয়েছে। মনে করিয়ে দেওয়া ভালো, দক্ষিণবঙ্গের কথা বাংলার কথা বলছি। এই ভাষায় 'করিলাম' যদি 'করলেম' হয়ে থাকে সে তার স্বরবর্ণের প্রকৃতিবশত। এই কারণেই 'হইয়া' হয়েছে 'হয়ে'।

বাংলায় উ স্বরবর্ণও খুব চঞ্চল। ইকার টেনে আনে এ স্বরকে, আর ও স্বরকে টানে উকার : পট+উআ=পোটো। মাঝের উ ডাইনে বাঁয়ে দিলে স্বর বদলিয়ে। শব্দের আশঙ্করে যদি থাকে আ, তা হলে এই সবাসাচী বা দিকে লাগায় এ, ডান দিকে ও। 'মাঠ' শব্দে উআ প্রত্যয় যোগে 'মাঠুআ', হয়ে গেল 'মেঠো' ; 'কাঠুআ' থেকে 'কেঠো'। উকারের আশ্ববিগর্জনের যেমন দৃষ্টান্ত দেখলুম, তার আশ্বপ্রতিষ্ঠারও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন : কুড়াল=কুড়ুল, উনান=উছন। কোথাও বা আশঙ্করের উকার পরবর্তী আকারকে ও ক'রে দিয়ে নিজে খাটি থাকে, যেমন : জুতা=জুতো, শুঁড়া=শুঁড়ো,

পূজা=পুজো, সূতা=সূতো, ছুতার=ছুতোয়, কুমার=কুমোয়, উজাড়=উজোড়।
উকারের পরবর্তী অকারকে অনেক স্থলেই উকার করে দেওয়া হয়, যেমন : পুতল=পুতল, পুখর=পুখুর, হকম=হকুম, উপড়=উপুড়।

একটা কথা বলে রাখি, ইকারে সঙ্গে উকারের একটা যোগসাজেস আছে।
তিন অক্ষরের কোনো শব্দের তৃতীয় বর্ণে যদি ই থাকে তা হলে সে মধ্যবর্ণের আ'কে
তাড়িয়ে সেখানে বিনা বিচারে উ'এর আসন করে দেয়। কিন্তু প্রথমবর্ণে উ কিংবা
ই থাকা চাই, যেমন : উড়ানি=উড়ুনি, নিড়ানি=নিড়ুনি, পিটানি=পিটুনি। কিন্তু
'পেটানি'র বেলায় খাটে না ; কারণ ওটা একার, ইকার নয়। 'মাতানি'র বেলায়ও
এইরূপ। 'খাটুনি' হয়, যেহেতু ট'এ আকারের সংস্রব নেই। গাঁথুনি মাতুনি
রাঁধুনি'রও উকার এসেছে অকারকে সরিয়ে দিয়ে। সেই নিয়মে : এখুনি চিকুনি।
'চালানি' শব্দে আকারকে যেহে উকার দখল পেলো না, কিন্তু 'চালনি' শব্দে অকারকে
ঠেলে ফেলে অন্যায়সে হল 'চালুনি'।

উকারের ব্যবহার দেখলে মনে পড়ে কোকিলকে, সে যেখানে সেখানে পরের বাসায়
ভিন্ন পেড়ে যায়।

এও দেখা গেছে ইআ প্রত্যয়-ওয়াল শব্দে ই'কে ঠেলে উ অনধিকারে নিজে
আসন জুড়ে বসে, যেমন : জুজল=জুজলিয়া=জুজুলে, বাদল=বাদলিয়া=বাদুলে।
এমনিতরো : নাটুকে মাতুনে।

হাতুড়ে কাঠুরে সাপুড়ে হাটুরে ঘেহুড়ে : এদের মধ্যে কোনো-একটা প্রত্যয়
যোগে র বা ড এসে জুটেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'ঘেহুড়ে'র ঘাসে লাগল
একার, 'সাপুড়ে'র সাপ রইল নিবিকার। ভাষাকে প্রব্র করলে এক-এক সময়ে ভালো
জবাব পাই, এক-এক সময় পাইও নে। চাষ যে করে সে 'চাষুড়ে' হল না কেন।

আমার হিন্দিভাষী বন্ধু বলেন, বাংলায় 'সাপুড়ে' ; হিন্দিতে : সাঁপেরা=সাঁপ+
হার। বাংলা 'কাঠুরে' হিন্দিতে 'লকড়হার', হিন্দিতে 'কাঠহার' কথা নেই। হিন্দির
এই 'হার' ভুক্তি প্রত্যয় ; অধিকার অর্থে এর প্রয়োগ, ক্রিয়া অর্থে নয়। বোধ করি
সেই কারণে 'চাষুড়ে' শব্দটা সম্ভব হয় নি।

স্বরবিকারের আর-একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত দেখো। ইআ প্রত্যয়-যোগে একটা
ওকার খামখা হয়ে গেল উ : গোবোর+ইয়া=গুবরে, কৌদোল+ইয়া=কুঁদুলে।
'কুঁদুলে' হল না কেন সেও একটা প্রশ্ন। 'গোবোর' থেকে ওকারটাকে হসঙ্কের ঘারে
তাড়িয়ে দিলে। 'কৌদোল' শব্দেও হসঙ্কে আয়গা না দিয়ে, নিজে বসল জমিয়ে।

অকারের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে আরও প্রমাণ দেওয়া যায়। হাত বুলিয়ে সন্ধান

করাকে বলে 'হাংড়ানো', অসমাপিকায় 'হাংড়িয়ে'। এখানে 'হাত'এর ত থেকে ছেঁটে দেওয়া হল অকার। অথচ 'হাতুড়ে' শব্দের বেলায় নাহক একটা উকার এনে জুড়ে দিলে, তবু অকারকে কিছুতে আমল দিল না। 'বাদল' শব্দের উত্তর ইআ প্রত্যয় যোগ করে 'বাদলে' করলে না বটে, কিন্তু দিলে 'বাহুলে' করে।

এই-সব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝতে পারি, অস্তুত পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের রসনার টান আছে উকারের দিকে। 'হাতড়ি' শব্দ তাই সহজেই হয়েছে 'হাতুড়ি'। তা ছাড়া দেখো : বাছুর তেঁতুল বামুন মিশুক হিংসুক বিষ্মাৎবার।^১

এই প্রসঙ্গে আর-একটা দৃষ্টান্ত দেবার আছে। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের স্থলে আজকাল 'চিবুতে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ ও বানান চলেছে। আজকাল বলছি এইজন্তে যে, আমার নিজেদের কাছে এই উচ্চারণ ছিল অপরিচিত ও অব্যবহৃত। 'চিবোতে' 'ঘুমোতে' শব্দের মূলরূপ : চিবাইতে ঘুমাইতে। আ+ই'কে ঠেলে ফেলে নিঃসম্পর্কীয় উ এসে বসল। অবশ্য এর অন্ত নজির আছে। বিনানি=বিশুনি, কিমানি=কিমুনি, পিটানি=পিটুনি শব্দে দেখা যাচ্ছে প্রথম বর্ণের ইকার তার সর্বত্র তৃতীয় বর্ণের 'পরে হস্তক্ষেপ করলে না, অথচ মধ্যবর্ণের আ'কে সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে উ। মনে রাখতে হবে, প্রথম বর্ণের ইকার তার এই বন্ধু উ'কে নিমন্ত্রণের জন্তে দায়ী। গোড়ায় যেখানে ইকারের ইচ্ছিত নেই সেখানে উ পথ পায় না ঢুকতে। পূর্বেই তার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। 'ঠ্যাঙানি' হয় না 'ঠেঙুনি', 'ঠকানি' হয় না 'ঠকুনি', 'বাকানি' হয় না 'বাকুনি'। 'চিবুতে' 'ঘুমুতে' উচ্চারণ আমার কানে ঠিক ব'লে ঠেকে না, সে যে নিতান্ত কেবল অভ্যাসের জন্তে তা আমি মানতে পারি নে। বাংলা ভাষায় এ উচ্চারণ অনিবারণ্য নয়। আমার বিশ্বাস 'চিনাইতে' শব্দকে কেউ 'চিমুতে' বলে না, অস্তুত আমার তাই ধারণা। 'হুলাইতে' কেউ কি 'হুলুতে', কিংবা 'ছুটাইতে' 'ছুটুতে' বলে? 'বুখাইতে' বলতে 'বুখুতে' কেউ বলে কিনা নিশ্চিত জানি নে, আশা করি বলে না। 'পুরাইতে' বলতে 'পুরুতে' কিংবা 'ঠকাইতে' বলতে 'ঠকুতে' শুনি নি। আমার নিশ্চিত বোধ হয় 'কান জুড়ুল' কেউ বলে না, অথচ 'ঘুমাইল' ও 'জুড়াইল' একই ছাঁদের কথা। 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনাইল' বাক্যটাকে চলতি ভাষায় যদি বলে 'আমাকে দিয়ে তার ঘোড়াটা কিনুল', আমার বোধ হয় সেটা বেআড়া পোনাবে। এই 'পোনাবে' শব্দটা 'গুহুবে' হয়ে উঠতে বোধ হয় এখনো দেরি আছে। আমরা এক কালে যে-সব

১ হিন্দিতে 'হাতুড়ি' শব্দের প্রতিশব্দ শ্রীলিঙ্গে 'হতোড়ি'। বিহারীতে শ্রীলিঙ্গে 'হতুটরি'। উড়া এবং উয়া প্রত্যয় থেকে উকারের প্রবেশ স্বাভাবিক। হিন্দিতেও দুই ওকারকে উকারের মতো বসবার ও লেখবার প্রবৃত্তি আছে : বোলবাবা=বুলবাবা, কোড়বাবা=কুড়বাবা, গোবর+এলা=গুবরৈলা।

উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিলুম এখন তার অন্তর্থা দেখি, যেমন : পেতোল (পিতোল), ভেতোর (ভিতোর), তেতো (ভিতো), সোন্দোর (সুন্দোর), ভাল দে (দিয়ে) যেখে খাওয়া, তার বে (বিয়ে) হয়ে গেল।

উকারের ধ্বনি তার পরবর্তী অক্ষরেও প্রতিধ্বনিত হতে পারে, এতে আশ্চর্যের কথা নেই, যেমন : মুণ্ডু মুণ্ডু শুদুর কদুর পুতুর মুণ্ডুর। শুবু 'কুণ্ডল' ঠিক আছে, কিন্তু 'কুণ্ডলি'তে লাগল উকার। 'সুন্দর' 'সুন্দরী'তে কোনো উৎপাত ঘটে নি। অথচ 'গণনা' শব্দে অনাহুত উকার এসে বানিয়ে দিলে 'গুনে'। 'শয়ন' থেকে হল 'গুয়ে', 'বয়ন' থেকে 'বুনে', 'চয়ন' থেকে 'চুনে'।

বাংলা অকারের প্রতি বাংলা ভাষার অনাদরের কথা পূর্বেই বলেছি। ইকার-উকারের পূর্বে তার স্বরূপ লোপ হয়ে ও হয়। ঐ নিরীহ স্বরের প্রতি একারের উপদ্রবও কম নয়। উচ্চারণে তার একটা অকার-ভাড়ানো বোঁক আছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাধারণ লোকের মুখের উচ্চারণে। বাল্যকালে প্রলম্ব-ব্যাপারকে 'পেল্লায়' ব্যাপার বলতে শুনেছি মেয়েদের মুখে। সমাজের বিশেষ স্তরে আজও এর চলন আছে, এবং আছে : পেল্লায় (প্রহ্লাদ), পেরনাম (প্রণাম), পেরদম (প্রথম), পেরদান (প্রদান), পেরজা (প্রজা), পেসোরো (প্রসর), পেসাদ অথবা পেরসাদ (প্রসাদ)। 'প্রত্যাশা' ও 'প্রত্যয়' শব্দের অপভ্রংশে প্রথম বর্ণে হস্তক্ষেপ না ক'রে দ্বিতীয় বর্ণে বিনা কৈফিয়তে একার নিয়েছে বাসা, হয়েছে 'পিভেস', 'পিভেয়', কখনো হয় 'পেভয়'। একারকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ইকার এবং স্বকার, তারও দৃষ্টান্ত আছে, যেমন : সেছো (সিদ্ধ), নেছো (নিভ্য বা নৃত্য), কেছো (কিছো), শেকোল (শিকল), বেরোদ (বৃহৎ), খেস্টান (খুস্টান)। প্রথম বর্ণকে ডিঙিয়ে মাঝখানের বর্ণে একার লাফ দিয়েছে সেও লক্ষ্য করবার বিষয়, যেমন : নিবেস বিবেস, সরেস (সরস), নীরেস ঈশেন বিলেত বিকেল অঘেট।

স্বরবর্ণের খেয়ালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক।—

'পিটানো' শব্দের প্রথম বর্ণের ইকার যদি অবিকৃত থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের আকারকে ঘেঁষ ওকার করে, হয় 'পিটোনো'। ইকার যদি বিগড়ে গিয়ে একার হয় তা হলে আকার থাকে নিরাপদে, হয় 'পেটানো'। তেমনি : মিটোনো = মেটানো, বিলোনো = বেলানো, কিলোনো = কেলানো। ইকার একারে যেমন অদল-বদলের সম্বন্ধ তেমনি উকারে ওকারে। শব্দের প্রথম বর্ণে উ যদি খাঁটি থাকে তা হলে দ্বিতীয় বর্ণের অকারকে পরাস্ত ক'রে করবে ওকার। যেমন 'ফুলানো' হয়ে থাকে 'ফুলোনো'। কিন্তু যদি ঐ উকারের অদল হয়ে হয় ওকার তা হলে আকারের ক্ষতি

হয় না, তখন হয় ‘ভোলানো’। ভেমনি : ডুবোনো = ভোবানো, ছোটোনো = ছোটানো। কিন্তু ‘ঘুমোনো’ কখনোই হয় না ‘ঘোমানো’, ‘কুলোনো’ হয় না ‘কোলানো’ কেন। অকর্মক বলে কি ওর স্বতন্ত্র বিধান।

দেখা যাচ্ছে বাংলা উচ্চারণে ইকার এবং উকার খুব কষিষ্ঠ, একার এবং ওকার ওদের পরগাগত, বাংলা অকার এবং আকার উৎপাত গইতেই আছে।

স্বরবর্ণের কোঠায় আমরা ঋকে ঋণস্বরূপে নিয়েছি বর্ণমালায়, কিন্তু উচ্চারণ করি ব্যঞ্জন বর্ণের— রি। সেইজন্তে অনেক বাঙালি ‘মাতৃভূমি’কে বলেন ‘মাত্রিভূমি’। যে কবি তাঁর ছন্দে ঋকারকে স্বরবর্ণরূপে ব্যবহার করেন তাঁর ছন্দে ঐ বর্ণে অনেকের রসনা ঠোকর খায়।

সাধারণত বাংলায় স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। তবু কোনো কোনো স্থলে স্বরের উচ্চারণ কিছু পরিমাণে বা সম্পূর্ণ পরিমাণে দীর্ঘ হয়ে থাকে। হসন্ত বর্ণের পূর্ববর্তী স্বরবর্ণের দিকে কান দিলে সেটা ধরা পড়ে, যেমন ‘জল’। এখানে জ’এ যে অকার আছে তার দীর্ঘতা প্রমাণ হল ‘জলা’ শব্দের জ’এর সঙ্গে তুলনা করে দেখলে। ‘হাত’ আর ‘হাতা’র প্রথমটির হা দীর্ঘ, দ্বিতীয়টির হ্রস্ব। ‘পিঠ’ আর ‘পিঠে’, ‘ভূত’ আর ‘ভূতো’, ‘ঘোল’ আর ‘ঘোলা’— তুলনা করে দেখলে কথাটা স্পষ্ট হবে। সংস্কৃতে দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতা সর্বত্রই, বাংলায় স্থানবিশেষে। কথায় যৌক দেবার সময় বাংলা স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই দীর্ঘ হয়, যেমন : ভা—রি তো পণ্ডিত, কে—বা কার খোজ রাখে, আ—জই যাব, হল—ই বা, অবা—ক করলে, হাজা—রো লোক, কী—যে বকো, এক ধা—র থেকে লাগা—ও যার। যুক্তবর্ণের পূর্বে সংস্কৃতে স্বর দীর্ঘ হয়, বাংলায় তা হয় না।

বাংলায় একটা অতিরিক্ত স্বরবর্ণ আছে যা সংস্কৃত ভাষায় নেই। বর্ণমালায় সে ঢুকেছে একারের নামের ছাড়পত্র নিয়ে, তার জন্তে স্বতন্ত্র আসন পাতা হয় নি। ইংরেজি bad শব্দের a তার সমজাতীয়। বাংলায় তার বিশেষ বানান করবার সময় আমরা য ফলায় আকার দিয়ে থাকি। বাংলায় আমরা যেটাকে বলি অস্ত্যস্ব য, চ বর্ণের জ’এর সঙ্গে তার উচ্চারণের ভেদ নেই। য’এর নীচে ফোঁটা দিয়ে আমরা আর-একটা অক্ষর বানিয়েছি তাকে বলি ইয়। সেটাই সংস্কৃত অস্ত্যস্ব য। সংস্কৃত উচ্চারণ-মতে ‘যম’ শব্দ ‘য়ম’। কিন্তু ওটাতে ‘যম’ উচ্চারণের অজুহাতে য’র ফোঁটা দিয়েছি সরিয়ে। ‘নিয়ম’ শব্দের বেলায় য’র ফোঁটা রক্ষা করেছি, তার উচ্চারণেও সংস্কৃত বজায় আছে। কিন্তু যফলা-আকারে (ya) য’কে দিয়েছি খেদিয়ে আর আ’টাকে দিয়েছি বীকা করে। সংস্কৃতে ‘শাস’ শব্দের উচ্চারণ ‘নিয়াস’, বাংলায়

হল nas। তার পর থেকে দরকার পড়লে য ফলায় চিহ্নটাকে ব্যবহার করি আকারটাকে বাকিয়ে দেবার ক্ষেত্রে। Paris শব্দকে বাংলায় লিখি 'প্যারিস', সংস্কৃত বানানের নিয়ম অনুসারে এর উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল 'পিয়ারিস'। একদা 'শ্রায়' শব্দটাকে বাংলায় 'নেয়ায়' লেখা হয়েছে দেখেছি।

অথচ 'শ্রায়' শব্দকে বানানের ছলনায় আমরা তৎসম শব্দ বলে চালাই। 'যম'কেও আমরা ভয়ে ভয়ে বলে থাকি কিন্তু সংস্কৃত শব্দ, অথচ রসনায় ওটা হয়ে দাঁড়ায় তদুব বাংলা।

সংস্কৃত শব্দের একার বাংলায় অনেক স্থলেই স্বভাব পরিবর্তন করেছে, যেমন 'খেলা', যেমন 'এক'। জেলাভেদে এই একারের উচ্চারণ একেবারে বিপরীত হয়। তেল মেঘ পেট লেজ— শব্দে তার প্রমাণ আছে।

পূর্বেই দেখিয়েছি আ এবং বাংলা অ স্বরবর্ণ সম্বন্ধে ইকার এবং উকারের ব্যবহার আধুনিক যবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে চাকলাজনক, অর্থাৎ এরা সর্বদা অপঘাত ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এদের অল্পগত একারের প্রতি এরা সদয়। 'এক' কিংবা 'একটা' শব্দের এ গেছে বেকে, কিন্তু উ তাকে রক্ষা করেছে 'একুশ' শব্দে। রক্ষা করবার শক্তি আকারের নেই, তার প্রমাণ 'এগারো' শব্দে। আমরা দেখিয়েছি ন'এর পূর্বে অ হয়ে যায় ও, 'যেমন' 'ধন' 'মন' শব্দে। ঐ ন একারের বিকৃতি ঘটায় : কেন সেন কেন ঘেন। ইকারের পক্ষপাত আছে একারের প্রতি, তার প্রমাণ দিতে পারি। 'লিখন' থেকে হয়েছে 'লেখা'— কিন্তু এ— 'গিলন' থেকে 'গেলা'। অথচ 'দেখন' থেকে 'ছাখা', 'বেচন' থেকে 'ব্যাচা', 'হেলন' থেকে 'হালা'। অসমাপিকা ক্রিয়ার মধ্যে এদের বিশেষ রূপগ্রহণের মূল পাওয়া যায়, যেমন : লিখিয়া—লেখা (পূর্ববঙ্গে 'ল্যাখা'), গিলিয়া—গেলা। কিন্তু : খেলিয়া—খালা, বেচিয়া—ব্যাচা। মিলন অর্থে আর-একটা শব্দ আছে 'মেলন', তার থেকে হয়েছে 'ম্যালা', আর 'মিলন' থেকে হয়েছে 'মেলা' (মিলিত হওয়া)।

য ফলায় আকার না থাকলেও বাংলায় তার উচ্চারণ আকার, যেমন 'বায়' শব্দে। এটা হল আত্মকরে। অন্ত্র ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব ঘটায়, যেমন 'সভা'। পূর্বে বলেছি ইকারের প্রতি একারের টান। 'ব্যক্তি' শব্দের ইকার প্রথম বর্ণে দেয় একার বসিয়ে, 'ব্যক্তি' শব্দ হয়ে যায় 'বেক্তি'। হ'এর সঙ্গে য ফলা যুক্ত হলে কোথা থেকে জ'এ-ঝ'এ জটলা ক'রে হয়ে দাঁড়ায় 'সোজ্‌ঝো'। অথচ 'সম্ব' শব্দটাকে বাঙালি তৎসম বলতে কুণ্ঠিত হয় না। বানানের ছলবেশে যুটিয়ে দিলেই দেখা যাবে, বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বললেই হয়। এমন-কি কোনো নতুন সংস্কৃত শব্দ আমদানি করলে বাংলার

নিয়মে তখনি সেটা প্রাকৃত রূপ ধরবে। কলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। অর্থাৎ আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়।

য ফলায় উচ্চারণ বাংলায় কোথাও সম্মানিত হয় নি, কিন্তু এক কালে বাংলার ক্রিয়াপদে পথ হারিয়ে সে স্থান পেয়েছিল। ‘ধাইল’ ‘আইল’ শব্দের ‘খাল্য’ ‘আল্য’ রূপ প্রাচীন বাংলায় দেখা গিয়েছে। ইকারটা শব্দের মাঝখান থেকে ভেঙে হরে শেষকালে গিয়ে পড়াতে এই ইঅ’র সৃষ্টি হয়েছিল।

বাংলার অন্তর প্রদেশে এই ফলা-আকারের অভাব নেই, যেমন ‘মায়া মায়া’। বাংলা সাধু ভাষার অসমাপিকা ক্রিয়াপদে ফলা-আকার ছদ্মবেশে আছে, যেমন : হইয়া খাইয়া। প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে তার বানান দেখা যায় : ইয়া খায়া।

সম্প্রতি একটা প্রশ্ন আমার কাছে এসেছে। ‘বাওয়া খাওয়া পাওয়া দেওয়া নেওয়া’ ধাতু ‘যেতে খেতে পেতে দিতে নিতে’ আকার নিয়ে থাকে, কিন্তু ‘গাওয়া বাওয়া চাওয়া কওয়া বওয়া’ কেন তেমনভাবে হয় না ‘গেতে বেতে চেতে ক’তে ব’তে’। এর যে উত্তর আমার মনে এসেছে সে হচ্ছে এই যে, যে ধাতুতে হ’এর প্রভাব আছে তার ই লোপ হয় না। ‘গাওয়া’র হিন্মি প্রতিশব্দ ‘গাহনা’, ‘চাওয়া’র চাহনা, ‘কওয়া’র কহনা। কিন্তু ‘খানা দেনা লেনা’র মধ্যে হ নেই। ‘বাহন’ থেকে ‘বাওয়া’, স্তত্রাং তার সঙ্গে হ’এর সম্বন্ধ আছে। ‘ছাদন’ ও ‘ছাওয়া’র মধ্যপথে বোধকরি ‘ছাহন’ ছিল, তাই ‘ছাইতে’র জায়গায় ‘ছেতে’ হয় না।

স্বরবর্ণের অমুরাগ-বিরাগের সূক্ষ্ম নিয়মভেদ এবং তার স্বৈরাচার কৌতুকজনক। সংস্কৃত উচ্চারণে যে নিয়ম চলেছিল প্রাকৃতে তা চলল না, আবার নানা প্রাকৃতে নানা উচ্চারণ। বাংলা ভাষা কয়েক শো বছর আগে যা ছিল এখন তা নেই। এক ভাষা ব’লে চেনাই শক্ত। আগে বলত ‘পড়ই’, এখন বলে ‘পড়ে’; ‘হোহ’ হয়ে গেছে ‘হও’; ‘আমহি’ হল ‘আমি’; ‘বাম্‌হন’ হল ‘বামুন’; এই বদল হওয়ার ঝোক বহু লোককে আশ্রয় ক’রে এমন স্বতোবেগে চলছে যেন এ সম্ভব পদার্থ। হয়তো এই মুহূর্তেই আমাদের উচ্চারণ তার কক্ষপথ থেকে অতি দীর্ঘে দীর্ঘে সরে যাচ্ছে। ফ হচ্ছে f, ড হচ্ছে ব, চ হচ্ছে স, এখনো কানে স্পষ্ট ধরা পড়ছে না।

যে প্রাচীন প্রাকৃতেই সঙ্গী বাংলা প্রাকৃতেই নিকটসম্বন্ধ তার রসভূমিতে আমাদের স্বরবর্ণগুলি জয়ান্তরে কী রকম লীলা করে এসেছে তার অমুরাগ করে এলে অপভ্রংশের কতকগুলি বাধা রীতি হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথের পথিক আমি নই। ধবর নিতে হলে যেতে হবে সুনীতিকুমারের ঘারে।

কিন্তু এ সম্বন্ধে রসনার প্রকৃতিগত কোনো সাধারণ নিয়ম বের করা কঠিন হবে। কেননা দেখা যাচ্ছে, পূর্ব উত্তর বঙ্গে এবং দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে অনেক স্থলে কেবল যে উচ্চারণের পার্থক্য আছে তা নয়, বৈপরীত্যও লক্ষিত হয়।

বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের উচ্চারণবিকার নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করেছি আমার বাংলা শব্দভাণ্ডারে^১।

স্বরবর্ণ সম্বন্ধে পালা শেষ করার পূর্বে একটা কথা বলে নিই। এর পরে প্রত্যয় সম্বন্ধে যেখানে বিস্তারিত করে বলেছি সেখানটা পড়লে পাঠকরা জানতে পারবেন বাংলা ভাষাটা ভদ্রীওয়াল ভাষা।

বাংলায় এ ও উ এই তিনটে স্বরবর্ণ কেবল যে অর্থবান শব্দের বানানের কাজে লাগে তা নয়। সেই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিছু ভদ্রী তৈরি করে। ‘হরি’কে যখন ‘হরে’ বলি কিংবা ‘কালী’কে বলি ‘কেলো’, তখন সেটা সম্মানের সম্ভাষণ বলে শোনাবে না। কিন্তু ‘হক’ বা ‘কালু’, ‘ভুলু’ বা ‘খুকু’, এমন-কি ‘খাঁছ’ শব্দে স্নেহ বহন করে। পূর্বে দেখানো হয়েছে বাংলা ই এবং উ স্বরটা সম্মানী, এ এবং ও অসম্মান। আ স্বরটা অনাদৃত, ওর ব্যবহার আছে অনাদরে, যেমন : মাখন = মাখনা, মদন = মদনা, বামন = বামনা। ইংরেজিতে ‘রবার্ট’ থেকে ‘বর্টি’, ‘এলিজাবেথ’ থেকে ‘লিজি’, ‘মার্গারেট’ থেকে ‘ম্যাগি’, ‘উইলিয়ম’ থেকে ‘উইলি’, চার্লস্ থেকে ‘চার্লি’— ইকার স্বরে দেয় আত্মীয়তার টান। ইকারে আদর প্রকাশ বাংলাতেও পাওয়া যায়। সেখানে আকারকে ঠেলে দিয়ে ই এসে বসে, যেমন : লতা = লতি, কণা = কনি, কমা = কেমি, সরলা = সরলি, মীরা = মীরি। অকারান্ত শব্দেও এ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেমন : শূর্ণ = শূর্নি। এগুলি সব ঘেষের নাম। আই যোগেও আদরের স্বর লাগে, যেমন : নিমাই নিতাই কানাই বলাই। এ কিংবা ও স্বরের অবজ্ঞা, উ স্বরের স্নেহব্যঞ্জনা সংস্কৃতে পাই নে।

বাংলা বর্ণমালায় কতকগুলো বর্ণ আছে যারা বেকার, আর কতকগুলো আছে যারা বেগার খাটে অর্থাৎ নিজের কর্তব্য ছেড়ে অন্যের কাজে লাগে। ক বর্ণের অস্থানাসিক ও সাধু ভাষায় যুক্তবর্ণে ছাড়া অন্তত আপন গৌরবে স্থান পায় নি। যেখানে রসনার তার উচ্চারণকে স্বীকার করেছে সেখানে লেখার উপেক্ষা করেছে তার স্বরূপকে। ‘রক্তবর্ণ’ বলতে বোঝায় যে শব্দ তাকে লেখা হয়েছে ‘রাক্ষা’, অর্থাৎ তখনকার ভয়লোকেরা জুল বানান করতে রাজি ছিলেন, কিন্তু ও’র বৈধ দাবি কিছুতে মানতে

চান নি। বানান-জগতে আমিই বোধ হয় সবপ্রথমে ও'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন, সেও বোধ করি ছন্দের প্রতি মমতাবশত। যেখানে 'ভাঙা' বানান ছন্দকে ভাঙে সেখানে ভাঙন রক্ষা করবার জন্তে ও'র শরণ নিয়ে লিখেছি 'ভাঙা'। কিন্তু চ বর্গের ঞ'র যথোচিত সঙ্গতি করা যায় নি। এই ঞ অন্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে আঁকড়িয়ে টিকে থাকে, একক নিজের জোরে কোথাও ঠাই পায় না। ঐ 'ঠাই' কথাটা মনে করিয়ে দিলে যে, এক কালে ঞ ছিল ঐ শব্দটার অবলম্বন। প্রাচীন সাহিত্যে অনেক শব্দ পাওয়া যায় অস্তিত্বে যার ঞ'ই ছিল আশ্রয়, যেমন : নাঞি মুঞি থাঞা হঞা। এইজাতীয় অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্রের ঞ'র প্রভুত্ব ছিল। আমার বিশ্বাস, এটা রাঢ়দেশের লেখক ও লিপিকরদের অভ্যস্ত ব্যবহার। অধুনাসিক বর্জনের জন্তেই পূর্ববঙ্গ বিখ্যাত।

বাংলা বর্ণমালায় আর-একটা বিভীষিকা আছে, মূর্ধন্ত এবং দন্ত্য ন'এ ভেদাভেদ-তত্ত্ব। বানানে ওদের ভেদ, ব্যবহারে ওরা অভিন্ন। মূর্ধন্ত ন'এর আসল উচ্চারণ বাঙালির জানা নেই। কেউ কেউ বলেন, ওটা মূলত ড্রাবিড়ি। ওড়িয়া ভাষায় এর প্রভাব দেখা যায়। ড'এ চক্ষুবিন্দুর মতো ওর উচ্চারণ। খাড়া চাড়াল ভাঁড়ার প্রভৃতি শব্দে ওর পরিচয় পাওয়া যায়।

ল কলকাতা অঞ্চলে অনেক স্থলে নকার গ্রহণ করে, যেমন : নেওয়া ছুন নেবু, নিচু (ফল), নাল (লালা), নাগাল নেপ স্তাপা, নোয়া (সধবার হাতের), স্তাজ, নোড়া (লোড়ু), স্তাংটা (উলঙ্গ)। কাব্যের ভাষায় : করিষু চলিষু। গ্রাম্য ভাষায় : নাটি, স্তাকা (লেখা), নাল (লাল বর্ণ), নকা ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের তিনটে বর্ণ আছে, শ স ষ। কিন্তু সবক'টির অস্তিত্বের পরিচয় উচ্চারণে পাই নে। ওরা বাঙালি শিশুদের বর্ণপরিচয়ে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়েছে। উচ্চারণ ধ'রে দেখলে আছে এক তালব্য শ। আর বাকি দুটো আসল দধল করেছে সংস্কৃত অভিধানের দোহাই পেড়ে। দন্ত্য স'এর উচ্চারণ অভিধান অনুসারে বাংলায় নেই বটে, কিন্তু ভাষায় তার দুটো-একটা ফাঁক জুটে গেছে। যুক্তবর্ণের যোগে রসনায় সে প্রবেশ করে, যেমন : স্নান হস্ত কাণ্ডে যাস্তল। শ্রী যিশ্র অশ্র : তালব্য শ'এর মুখোষ পড়েছে কিন্তু আওয়াজ দিচ্ছে দন্ত্য স'এর। সংস্কৃতে যেখানে র ফলার সংস্রবে এসেছে তালব্য শ, বাংলায় সেখানে এসে দন্ত্য স। এ ছাড়া 'নাচতে' 'মুছতে' প্রভৃতি শব্দে চ-ছ'এর সঙ্গে ত'এর ঘেষ লেগে দন্ত্য স'এর ধ্বনি জাগে।

সংস্কৃতে অস্ত্যস্থ, বর্গীয়, দুটো ব আছে। বাংলায় যাকে আমরা বলে থাকি তৎসম শব্দ, তাতেও একমাত্র বর্গীয় ব'এর ব্যবহার। হাওয়া থাওয়া প্রভৃতি ওয়া-ওয়াল শব্দে অস্ত্যস্থ ব'এর আভাস পাওয়া যায়। আসামি ভাষায় এই ওয়া অস্ত্যস্থ ব দিয়েই

লেখে, যেমন : 'হওয়া'র পরিবর্তে 'হবা'। হ এবং অস্ত্যাহ ব'এর সংযুক্ত বর্ণেও রসনা অস্ত্যাহ ব'কে ল্পর্শ করে, যেমন : আহ্বান জিহ্বা।

বাংলা বর্ণমালার সবপ্রান্তে একটি যুক্তবর্ণকে স্থান দেওয়া হয়েছে, বর্ণনা করবার সময় তাকে বলা হয় : ক'এ মূর্ধন্ত য 'ক্ষিযো'। কিন্তু তাতে না থাকে ক, না থাকে মূর্ধন্ত য। শব্দের আরম্ভে সে হয় খ ; অস্তে মধ্যে দুটো খ'এ জোড়া ধ্বনি, যেমন 'বক্ষ'। এই ক'র একটা বিশেষত্ব দেখা যায়, ইকারের পূর্বে সে একার গ্রহণ করে, যেমন : ক্ষেতি ক্ষেমি ক্ষেপি। তা ছাড়া আকার হয় াকার, যেমন 'কাস্ত' হয় 'খ্যাস্তো' ; কারও কারও মুখে 'কমা' হয় 'খ্যামা'।

১৩

আমাদের শিকার ক্ষেত্র বতই বেড়ে চলেছে ততই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের চলতি ভাষার কারখানায় জোড়তোড়ের কৌশলগুলো অত্যন্ত দুর্বল। বিশেষকে বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে পরিণত করবার সহজ উপায় আমাদের ভাষায় নেই বললেই হয়। তাই বাংলা ভাষায় আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য। সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলো টুকরো শব্দ আছে যেগুলোর খতর কাজ নেই, তারা বাক্যের লাইন বদলিয়ে দেয়। রেলের রাস্তায় যেমন সিগ্ণাল, ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙের আলোয় তাদের ভিন্ন রকমের সংকেত, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপসর্গগুলো শব্দের মাথায় চড়া সেইরকম সিগ্ণাল। কোনোটাতে আছে নিষেধ, কোনোটা দেখায় এগোবার পথ, কোনোটা বাইরের পথ, কোনোটা নীচের দিকে, কোনোটা উপরের দিকে, কোনোটা চার দিকে, কোনোটা ডাকে ফিরে আসতে। 'গত' শব্দে আ উপসর্গ জুড়ে দিলে হয় 'আগত', সেটা লক্ষ্য করার কাছের দিক ; নিম্ন জুড়ে দিলে হয় 'নির্গত', দেখিয়ে দেয় বাইরের দিক ; অহু জুড়ে দিলে হয় 'অহুগত', দেখিয়ে দেয় পিছনের দিক ; তেমনি 'সংগত' 'দুর্গত' 'অপগত' প্রভৃতি শব্দে নানা দিকে তর্জনী চালানো। উপসর্গ থাকে সাযনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে। তারা আছে একই শব্দের নানা অর্থ বানাবার কাজে। নতুন শব্দ তৈরি করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।

শব্দগড়নের কাজে বাংলাতেও কতকগুলো প্রত্যয় পাওয়া যায়। তার একটার দৃষ্টান্ত অন, যার থেকে হয়েছে : চলন বলন গড়ন ভাঙন। এরই সহকারী আ প্রত্যয়, যার থেকে পাওয়া যায় বিশেষ পদে : চলা বলা গড়া ভাঙা। এই প্রত্যয়টা বাংলার সবচেয়ে সাধারণ, প্রায় সব ক্রিয়াতেই এদের জোড়া যায়। এই আ প্রত্যয়

বিশেষণেও লাগে, যেমন : ঠেলা গাড়ি, ভাঙা রাস্তা। কিন্তু তি দিয়ে একটা প্রত্যয় আছে যেটা বিশেষভাবে বিশেষণেরই, যেমন : চলতি গাড়ি, কাটতি মাল, ঘাটতি ওজন। মুশকিল এই যে, সব জায়গাতেই কাজে লাগাতে পারি নে, কেন পারি নে তারও স্পষ্ট কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। ‘গড়তি টেবিল’ কিংবা ‘কথা-কইতি খোকা’ বলতে মুখে বাধে, এর কোনো সংগত কারণ ছিল না। কাজ চালাবার ক্ষেত্রে অন্য কোনো প্রত্যয় খুঁজতে হয়, সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। যে টেবিল গড়া চলছে তাকে সংস্কৃতে বোধ হয় ‘সংঘটমান’ বলা চলে, কিন্তু বাংলায় কিছু হাংড়ে পাই নে। যে খোকা কথা কয় ইএ প্রত্যয়ের সাহায্যে তাকে ‘কথা-কইয়ে’ বলা যেতে পারে। অথচ ঐ প্রত্যয় দিয়ে ‘হাসিয়ে’ ‘কাদিয়ে’ বলা নিষিদ্ধ। কানার বেলায় আর-এক প্রত্যয় খুঁজে পাওয়া যায় উনে, বলি ‘কাদুনে’। কিন্তু ‘হাসুনে’ বললে হাসির উদ্রেক হবে। অথচ ‘নাচুনে’ চলতে পারে। ‘দৌড়ুনে’ কথার দরকার আছে কিন্তু বলা হয় না, কেউ যদি সাহস ক’রে বলে খুশি হবে। ‘জুতধাবনলীল ঘোড়া’র চেয়ে ‘জোরে-দৌড়ুনে ঘোড়া’ কানে ভালোই শোনায। এই শব্দগুলোর প্রত্যয়টাকে ঠিক উনে বলা চলবে না; ‘নাচুনে’ শব্দের গোড়া হচ্ছে : নাচন + ইয়া = নাচনিয়া। বাংলা ভাষার প্রকৃতি ই এবং আ’কে উ এবং এ করে দিয়েছে, হয়ে উঠেছে ‘নাচুনে’। এই কথাটা মনে ক’রে কৌতুক লাগে যে, ছোটো অসদৃশ স্বরবর্ণকে ঠেলে দিয়ে কোথা থেকে উ এবং এ যায় জুটে।

সংস্কৃতে প্রত্যয় নিয়ম মেনে চলে, বাংলায় প্রায়ই ঝাঁকি দেয়। বেস্বর-বিশিষ্টকে বলি ‘বেসুরা’ (চলতি উচ্চারণ ‘বেসুরো’); স্বর-বিশিষ্টকে বলি নে ‘সুরা’ বা ‘সুরো’, আর কী বলি তাও তো ভেবে পাই নে। ‘সুরেলা গলা’ হয়তো বলে থাকি জানি নে, অস্তুত বলতে দোষ নেই। বালি-বিশিষ্টকে বলি ‘বালিয়া’, অপভ্রংশে ‘বেলে’; কিন্তু চিনি-বিশিষ্টকে বলব না ‘চিনিয়া’ বা ‘চিনে’, চিনদেশজ বাদামকে ‘চিনে বাদাম’ বলতে আপত্তি করি নে।

অন্য প্রত্যয়-যোগে হয় ‘পাও’ থেকে ‘পাওনা’, ‘গাও’ থেকে ‘গাওনা’। কিন্তু ‘ধাও’ থেকে ‘ধাওনা’ হয় না। অন্য প্রত্যয় যোগে হতে পারে ‘ধাওয়াই’। ‘কুট’ থেকে ‘কোটনা’; ‘কুট’ থেকে ‘কুটকি’ হয়, ‘কোটনা’ হয় না। ‘ঘাটা’ থেকে ‘ঘাটনা’ হয়; ‘ছাটা’ থেকে ‘ছাটাই’ হবে, ‘ছাটনা’ হবে না।

সংস্কৃতে মং প্রত্যয় কোথাও ‘মান’ কোথাও ‘বান’ হয়, কিন্তু তার নিয়ম পাকা। সেই নিয়ম মেনে যেখানে দরকার ‘মান’ বা ‘বান’ লাগিয়ে দেওয়া যায়। সংস্কৃতে ‘শক্তিমান’ বলব, ‘ধনবান’ বলব; বাংলায় একটাকে বলব ‘জোয়ালো’ আর-একটাকে

‘টাকাওয়ালা’। অন্য ভাষাতেও ভাষার খেলাল ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়, কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কম। যেমন ইংরেজিতে আছে : হেল্‌থি ওয়েল্‌থি থ্রাকি লাকি ওয়েটি স্টিকি মিস্টি ফগি। কিন্তু ‘কারেজি’ নয়, ‘কারেজিঙ্গস’। তবু একটা নিয়ম পাওয়া যায়। এক সিলেবল্‌এর হালকা কথায় প্রায় সর্বত্রই বিশিষ্ট অর্থে y লাগে, বড়ো মাত্রার কথায় এই প্রত্যয় ধাটে না।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষাতেও প্রত্যয় আছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগ সংকীর্ণ, আর তাদের নিয়ম ও ব্যতিক্রমে পারা চলেছে, কে হারে কে জেতে।

সংস্কৃতে আছে ত প্রত্যয়-বুদ্ধ ‘বিকশিত পুষ্প’, বাংলায় ‘ফোটা ফুল’। বুক-ফাটা কাপা, চুল-চেরা ডরু, মন-মাতানো গান, ঘুমে-পড়া ভাল, কুলি-খাটানো ব্যবসা : এই দৃষ্টান্তগুলোতে পাওয়া যায় আ প্রত্যয়, আনো প্রত্যয়। কাজ চলে, কিন্তু এর চেয়ে আর-একটু জটিল হলে যুশকিল বাধে। ‘অচিন্তিতপূর্ব ঘটনা’ ধাস বাংলায় সহজে বলবার জো নেই।

কিন্তু এ কথাও জেনে রাখা ভালো, ধাস বাংলায় এমন-সব বলবার ভঙ্গী আছে যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। শব্দকে খিণ্ণ করবার একটা কৌশল কথা বাংলায় চলতি, কোনো অর্থবান শব্দে তার ইশারা দেওয়া যায় না। মাঠ ধুঁ করছে, রোজু করছে কাঁকা : মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে : উস্‌খুস্‌ নিস্‌পিস্‌ ক্যাল্‌ক্যাল্‌ কাচুমাচু শব্দের ধরাবীধা অর্থ নেই। তাদের কাছ থেকে যেন উপরিপাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।

বাংলায় আর-একরকম শব্দবৈচিত্র্য আছে তাদের মধ্যে অর্থের আভাস পাই, কিন্তু তারা যতটা বলে তার চেয়ে আড়ুল দেখিয়ে দেয় বেশি। সংস্কৃতে আছে ‘পতনোমুখ’, বাংলায় বলে ‘পড়ো-পড়ো’। সংস্কৃতে বা ‘আসন্ন’ বাংলায় তা ‘হব-হব’। সেইরকম : গেল-গেল যায়-যায়। সংস্কৃতে বা ‘বাপ্পাকুল’ বাংলায় তা ‘কাঁদো-কাঁদো’। সংস্কৃতে বলে ‘অবরুদ্ধম্বরে’, বাংলায় বলে ‘বাধো-বাধো গলায়’। বাংলায় ঐ কথাগুলোতে কেবল যে একটা ভাব পাওয়া যায় তা নয়, যেন ছবি পাই। একটা শ্লোক বলা যাক—

যাব-যাব করে, চরণ না সরে,
কিরে-কিরে চার পিছে,
পড়ো-পড়ো জলে ডরো-ডরো চোখ
তুধু চেয়ে থাকে নীচে।

ঠিক এরকম একটুকরো রেখালেখা এই বাধো-বাধো ভাষাতেই বানানো চলে।

বাংলায় বর্ণনার ছবিকে স্পষ্ট করবার জন্যেই এই-যে অস্পষ্ট ভাষার কায়দা, এর কথা বাংলা শব্দতত্ত্ব গ্রন্থে ধনাত্মক শব্দের আলোচনায় আরও বিস্তারিত করে বলেছি।*

বাংলায় কোনো কোনো প্রত্যয় অর্থগত ব্যবহার অতিক্রম ক'রে এইরকম ইচ্ছিতের দিকে পৌঁচেছে, তার উল্লেখ করা যাক : কিপ্টেমো ছিব্লেমো ছেলেমো জ্যাঠামো ঠ্যাঠামো ফাজ্লেমো বিট্লেমো পেজোমো ছাংলামো বোকাযো বাদ্রামো গোড়ামো মাংলামো গুণামো।

সংস্কৃতের কোন্ প্রত্যয়ের সঙ্গে এর তুলনা করব? স্ব প্রত্যয় দিয়ে 'কিপ্টেমো'কে 'কিপ্টেত্ব' বলা যেতে পারে। কিন্তু স্ব প্রত্যয় নিবিকার, ভালো-মন্দ প্রিয়-অপ্রিয় জড়-অজড়ে ভেদ করে না। অথচ উপরের ফর্দটা দেখলেই বোঝা যাবে, শব্দগুলো একেবারেই ভদ্রজাতের নয়। গাল-বর্ষণের জন্যেই যেন পাকের পিণ্ড জমা করা হয়েছে। ঐ মো বা আমো প্রত্যয়ের যোগে 'বাদ্রামো' বলি, কিন্তু 'সিংহমো' বলি নে। 'কিপ্টেমো' হল, 'দাতামো' হল না। 'পেজোমো' বলা চলে অনায়াসে, কিন্তু 'সেধোমো' (সাধুত্ব) বলতে বাধে। একটা প্রত্যয় দিয়ে বিশেষ ক'রে মনের ঝাল যেটাবার উপায় বোধ করি আর-কোনো ভাষাতেই নেই।

আর-একটা প্রত্যয় দেখো, পনা : বুড়োপনা স্ত্রীপনা ছিব্লেপনা আহরেপনা গিরিপনা। সবগুলোর মধ্যেই কটাক্ষপাত। ব্যাকরণের প্রত্যয়ের যেরকম ভেদনিবিচার হওয়া উচিত, এ একেবারেই তা নয়। চণ্ডীমণ্ডপে বসে বিকল্প দলকে খোঁচা দেবার জন্যেই এগুলো যেন বিশেষ করে শান-দেওয়া।

আনা প্রত্যয়টা দেখো : বাবুআনা বিবিআনা সাহেবিআনা নবাবিআনা মুকসি-আনা গরিবিআনা। বলা বাহুল্য, এর ভাবখানা একেবারেই ভালো নয়। ঐ যে 'গরিবিআনা' শব্দটা বলা হয়েছে, ওর মধ্যেও কপট অহংকারের ভাণ আছে। যদি বলা যায় 'সাধুআনা' তা হলে বুঝতে হবে সেটা সত্যিকার সাধুত্ব নয়।

এই জাতের আর-একটা প্রত্যয় আছে, গিরি। তার সঙ্গে প্রায় 'কলাতে' কথার যোগ হয় : বাবুগিরি গুরুগিরি সাধুগিরি দাতাগিরি। এতে ভাণ করা, মিথ্যে অহংকার করা বোঝায়।

আরও একটা প্রত্যয় দেখা যাক, অনি বা আনি : বহুনি ধমকানি ছিঁচকাহুনি শাসানি হাপানি নাকানি-চোবানি জলুনি কাপুনি মুখ-বাঁকানি খ্যাকানি লোক-হাসানি ফোপানি গ্যাঙানি ভ্যাঙানি ঘ্যাঙানি খিঁচুনি ছট্ফটানি কুট্ফটুনি কোস্ফোসানি। এর সবগুলিই গাল-দেওয়া শব্দ নয়, কিন্তু অপ্রিয়। হাসিটা তো ভালো জিনিস, কিন্তু, আনি

প্রত্যয় দিয়ে হল ‘লোকহাসানি’, হাসির গুণটা গেল বিগড়িয়ে। ছাঁকুনি নিড়ুনি বিজুনি চাটনি শব্দ বস্তুবাচক, সেইজন্যে তাদের মধ্যে নিন্দার স্বাক্ষর প্রবেশ করতে পারে নি।

ইআ [বিকারে ‘এ’] প্রত্যয়টা বখন বস্তুচক না হয়ে ভাবচক হয়, তখন তার ইজিডে কোথাও স্থখের বা অস্বস্তির আভাস পাব না। যেমন : নড়্‌বড়ে নিড়্‌বিড়ে খিট্‌খিটে কট্‌মটে টন্‌টনে কন্‌কনে মিন্‌মিনে প্যান্‌পেনে ঘ্যান্‌ঘেনে ভ্যান্‌ভেজে ভ্যান্‌ভেদে ম্যান্‌মেজে ম্যাড়্‌মেড়ে জব্‌জবে খস্‌খসে জ্যান্‌জলে। সামান্য কয়েকটা ব্যতিক্রম আছে, ‘জল্‌জলে’ ‘টুক্‌টুকে’ ; সংখ্যা বেশি নয়।

এবার দেখা যাক উআ’র বিকারে ‘ও’ প্রত্যয় : ঘেরো বেতো জোরো হলো টেকো ফ্রেকো গুংফো কুনো বুনো পেকো, কোতো (বাবু), রোখো খেলো ভেতো, খেগো (পোকায়)। এগুলোও স্থবিধের নয় ; হয় তুচ্ছ নয় পীড়াকর। ভাত যে খায় সে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু কাউকে যদি বলি ‘ভেতো’ তবে তাকে সম্মান করা হয় না। জীবমাত্রই ধাতুপদার্থ ব্যবহার করে, সেটা দোষের নয় ; কিন্তু কোনো-একটা ধাতুর সম্পর্কে কাউকে যদি বলা হয় ‘খেগো’ তা হলে বুঝতে হবে সেই বাস্তব সম্বন্ধে অবজ্ঞার কারণ আছে। বথান্থানে বথাপরিমাণে জল উপাদেয়, কিন্তু যাকে বলি ‘জোলো’ তার মূল্য বা স্বাদের সম্বন্ধে অপবাদ দেওয়া হয়।

মন্দহ বোঝাতে সংস্কৃতে হুঃ ব’লে একটা উপসর্গ আছে, হু’ও যোগ করা যায়। কিন্তু বাংলায় এই প্রত্যয়গুলোতে যে হুংসাবিধি অবমাননা আছে অন্য কোনো ভাষায় বোধ হয় তা পাওয়া যায় না।

এবার ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ের আলোচনা ক’রে প্রত্যয়ের পালা শেষ করা যাক।

খাপছাড়াভাবে সংস্কৃতের অনুসরণে নী ও দ্বী প্রত্যয়ের যোগে ত্রীলিঙ্গ বোঝাবার রীতি বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকেও মেনে চলবার অভ্যাস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাঘ্রের ত্রী ‘ব্যাঘ্রী’, বাংলায় সে ‘বাঘিনী’। সংস্কৃতে ‘সিংহী’ই ত্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে ‘সিংহিনী’। আকারযুক্ত ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে, যেমন ‘লতা’ ; কিন্তু ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারীশ্রেণীর বলে সন্দেহ করি। বাংলাদেশের মেয়েদের ‘সবিতা’ নাম দেখে প্রায়ই আশঙ্কা হয় ‘পিতা’কে পাছে কেউ এই নিয়মে মাতা ব’লে গণ্য করে। মেয়েদের নামে ‘চন্দ্রমা’ শব্দেরও ব্যবহার দেখেছি, আর মনে পড়ছে কোনো দূর্বোগে ভগবান চন্দ্রমা স্বীকৃতবেশে বাঙালির ঘরেও দেখা দিয়েছেন, বাঙালির কাব্যেও অবতীর্ণ হয়েছেন।

এ দিকে ‘নীলিমা’ ‘তনিমা’ প্রভৃতি পুংলিঙ্গ শব্দ আকারের টানে মেয়েদের নামের সঙ্গে এক মালায় গাঁথা পড়ে। ‘নিভা’ নামক একটা ছিন্নমুণ্ড শব্দ ‘শরচ্ছিন্ননিভাননা’ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত হয়েছে বাঙালি মেয়েদের নামমালায় আকারের টিকিট দেখিয়ে।

স্ত্রীলিঙ্গের কোনো একটি বা একাধিক প্রত্যয় যদি নিবিশেষে বা বাঁধা নিয়মে ভাষায় ধাটত তা হলে একটা শৃঙ্খলা থাকত, কিন্তু সে স্বযোগ ঘটে নি। বাংলার ‘উট’ হয়তো ‘উটী’, কিন্তু ‘মোষ’ হয় না ‘মোষী’, এমন-কি ‘মোষিনী’ও না— কী হয় বলতে পারি নে, বোধ করি ‘মাদী মোষ’। ‘হাতি’ সম্বন্ধেও ঐ এক কথা, ‘নাতনী’ বলি কিন্তু ‘হাতিনী’ বলি নে। উট-হাতির চেয়ে কুকুর-বিড়াল পরিচিত জীব, ‘কুকুরী’ ‘বিড়ালী’ বললেই চলত, কিংবা ‘কুকুরনী’ ‘বিড়ালনী’। বলা হয় না। মাহুঘ সম্বন্ধেও কেমন একটা ইতস্তত আছে— ‘খোট্টানি’ ‘উড়েনি’ বলে থাকি, কিন্তু ‘পাণ্ডাবিনী’ ‘নিধিনী’ ‘মগিনী’ বলি নে; ‘মাদ্রাজিনী’ও তদ্রূপ; ‘বাঙালিনী’ বলি নে, ‘কাঙালিনী’ বলে থাকি।

আত্মীয়তা সম্বন্ধের নামগুলিতে স্ত্রী প্রত্যয়ের ছাপ আছে: দিদি মাসি পিসি জ্বালী শাশুড়ি ভাইঝি বোনঝি। ‘নন্দ’ শব্দে ইনী যোগ না করলেও তার প্রভাব সম্পূর্ণ থেকে যায়। জা জ্বালাজ প্রভৃতি শব্দে দীর্ঘ ঙ্গে আকারের সমাগম নেই।

জাতঘটিত ব্যবসায়টিত নামে নী ইনী যথেষ্ট চলে: বামনী কায়েতনী। অন্য জাত সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ‘বন্ধিনী’ কখনো শুনি নি। ‘বাগ্‌দিনী’ চলে, ‘ডোমনী’ ‘হাড়িনী’ও শুনেছি, ‘শাওতালনী’ বললে খটকা লাগে না। পুরুতনী ধোবানী নাপতিনী কামারনী কুমোরনী তাঁতিনী: সর্বদাই ব্যবহার হয়। অথচ শেলাই ব্যবসা ধরলেও মেয়েরা ‘দক্ষিনী’ উপাধি পাবে কি না সন্দেহ। বা হোক মোটের উপর বাংলার স্ত্রীলিঙ্গে নী ইনী প্রত্যয়টারই চল বেশি।

একটা বিষয়ে বাংলাকে বাহাদুরি দিতে হবে। যুরোপীয় অনেক ভাষায়, তা ছাড়া হিন্দি হিন্দুস্থানি গুজরাটি মারাঠিতে, কাল্পনিক বেদ্যালে বা স্বরবর্ণের বিশেষত্ব নিয়ে লিঙ্গভেদপ্রথা চলেছে। ভাষায় এই অসংগত ব্যবহার বিদেশীদের পক্ষে বিষম সংকটের। বাংলা এ সম্বন্ধে বাস্তবকে মানে। বাংলার কোনোদিন ঘুড়ি উড়ীয়ায়ানা হবে না, কিংবা বিজ্ঞাপনে নির্মলা চিনির পাকে সুমধুরা রসগোল্লার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করবে না। কিংবা লুক্কায় কাছে দাক্ষণ্য বাধাধরায় বয়স্কশীতলা জলপটির প্রয়োগ-সম্ভাবনা নেই।

এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সংকুত ভাষায় নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্তর্জ দীর্ঘ ঙ্গে আকার বা ন’এ দীর্ঘ ঙ্গে আকার মানবার যোগ্য নয়। খাটি

বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভিযোগের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদমূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এই-সকল খেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ইকারকে মানব। ‘ইংরেজি’ বা ‘মুসলমানি’ শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচ হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। শুটাকে ইন্-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমानी লেখক ‘মুসলমানিনী’ কায়দা বা ‘ইংরেজিনী’ রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা থেকে যায়।

১৪

বাংলা বিশেষ্যপদে বহুবচনের প্রভাব অল্পই। অধিকাংশ স্থলেই ‘সব’ ‘গুলি’ ‘সকল’ প্রকৃতি শব্দ জোড়া দিয়ে কাজ চালানো হয়। এ ভাষায় সর্বনাম শব্দে বহুবচনের বিভক্তি যতটা চলে অল্প ততটা নয়। বহুবচনে ‘মামুষরা’ বলে থাকি অথচ ‘ঘোড়ারা’ বলতে কানে ঠেকে, অথচ ‘ঘোড়াদের’ বলা চলে। মোটের উপর এ কথা খাটে যে সচেতন জীবদের নিয়ে বহুবচনে রা এবং সম্বন্ধে ও কর্মকারকে দেয় চিহ্ন ব্যবহার হয়ে থাকে। ‘মোষেরা খুব বলবান জীব’ বা ‘নয়ূরদের পুচ্ছ লম্বা’ এটা নিয়মবিরুদ্ধ নয়। এই রা চিহ্ন সাধারণ বিশেষ্যে লাগে। বিশেষ বিশেষ্যে ওর প্রয়োগ কানে বাধে। বলতে পারি ‘ঐ মোষরা পাঁকে ডুবে আছে’, কিন্তু ‘ঐ মোষগুলো পাঁকে ডুবে আছে’ বললেই মানানসই হয়। ‘মোষরা’ বললে মোষজাতিকে মনে আসে, ‘মোষগুলো’ বললে মনে আসে বিশেষ মোষের দল।

‘মামুষরা নিষ্ঠুরতার পশুকে হার মানালো’ ঠিক শোনায, এও ঠিক শোনায : কুলিগুলো নির্দয়ভাবে গাড়িতে বোঝা চাপিয়েছে। কিন্তু ‘মামুষগুলো পশুকে হার মানায়’ অশুদ্ধ। সাধারণ বিশেষ্যে রা চলে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ্যে গুলো। ‘মামুষরা ওখানে জটলা করছে’ বললে মনে হয় যেন জানানো হচ্ছে অল্প কোনো জীব করে নি। এখানে ‘মামুষগুলো’ বললেই সংশয় থাকে না।

‘টেবিলরা’ ‘চৌকিরা’ নিষিদ্ধ। অল্পপদার্থের ‘গুলো’ ছাড়া গতি নেই। আর-একটা শব্দ আছে, কথার পূর্বে বসে সমষ্টি বোঝায়, যেমন ‘সব’ : সব চৌকি, সব ছদ্ম, সব মামুষ। কিন্তু এখানে এই শব্দ কেবলমাত্র বহুবচন বোঝায় না, সম্বন্ধে সম্বন্ধে

একটা ঝোক দেয়। সব চৌকি সরিয়ে দাও, অর্থাৎ একটাও বাকি রেখো না। সব ভিখিরিই বাঙালি, অর্থাৎ নির্বিশেষে বাঙালি। 'সব' প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে 'গুলো' প্রয়োগটা যোগ দিতে চায়, যেমন : সব চৌকিগুলোই ভাঙা, সব ভিখিরিগুলোই চোঁচাচ্ছে। এখানে 'সব' বোঝাচ্ছে একান্ততা, আর 'গুলো' বোঝাচ্ছে বহুবচন। বহুবচনে এক সময়ে 'সব' ব্যবহৃত হত। কবিতায় এখনো দেখা যায়, যেমন : পাখিসব তোমাসব ইত্যাদি। আমরা বলি : কাকিরা সব কালো। বহুবচনের রা বিভক্তির সঙ্গে জোড়া লাগে 'সব' শব্দ : এরা সব গেল কোথায়। শুধু 'এরা গেল কোথায়' বললেই চলে, কিন্তু 'সব' শব্দের দ্বারা সমষ্টির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই 'সব' শব্দ একবচনকে বহুবচন করে না, বহুবচনকে স্থনির্দিষ্ট করে। 'সবাই' শব্দে আরও বেশি জোর লাগে : এরা যে সবাই চলে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সবাইকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। 'সব' শব্দের সমার্থক হচ্ছে 'সকল' : এরা সকলেই চলে গেছে, কিংবা, চৌধুরীদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু 'সকল' শব্দের প্রয়োগ 'সব' শব্দের চেয়ে সংকীর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ভাষার একটা বিশেষ ভঙ্গীর কথা বলি। 'সব' শব্দের অর্থে কোনো দৃশ্যীয়তা নেই, 'যত' সর্বনাম শব্দটাও নিরীহ। কিন্তু ছোটোকে এক করলে সেই জুড়িশব্দটা হয়ে ওঠে নিন্দার বাহন। 'মূর্থ' 'কুঁড়ে' কিংবা 'লক্ষীছাড়া' প্রভৃতি কট্টবাদ বিশেষণ ঐ 'যত সব' শব্দটাকে বাহন ক'রে ভাষায় যেন মূগ সিটুকোতে আসে, যথা : যত সব বাদর, কিংবা কুঁড়ে, কিংবা লক্ষীছাড়া। এখানে বলা উচিত ঐ 'যত' শব্দটার মধ্যেই আছে বিষ। 'যত বাদর এক জায়গায় জুটেছে' বললেই যথেষ্ট অকথ্য বলা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়টা এই যে, 'যত' শব্দটা একটা অসম্পূর্ণ সর্বনাম, 'তত' দিয়ে তবে এর সম্পূর্ণতা। 'তত' বাদ দিলে 'যত' হয়ে পড়ে বেকার, লেগে যায় অনর্থক গালমন্দর কাজে।

বাংলা ভাষায় সর্বনামের খুব ঘটা। নানা প্রণীত সর্বনাম, যথা ব্যক্তিবাচক, স্থানবাচক, কালবাচক, পরিমাণবাচক, তুলনাবাচক, প্রভৃতিবাচক।

'মুই' এক কালে উত্তমপুরুষ সর্বনামের সাধারণ ব্যবহারে প্রচলিত ছিল, প্রাচীন কাব্যগ্রন্থে তা দেখতে পাই। 'আমহি' ক্রমশ 'আমি' রূপ ধরে ওকে করলে কোণঠেসা, ও রইল গ্রাম্য ভাষার আড়ালে। সেকালের সাহিত্যে ওকে দেখা গেছে দীনতাপ্রকাশের কাজে, যেমন : মুঞি অতি অভাগিনী।

নিজের প্রতি অবজ্ঞা স্বাভাবিক নয় তাই ওকে সংকোচে সরে দাঁড়াতে হল। কিন্তু মধ্যমপুরুষের যেলায় যথাস্থানে কুঠার কোনো কারণ নেই, তাই 'তুই' শব্দে বাধা ঘটে নি;

নীচের যেভাবে ও রয়ে গেল। ‘তুমি’ ‘তুমি’-রূপে ভর্তি হয়েছে উপরের কোঠায়। এরও গৌরবার্থ অনেকখানি করে গেল, বোধকরি নির্বিচার সৌজন্দের আতিশয্যে। তাই উপরওয়ালাদের অন্তে আরও একটা শব্দের আমদানি করতে হয়েছে, ‘আপনি’ থেকে ‘আপনি’। আইনমতে মধ্যমপুরুষের আসন ওর নয়, ওর অল্পবর্তী ক্রিয়াপদের রূপ দেখলেই তার প্রমাণ হয়। ‘তুমি’র বেলার ‘আছ’; ‘আপনি’র বেলার ‘আছেন’, এই শব্দটি যদি খাটি মধ্যমপুরুষ-জাতীয় হত তা হলে ওর অল্পচর ক্রিয়াপদ হতে পারত ‘আপনি আছ’ কিংবা ‘আছি’।

‘আপনি’ শব্দের মূল হচ্ছে সংস্কৃত ‘আত্মন’। বাংলার প্রথমপুরুষেও ‘স্বয়ং’ অর্থে এর ব্যবহার আছে, যেমন : সে আপনিই আপনার প্রভু। আত্মীয়কে বলা হয় ‘আপন লোক’। হিন্দিতে সম্মানসূচক অর্থে প্রথমপুরুষ মধ্যমপুরুষ উভয়তাই ‘আপ’ ব্যবহৃত হয়।

বাংলা ভাষায় উত্তমপুরুষে ‘আম’-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার চলে, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। তার তিনরকম রূপ প্রচলিত : করলাম, করলুম, করলেম। ‘করলাম’ নদিয়া হতে শুরু করে বাংলার পূর্বে ও উত্তরে চলে থাকে। এর প্রাচীন রূপ দেখেছি : আইলাঙ কইলাঙ। আমরা দক্ষিণী বাঙালি, আমাদের অভ্যাস ‘করলুম’ ও ‘করলেম’। উত্তমপুরুষের ক্রিয়াপদে সাহুনাসিক উকার পক্ষে এখনো চলে, যেমন : হেরিছু করিছু। কলকাতার অপভাষায় ‘করছু’ ‘খেছু’ ব্যবহার শোনা যায়। ক্রিয়াপদে এই সাহুনাসিক উ প্রাচীন সাহিত্যে যথেষ্ট পাই : কেন গেলুঁ কালিন্দীর কূলে, ছুকূলে দিলুঁ দুধ, মলুঁ মলুঁ সই। ‘করলেম’ শব্দের আলোচনা পরে করা যাবে। কৃত্তিবাসের পুরাতন রামায়ণে দেখেছি ‘রাখিলোম প্রাণ’। তেমনি পাওয়া যায় ‘তুমি’র জায়গায় ‘তোমি’। বাংলা ভাষায় উকারে ওকারে দেনাপাওনা চলে এ তার প্রমাণ।

প্রথমপুরুষের মহলে আছে ‘সে’ আর ‘তিনি’। রামমোহন রায়ের সময়ে দেখা যায় ‘তিনি’ শব্দের সাধুভাষার প্রয়োগ ‘তৌহ’। মেয়েদের মুখে ‘ভেনার’ ‘ভেনবা’ আজও শোনা যায়, ওটা ‘তৌহ’ শব্দের কাছাকাছি। প্রাচীন রামায়ণে ‘তীর’ ‘তীহার’ শব্দ নেই বললেই হয়, তার বদলে আছে ‘তান’ ‘তাহান’। ন’কারের অসহুনাসিকটা বহুবচনের রূপ। তাই সম্ভানের চর্যাবিশ্বুতিলকধারী বহুবচনরূপী ‘তৌহ’ ও ‘তিঁহো’ (পুরাতন সাহিত্যে) হয়েছে ‘তিনি’। গৌরবে তার রূপ বহুবচনের বটে, কিন্তু ব্যবহার একবচনের। তাই পুনর্বীর বহুবচনের আশঙ্কে রা বিভক্তি জুড়ে ‘তীহা’ শব্দের রাস্তা দিয়ে ‘তীহার’ শব্দ সাজানো হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে যে ক্রিয়াপদটি তার দখলে তাতে আছে প্রাচীন ন’কারাক্ত বহুবচনরূপ, যেমন ‘আছেন’। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পরবর্তী

বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদে বহুবচনের চিহ্ন থাকলেও তার অর্থ হয়েছে লোপ। সংস্কৃতে বহুবচনে 'পতন্তি' শব্দ আছে প্রথমপুরুষের পতন বোঝাতে। বাংলায় সেই অঙ্কি'র ন রয়েছে 'পড়েন' শব্দে, কিন্তু এ ভাষায় 'তিনি'ও পড়েন 'তারা'ও পড়েন। এই ন'কার-ধারী ক্রিয়াপদ কেবল 'আপনি' আর 'আপনারা', 'তিনি' ও 'তারা', এদের সম্বন্ধে রক্ষার কাজেই নিযুক্ত। প্রাচীন রামায়ণে এইরূপ স্থানে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায় 'পড়েন্ত' 'দেখিলেন্ত' প্রভৃতি স্ব-বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ একবচনে এবং বহুবচনে, প্রথমপুরুষে।

সম্ভবতীত কালের প্রথমপুরুষ ক্রিয়াপদে বিকল্পে ইল এবং ইলে প্রয়োগ হয়, যেমন : সে ফল পাড়ল, সে ফল পাড়লে। এই একার প্রয়োগ প্রাচীন পদ্যাবলীতে দৈবাৎ দেখেছি, যথা : বিঁধিলে বাণ। কিন্তু অনেক দেখা গেছে ময়নামতীর গানে, যেমন : বিকল দেখি হাড়িপা রহিলে। এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, অচেতনবাচক শব্দের ক্রিয়াপদে 'এ' লাগে না। অসমাপিকাতে লাগে, যেমন : পা ফুললে ডাক্তার ডেকো। 'তার পা ফুলল' হয়, 'পা ফুললে' হয় না। নির্বন্ধক শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা : তাঁর কলকাতায় যাওয়া ঘটল না। 'ঘটলে না' হতে পারে না। এ ছাড়া নিম্নলিখিত কয়েকটি ক্রিয়াপদে 'এ' খাটে না : এল গেল হল, প'ল (পড়ল), ম'ল (মরল)। দুই অক্ষরের ক্রিয়াপদমাঝে এই ব্যতিক্রম হয় এমন যেন মনে করা না হয়। তার প্রমাণ : খেল নিল দিল শুল ধুল। ইতে-প্রত্যয়যুক্ত জোড়া ক্রিয়াপদে 'এ' লাগে না, যেমন : করতে থাকল, হাসতে লাগল। কিন্তু ইয়া-প্রত্যয়যুক্ত জোড়া ক্রিয়াপদে লাগে, যেমন : সে হেসে ফেললে। এ ছাড়া আরও দুই-এক জায়গায় কানে সন্ধেহ ঠেকে, যেমন 'ভোর বেলায় সে মরলে' বলি নে, 'মরল'ই ঠিক শোনায়। কিন্তু 'তিনি মরলেন' নিতাব্যবহৃত। 'কলকাতায় সে চললে' বলি নে, কিন্তু 'তিনি চললেন' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

প্রাচীন রামায়ণে দেখা গেছে প্রথমপুরুষের সম্ভবতীত ক্রিয়াপদে প্রায় সর্বত্রই ক-প্রত্যয়-সম্ভেদ একার, যেমন : দিলেক লইলেক। আবার একারের সম্পর্ক নেই এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে, যেমন : চলিল সঙ্গর, পাঠাইল সুরিত। আধুনিক বাংলায় এইরূপ ক্রিয়াপদে কোথাও 'এ' লাগে কোথাও লাগে না, কিন্তু অস্বস্থিত ক-প্রত্যয়টা থসে গেছে।

প্রথমপুরুষ ইল-প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়াপদে এই-যে একার প্রয়োগ, এরই সঙ্গে সম্ভবত 'করলেন' 'চললেন' শব্দের একার-উচ্চারণের যোগ আছে। করলেন (করিল তিনি), আর, করলেন (করিল আমি) : এক নিয়মে পাশাপাশি বসতে পারে। আরও একটা কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে, সে হচ্ছে স্বরবিকায়েব নিয়ম। ই'র পর আ থাকলে

দুইয়ে যিলে 'এ' হয় তার অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন 'দৈশান' থেকে 'দৈশেন', 'বিলান্ত' থেকে 'বিলেত', 'নিশান' থেকে 'নিশেন'।

এক কালে 'মুই' ভদ্র সমাজে ত্যাক্স ছিল না। প্রাচীন রামায়ণে পাওয়া যায় 'মুঞি নরপতি'। কর্মকারকে 'মোকে', কোথাও বা 'মোখে'। বহুবচনে 'মোরা'। আজ 'মোরা' রয়ে গেছে কাব্যলোকে। কবির কলমে 'আমরা' শব্দের চেয়ে 'মোরা' শব্দের চলন বেশি। প্রাচীন বাংলার 'আমরা' 'তোমরা'র পরিবর্তে 'আমিসব' 'তুমিসব' শব্দের ব্যবহার প্রায়ই দেখা গেছে।

আমি তুমি আপনি তিনি : ব্যক্তিবাচক সর্বনাম, মানুষ সব্বদেই খাটে। 'সে' কেবলমাত্র মানুষ নয় জন্তু সব্বদেই খাটে, যেমন : কুকুরটাকে যারতেই সে চেষ্টা করে উঠল। 'সে' থেকে বিশেষণ শব্দ হয়েছে 'সেই'। এর প্রয়োগ সর্বত্রই : সেই মানুষ, সেই গাছ, সেই গোক। 'এ' থেকে হয়েছে 'এই'। 'এ' বোঝায় কাছের বর্তমান পদার্থকে, 'সে' বোঝায় অদূরতমানকে। সম্মানার্থে 'এ' থেকে হয়েছে 'ইনি'।

বাংলা ভাষার একটা বিশেষত্ব এই যে, সর্বনামে লিঙ্গভেদ নেই। ইংরেজিতে প্রথম পুরুষে he পুংলিঙ্গ, she স্ত্রীলিঙ্গ, it ক্লীবলিঙ্গ। ইংরেজিতে যদি বলতে হয়, সে প'ড়ে গেছে, তবে সেই প্রসঙ্গে he she বা it বলাই চাই। বাংলার ক্লীবলিঙ্গের নির্দেশ আছে, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের নেই। সে এ ও তিনি ইনি উনি : স্ত্রীও হয়, পুরুষও হয়। ক্লীবলিঙ্গে 'সে' 'এ' 'ও' শব্দে নির্দেশক চিহ্ন যোগ করা চাই, যেমন : সেটা ওটা সেখানা ওখানা। বাংলা কাব্যে এই প্রথমপুরুষ সর্বনামে যখন ইচ্ছাপূর্বক লিঙ্গ নির্দেশ করা হয় না তখন তার ইংরেজি ভাষায় অসম্ভব হয়। 'যে' সর্বনাম পদের সঙ্গে কোনো না কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য বা ব্যক্তি রূপে থাকেই। 'যে গান গাচ্ছে' বলতে বোঝায়, যে মানুষ। অন্তর্ভুক্ত : যে ঘড়ি চলছে না, যে বাড়ি ভাঙা দেখা হয়েছে।

'যেই' শব্দের একটি প্রয়োগ আছে, তাতে 'মুহূর্তে' বা 'ক্ষণে' উদ্দেশ্য থাকে, যথা : যেই এল অমনি চলে গেল, যেই দেখা সেই আর মুখে কথা নেই। এখানে 'যেই আর সেই' শব্দের পিছনে উদ্দেশ্য আছে 'ক্ষণে'। অন্তর্ভুক্ত 'যেই' বা 'সেই' শব্দের প্রয়োগে উদ্দেশ্য থাকে 'মানুষ', যেমন : যেই আসুক সেই যার থাকে। 'যাই' শব্দের সঙ্গে উদ্দেশ্য থাকে দুটি বিশেষণের জন্ত, যেমন : সে যাই বলুক। অর্থাৎ, এটাই বলুক বা ওটাই বলুক, ভালোই বলুক বা মন্দাই বলুক। আর-এক প্রকার প্রয়োগ আছে 'যেই কথা সেই কাজ', অর্থাৎ কাজে কথার প্রভেদ নেই—এখানে ই প্রত্যয় নিষ্করতা অর্থে কোঁক দেবার জন্তে।

'যে' অসম্পূর্ণার্থক সর্বনাম বিশেষণ, যানবার্থে তার পূরণ হয় 'ও' এবং 'সে' দিয়ে। অন্তর্ভুক্ত বা বস্তুর সব্বদে যখন তার প্রয়োগ হয় তখন সেই বস্তু বা জীবের নাম তার

সঙ্গে জুড়তে হয়, যেমন : যে পুকুর, যে ঘটি, যে বেড়াল। নির্বাক্তক শব্দেও সেই নিয়ম, যেমন : যে শ্রেহ শিশুর অনিষ্ট করে সে শ্রেহ নিষ্ঠুরতা।

কখনো কখনো বাক্যকে অসম্পূর্ণ রেখে 'যে' শব্দের ব্যবহার হয়, যেমন : যে তোমার বুদ্ধি। বাকিটুকু উহ্য আছে বলেই এর দংশনের জোর বেশি। বাংলা ভাষায় এইরকম খোঁচা-দেওয়া বাক্য ভঙ্গীর আরও অনেক দৃষ্টান্ত পরে পাওয়া যাবে।

মাহুষ ছাড়া আর কিছুকে কিংবা সমূহকে বোঝাতে গেলে 'যে' ছেড়ে 'যা' ধরতে হবে, যেমন : যা নেই ভারতে (মহাভারতে) তা নেই ভারতে। কিন্তু 'যারা' শব্দ 'যা' শব্দের বহুবচন নয়, 'যে' শব্দেরই বহুবচন, তাই ওর প্রয়োগ মানবার্থে। 'তা' বোঝায় অচেতনকে, কিন্তু 'তারা' বোঝায় মাহুষকে। 'সে' শব্দের বহুবচন 'তারা'।

শব্দকে ছনো করে দেবার যে ব্যবহার বাংলায় আছে, 'কে' এবং 'যে' সর্বনাম শব্দে তার দৃষ্টান্ত দেখানো যাক : কে কে এল, যে যে এসেছে। এর পূরণার্থে 'সে সে লোক' না বলে বলা হয় 'তারা' কিংবা 'সেই সেই লোক'। 'যেই যেই লোক'এর ব্যবহার নেই। সম্বন্ধপদে 'যার যার' 'তার তার' মানবার্থে চলে। এইরকম বৈতে বহুকে এক এক ক'রে দেখবার ভাব আছে। ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকে নির্দেশ ক'রে 'ভূমি ভূমি' 'তোমার তোমার' বললে দোষ ছিল না, কিন্তু বলা হয় না।

যে বাক্যের প্রথম অংশে বৈতে আছে 'যে' তার পূরণার্থক শেষ অংশে সমগ্রবাচক বহুবচন-ব্যবহারটাই নিয়ম, যেমন : যে যে লোক, বা যারা যারা এসেছেন তাঁদের পান দিয়ে।

যত এত তত অত কত শব্দ পরিমাণবাচক। এদের মধ্যে 'তত' শব্দ ছাড়া আর সবগুলিতে বিঘ্ন চলে।

এখন তখন যখন কখন কালবাচক। 'কখন' শব্দ প্রায়ই প্রস্তুতক, সাধারণভাবে 'কখন' বলতে অনিশ্চিত বা দূরবর্তী সময় বোঝায় : কখন যে গেছে। কিন্তু 'কখনো' প্রস্তুতক হয় না। প্রশ্নের ভাবে যখন বলি 'সে কখনো এ কাজ করে' তখন 'কি' অব্যয়-শব্দ উহ্য থাকে। ঈর্ষে 'কখনো' শব্দের অর্থ 'যাবে যাবে'। 'কখনোই' একটা 'না' চায় : কখনোই হবে না।

'কখন' শব্দের 'কী খেনে' -ভঙ্গীওয়াল। রূপ কাব্যসাহিত্যে পাওয়া যায়।

'কত' শব্দের অর্থও 'কখনো'। এখন দৈবাৎ পড়ে ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগে না। ওর জুড়ি ছিল 'তবু' শব্দটা, কিন্তু ওর সময়বাচক অর্থটা নেই। 'তবু' শব্দের দ্বারা এমন কোনো সম্ভাবনা বোঝায় যেটা ঠিক উপযুক্ত বা আকাঙ্ক্ষিত নয় : যদিও রৌদ্র প্রখর তবু সে ছাতা মাথায় দেয় না, আমি তো বারণ করেছি তবু যদি যায়

দুঃখ পাবে। কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণে বহুবচন বা কর্মকারক নেই। সম্বন্ধপদে : এখনকার তখনকার কখনকার, কোন্ সময়কার, কোন্ সময়টার। অধিকরণে : কোন্ সময়ে, যে সময়ে। পক্ষে ‘কোন্ ধনে’, গ্রাম্য ভাষায় ‘কী খেনে’ এবং অধিকাংশ স্থলেই শুভ অশুভ লক্ষণ-সূচনায় এর প্রয়োগ হয়। অপাদান : যখন থেকে, কোন্ সময় থেকে।

কালবাচক ক্রিয়াবিশেষণ আরও একটা বাকি আছে ‘কবে’। ওর দুটি জুড়ি ছিল : এবে যবে। তারা পক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। ‘তবে’ একদা ওদেরই দলে ছিল, কিন্তু এখন ‘তবু’ শব্দের মতো সেও অর্থ বদলিয়েছে। একটা সম্ভাবনার সঙ্গে আর-একটা সম্ভাবনাকে সে জোড়ে, যেমন : যদি যাও তবে বিপদে পড়বে। তবে এক কাজ করো : ‘তবে’ শব্দের পূর্ববর্তী উচ্চ ব্যাপারের প্রসঙ্গে কোনো কাজ করার পরামর্শ।

এই প্রসঙ্গে ‘সবে’ শব্দটার উল্লেখ করা যেতে পারে। বলে থাকি : সবে এইমাত্র চলে গেছে, সবে পাঁচটা বেজেছে। এখানে ‘সবে’ অব্যয়, শুভে মাত্রা বোঝায়, সকল ক্ষেত্রেই পরিমাণের সীমা বোঝাতে তার প্রয়োগ : সবে পাঁচজন। সবে ভোর হয়েছে : অর্থাৎ সময়ের মাত্রা ভোরে এসে পৌঁচেছে। সেইরকম : সবে এক পোওয়া দুধ।

যেমন তেমন অমন এমন কেমন তুলনাবাচক। ‘কেমনে’ শব্দের ব্যবহার পক্ষে করণকারকে। ‘কেমন’ শব্দের সৈতে সন্দেহ বোঝায় : কেমন কেমন ঠেকছে। গা কেমন কেমন করছে : একটা অনির্দিষ্ট অসুস্থ ভাব। ‘কেমন’ শব্দের সঙ্গে ‘যেন’-যোগে সংশয় ঘনীভূত হয়, আর সে সংশয়টা অপ্রিয়। লোকটাকে কেমন যেন ঠেকছে : অর্থাৎ ভালো ঠেকছে না। ভকীওয়াল ‘কেমন’ শব্দটা আছে খোঁচা দেবার কাজে : কেমন জল, কেমন মায় মেরেছে, কেমন জুতো, কেমন ঠকানটাই ঠকিয়েছে।

অধিকরণের বাহনরূপে ‘এমনি’ শব্দের ব্যবহার আছে : এমনিতেই জামগা পাই নে। খোঁচা দেবার ভঙ্গিতেও এই শব্দটার যোগ্যতা আছে : এমনিই কী যোগ্যতা।

‘অত’ শব্দ তার জুড়ি হারালে টিঁটকারির কাজে লাগে সে কথা পূর্বেই বলেছি। ‘অত’ কথাটারও ভীতুতা আছে, যেমন : অত চালাকি কেন, অত বাবুগিরি তোমাকে মানায় না, অত ভালোমাসুখি করতে হবে না।

এজাতীয় আরও দুটো আছে, যথা ‘যে’ এবং ‘যেমন’। ‘সে’ এবং ‘তেমন’এর সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ ঘটানো যায় তবে মুখ বাকানোর ভঙ্গী আনে, যথা : যে মধুর বাক্য তোমার। ‘তেমন’এর সঙ্গ-বর্জিত ‘যেমন’ শব্দটাও বদমেজাজি : যেমন তোমার মুখি।

এই ধরণেরই আর-একটা দুটো মনে পড়ে : কোথাকার মাসুখ হে। এ বাক্যটার চেহারা প্রায়েরই মতো, কিন্তু উক্তরের অপেক্ষা রাখে না। এতে যে সংবাদ

উহু আছে সে নিবাসঘটিত নয়, সে হচ্ছে লোকটার ধৃষ্টতার বা মূর্খতার পরিচয় নিয়ে। কোথাকার সাধুপুরুষ এসে জুটল : লোকটার সাধুতা নিয়ে বিশ্বয় প্রকাশ হচ্ছে না।

‘যেমতি’ ‘ডেমতি’ পড়ে আশ্রয় নিয়েছে। ‘সেইমতো’ ‘এইমতো’ এখনো টিকি আছে। কিন্তু ‘এর মতো’ ‘তার মতো’র ব্যবহারটাই বেশি। করণকারকে মনে গেছে ‘কোনোমতো’। অথচ ‘কোনোমতো’ বা ‘কোনুমতো’ শব্দটা নেই।

‘কেন’ শব্দটা সর্বনাম। এর অর্থ প্রশ্নবাচক, এর রূপটা করণকারকের। ঘটনা ঘটল কেন : অর্থাৎ ঘটল কী কারণের দ্বারা। ‘কেনে বা’ প্রাচীন কাব্যোপ পড়েছি, গ্রাম্য লোকের মুখেও শোনা যায়।

কেন, কেন বা, কেনই বা। ‘লোকটা কেন কাঁদছে’ এ একটা সাধারণ প্রশ্ন। ‘কেন বা কাঁদছে’ বললে কান্নাটা যে ব্যর্থ বা অবোধা সেইটে বলা হল। কেন বা এলে বিদেশে : অর্থাৎ বিদেশে আসাটা নিফল। কেনই বা মরতে এখানে এলুম : এ হল পরিতাপের দিক্কার। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই প্রয়োগগুলির সবগুলোই অপ্রিয়তাব্যঞ্জক। কেন তিনি তিক্তি পড়ছেন তা নিজেরই জানেন না : এ সহজ কথা। যেই বলা হল ‘কেনই বা তিনি তিক্তি পড়তে দলেন’ অমনি বোঝা যায়, কাজটা স্বেচ্ছায় মতো হয় নি।

‘কেন’ শব্দের এক বর্গের শব্দ ‘যেন’ ‘হেন’। ‘যেন’ সাদৃশ্য বোঝাতে। ‘হেন’ শব্দের প্রয়োগ বিশেষণে, যথা : হেন রূপ দেখি নাই কহু, হেন কাজ নেই যা সে করতে পারে না, সে-হেন লোকও ভেড়ে এল। হেন কাজ = এমন কাজ। সে-হেন = তার মতো।

‘যেন’ শব্দটাতে বিক্রপের ভঙ্গী লাগানো চলে : যেন নবাব খাঞ্চে খা, যেন আফ্রাদে পুতুল, যেন কাতিকটি, যেন ডানাকাটা পরী। বাংলায় বিক্রপের ভঙ্গীরীতি অত্যন্ত স্থলভ।

‘তেন’ শব্দের ব্যবহার লোপ পেয়েছে। ‘হেন’ শব্দের অর্থ ‘মতো’ কিংবা ‘এই-মতো’। এর সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় ‘তেন’ শব্দের অর্থ ‘সেইমতো’। ‘হেন-তেন’ জোড়া শব্দ এখনো চলিত আছে। হেন-তেন কত কী ব’কে গেল : অর্থাৎ, ব’কল কখনো এরকম কখনো সেরকম, অসংলগ্ন বহুনি। প্রাচীন বাংলায় দেখেছি ‘যেন কস্তা তেন বর’। এখানে ‘যেন’ শব্দের ‘যে-হেন’ অর্থ।

‘যেন’ শব্দটা ‘হেন’ শব্দের জুড়ি। পদ্যাবলীতে পাওয়া গেছে, ‘যেহু’ (যে-হেন)। বোঝা যায় এই ‘হেন’ শব্দের যোগেই ‘যেন’ শব্দ চোঁহারা পেয়েছে। আধুনিক বাংলায় ‘যেন’ শব্দটা তুলনা-উপমার কাজেই লাগে, কিন্তু পুরাতন বাংলায় তার অর্থের বিকৃতি

হয় নি। তখন তার অর্থ ছিল 'যেনন' : যেন বায় তেন আইসে, যেন রাজা তেন দেশ।

'হেন' শব্দটা রয়ে গেছে ভাষার মহাদায়্য পক্ষে। কিন্তু 'সে' কিংবা 'এ' শব্দের যোগে এখনো চলে, যেনন : সে-হেন লোক। এই 'হেন' শব্দের যোগে ঐ 'সে' শব্দে অক্ষমতা বা অসম্মানের আভাস দেয়। যেনন : সে-হেন লোক দৌড় মারলে। 'হেন' শব্দের যোগে 'এ' শব্দে অসামান্যতা বোকার, যেনন : এ-হেন লোক দেখা দায় না, এ-হেন দুর্দশাতেও মাহুষ পড়ে।

'কেন'র সঙ্গে 'যে' যোগ করলে পরিতাপ বা ভৎসনার ভঙ্গী আসে, যেনন : কেন যে মরতে আসা, কেন যে এতগুলো পাস করলে। 'কী করতে' শব্দটারও ঐ-রকম ঝোক, অর্থাৎ তাতে আছে বার্ষতার কোভ।

শুধু 'কী' শব্দের মধ্যেও এই রকমের ভঙ্গী। এই কাজে ওর সঙ্গে যোগ দেয় ই অব্যয় : কী চেহারাই করেছে, কী কবিতাই লিখেছেন, কী সাধুগিরিই লিখেছ। ঐ 'কী'এর সঙ্গে 'বা' যোগ করলে ঝাঁজ আরও বাড়ে। 'কী বা'কে বাকিবে 'কীবে' করলে ভঙ্গীতে আরও বিকল্প পৌছয়। ই'র সহযোগিতা বাদ দিলে 'কী' বিশুদ্ধ বিষয় প্রকাশের কাজে লাগে : কী সুন্দর তার মুখ।

সম্মান খর্ব করবার বিশেষ প্রত্যয় বাংলা ভাষায় যথেষ্ট পাওয়া গেল, সর্বনামের প্রয়োগেও বক্রোক্তি দেখা গেছে। কিন্তু প্রজ্ঞা বা প্রশংসা-প্রকাশের প্রয়োজনে ভাষায় কেবল একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে 'আহা' অব্যয় শব্দটার যোগে, যেনন : আহা মানুষটি বড়ো ভালো। কল্পনা প্রকাশেও এর ব্যবহার আছে। অথচ 'আহামরি' শব্দের পরিণামটা ভালো হয় নি। গোড়ায় এর উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, এখন এ শব্দটার যে প্রকৃত স্বভাব সেইটাই গেছে বিপরীত হয়ে। এটা হয়েছে বিজ্ঞপের বাহন। এটাকে আরও একটু প্রশস্ত ক'রে হল 'আহা ম'রে যাই' ; এর ঝাঁজ আরও বেশি। পড়ে পড়ে বাংলায় এই বাক্য ভঙ্গীটা এসে পড়ে : ভা-রি তো পণ্ডিত, ম-স্ত নবাব। এদের কণ্ঠস্বর উৎসাহে দীর্ঘকৃত হয়ে গাল পাড়ে যথার্থ যানেটাকে ডিঙিয়ে। ইদারায় ভোদারায় বোকারায় ভাবাগজারায় শব্দগুলোর ব্যবহার চূড়ান্ত যুচতা প্রকাশের ক্ষমতা। কিন্তু 'স্ববুদ্ধিরায়' 'স্বপটুরায়' বলবার প্রয়োজনমাত্র ভাষা অহুভব করে না। সবচেয়ে অদ্ভুত এই যে 'রায়' শব্দের সঙ্গেই বস্ত বোকা বিশেষণের যোগ, 'বোকা লক্ষণ' বলতে কারও কচিই হয় না।

'কি' যেখানে অব্যয় সেখানে প্রশ্নের সংকেত। উহু বিশেষণের সহযোগে বিশেষণে ওর প্রয়োগ আছে। তুমি কী করছ : অর্থাৎ 'কী কাজ' করছ। আর-একটা প্রয়োগ বিষয়

বোঝাতে, যেমন : কী স্বন্দর । পূর্বেই বলেছি তীক্ষ্ণধার স্বরবর্ণ ই সঙ্গে না থাকলে এর সৌজন্য বজায় থাকে । বিশেষণ-প্রয়োগে ‘কী’, যথা : কী কাজে লাগবে জানি নে । ‘কী’ বিশেষণ শব্দে অচেতন বা নির্বাক বা অনির্দিষ্ট বোঝায় : ওর কী দশা হবে, কী হ’তে কী হল । বিকল্প বোঝাতে ওর প্রয়োগ আছে, যেমন : কী রাম কী শ্রাম কাউকেই বাম দেওয়া যায় না । ‘কোন্’ বিশেষণ জড় চেতন দুইয়েই লাগে ।

সর্বনামের কর্মকারকে সাধারণত কে বিভক্তি : আমাকে তোমাকে । ‘সে’র বেলায় ‘তাকে’ কিংবা ‘সেটিকে’ ‘সেটাকে’ ।

বাংলা সর্বনাম করণকারকে একটা বিভক্তির উপরে আর-একটি চিহ্ন জোড়া হয় । বিভক্তিটা সম্বন্ধপদের, যেমন ‘আমার’, ওতে জোড়া হয় ‘দ্বারা’ শব্দ : আমার দ্বারা । আর-একটা শব্দচিহ্ন আছে ‘দিয়ে’ । তার বেলায় মূলশব্দে লাগে কর্মকারকের বিভক্তি : আমাকে দিয়ে ।

‘কী’ শব্দের করণকারকের রূপ : কিসে, কিসে ক’রে, কী দিয়ে, কিসের দ্বারা । অধিকরণেরও রূপ ‘কিসে’, যথা : এ লেখাটা কিসে আছে । এ-সমস্তই একবচনের ও অজীববাচকের দৃষ্টান্ত, এরা বহুবচনে হবে : এগুলোকে দিয়ে, সেগুলোকে দিয়ে, কোন্‌গুলোকে দিয়ে । অসম্মানে মানুষের বেলা হয় ; নচেৎ হয় : এদের দিয়ে, তাদের দিয়ে, ওদের দিয়ে ।

সাধারণত বাংলায় বিশেষণপদের বহুবচনরূপ নেই । ওদের অধিকৃত বিশেষ্য শব্দগুলিতে বহুবচনের ব্যবস্থা করতে হয়, যথা : বুনো পশুদের, পিতলের ঘটিগুলোর । বলা বাহুল্য ‘ঘটিদের’ হয় না, ‘পশুদের’ হয় । রা এবং দেয় বিভক্তি জড়বাচক শব্দের অধিকারে নেই । তার পক্ষে গুলো শব্দই বৈধ । অথচ গুলো অপর পক্ষের ব্যবহারেও লাগে । কিন্তু পরিমাণবাচক ‘এত’ ‘তত’ ‘যত’ ‘কত’ বিশেষণের সঙ্গে বহুবচন-বিভক্তি গুলো যুক্ত হয় । তা ছাড়া ‘এ’ ‘সে’ ‘যে’ ‘ও’ ‘ঐ’ ‘সেই’ ‘কোন্’ শব্দের সঙ্গে বহুবচনে কর্তৃপদে গুলো ও কর্মকারকে বা সম্বন্ধে দেয় যোগ করা হয় ।

বাংলা সর্বনামশব্দ-প্রয়োগে একটা খটকার জায়গা আছে ।

‘আমাকে তোমাকে খাওয়াতে হবে’ এমন কথা শোনা যায় । কে কাকে খাওয়াবে তর্কটা পরিষ্কার হয় না । এমন স্থলে যিনি খাওয়াবার কর্তা তাঁকে সম্বন্ধ-আসনে বসালে কথাটা পাকা হয় । আর সেটা যদি ক্রিয়াপদের পূর্বেই থাকে তা হলে ঠিক মেটে । ‘আমাকে তোমার খাওয়াতে হবে’ শাকটা স্পষ্ট । গোল বাধে বহুবচনের বেলায় । কেননা বহুবচনের সম্বন্ধপদে দেয় আর কর্মকারকের দেয় একই চেহারায় । এর একমাত্র উপায় কে বিভক্তি দ্বারা কর্মকারকে নিঃসংশয় করা । ‘আমাদেরকে

তোমাদের খাওয়াতে হবে' বললে নিশ্চিন্ত মনে নিমন্ত্রণে যাওয়া যায়। সম্বন্ধকারকের চিহ্নে কর্মকারকের কাজ চালিয়ে নেওয়া ভাষার অমার্জনীয় টিলেমি।

১৫

বাংলার নির্দেশকপদরূপে প্রধানত ব্যবহৃত হয় : টি টা খানি খানা। ইংরেজিতে এর প্রতিরূপ the। ইংরেজিতে the বসে শব্দের পূর্বে, বাংলার নির্দেশক শব্দ বসে শব্দের পরে, বস্তুবাচক বা জীববাচক শব্দের অন্তর্ভুক্ত। বা বস্তু বা জীব-বাচক নয় স্থানবিশেষে তার সঙ্গেও যোগ হয়, যেমন : বেশি লজ্জাটা ভালো নয়, ওর হাসিটি বড়ো মিষ্টি। এখানে লজ্জা ও হাসিকে বস্তুর মতোই কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে।

এক দুই তিন শব্দ সংখ্যাবাচক। ওদের সঙ্গে প্রায় নিত্যযোগ টি ও টা'র। ইংরেজিতে এ দস্তুর নেই। বাংলার সংখ্যাবাচক শব্দ যখন সমাসে বাধা পড়ে তখন তাদের টি টা পড়ে থ'সে, যেমন : দশসের আটহাত পাঁচমিশলি। তা ছাড়া 'জন' শব্দের সংযোগে টি টা চলে না। 'একটি জন' বলি নে, অথচ 'একটি মানুষ' বলেই থাকি।

আরও কয়েকটি নির্দেশক শব্দ আছে, যেমন : টু টুক টুক গোছা গাছি। তেল জল ধুলো কাদা প্রভৃতি অনিদিষ্ট-আকার-বাচক শব্দে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার চলে না। 'একটা তেল' 'একটি ধুলো' বলি নে, কিন্তু 'একটু তেল' 'একটু ধুলো' বলেই থাকি। 'অনেকটা জল' 'অনেকটা ময়দা' বলে থাকি কিন্তু 'অনেকটি' মাটি বা ছুখ বলা চলে না। কেননা টা শব্দে ব্যাপকতা বোঝায়, টি শব্দে বোঝায় ঋণাত্মক।

টু টুক টুক : বস্তুভাষ্যচক। সজীব পদার্থে এর ব্যবহার নেই। ছোটো গাধার বাচ্চাকেও কেউ 'গাধাটুকু' বলবে না, পরিহাস ক'রে 'মাছটুকু' বলা চলে।

সকল লম্বা জিনিসের সঙ্গে 'গাছি' 'গাছা'র ব্যবহার : দড়িগাছা বেতগাছা হারগাছা। দুই-একটা ব্যতিক্রম থাকতে পারে, যেমন 'চুড়িগাছি'। লম্বায়-ছোটো জিনিসে চলে না ; 'গোঁফগাছি' কিছুতেই নয়। টুকু চলে ছোটো জিনিসে, কিন্তু গড়নওয়ালো জিনিসে নয়। 'চুনটুকু' হয়, 'পল্লটুকু' হয় না ; 'আংটিটুকু' হয় না, 'পল্লটুকু' হয়। সম্মাগাঠাকুরের 'মাগটুকু' প্রভৃতি অবজ্ঞাবাচক শব্দেও চলে : 'একটুকু' হয়, কিন্তু 'দুটুকু' 'তিনটুকু' হয় না। 'ঐটুকু' শব্দের সঙ্গে 'খানি' জোড়া যায়, 'খানা' যায় না ; 'একটুকখানি', কিন্তু 'একটুকখানা' নয়। জীববাচক শব্দে খাটে না ; 'একটুক জীব' নেই কোথাও।

আরও কয়েকটি নির্দেশক পদ আছে যা শব্দের পূর্বে বসে। তারা সর্বনাম আভেদর, যেমন : সেই এই ঐ।

বাংলা বিশেষ্যশব্দে সংকুত বিশেষ্যশব্দের অস্থায়ী বিসর্গ না থাকাতে কর্তৃকারকে চিহ্নের কোনো উৎপাত নেই। একেবারে নেই বলাও চলে না। কর্তৃপদে যাবে যাবে একারের সংকেত দেখা যায়, যেমন : পাগলে কী না বলে।

ভাষাবিজ্ঞানীরা এইরকম প্রয়োগকে তিৰ্ধকরূপ বলেন, এ যেন শব্দকে ত্যাগ করে দেওয়া। সব গোড়ীয় ভাষায় এই তিৰ্ধকরূপ পাওয়া যায়, যেমন : দেবে জনে ঘোড়ে। বাংলায় বলি : দেবে মানবে লেগেছে, পাঁচজনে বা বলে। ‘ঘোড়ে’ বাংলায় নেই, আছে ‘ঘোড়ায়’ : ঘোড়ায় লাগি মেরেছে।

এই তিৰ্ধকরূপের ভিতর দিয়েই কারকের বিভক্তিগুলো তৈরি হয়েছে, আর হয়েছে বহুবচনের রূপ, যেমন : মানুষে থেকে, মানুষেরা মানুষেতে মানুষেদের। তোমা আমা যাহা তাহা থেকে : তোমার আমার যাহার তাহার তোমাকে আমাকে ইত্যাদি।

এই তিৰ্ধকরূপের কর্তৃকারক এক সময়ে সাধারণ অর্থে ছিল : আপনে শিখায় প্রভু শচীর নন্দনে, লোই আপনে কর সেবা। প্রাচীন রামায়ণে দেখা যায় নামসংজ্ঞায় প্রায় সর্বত্রই এই তিৰ্ধকরূপ, যেমন : সুমিত্রায়ে কোণল্যায়ে ময়ূরায় লোমপাদে। এখন এর ব্যবহারে একটা বিশেষত্ব ঘটেছে। ‘বানরে কলা খায়’ বলে থাকি, ‘গোপালে সন্ধেশ খায়’ বলি নে। বাংলার কোনো কোনো অংশে তাও বলে শুনেছি। ময়মনসিংহগীতিকায় আছে : কোনো দোষে দোষী নয় আমার সোমামিজননে।

শ্রেণীবাচক কর্তৃপদে তিৰ্ধকরূপ দেখা যায়, অন্ততঃ যায় না। ‘বাঘে গোকটাকে খেয়েছে’ বললে বোঝায় : বাঘজাতীয় জন্তুতে গোককে খেয়েছে, ভালুকে খায় নি। যখন বলি ‘রামে মারলে মরব, রাবণে মারলেও মরব’, তখন ব্যক্তিগত রাম রাবণের কথা বলি নে ; তখন রামশ্রেণীয় আঘাতকারী ও রাবণশ্রেণীয় আঘাতকারীর কথা বলা হয়।

‘জন’ শব্দের তিৰ্ধকরূপ ‘জনা’। একো জনা একো রকমের : এই ‘জনা’ বিশেষ একজনের সম্বন্ধে নয়, জনগুলি এক-একটি শ্রেণীগত। ‘একহ’ শব্দ থেকে হয়েছে ‘একো’।

মনে রাখা দরকার, কর্তৃপদের এই তিৰ্ধকরূপ শুধু পদার্থে খাটে না। যখন বলি ‘মেঘে অঙ্ককার করেছে’ তখন বুঝতে হবে, ‘মেঘে’ করণকারক।

গোড়ীয় ভাষার প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, শব্দরূপে সম্বন্ধপদের চিহ্নই প্রাধান্য পেয়েছিল। অবশেষে প্রয়োজনমত তারই উপরে স্বতন্ত্র কারকের বিভক্তি যোগ করতে হয়েছে। তারই নিদর্শন পাই কর্তৃকারকে ‘তোমারে’ ‘শ্রীরামেরে’ প্রভৃতি শব্দে।

আধুনিক বাংলা পক্ষেও এই যে বিভক্তিরই প্রাধান্য। বাংলা রামায়ণ-মহাভারতে কর্মকারকে কে বিভক্তি অল্প। কবিকল্পে দেখা গেছে : খাণ্ডাব তোমাকে হে নবাং আশ্রয়সে। অশ্বত্থ : উজানী নগরকে বাসিবে যেন হিম। এরকম প্রয়োগ বেশি নেই।

বাংলা নির্বাক পদার্থ-বাচক শব্দের কর্মকারকে টা টি'র প্রয়োগবাহুল্য, যথা 'মৃত্যুভয় দূর করো', 'চকুলজ্জা ছাড়ো'। কিন্তু ওরই মধ্যে একটু বিশেষত্বের ঝোঁক দিবে বলা চলে : মৃত্যুভয়টা দূর করো, চকুলজ্জাটা ছাড়ো। 'মৃত্যুভয়টাকে দূর করো' বলতেও দোষ নেই।

যাহুয়ের বা জন্তু-জানোয়ারের বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন নিয়ে শৈথিল্য করা হয় নি : গোপাল যদি সন্দেশের যোগ্য হয় তা হলে গোপালকেই সন্দেশ দেওয়া যায়। কিন্তু যে বিশেষ্যপদ সাধারণবাচক তার বেলায় কর্মকারকের চিহ্ন কাজে লাগে না, যেমন : রাখাল গোক চরায়। 'গোককে' চরায় না। ময়রা সন্দেশ বানায়, 'সন্দেশকে' বানায় না।

বিপদ এই, একটা নিয়মের নাগাল যেই পাওয়া যায় অমনি জুটে যায় অনিয়মের দৃষ্টান্ত, যথা : যে গাড়োয়ান গোককে পীড়ন করে সে তো কশাইয়েরই খুড়তুতো ভাই। এখানে গোক যদিও সাধারণ বিশেষ্য তবু এখানে কর্মকারকে কে বিভক্তি দ্বারা তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষের মতো ব্যবহার করা হল। ঝিকে মেয়ে বৌকে শেখানো : এখানে 'ঝি' 'বৌ' বিশেষ বিশেষ্য নয়, সাধারণ বিশেষ্য, তবু কে বিভক্তি গ্রহণ করেছে। এটা বেআইনি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আইন আছে প্রচুর হয়ে। রাখালসাধারণ গোক চরিয়ে থাকে, সেই তার ব্যবসা। কিন্তু গাড়োয়ান গোককে যে পীড়ন করে সে একটা বিশেষ ঘটনা, না পিটোতেও পারত। বউয়ের উপকারের জন্যে শাওড়ি যদি ঝিকে মাঝে সে একটা বিশেষ ব্যাপার, মারাটা সাধারণ ঘটনা নয়। ব'লে থাকি 'ময়রা মালপো তৈরি করে', 'মালপোকে তৈরি করে' বলিই নে। কিন্তু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলা অসম্ভব নয় যে : ময়রা মালপোকে করে তোলে জুতোর সুকতলা। মালপো তৈরি করা সাধারণ ময়রা কর্তৃক সাধারণ ব্যাপার ; সুকতলার মতো মালপো তৈরি করাটা নিঃসন্দেহ সাধারণ ব্যাপার নয়।

সর্বনামের প্রসঙ্গে করণকারকের নিয়ম পূর্বেই বলা হয়েছে। অল্প বিশেষ্যপদ সম্বন্ধেও প্রায় সেই একই কথা। দ্বারা দিবে ক'রে : এই তিনটে শব্দ করণকারকের প্রধান উপকরণ। সর্বনামের সঙ্গে অল্প বিশেষ্যপদের একটা প্রভেদ বিভক্তি নিয়ে ; সর্বনামে কে, বিশেষ্যে এ। যথা : হাতে দ্বারা ভালো ভাতে দ্বারার চেয়ে,

পৃথিবী পুরাবে ভূমি ভরতের ধনে। সর্বনামে এই বিভক্তি বিকল্পে য়, যেমন : ভোঝায় দিয়ে। নিম্নের দৃষ্টান্তে কর্মকারকের চিহ্ন দেখি নে, যথা : মন দিয়ে শোনো, হাত দিয়ে খাও, লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও। মন দিয়ে কাজ করো, বাজে কাজে হাত দিয়ে না : এখানে মনও নির্বক্তক, হাতও তাই ; এ হাত দৈহিক হাত নয়, এ হাত বলতে বোঝায় চেটা। লোক দিয়ে চিঠি পাঠাও : এ লোক কোনো বিশেষ লোক নয়, সাধারণভাবে যাকে হোক কাউকে দিয়ে চিঠি পাঠাবার কথা হচ্ছে। ঘরামি দিয়ে চাল ছাইতে হবে : এখানে বিকল্পে ‘ঘরামিকে দিয়ে’ও হয়। কিন্তু ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যে কর্মকারকের কে বিভক্তি থাকাই চাই : রামকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ো। মানুষ ছাড়া অন্য জীববাচক বিশেষ্যে সম্বন্ধেও এই নিয়ম, যেমন : বাদরকে দিয়ে চাষ করানো চলে না, ধোবার গাধাকে দিয়ে ঘোড়দৌড় খেলাবে না কি।

করণকারকে ‘ক’রে’ শব্দ অধিকরণরূপের সঙ্গে যুক্ত হয় : মাসে ক’রে অল খাও, তুলিতে ক’রে আঁকো।

করণকারকে ‘দিয়ে’ আর ‘ক’রে’ শব্দে পার্থক্য আছে। ‘পাঙ্কিতে ক’রে’ যাওয়া চলে, ‘পাঙ্কি দিয়ে’ চলে না। খাবার বেলায় বলি ‘হাতে ক’রে খাও’ ; নেবার বেলায় বলি ‘হাত দিয়ে নাও’। একটাতে হাত হচ্ছে উপায়, আর-একটাতে হাত হচ্ছে আধার। পাঙ্কিতে ‘ক’রে’ মানুষ যায়, কিন্তু যায় পথ ‘দিয়ে’। এখানে পাঙ্কি উপায়, পথ আধার। কিন্তু অর্থহিসাবে বিকল্পে হাত উপায়ও হতে পারে, আধারও হতে পারে। তাই ‘হাত দিয়ে খাও’ বলাও চলে, ‘হাতে ক’রে খাও’ বলতেও দোষ নেই।

ব’লে থাকি : বড়ো রাস্তা দিয়ে যখন বাবে গাড়িতে ক’রে যেয়ো। কোনো সাহেব যদি বলে ‘রাস্তায় ক’রে যাবার সময় গাড়ি দিয়ে যেয়ো’, বুঝব সে বাঙালি নয়। লোক ‘দিয়ে’ পাঠাব চিঠি, লোকটা উপায় ; ব্যাগে ‘ক’রে’ সে চিঠি নেবে, ব্যাগটা আধার।

‘হতে’ আর ‘থেকে’ এই দুটো শব্দ বাংলা অপাদানের সম্বল। প্রাচীন হিন্দিতে ‘হতে’ শব্দের জুড়ি পাওয়া যায় ‘হস্তো’, নেপালিতে ‘ভন্দা’, সংস্কৃত ‘ভবন্ত’। প্রাচীন রামায়ণে দেখেছি : ঘরে হনে, ভূমি হনে।

অপভ্রংশ প্রাকৃতের অপাদানে পাওয়া যায় : হোংতও হোংতউ। ‘থেকে’ শব্দটার ধ্বনিসাদৃশ্য পাওয়া যায় নেপালিতে, যেমন : ‘তাহা দেখি—সেখান থেকে, মাঝ দেখি—মাঝ থেকে। গুজরাটিতে আছে ‘থকি’। বাংলায় অপাদানে একটা গ্রাম্য প্রয়োগ

আছে 'ঠেঞে' (ঠাই হতে), যথা : তোমার ঠেঞে কিছু আদায় করতে হবে ।

একদা পালি ব্যাকরণে পেয়েছিলুম-'অজ্ঞতগ্গে' শব্দ । এর সংস্কৃত মূল 'অজ্ঞতঃ অগ্রে' ; 'আজ থেকে' শব্দের সঙ্গে এর ধ্বনি ও অর্থের মিল আছে । জানি নে পণ্ডিতদের কাছে এ ইঙ্গিত গ্রাহ্য হবে কি না ।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে । 'পশুর থেকে মানুষের উৎপত্তি' এ কথা বলা চলে । কিন্তু 'মানুষ থেকে গছ বেরচ্ছে' বলি নে, বলি 'মানুষের গা থেকে' কিংবা 'কাপড় থেকে' । 'বিপিন থেকে টাকা পেয়েছি' বলা চলে না, বলতে হয় 'বিপিনের কাছ থেকে টাকা পেয়েছি' । এর কারণ, অচেতন পদার্থের নামের সঙ্গেই 'থেকে' শব্দের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । তাই 'মেঘ থেকে' বৃষ্টি নামে, 'পাখি থেকে' গান ওঠে না, 'পাখির কণ্ঠ থেকে' গান ওঠে ।

কেবল 'থেকে' নয়, 'হতে' শব্দ-প্রয়োগেও ঐ একই কথা । 'অযোধ্যা হতে' রাম নির্বাসিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন 'রাবণের কাছ হতে' ।

তুলনামূলক অর্থেও ব্যবহৃত হয় : হতে থেকে চেয়ে চাইতে ।

অন্য প্রসঙ্গে সম্বন্ধপদের আলোচনা হয়ে গেছে । এক কালে বহুবচনে সম্বন্ধপদের 'দিগের' শব্দের পূর্বেও সম্বন্ধের আর-একটা বিভক্তি থাকত, যেমন 'আমারদিগের' ।

বাংলা সম্বন্ধপদের একটা প্রভাব আছে 'কার' । এর ব্যবহার সার্বত্রিক নয় । সময়-বাচক ক্রিয়াবিশেষণে 'এখন' 'তখন' 'যখন' 'কখন'এর সঙ্গে 'কার' জোড়া হয় । বিশেষ কোনো 'বেলাকার' 'দিনকার' 'রাতকার'ও চলে । 'আজ' এবং 'কাল' শব্দে কর্মকারকের বিভক্তির সঙ্গে যোগ করে ওর ব্যবহার : আজকেকার কালকেকার । 'পল্লীকার', অমুক 'হুগুঁকার' বা 'বছরকার' হয়, কিন্তু অমুক 'মাসকার' কিংবা অমুক 'ঘণ্টাকার' হয় না । 'সকলকার' হয়, 'সমস্তকার' হয় না । 'সত্যকার' হয়, 'মিথ্যাকার' হয় না । ভিতর-কার বাহিরকার উপরকার নিচেকার এদিককার ওদিককার এধারকার ওধারকার—চলে । ব্যক্তি বা বস্তুবাচক শব্দ সম্পর্কে এর ব্যবহার নেই । 'জন' শব্দ যোগে সংখ্যাবাচক শব্দে 'কার' প্রয়োগ হয় : একজনকার দুজনকার । কিন্তু 'জন' ছাড়া মনুষ্যবাচক আর-কোনো শব্দের সঙ্গে ওর যোগ নেই । 'ইংরেজকার' বলা চলে না ।

হওয়া থাকা আর করা, এই তিন অবস্থাকে প্রকাশ করে ক্রিয়াপদে । আমি ধনী, তুমি পণ্ডিত—এ কথা ইংরেজিতে বলতে গেলে এর সঙ্গে 'হওয়া' ক্রিয়াপদ যোগ

করতে হয়, বাংলায় সেটা উল্লেখ থাকে। ‘সান্তাটা সোজা’, ‘পুকুরটা গভীর’, যখন বলি তখন সেটাতে তার নিত্য অবস্থা জানায়। কিন্তু ‘বর্ষায় পুকুর ঘোলা হয়েছে’ এটা আকস্মিক অবস্থা, তাই হওয়ার কথাটা তুলতে হয়। ওর লোভ হয়েছে, মনে হচ্ছে ওর জ্বর হবে—বাক্যগুলিও এইরকম।

সাবেক বাংলায় বিশেষ্য বা সর্বনাম শব্দ-সহযোগে ইংরেজি is ও are -এর অনুরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায় : তুমি কে বটো, সে কে বটে, আমি রাজার ঝিয়ারি বটি। অচেতনবাচক শব্দও চলত, যেমন : ঐ গাছটা কী বটে, এই নদী গঙ্গাই বটে। ‘বটে’ শব্দটা এখনো ভাষায় আছে, বিশেষ ঝোক দেবার ক্ষেত্রে, যেমন : লোকটা ধনী বটে। আবার ভদ্রীর কাজেও লাগে, যেমন : বটে, চালাকি পেয়েছ! ‘বটে’র সঙ্গে ‘কিন্তু’র যোগ হলে ভদ্রীটা আরও জমে, যেমন : উনি সর্দারি করেন বটে কিন্তু টের পাবেন। ইংরেজিতে স্বভাব বা অবস্থা বোঝাতে is বা are ব্যতীত বিশেষ্যের গতি নেই, বাংলায় তা নয়। ইংরেজিতে বলাই চাই He is lame, কিন্তু বাংলায় যদি বলি ‘সে খোঁড়া বটে’ তা হলে হয় বোঝাবে, তার খোঁড়া অবস্থাটা একটা বিশেষ আবিষ্কার, নয় ওর সঙ্গে একটা অসংগত ব্যাপারের যোগ আছে। যেমন : ও খোঁড়া বটে কিন্তু দৌড় খুব। কিংবা সন্দেহের বিদ্রূপ প্রকাশ করে : তুমি খোঁড়া বটে! অর্থাৎ, খোঁড়া নও যে তা প্রমাণ করতে পারি।

বাংলায় থাকার কথাটা যখন জানাই তখন বলি—আছি বা আছে, ছিলে ছিল বা ছিলুম। ‘আছিল’ শব্দেরই সংক্ষেপ ‘ছিল’। কিন্তু ভবিষ্যতের বেলায় হয় ‘থাকব’। বাংলায় ক্রিয়াপদের রূপ প্রধানত এই থাকার ভাবকে আশ্রয় করে। করেছে করেছে করেছিল করছিল—শব্দগুলো ‘আছি’ ক্রিয়াপদকে ভিত্তি করে স্থিতির অর্থকেই মুখ্য করেছে। সংস্কৃত ভাষায় এটা নেই, গৌড়ীয় ভাষায় আছে। হিন্দিতে বলে ‘চলা থা’, চলেছিল। কাজটা যদিও চলা, তবু থা শব্দে বলা হচ্ছে, চলার অবস্থাতে স্থিতি করেছিল। গতিটা যেন স্থিতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

যে কাজকে নির্দেশ করা হচ্ছে প্রধানত সেই কাজের মূল ধাতুকে দিয়েই ক্রিয়াপদের গড়ন। ‘খা’ ধাতুতে খাওয়া বোঝায়, খাওয়া কালের সমস্ত ক্রিয়ারূপ এই ধাতুর যোগেই তৈরি। কিন্তু বাংলা ভাষায় অনেকস্থলে কার্ঘ্যটা ক্রিয়ার রূপ ধরে নি। স্নুখা পাওয়া, তৃষ্ণা পাওয়া, প্রতি দিনের ঘটনা; অথচ বাংলায় সেটা ক্রিয়ারূপ নেয় নি, বিশেষ্যের সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে বলতে হয় : স্নুখা পেল, তৃষ্ণা পেল। হওয়া উচিত ছিল ‘স্নুখিল’ ‘তৃষ্খিল’, কার্যে এইরকম ক্রিয়ারূপের কোনো বাধা নেই। কিন্তু গল্পবাংলায় ক্রিয়াপদকে অনেক স্থলে গোটা বিশেষ্যপদের ভার বয়ে বেড়াতে হয়।

বাংলায় দুটো ক্রিয়াপদ জুড়ে ক্রিয়াবিশেষণ গড়ার একটা রীতি আছে। তাতে যে ইচ্ছিতের ভাষা তৈরি হয়েছে তার ভাবপ্রকাশের শক্তি অসাধারণ। সামান্য এই কথাটা ‘রয়ে বসে কাজ করা’ বা বলে তা কোনো বাধা সংকুল শব্দে বলাই যায় না। ‘উঠেপ’ড়ে’ ‘উঠেইটে’ কিংবা ‘নেচেকুঁদে’ বেড়ানোতে কুঁড়ি প্রকাশ পায় সেটার ঠিক উপযুক্ত শব্দ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের স্বাভাবিক শব্দ : তেড়েফুঁড়ে কেটেছেটে বেঁচেবর্তে রয়েসয়ে হেসেখেলে। এমন আরও বিস্তর আছে। অনেক স্থলে ঐ জোড়া শব্দের দুটিতে অর্থের সাহা থাকে না। বস্তুত ওগুলো শব্দযোজনায় একরকম খেপামি। ‘বেয়েছেয়ে দেখা’র বা বলা হচ্ছে তার সঙ্গে যাওয়া এবং ছাওয়ার কোনো সম্পর্কই নেই। যখন বলি ‘নেড়েচেড়ে দেখতে হবে’ তখন ‘নেড়ে’ শব্দের সহচরটিকে ব্যবহার করা হয় অর্থহীন বাটখারার মতো ওজন ভারী করবার জন্তে। চেছেচিছে কেঁদেকেটে : এরা আছে অল্পপ্রাসের গাঁঠ বাধার কাজে। এটেসেটে খেটেখুটে খেয়ে-খেয়ে ঠেলেঠেলে : এরা ধ্বনির পুনরাবৃত্তিতে যনকে ঠেলে দেবার কাজ করে।

আর একরকম ক্রিয়াবিশেষণ আছে পদকে ছনো করে দিয়ে। যেমন, ‘জর হবে হবে’ কিংবা ‘জর জর করছে’। যনটা ‘পালাই পালাই’ করে। এর মধ্যে খানিকটা অনিশ্চয়তা অর্থাৎ হওয়ার কাছাকাছি ভাব আছে। ‘লড়াই লড়াই খেলা’ সত্যিকার লড়াই নয় কিন্তু যেন লড়াই। ‘হতে হতে হল না’ অর্থাৎ হতে গিয়ে হল না। এতে যেমন জোর কমান, আবার কোনো স্থলে জোর বাড়ায় : দেখতে দেখতে জল বেড়ে গেল, হাতে হাতে ফল পাওয়া। সরে সরে যাওয়া, চলে চলে ক্লান্ত, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল, পিছু পিছু চলা, কাছে কাছে থাকা : এই ঘিছে নিরন্তরতার ভাব পাওয়া যায়, কিন্তু একটানা নিরন্তরতা নয়, এর মধ্যে একটা বারংবার আছে। ‘পাতে-পাতেই মাছের মুড়ো দেওয়া হয়েছে’ বললে মনে হয় সেটা যেন একে একে পরে পরে গণনীয়। ‘পাথরটা পড়ি পড়ি করছে’, কোনো কালেই হয়তো পড়বেনা, কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্তে বারে বারে তার ভাবখানা পড়বার মতো। ‘আপনি আপনিই তিনি বকে যাচ্ছেন’ বললে কেবল যে স্বগত বকা বোঝায় তা নয়, বোঝায় পুনঃ পুনঃ বকা। এরকম ভাবব্যঞ্জনা কোনো স্পষ্টার্থক বিশেষণের দ্বারা সম্ভব নয়। এ যেন সিনেমায় ছবি নেওয়ার প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ অঙ্কুর্তির সমষ্টি।

ক্রিয়ার বিশেষণে অর্থহীন ধ্বনি সম্বন্ধে বাংলা শব্দভাষ্য বইখানিতে অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি, যেমন : কস্ ক’রে, চট্ ক’রে, ধুপ্ ক’রে, ধাঁ ক’রে, সোঁ ক’রে, ঢ্যাচ ক’রে দেওয়া, গ্যাট হয়ে বসা, টিপ করে প্রণাম করা। এদের কোনো শব্দই সার্থক নয়, অথচ অর্থবান শব্দের চেয়ে এরা স্পষ্ট করে মনে রেখাপাত করে। বাঁ বাঁ করছে রোদ্দুর, ধু ধু

করছে ঝাঠ, ধই ধই করছে জল : এরা এক আঁচড়ের ছবি ।

শারীরিক বেদনাগুলি ইংরেজি ভাষায় অর্থবান শব্দ দিয়ে বোঝানো হয়, যেমন : throbbing cutting gnawing pricking ইত্যাদি । এরকম দৈহিক উপলক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বাংলা ভাষায় নেই । বাংলার আছে ধ্বনি : দব্দব্দ ঝন্ঝন্ টন্টন্ কন্কন্ কুট্‌কুট্‌ কব্বকব্ব তিড়িক্‌তিড়িক্‌ ঘিন্‌ঘিন্‌ ঝিম্‌ঝিম্‌ হুড়্‌হুড়্‌ গিব্‌গিব্‌ । এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে অল্পভূতির কোনোই শব্দগত সাদৃশ্য নেই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অল্পভূতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয় এমন আর কিছুতেই হতে পারে না ।

বাংলা ক্রিয়াপদে আর-এক বিশেষত্ব আছে দুটো ক্রিয়ার জোড় দেওয়া, তাদের মধ্যে অর্থের সংগতি না থাকলেও, যেমন : হয়ে যাওয়া, হয়ে পড়া, হতে থাকা, হয়ে ওঠা ; করে যাওয়া, করে ফেলা, করে তোলা, করে দেওয়া, করে চলা, করে ওঠা, করতে থাকা । হয়ে পড়া, করে ফেলা 'র ভাবটা একই ; একটা অক্রিয়, একটা সক্রিয় । আর-একরকম আছে বিশেষ্যের সঙ্গে ক্রিয়ার কিংবা দুই ক্রিয়ার অসংগত যোগ, যেমন : মার খাওয়া, উঠে পড়া, গাল দেওয়া, বসে যাওয়া, ঘুরে মরা, গিয়ে পড়া, খেয়ে বাঁচা, নেড়ে দেওয়া ।

১৯

ক্রিয়াপদে দু রকমের অসঙ্গতা আছে । এক, উপস্থিত ব্যক্তিকে অস্বরোধ বা আদেশ করা । আর, উপস্থিত বা অস্বপস্থিত কারও সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করা, যেমন 'ও করুক' ।

হোক যাক চলুক বা করুক প্রভৃতি শব্দগুলিতে ক প্রত্যয় পুরোনো ভাষায় সর্বত্র প্রচলিত ছিল না, যথা : জাউ, মন্দ পবন বহ, উদ্ভিত হউ চন্দা, মউরগণ নাদ কর ।

পূর্বেই বলেছি বাংলা ভাষায় প্রধান লক্ষণ, তার ভঙ্গীর প্রাবল্য । উপরোক্ত শ্রেণীর ক্রিয়াপদে একটা অনর্থক গে শব্দের যোগে যে ইঙ্গিত প্রকাশ করা হয় সেটা সহজ শব্দের দ্বারা হয় না, যথা : হোকগে করুকগে মরুকগে । এতে ঐদাসীন্দ্রে ও কোভে জড়িয়ে যে ভাবটা ব্যক্ত করে সেটা অন্য ভাষায় সহজে বলা যায় না । কেননা গে শব্দের কোনো অর্থ নেই, ওটা একটা মূহুরা । 'হোকগে' শব্দের ইংরেজি তর্জমা করতে হলে বলতে হয় : Let it happen, I don't care । ওর সঙ্গে 'ভূমিও যেমন' যদি যোগ করা যায় তা হলে ভঙ্গিয়া আরও প্রবল হয়ে ওঠে । ইংরেজি বাক্যে হয়তো এর কাছাকাছি যায় : Oh let it be, don't bother । মোটের উপর এই

শব্দভাষ্যর ভাষ্যনা এই যে, যা হচ্ছে বা করা হচ্ছে সেটা ভালো নয়, সেটা কঠিন, বা অপ্রিয়, কিন্তু তবু ওটাকে গ্রহণ করার দরকার নেই। 'মক্কগে' শব্দে এই ভাষ্যভাষ্য খুবই স্পষ্ট হয়েছে। এই ছোট্ট বাংলা শব্দটির ইংরেজি প্রতিবাক্য : Hang it, let it go to the dogs।

ইংরেজিতে সাধারণ ব্যবহারের ক্রিয়াপদ অল্পসংখ্যক প্রায়ই এক মাত্রার হয়, যেমন, run stop cut beat shoot march hold throw। যেখানে যুগ্ম ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় সেখানে এক মাত্রার দুটি শব্দ জোড়া লাগে, যেমন : come in, go out, cut down, stand up, run on ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এইরূপ সংক্ষিপ্ত শব্দে আজ্ঞার জোর পৌঁছয়। স্বাউটের বা ফৌজের কুচকাওয়াজে ইংরেজিতে যে-সব আদেশবাক্য আছে এই কারণে সেগুলো জোরালো হয়। যে-সকল শব্দ ব্যঞ্জনবর্ণে শেষ হয় তারা ধাক্কা দেয় জোরে। stand up শব্দ উভয়ে মিলে দুই মাত্রার বটে কিন্তু তাতে দুই ব্যঞ্জনবর্ণের দুটো ঠাকর আছে।

'দাঁড়াও' শব্দটাও দুই মাত্রার, কিন্তু তার আগাগোড়া স্বরবর্ণ, তাদের স্পর্শ বোলায়েম। কথাটা ধাঁ করে ছোট্টে না।

'তুই' 'তোরা' বর্ণের অল্পসংখ্যক এই দুর্বলতা নেই। বোস্ ওঠ্ ছোট্ট থাম্ কাট্ মাম্ ধম্ খেল্ : এগুলি দৌড়ার শব্দ। আদিকালে ভাষায় 'তু' 'তুই' ছিল একমাত্র মধ্যম-পুরুষের সর্বনাম শব্দ। সেটা যদি চলে আসত তা হলে ক্রিয়াপদকে স্বরবর্ণ এমন নরম করে রাখত না, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণে তাকে তীক্ষ্ণতা দিত। 'করো' হ'ত 'কব্'। 'কোরো' হ'ত 'করিস'। 'দাঁড়া' শব্দ যদিও স্বরবর্ণ বহন করে তবু 'দাঁড়াও' শব্দের চেয়ে তার মধ্যে প্রকৃষ্টতা বেশি। 'ঘুমো' আর 'ঘুমোও' তুলনা করলে অল্পসংখ্যক দিক থেকে প্রথমোক্তটির প্রবলতা মানতে হয়।

চলতি বাংলা ভাষাপ্রধান ভাষা, তার একটা লক্ষণ ক্রিয়াপদের অল্পসংখ্যক অসংগত ভাবে 'না' শব্দের ব্যবহার। এর কাজ হচ্ছে আদেশ বা অল্পরোধকে অল্পনয়ে নরম করে আনা।

'হোক না' 'করোই না' ক্রিয়াপদে 'না' শব্দে নির্বন্ধ প্রকাশ পায়, কোনো-এক পক্ষের অনিচ্ছাকে যেন ঠেলে দেওয়া। 'না' শব্দের দ্বারা 'হাঁ' প্রকাশ করা আর প্রথমপুরুষ-বাচক 'আপনি'কে মধ্যমপুরুষের অর্থে ব্যবহার একই মনস্তত্ত্বমূলক। যিনি উপস্থিত আছেন যেন তিনি উপস্থিত নেই, তাঁর সঙ্গে যোকাবিলার কথা বলার স্পর্ধা বক্তার পক্ষে সম্ভব নয়, এই ভাবের দ্বারাই তাঁর উপস্থিতির মূল্য বার বেড়ে। তেমনি অল্পরোধ জানানোর পরকণ্ঠেই 'না' বলে তার প্রতিবাদ করে অল্পরোধের মধ্যে সম্মানের কাকুতি এনে

দেওয়া হয়। 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ বাংলা ভাষার আর-একটি বিশেষত্ব, যথা : আমি নই, তুমি নও, সে নয়, তিনি নন, আমি নেই, তুমি নেই, সে নেই, তিনি নেই ; হই নে, হও না, হন না, হয় নি, হন নি।

বাংলা ক্রিয়াপদে নানারকম শব্দ-যোজনায় নানারকম ভঙ্গী। তার কতকগুলি সার্থক, কতকগুলি নিরর্থক। ক্রিয়াপদে এতরকম ইশারা বোধ হয় আর-কোনো ভাষায় নেই।

পড়ল বা, করলে বা, শব্দে আশঙ্কার সূচনা। কোনো ক্রিয়াবিশেষণ-যোগে এর ভাবটা প্রকাশ হতে পারত না।

এতে যদি ইকার যোগ করা যায় তাতে আর-একরকম ভঙ্গী এসে পড়ে। হলই বা, করলই বা : এর ভঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্য অঙ্গুলারে ক্ষমাও বোঝাতে পারে, স্পর্ধাও বোঝাতে পারে, উপেক্ষাও বোঝাতে পারে।

হল বুঝি, করল বুঝি, হল ব'লে, করল ব'লে : আসন্ন অপ্রিয়তার আশঙ্কা।

হল যে, করল যে : উদ্বেগ।

হল তো, করলে তো : অপ্রত্যাশিতের সম্বন্ধে বিস্ময়।

আবার ওকেই প্রশ্নের সুরে বলিলে যদি বলা হয় 'হল তো ?' তা হলে জানানো হয় : এখন তো আর কোনো নালিশ রইল না ?

হোক না, করুক না, হোক্গে, করুক্গে, যরুক্গে : ঔদাসীন্য।

হলই বা, করলই বা, নাই বা হল, নাইয় হল : স্পর্ধার ভাষা।

হবে বা, হবেও বা : দ্বিধা এবং স্বীকার মিশিয়ে।

হবেই হবে, করবেই করবে : সুনিশ্চিত প্রত্যাশা।

করতেই হবে, হতেই হবে, করাই চাই, হওয়াই চাই : ইচ্ছার জোর প্রয়োগ।

হলেই হল : অর্থাৎ হয় যদি তবে আর-কোনো তর্কের দরকার নেই।

হোক্গে ছাই, যরুক্গে ছাই : প্রবল ঔদাসীন্য।

২০

অব্যয়। বাংলা ভাষায় প্রাক্ষরচক অব্যয় সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

প্রাক্ষরচক কি শব্দের অঙ্গরূপ আর-একটি 'কি' আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম। এ তার প্রকৃত অর্থের প্রয়োজন সেরে মাঝে মাঝে খোঁচা দেবার কাজে লাগে, যেমন : কী তোমার ছিри, কী-যে তোমার বুজি।

তিনটি আছে বোজক অব্যয় শব্দ : এবং আর ও। 'এবং' সংস্কৃত শব্দ। এর প্রকৃত অর্থ 'এইমতো'। ইংরেজি and শব্দের অর্থে কতদিন এর ব্যবহার চলেছে জানি নে। পুরোনো কাব্যসাহিত্যে 'এবং' শব্দের দেখা পাই নি। আধুনিক কাব্যসাহিত্যেও এর ব্যবহার নেই বললেই হয়। খাঁটি বাংলা বোজক শব্দ 'আর', হিন্দি 'ঔর'। সংস্কৃত 'অপর' শব্দ থেকে এর উদ্ভব। 'এবং' শব্দ তার অর্থের অসংগতি সত্ত্বেও পুরাতন 'আর'কে সাধু ভাষা থেকে প্রায় তাড়িয়ে দিচ্ছে। তাড়ানো সহজ হয়েছে তার প্রধান কারণ, স্বাভাবিক বাংলার স্বস্বস্বাসেই বোজকের কাজ সারা হয়ে থাকে। আমরা বলি : হাতিঘোড়া লোকলম্বর নিয়ে রাজা চলেছেন। আমরা বলি : চৌকিটেবিল আয়না-আলমারিতে ঘর ঠাসা। ইংরেজিতে উভয় স্থলেই একটা and না বসিয়ে চলে না, যথা : The king marches with his elephants, horses and soldiers। The room is full of chairs, tables, clothes-racks and almirahs।

বাংলার যদি বলি 'রাস্তা দিয়ে চলেছে হাতি আর ঘোড়া', তা হলে বোঝাবে বিশেষ করে ওরাই চলেছে।

'আর' শব্দের আরও কয়েকটি কাজ আছে, যেমন : আর কত থাকে : অর্থাৎ অতিরিক্ত আরও কত থাকে। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না : অর্থাৎ পুনশ্চ দেখা হবে না।

তোমাকে আর চালাকি করতে হবে না : এ একটা ভজিওমালা কথা। এই শব্দ থেকে 'আর' শব্দটা বাদ দিলেও চলে, কিন্তু তাতে ঝাঁজ মরে যায়।

সাহিত্যে 'ও' শব্দটা 'এবং' শব্দের সমান পর্যায়ে চলেছে। কিন্তু চলতি ভাষায় 'ও' সংস্কৃত 'চ'এর মতো, যথা : আমি যাচ্ছি তুমিও যাবে, অ্যাও যার ব্যাও যার থলুসে বলে আমিও যাব।

এক কালে এই 'ও' ছিল 'হ' রূপে, যেমন : সেহ, এহ বাহ, এহ তো মানুষ নয়। এই হ অবিকৃত রূপে বাকি আছে সাধু ভাষায় 'কেহ' শব্দে। চলতি ভাষায় 'কেও' থেকে ক্রমে 'কেউ' হয়েছে। পুরাতন সাহিত্যে 'কেহ' পাওয়া যায়, 'উঁহ' শব্দটা আজ হয়েছে 'তিনি'। 'ওহ' নেই কিন্তু সাধু ভাষায় 'উহা' আছে। 'যেহ' নেই, আছে 'যাহা'। এই শেষ দুটি বিশেষণ অপ্রাপ্তী সম্পর্কে।

বোজক 'ও'র উৎপত্তি ফার্সি উজ (অন্ত্যাহ ব) শব্দ থেকে, স্তত্রাং and'এর প্রতিশব্দরূপে এর ব্যবহার অবৈধ নয়। কিন্তু তবু ভাষায় ভালো করে মিশে যায় নি। তুমি ও আমি একসঙ্গেই যাব : এ খাঁটি বাংলা নয়। আমরা সহজে বলি : তুমি আমি

একসঙ্গেই বাব। কেউ কেউ যেন করেন 'অপি' থেকে 'ও' হয়েছে, কিন্তু স্বরবিকারের নিয়ম অনুসারে সেটা সম্ভব কি না সম্ভেদ করি।

রাজাও চলেছে সন্ন্যাসীও চলেছে : এ খাটি বাংলা। কিন্তু 'রাজা ও সন্ন্যাসী চলেছে' কানে ঠিক লাগে না। সে এগোয়ও না পিছোয়ও না : 'ও' শব্দের এই স্বার্থ ব্যবহার। সে এগোয় না ও পিছোয় না : এ বাক্যটা দুর্বল।

তুমিও যেমন, হবেও বা : এ-সব জায়গায় 'ও' ভাষাভঙ্গীর সহায়তা করে।

দেখা যায় 'এবং' শব্দটাকে দিয়ে আমরা অনেক স্থানে and শব্দের অনুকরণ করাই। He has a party of enemies and they vilify him in the newspapers এ বাক্যটা ইংরেজি মতে শুদ্ধ, কিন্তু আমরা যখন ওই তর্জমা করে বলি 'তঁার একদল শত্রু আছে এবং ওরা খবরের কাগজে তাঁর নিন্দা করে', তখন বোঝা উচিত এটা বাংলারীতি নয়। আমরা এখানে 'এবং' বাদ দিই। He has enemies and they are subsidised by the government এই বাক্যটা তর্জমা করবার সময় ফস্ করে বলা অসম্ভব নয় যে : তাঁর শত্রু আছে এবং তারা সরকারের বেতন-ভোগী। কিন্তু ওটা ঠিক হবে না, 'এবং' পরিত্যাগ করতে হবে। বাক্যের এক অংশে 'থাকা', আর-এক অংশে 'হওয়া', এদের যাকখানে 'এবং' মধ্যস্থতা করবার অধিকার রাখে না। তিনি হচ্ছেন পাকা ছোড়ার, এবং তিনি নোট জাল করেন : ইংরেজিতে চলে, বাংলায় চলে না।

'সে দরিদ্র এবং সে ধূর্য' এ চলে, 'সে চরকা কাটে এবং ধান ভেনে খায়' এও চলে। কারণ প্রথম বাক্যের দুই অংশই অস্তিত্ববাচক, শেষ বাক্যের দুই অংশই কর্তৃত্ববাচক। কিন্তু 'সে দরিদ্র এবং সে ধান ভেনে খায়' এ ভালো বাংলা নয়। আমরা বলি : সে দরিদ্র, ধান ভেনে খায়। ইংরেজিতে অনান্যাসে বলা চলে : She is poor and lives by husking rice।

প্রয়োগবিশেষে 'যে' সর্বনামশব্দ ধরে অব্যয়রূপ, যেমন : ছবি যে গেল না। 'যে' শব্দ 'গেল না' ব্যাপারটা নির্দিষ্ট করে দিল। তিনি বললেন যে, আজই তাঁকে যেতে হবে : 'তাঁকে যেতে হবে' বাক্যটাকে 'যে' শব্দ যেন ঘের দিয়ে শক্ত করে দিলে। শুধু উক্তি নয়, ঘটনাবিশেষকেও নির্দিষ্ট করা তার কাজ, যেমন : যধু যে রোজ বিকেলে বেড়াতে যায় আমি জানতুম না। যধু বিকেলে বেড়াতে যায়, এই ব্যাপারটা 'যে' শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হল।

আর-একটা অব্যয় শব্দ আছে 'ই'। 'ও' শব্দটা মিলন জানায়, 'ই' শব্দ জানায় স্বাতন্ত্র্য। 'তুমিও যাবে', অর্থাৎ মিলিত হয়ে যাবে। 'তুমিই যাবে', অর্থাৎ একলা

যাবে। 'সে যাবেই ঠিক করেছে', অর্থাৎ তার যাওয়াটাই একান্ত। 'ও' দেয় জুড়ে, 'ই' ছিঁড়ে আনে।

বক্রোক্তির কাজেও 'ই'কে লাগানো হয়েছে : কী কাণ্ডই করলে, কী বাঁদরামিই শিখেছে। 'কী শোভাই হয়েছে' ভালোভাবে বলা চলে, কিন্তু মন্দভাবে বলা আরও চলে। এর সঙ্গে 'টা' জুড়ে দিলে তীক্ষ্ণতা আরও বাড়ে, যেমন : কী ঠকানটাই ঠকিয়েছে। আমরা সোজা ভাষায় প্রশংসা করে থাকি : কী চমৎকার, কী সুন্দর। এর সঙ্গে একটু-আধটু ভঙ্গিমা জুড়ে দিলেই হয়ে দাঁড়ায় বিদ্রূপ।

'তা' শব্দটা কোথাও সর্বনাম কোথাও অব্যয়। তুমি যে না বলে যাবে তা হবে না : এখানে না বলে যাওয়ার প্রতিনিধি হচ্ছে তা, অতএব 'সর্বনাম'। তা, তুমি বরং গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো : এই 'তা' অব্যয় এবং অর্থহীন, না থাকলেও চলে। তবু মনে হয় একটুখানি ঠেলা দেবার জন্যে যেন প্রয়োজন আছে। তা, এক কাজ করলে হয় : একটা বিশেষ কাজের দিকটা ধরিয়ে দিল ঐ 'তা'।

'বুঝি', সহজ অর্থ 'বোধ করি'। অথচ বাংলা ভাষায় 'বুঝি' 'বোধ করি' 'বোধ হচ্ছে' বললে সংশয়যুক্ত অসুস্থমান বোঝায় : লোকটা বুঝি কালা, তুমি বুঝি কলকাতায় যাবে। 'তুমি কি যাবে' এই বাক্যে 'কি' অব্যয়ে সুস্পষ্ট প্রশ্ন। কিন্তু 'তুমি বুঝি যাবে' এই প্রশ্নে যাবে কি না সন্দেহ করা হচ্ছে। বাংলা ভাষায় 'বুঝি' শব্দে বুঝি ভাবটাকে অনিশ্চিত করে রাখে। বুঝির সঙ্গে 'বা' জুড়ে দিলে তাতে অসুস্থমানের সুরটা আরও প্রবল হয়।

যদি, যদি বা, যদিই বা, যদিও বা। যদি অন্তায় কর শাস্তি পাবে : এটা একটা সাধারণ বাক্য। যদি বা অন্তায় ক'রে থাকি : এর মধ্যে একটু ফাঁক আছে, অর্থাৎ না করার সম্ভাবনা নেই-যে তা নয়। যদিই বা অন্তায় করে থাকি : অন্তায় করাটা নিশ্চিত বলে ধরে নিলেও আরও কিছু বলবার আছে। যদিও বা অন্তায় করে থাকি : অন্তায় সন্দেহও স্পর্ধা আছে মনে।

'তো' অব্যয়শব্দে অনেক স্থলে 'তবু' বোঝায়, যেমন : বেলায় এলে তো খেলে না কেন। কিন্তু, তুমি তো বলেই খালাস, সে তো হেসেই অজ্ঞান, আমি তো ভালো মনে করেই তাকে ডেকেছিলুম, তুমি তো বেশ লোক, সে তো যন্ত পণ্ডিত—এ-সব স্থলে 'তো' শব্দে একটু স্তম্ভনার বা বিস্ময়ের আভাস লাগে, যথা : তুমি তো গেলে না, সে তো বসেই রইল, তবে তো দেখছি যাঁটি হল।

'গো' শব্দের প্রয়োগ সন্ধানেনে 'তুমি' বর্গের মাতৃশব্দে, 'তুই' বা 'আপনি' বর্গের নয় : কেন গো, মশায় গো, কী গো, ওগো জ্ঞানে যাও, হাঁ গো তোমার হল কী।

সংস্কৃত 'ভোঃ' শব্দের মতো এর বহুল ব্যবহার নেই। ইা গো, না গো : মুখের কথায় চলে ; মেয়েদের মুখেই বেশি। ভয় কিংবা ঘৃণা -প্রকাশে 'মা গো'। 'বাবা গো' শুধু ভয়-প্রকাশে। 'শোনো' শব্দের প্রতি 'গো' যোগ দিয়ে অসুযোগে মিনতির স্বর লাগানো যায়। 'কী গো' 'কেন গো' শব্দে বিজ্ঞপ চলে : কেন গো, এত রাগ কেন ; কেন গো, তোমার যে দেখি গাছে কাঁঠাল গৌকে তেল ; কী গো, এত রাগ কেন গো মশায় ; কী গো, হল কী তোমার। ভয় বা ছুঃখ -প্রকাশে মেয়েদের মুখে 'কী হবে গো', কিংবা অসুযোগে 'একা ফেলে যেয়ো না গো'। 'ইগা' 'কেনে গা' গ্রাম্য ভাষায়।

শুধু 'হে' শব্দ আহ্বান অর্থে সাহিত্যেই আছে। মুখের কথায় চলে 'ওহে'। কিংবা প্রণয়ের ভাবে : কে হে, কেন হে, কী হে। অসুযোগে 'চলো হে'। মাননীয়দের সম্বন্ধে এই 'ওহে'র ব্যবহার নেই। 'তুমি' 'তোমার' সঙ্গেই এর চল, 'আপনি' বা 'তুই' শব্দের সঙ্গে নয়।

'রে' শব্দ অসম্মানে কিংবা স্নেহপ্রকাশে : ইা রে, কেন রে, ওরে বেটা ভূত, ওরে হতভাগা, ওরে সর্বনেশে। এর সম্বন্ধ 'তুই' 'তোরা'র সঙ্গে।

'লো' 'লা' মেয়েদের মুখের সম্বোধন। এও 'তুই' শব্দের যোগে। ভদ্রমহল থেকে ক্রমশ এর চলন গেছে উঠে।

অব্যয় শব্দ আরও অনেক আছে, কিন্তু এইখানেই শেষ করা যাক।

২১

ভাষার প্রকৃতির মধ্যে একটা গৃহীণীপনা আছে। নতুন শব্দ বানাবার সময় অনেক স্থলেই একই শব্দে কিছু মালমসলা যোগ করে কিংবা ছোটো-তিনটে শব্দ পাশাপাশি জুট করে দিয়ে তাদের বিশেষ ব্যবহারে লাগিয়ে দেয়, নইলে তার ভাঙারে জায়গা হত না। এই কাজে সংস্কৃত ভাষার নৈপুণ্য অসাধারণ। ব্যবস্থাবদ্ধনের নিয়মে তার মতো সতর্কতা দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় নিয়মের খবরদারি যথেষ্ট পাকা নয়, কিন্তু সেও কতকগুলো নির্মাণরীতি বানিয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলোকে সমাসের পর্যায়ে ফেলা যায়, যেমন : চটামেজাজ নাকিস্বর তোলাউমুন ভোলামন। এগুলো হল বিশেষ-বিশেষণের জোড়। বিশেষণগুলোও ক্রিয়াপদকে প্রত্যয়ের শান দিয়ে বসানো। সেও একটা বিতব্যাখ্যতার কৌশল। বদমেজাজি ভালোমাসুবি তিনমহলা, এগারোহাতি (শাড়ি) : এখানে জোড়া শব্দের শেষ অংশদ্বয়ের পিঠে ইকারের আকারের ছাপ লাগিয়ে দিয়ে তাকে এক শ্রেণীর বিশেষ্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে আর-এক শ্রেণীর বিশেষ্যে। অবশেষে সেই বিশেষ্যের

গোড়ার দিকে বিশেষণ যোগ ক'রে তাকে বিশেষ্য দিয়েছে। অবিকৃত বিশেষ্য-বিশেষণের মিলন ঘটানো হয়েছে সহজেই ; তার দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষ্য গৌণে সংস্কৃত বহুব্রীহি মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ের মতো এক-একটা বাক্যাংশকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। যেমন 'পুজোবাড়ি', অর্থাৎ পুজো হচ্ছে যে বাড়িতে সেই বাড়ি। কাঠকয়লা : কাঠ পুড়িয়ে যে কয়লা হয় সেই কয়লা। হাঁটুজল : হাঁটু পর্যন্ত পড়ীর যে জল সেই জল। মাটকোঠা : মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে যে কোঠা। দুই বিশেষণের যোগে যে সমাস তারও গ্রহি ছাড়িয়ে দিলে অর্থের ব্যাখ্যা বিকৃত হয়ে পড়ে ; যেমন : কাঁচামিঠে : কাঁচা তবুও মিঠি। বাদশাহি-কুঁড়ে : বাদশাহর সমতুল্য তার কুঁড়েমি। সেয়ানা-বোকা : লোকটাকে বোকায় মতো দেখায় কিন্তু আসলে সেয়ানা। বিশেষ্য এবং ক্রিয়া থেকে বিশেষণ-করা শব্দের যোগ, যেমন : পটলচেরা : অর্থাৎ পটল চিরলে যে গড়ন পাওয়া যায় সেই গড়নের। কাঠঠোকরা : কাঠে যে ঠোকর মারে। চুলচেরা : চুল চিরলে সে বস্তু সূক্ষ্ম হয় তত সূক্ষ্ম।

কিন্তু শব্দরচনার বাংলা ভাষার নিজের বিশেষত্ব আছে, তার আলোচনা করা যাক।

বাংলা ভবীওয়াল ভাষা। ভাবপ্রকাশের এরকম সাহিত্যিক রীতি অন্য কোনো ভাষায় আমার জানা নেই।

অর্থহীন ধ্বনিসমবায় শব্দরচনার দিকে এই ভাষায় যে ঝোঁক আছে তার আলোচনা পূর্বেই করেছি। আমাদের বোধশক্তি যে শব্দার্থজালে ধরা দিতে চায় না বাংলা ভাষা তাকে সেই অর্থের বন্ধন থেকে ছাড়া দিতে সৃষ্টিত হয় নি, আভিধানিক শাসনকে লঙ্ঘন ক'রে সে বোবার প্রকাশ-প্রণালীকেও অস্বীকার করে নিয়েছে।

ধ্বনাত্মক শব্দগুলিতে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি। পোকা কিল্‌বিল্‌ করছে : এ বাক্যের ভাবটা ছবিটা কোনো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় না। 'খিটখিটে' শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে irritable, peevish, pettish ; কিন্তু 'খিটখিটে' শব্দের মতো এমন তার জোর নেই। নেশায় চুরচুর হওয়া, কটমট ক'রে তাকানো, ধপান্ ক'রে পড়া, পা টন্ টন্ করা, গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করা : ঠিক এ-সব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতুপ্রত্যয়ওয়াল ভাষায় কর্ম নয়। ইংরেজিতে বলে creeping sensation, বাংলায় বলে 'গা ছম্‌ছম্‌ করা' ; আবার তো মনে হয় বাংলারই জিত। গুটিকয়েক শব্দের বোধকে ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করার বাংলা ভাষায় একটা আকৃতি দেখতে পাওয়া যায় : টুকটুকে, টকটকে, দগ্‌দগে লাল ; ধব্‌ধবে, ক্যাক্‌কেকে, ক্যাট্‌কেটে সাদা ; মিস্‌মিসে, কুচ্‌কুচে কালো।

বাংলায় শব্দের দ্বিধ ঘটিয়ে যে ভাবপ্রকাশের রীতি আছে সেও একটা ইশারার ভঙ্গী, যেমন : টাটকা-টাটকা গরম-গরম নীত-নীত মেঘ-মেঘ জর-জর ঘাব-ঘাব উঠি-উঠি। অর্থের অসংগতি, অভ্যক্তি, রূপক-ব্যবহার, তাতেও প্রকাশ হয় ভঙ্গীর চাকল্য ; অন্য ভাষাতেও আছে, কিন্তু বাংলায় আছে প্রচুর পরিমাণে।

আকাশ থেকে পড়া, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়া, হাড় কালী করে দেওয়া, পিটিয়ে লম্বা করা, ভেসে দেওয়া, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো, নাকে তেল দিয়ে ঘুষানো, তেলে বেঙনে জলা, পিঁ্ডি জলে যাওয়া, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, ঘেয়া পিঁ্ডি, বুড়ির ঢেঁকি, পাড়া মাথায় করা, তুলো ধুনে দেওয়া, ঘোল খাইয়ে দেওয়া, হেসে কুকক্ষেত্র, হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছেঁড়া, কিল খেয়ে কিল চুরি, আদার কাঁচকলায়, আহ্লাদে আটখানা : এমন বিস্তর আছে।

বাংলায় অনেক জোড়া শব্দ আছে যার এক অংশে অর্থ, অন্য অংশে নিরর্থকতা। তাতে করে অর্থের চারি দিকে একটা কাপসা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে ; সেই জায়গাটাতে যা তা কল্পনা করবার উপায় থাকে।

আমরা বলি ‘ঔষুধপত্র’। ‘ঔষুধ’ বলতে কী বোঝায় তা জানা আছে, কিন্তু ‘পত্রটা’ যে কী তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা অসম্ভব। ওটুকু অব্যাক্তই রেখে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ওতে অনেক কিছুই বোঝাতে পারে। হয়তো ফীভারমিক্চারের সঙ্গে মকরদ্বন্দ্ব, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন, থর্মমিটার, কুইনিনের বড়ি, হোমিওপ্যাথি ঔষুধের বাক্স। হয়তো তাও নয়। হয়তো কেবলমাত্র দু বোতল ডি-গুপ্ত। এমনি ‘মালপত্র’ ‘দলিলপত্র’ ‘বিছানাপত্র’ প্রভৃতি শব্দে ব্যাক্ত অব্যাক্তের যুগলমিলন।

আর-একরকম জোড়মেলানো শব্দ আছে যেখানে দুই ভাগেরই এক মানে, কিংবা প্রায় সমান মানে ; যেমন ‘লোকলস্কর’। এই ‘লস্কর’ শব্দে সব জায়গাতেই যে ফোজ বোঝাবেই তা নয় ; প্রায় ওতে ‘লোক’ শব্দের অর্থের সঙ্গে অনির্দিষ্ট লোকসঙ্খ্যের ব্যাপকতা বোঝায়। অন্তরকম করে বলতে গেলে হয়তো বলতুম, হাজার হাজার লোক চলেছে ; অথচ গুণে দেখলে হয়তো আড়াইশো’র বেশি লোক পাওয়া যেত না।

খুব ‘চড়চাপড়’ লাগালে : ওর মধ্যে চড়টা স্থনিশ্চিত, চাপড়টা অনিশ্চিত। ওটা কি তবে একবার গালে চড়, একবার পিঠে চাপড়। খুব সম্ভব তা নয়। তবে কি অনেকগুলো চড়। হতেও পারে।

মারাধরা মারধোর : বর্ণিত ঘটনার শুধু হয়তো মারাই হয়েছিল কিন্তু ধরা হয় নি। কিন্তু ‘মারধোর’ শব্দের দ্বারা মারটাকে স্থনির্দিষ্ট সীমার বাইরে ব্যাপ্ত করা হল। যে উৎপাতটা ঘটেছিল তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো এই শব্দে

ইজিতের মধ্যে সেয়ে দেওয়া হয়েছে।

‘কালিকিষ্টি’ এটা একটা ভদ্রীওয়াল কথ। শুধু ‘কালো’ বলে যখন মনে ভৃপ্তি হয় না তখন তার সঙ্গে ‘কিষ্টি’ যোগ করে কালিয়াকে আরও অবজ্ঞায় ঘনিষে তোলা হয়।

ভাবনাচিন্তা আপদবিপদ কাটাছাঁটা হাঁকডাক শব্দে অর্থের বিস্তার করে। শুধু ‘চিন্তা’ দুঃখজনক, কিন্তু ‘ভাবনাচিন্তা’ বিচিত্র এবং দীর্ঘায়িত।

স্বতন্ত্র শব্দে ‘আপদ’ কিংবা ‘বিপদ’ বলতে যে বিশেষ ঘটনা বোঝায়, যুক্ত শব্দে ঠিক তা বোঝায় না। ‘আপদবিপদ’ সমষ্টিগত, ওর মধ্যে অনিদিষ্টভাবে নানাপ্রকার দুর্ভোগের সম্ভাবনার সংকেত আছে।

‘ধারধোর’ শব্দে ধার করার উপরেও আর কিছু অস্পষ্টভাবে উদ্ভূত থাকে। হয়তো, কাউকে ধ’রে পড়া। রূপক অর্থে শুধু ‘ছাই’ শব্দে তুচ্ছতা বোঝায় যথেষ্ট, এই অর্থে ‘ছাই’ শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে, যেমন : কী ছাই বকছ। কিন্তু ‘ছাইভষ্ম কী যে বকছ’, এতে প্রলাপের বহর যেন বড়ো করে দেখানো হয়।

‘হাড়িকুঁড়ি’ শব্দ সংক্ষেপে পাকশালার বহুবিধ আয়োজনের ছবি এনে দেয়। এরকম স্থলে তন্নতন্ন বর্ণনার চেয়ে অস্পষ্ট বর্ণনার প্রভাব বেশি। ‘মামলা-মকদ্দমা’ শব্দটা ব্রিটিশ আদালতের দীর্ঘপ্রলম্বিত বিপত্তির বিপদী প্রতীক। এইজাতীয় শব্দের কতকগুলি নমুনা দেওয়া গেল : মাথামুণ্ড মালমসলা গোনাগুস্তি চালচলন বাঁধাছাঁদা হাসিতামাশা বিয়েথাওয়া দেওয়াখোওয়া বেঁটেখাটো পাকাপোক্ত মায়াদহা ছুটোছাঁটা কুটোকাটা কাঁটাখোঁচা ঘোরাফেরা নাচাকোঁদা জাঁকজমক গড়াপেটা জানাশোনা চাষাভুষো দাবিদাওয়া অদলবদল ছেলেপুলে নাতিপুতি।

২২

চলতি বাংলার আর-একটি বিশেষত্ব জানিয়ে দিবে এ বই শেষ করি। যারা সাধু ভাষার গম্ভীরাহিত্যকে রূপ দিয়েছিলেন স্বভাবতই তাঁদের হাতে বাক্যবিস্তারের একটা ধারা বাঁধা হয়েছিল।

তার প্রয়োজন নিয়ে তর্ক নেই। আমার বক্তব্য এই যে, এ বাঁধাবাধি বাংলা চলতি ভাষার নয়।

কোথায় গেলেন তোমার দাদা, তোমার দাদা কোথায় গেলেন, গেলেন কোথায় তোমার দাদা, দাদা তোমার গেলেন কোথায়, কোথায় গেলেন দাদা তোমার : প্রথম

পাঁচটি বাক্যে ‘গেলেন’ ক্রিয়াপদের উপর এবং শেষের বাক্যটিতে ‘কোথায়’ শব্দের উপর ক্রোক দিয়ে এই সবকটা প্রয়োগই চলে। আশ্চর্য তোমার সাহস, কিংবা, রেখে দাও তোমার চালাকি, একেবারে ভাসিয়ে দিলে কেঁদে : সাধু ভাষার ছাঁদের চেয়ে এতে আরও বেশি জোর পৌঁছয়। যা থাকে অনুষ্ঠে, যা করেন ভগবান, সে প’ড়ে আছে পিছনে : এ আমরা কেবল-যে বলি তা নয়, এইটেই বলি সহজে।

বাংলা ভাষার একটা বিপদ তার ক্রিয়াপদ নিয়ে ; ‘ইল’ ‘তেছে’ ‘ছিল’-যোগে বিশেষ বিশেষ কালবাচক ক্রিয়ার সমাপ্তি। ক্রিয়াপদের এই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি এড়াবার জন্যে লেখকদের সতর্ক থাকতে হয়। বাংলা বাক্যবিজ্ঞানে যদি স্বাধীনতা না থাকত তা হলে উপায় থাকত না। এই স্বাধীনতা আছে বটে, কিন্তু তাই বলে স্বৈরাচার নেই। ‘ভাসিয়ে একেবারে দিলে কেঁদে’ কিংবা ‘ভাসিয়ে দিলে একেবারে কেঁদে’ বলি নে। ‘সে প’ড়ে সবার আছে পিছনে’ কিংবা ‘রেখে চালাকি দাও তোমার’ হবার জো নেই। তার কারণ জোড়া ক্রিয়ার জোড় ভাঙা অবৈধ।

চলতি গণ্ডের একটা নমুনা দেওয়া যাক। এতে সাধু গম্ভ্যভাষার বাক্যপদ্ধতি অনেকটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে—

কুঞ্জবাবু চললেন মথুরায়। তাঁর ভাই মুকুন্দ যাবে স্টেশন পর্যন্ত। বৈজু দারোয়ান চলেছে মাঠাকরনের পাঙ্কির পাশে পাশে, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, ছিটের মেরুজাই গায়ে, গলায় কড়াকের মালা। ঘর সামলাবার জন্যে রয়ে গেছে ভরু সর্দার। টেমি কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল সিমেন্টের বস্তার উপর ল্যাজে মাথা গুঁজে, গোলমাল শুনে ছুটে এল এক লাফে। যত ওরা বারণ করে ততই কেঁই-কেঁই ঘেউ-ঘেউ রবে মিনতি জানায়, ঘন ঘন নাড়ে বোঁচা ল্যাজটা। রেল লাইন থেকে পোনা যাচ্ছে মালগাড়ি আসার শব্দ। ডাকগাড়ি আসতে বাকি আছে বিশ মিনিট মাত্র। বিষয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল মুকুন্দ ; সে যাবে কলকাতার দিকে, আজ সেখানে মোহনবাগানের ম্যাচ। ঐ বুকি দেখা গেল সিগ্যাল-ডাউন। এ দিকে নামল কামাক্ষী বৃষ্টি, তার সঙ্গে জোর হাওয়া। বেহারাগুলো পাঙ্কি নামালো অশথতলায়। হঠাৎ একটি ভিথিরি মেয়ে ছুটে এসে বললে, ‘দরজা খোলো মা, একবার মুখখানি দেখে নিই।’ দরজা খুলে চমকে উঠলেন গিরিঠাকরন, ‘ওমা, ও কে গো! আমাদের বিনোদিনী যে! কে করলে ওর এ দশা!’ কুকুরটা ওকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, ওর বুকে ছুই পা ভুলে কাঁই-কাঁই করতে লাগল আনন্দে। বিনোদিনী একবার তার গলা জড়িয়ে ধরল ছুই হাতে, তার পরেই ওকে সরিয়ে দিল, জোরে

ঠেলা দিয়ে। গোলেমালে কোথায় যেহেটি পালালো ঝড়ের আড়ালে, দেখা গেল না। চারি দিকে সজ্জানে ছুটল লোকজন। বড়োবাবু স্বয়ং হাঁকতে থাকলেন ‘বিছু বিছু’, মিলল না কোনো সাড়া। যুকুম্ব রইল তার সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়িতে, ক্রমালে মুখ লুকিয়ে একেবারে চূপ। মেলগাড়ি কখন গেল বেরিয়ে। কুষ্টির বিরাম নেই।

২৩

আমাদের দেহের মধ্যে নানাপ্রকার শরীরবস্ত্রে মিলে বিচিত্র কর্মপ্রণালীর বোনে শক্তি পাচ্ছে প্রাণ সমগ্রভাবে। আমরা তাদের বহন করে চলেছি কিছুই চিন্তা না করে। তাদের কোনো জায়গায় বিকার ঘটলে তবেই তার দুঃখবোধে দেহব্যবস্থা সঙ্কটে বিশেষ করে চেতনা জেগে ওঠে।

আমাদের ভাষাকেও আমরা তেমনি দিনরাত্রি বহন করে নিয়ে চলেছি। শব্দপুঞ্জ বিশেষে বিশেষণে সর্বনাশে বচনে লিঙ্গে সন্ধিপ্ৰত্যয়ে এই ভাষা অত্যন্ত বিপুল এবং জটিল। অথচ তার কোনো তার নেই আমাদের মনে, বিশেষ কোনো চিন্তা নেই। তার নিয়মগুলো কোথাও সংগত কোথাও অসংগত, তা নিয়ে পদে পদে বিচার ক’রে চলতে হয় না।

আমাদের প্রাণশক্তি যেমন প্রতিনিমিত্ত বর্ণে গন্ধে রূপে রসে বোধের জাল বিস্তার করে চলেছে, আমাদের ভাষাও তেমনি সৃষ্টি করছে কত ছবি, কত রস— তার ছন্দে, তার শব্দে। কত রকমের তার জাদুশক্তি। মানুষ যখন কালের নেপথ্যে অন্তর্ধান করে তখনো তার বাণীর লীলা সজীব হয়ে থাকে ইতিহাসের রক্তভূমিতে। আলোকের রক্তশালায় গ্রহতারার নাট্য চলেছে অনাদিকাল থেকে। তা নিয়ে বিজ্ঞানীর বিশ্বয়ের অস্ত নেই। দেশকালে মানুষের ভাষারঞ্জের সীমা তার চেয়ে অনেক সংকীর্ণ, কিন্তু বাণীলোকের রহস্তের বিশ্বয়করতা এই নক্ষত্রলোকের চেয়ে অনেক গভীর ও অভাবনীয়। নক্ষত্রলোকের তেজ বহু লক্ষ তারা চলার পথ পেরিয়ে আজ আমাদের চোখে এসে পৌঁছল; কিন্তু তার চেয়ে আরও অনেক বেশি আশ্চর্য যে, আমাদের ভাষা নীহারিকাচক্রে বর্গ্যমান সেই নক্ষত্রলোককে স্পর্শ করতে পেরেছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আমাকে কোনো ভাষাতাত্ত্বিক অস্বরোধ করেছিলেন আমার এই প্রকাশনোদ্দেশ্য বইখানিতে আমি যেন ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা করে কাজ আরম্ভ করি। তার যে উত্তর দিয়েছিলেন নিয়ে তা উদ্ভূত করে দিই। সেটা পড়লে পাঠকেরা বুঝবেন আমার বইখানি তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে।—

আমার পক্ষে যা সবচেয়ে দুঃসাধ্য তাই তুমি আমাকে করমান করেছ। অর্থাৎ মানুষের মূর্তির ব্যাখ্যা করবার ভার যে নিয়েছে তাকে তুমি মানুষের শরীরবিজ্ঞানের উপদেষ্টার মতো চড়াতে চাও। অহংকারে মানুষকে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্ধ করে—যদুন্দনের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, দর্পহরণ করবার প্রয়োজন ঘটবার পূর্বেই তিনি আমাকে যেন কৃপা করেন। আমার এ গ্রন্থে ব্যাকরণের বহু পথ একেবারেই এড়াতে পারি নি, প্রতি মুহূর্তে পদস্থলনের আশঙ্কায় কম্পান্বিত আছি। ভয় আছে, পাছে আমার স্পর্শ দেখে তারিকেরা ‘হায় কুষ্টি’ ‘হায় কুষ্টি’ বলে বন্ধে করাঘাত করতে থাকেন। কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শারীরতত্ত্বের যথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, আমার বইখানি যদি সেই সৌভাগ্য লাভ করে তা হলেই ধন্য হব। ১৬/১১/৩৮

পথের সঞ্চয়

পথের সঞ্চয়

যাত্রার পূর্বপত্র

মাঠের মাঝখানে এই আমাদের আশ্রয়ের বিস্তার। এখানে আমরা বড়োয় ছোটোয় একসঙ্গে থাকি, ছাত্র ও শিক্ষকে এক ঘরে শয়ন করি, ভেয়ানি এখানে আরও আমাদের সঙ্গী আছে ; আকাশ আলোক এবং বাতাসের সঙ্গেও আমরা কোনো আড়ালের সম্পর্ক রাখি নাই। এখানে ভোরের আলো একেবারে আমাদের চোখের উপর আসিয়া পড়ে, আকাশের তারা একেবারে আমাদের মুখের উপর তাকাইয়া থাকে। ঝড় বখন আসে সে একেবারে দিক্‌প্রান্তে ধুলার উত্তরীয় ছুলাইয়া বহু দূর হইতে আমাদের খবর দিতে থাকে। কোনো ঝড় বখন আসন্ন হয় তখন তাহার প্রথম সংবাদটি আমাদের গাছের পত্রে পত্রে প্রকাশিত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিকে এক মুহূর্ত আমাদের ঘরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয় না।

আমাদের ইচ্ছা পৃথিবীর বায়ুঘের সঙ্গেও আমাদের এমনি একটা যোগ থাকে। সর্বমাস্থলের ইতিহাসে যে-সমস্ত ঝড় আসে-বায়, সূর্যের যে উদয়ান্ত ঘটে, ঝড়-বাদলের যে যাতায়াতি চলে, সমস্তকেই বেন আমরা স্পষ্ট করিয়া এবং বড়ো আকাশের মধ্যে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই, ইহাই আমাদের মনের বাসনা। আমরা লোকালয় হইতে দূরে আছি বলিয়াই আমাদের এই স্বযোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ এখানে কোনো একটি ছাঁচের মধ্যে আসিয়া পড়িতে পার না, আমরা ইচ্ছা করিলে তাহাকে অবাস্তবিক রূপে গ্রহণ করিতে পারি।

বায়ুঘের জগতের সঙ্গে আমাদের এই মাঠের বিস্তারঘের সখ্যটিকে অব্যাহত করিবার জন্য পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করি। আমরা সেই বড়ো পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের পত্র পাইয়াছি। কিন্তু, সেই নিয়ন্ত্রণ তো বিস্তারঘের দুই পো ছাত্র মিলিয়া রক্ষা করিতে বাইতে পারিব না। তাই স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের হইয়া আমি একলাই এই নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করিয়া আসিব। আমার একলার মধ্যেই তোমাদের সকলের ভ্রমণ সাধিয়া লইব। বখন আমার তোমাদের আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিব তখন বাহিরের পৃথিবীটাকে আমার জীবনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে ভরিয়া আনিতে পারিব।

যখন ফিরিব তখন অবকাশমত অনেক কথা হইবে, এখন বিদায়ের সময় দুই-একটা কথা পরিষ্কার করিয়া যাইতে চাই।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি যুরোপে ভ্রমণ করিতে যাইতেছ কেন।’ এ কথার কী জবাব দিব ভাবিয়া পাই না। ভ্রমণ করাই ভ্রমণ করিতে যাইবার উদ্দেশ্য, এমন একটা সরল উত্তর যদি দিই তবে প্রশ্নকর্তা নিশ্চয় মনে করিবেন, কথাটাকে নিতান্ত হাকারকম করিয়া উড়াইয়া দিলাম। ফলাফল বিচার করিয়া লাভ-লোকসানের হিসাব না ধরিয়া দিতে পারিলে, মাহুষকে ঠাণ্ডা করা যায় না।

প্রয়োজন না থাকিলে মাহুষ অকস্মাৎ কেন বাহিরে যাইবে, এ প্রশ্নটা আমাদের দেশেই সম্ভব। বাহিরে যাইবার ইচ্ছাটাই যে মাহুষের স্বভাবসিদ্ধ, এ কথাটা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কেবলমাত্র ঘর আমাদেরকে এত বাধনে এমন করিয়া বাঁধিয়াছে, চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইবার সময় আমাদের এত অঘাতা, এত অবেলা, এত ইচি টিক্‌টিকি, এত অশ্রুপাত যে, বাহির আমাদের পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে; ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আত্মীয়স্বজনী আমাদের দেশে এত নীরস্ত্র নিবিড় যে, পরের মতো পর আমাদের কাছে আর-কিছুই নাই। এইজন্যই অল্প সময়ের জন্যও বাহির হইতে হইলেও সকলের কাছে আমাদের এত বেশি জবাবদিহি করিতে হয়। বাঁধা থাকিয়া থাকিয়া আমাদের ডানা এমনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে যে, উড়িবার আনন্দ যে একটা আনন্দ, এ কথাটা আমাদের দেশে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল, সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বা বারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভালো কৈফিয়ত—কিন্তু, বাহার বৎসর বয়সে সে কৈফিয়ত বাটে না, এখন কোনো পারমাণবিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।

আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভ্রমণের প্রয়োজন আছে, এ কথাটা আমাদের দেশের লোকেরা মানিয়া থাকে। সেইজন্য কেহ কেহ কল্পনা করিতেছেন, এ বয়সে আমার যাত্রার উদ্দেশ্য তাহাই। এইজন্য তাঁহারা আশ্চর্য হইতেছেন, সে উদ্দেশ্য যুরোপে সাধিত হইবে কী করিয়া। এই ভারতবর্ষের তীর্থে ঘুরিয়া এখানকার সাধু-সাধকদের সঙ্গ লাভ করাই একমাত্র মুক্তির উপায়।

আমি গোড়াতেই বলিয়া রাখিতেছি, কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুটা চক্ষু

বিরাটকে যত দিক দিয়া যত বিচিত্র করিয়া দেখিবে ততই সার্থক হইবে।

তবু এ কথাও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে যে, লাভের প্রতিও আমার লোভ আছে ; কেবল স্থখ নহে, এই ভ্রমণের সংকল্পের মধ্যে প্রয়োজনসাধনেরও একটা ইচ্ছা গভীরভাবে লুকানো রহিয়াছে।

আমি মনে করি, যুরোপের কেহ যদি যথার্থ প্রজ্ঞা লইয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া যাইতে পারেন তবে তাঁহারা তীর্থভ্রমণের কললাভ করেন। তেমন যুরোপীয়ের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে ভক্তি করি।

সে ভক্তির কারণ ইহা নহে যে, আমাদের ভারতবর্ষের বাহ্যিক তীহাদের প্রজ্ঞার মধ্য দিয়া প্রতিফলিত হইয়া আমাদের কাছে উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়। তাঁহাদেরই হৃদয়ের শক্তি দেখিয়া আমার মন প্রণত হয়। অপরিচয়ের বাধা ভেদ করিয়া সত্যকে স্বীকার ও কল্যাণকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সর্বদা দেখিতে পাই না। পরের দেশে না গেলে সত্যের মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা অভ্যস্ত তাহাকেই বড়ো সত্য বলিয়া মানা ও যাহা অনভ্যস্ত তাহাকেই তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া বর্জন করা, ইহাই দীনাত্মার লক্ষণ।

অনভ্যাসের মন্দিরের কপাট ঠেলিয়া যখন আমরা সত্যকে পূজা দিয়া আসিতে পারি, তখন সত্যের প্রতি ভক্তিকে আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের সেই পূজা স্বাধীন ; আমাদের সেই ভক্তি প্রথার দ্বারা অঙ্কভাবে চালিত নহে।

যুরোপে গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই প্রজ্ঞাটি লইয়া যদি আমরা সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে। ভারতবর্ষে আমি প্রজ্ঞাপরায়ণ যে যুরোপীয় তীর্থযাত্রীদিগকে দেখিয়াছি আমাদের হৃগতি যে তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই তাহা নহে, কিন্তু সেই ধূলার তীহাদিগকে অঙ্ক করিতে পারে নাই ; জীর্ণ আবরণের আড়ালেও ভারতবর্ষের অন্তরতম সত্যকে তাঁহারা দেখিয়াছেন।

যুরোপেও যে সত্যের কোনো আবরণ নাই তাহা নহে। সে আবরণ জীর্ণ নহে, তাহা সমুজ্জ্বল। এইজন্মই সেখানকার অন্তরতম সত্যটিকে দেখিতে পাওয়া হয়তো আরও কঠিন। বীর প্রহরীদের দ্বারা রক্ষিত, বশিষ্ঠের কালকের দ্বারা খচিত, সেই পর্দাটাকেই সেখানকার সকলের চেয়ে মূল্যবান পদার্থ মনে করিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া কিরিয়া আসিতে পারি— তাহার পিছনে যে দেবতা বসিয়া আছেন তাঁহাকে হয়তো প্রণাম করিয়া আসা ঘটিয়া উঠে না।

সেই পর্দাটাই আছে আর তিনি নাই, এমন একটা অদ্ভুত অশ্রদ্ধা লইয়া যদি সেখানে যাই তবে এই পথ-ধরচাটার মতো এতবড়ো অপব্যয় আর কিছুই হইতে পারে না।

যুরোপীয় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই, এই একটা বুলি চারি দিকে প্রচলিত হইয়াছে। যে কারণেই হউক, এইরূপ জনশ্রুতি যখন প্রচার লাভ করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার আর সত্য হওয়ার প্রয়োজন থাকে না। পাঁচজনে যাহা বলে ষষ্ঠ ব্যক্তির তাহা উচ্চারণ করিতে বাধে না এবং নানা কণ্ঠের আবৃত্তিই তখন যুক্তির স্থান গ্রহণ করিয়া বসে।

এ কথা গোড়াতেই মনে রাখা দরকার, মানবসমাজে যেখানেই আমরা যে-কোনো মঙ্গল দেখি-না কেন, তাহার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। অর্থাৎ, মানুষ কখনোই সত্যকে কল দিয়া পাইতে পারে না, তাহাকে আত্মা দিয়াই লাভ করিতে হয়। যুরোপে যদি আমরা মানুষের কোনো উন্নতি দেখি তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে—কখনোই তাহা জড়ের সৃষ্টি নহে। বাহিরের বিকাশে আত্মারই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

যুরোপে মানুষ মানবাত্মাকে প্রকাশ করিতেছে না, কেবল জড়বস্তুকেই সূপাকার করিতেছে, এ কথাও যা আর যদি বলি ‘বনস্পতি কেবল শুকনো পাতা ঝরাইয়া মাটি ছাইয়া ফেলে, সে আপনার জীবনকে প্রকাশ করে না’—তবে সেও ভেয়ানি। বস্তুত, বনস্পতির প্রবল প্রাণশক্তিই প্রচুর পল্লব বর্ষণ করে, অবিশ্রাম পরিত্যক্ত মৃত পত্র তাহার মৃত্যু প্রমাণ করে না। জীবনই প্রতি মুহূর্তে মরিতে পারে—মৃত্যু যখন বন্ধ হইয়া যায় তখনই ষথার্থ মৃত্যু।

যুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চূপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে।

বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু উৎপন্ন হইতেছে। অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না।

বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। যুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে।

ইউরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব— তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিজ্ঞা নহে, যাহা আনন্দ ।

যে কথাটা আমি বলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা সহজে বুঝিবার মতো একটা ঘটনা সম্প্রতি ঘটিয়াছে । দুই হাজার যাত্রী লইয়া আটলান্টিক সমুদ্রে এক জাহাজ পাড়ি দিতেছিল ; সেই জাহাজ অর্ধরাত্রে চলমান হিমশৈলে ঠেকিয়া যখন ডুবিবার উপক্রম করিল তখন অধিকাংশ ইউরোপীয় ও আমেরিকান যাত্রী নিজের জীবন-রক্ষার প্রতি ব্যাকুলতা প্রকাশ না করিয়া স্বীলোক ও বালকদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছে । এই প্রকাণ্ড অপমৃত্যুর অভিঘাতে ইউরোপের বাহিরের আবরণ সরিয়া যাওয়াতে আমরা এক মুহূর্তে তাহার অন্তরতর মানবাত্মার একটি সত্য মূর্তি দেখিতে পাইয়াছি ।

যেমন দেখিয়াছি অমনি তাহার কাছে মাথা প্রণত করিতে আমাদের আর লজ্জা হয় নাই । অমনি আত্মার পরিচয়ে আত্মার আনন্দ উদ্বারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ।

এই ঘটনার অনতিকালের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ঢাকা হইতে সিঁচারে করিয়া ফিরিতেছিলেন । সিঁচারের আঘাতে পদ্মার মাঝখানে একটা নৌকা ডুবিয়া গেল, তাহার তিনজন আরোহী জলের মধ্যে পড়িল । অনতিদূরে পাশ দিয়া আর-একখানা নৌকা চলিয়া বাইতেছিল— জাহাজের সকল লোকে মিলিয়া চীৎকার করিয়া উদ্ধারের জন্য তাহার মাঝিকে বিস্তর ডাকাতাকি করিল, সে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া চলিয়া গেল ; বিপদের কোনো আশঙ্কা ছিল না, নিকটেও সে ছিল, কাজটাকে কোনো-মতেই হুঃসাধ্য বলা চলে না ।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িল । রাত্রে প্রবল ঝড় হইয়া গিয়াছে । সকালবেলা বাতাসের বেগ কমিয়া গেছে, কিন্তু নদী চঞ্চল । গোয়াই নদীর তীরে আমার বোট বাধা ; হঠাৎ মনে হইল, নদীর মাঝখান দিয়া স্বীলোকের বেহ ডানিয়া চলিয়াছে, জলের উপরে চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, আর কিছুই দেখা যায় না । ঘাটের কাছে বাহারা ছিল আমি সকলকেই ডাকিয়া বলিলাম, ‘আমার ছোটো লাইক-বোটটি বাহিয়া উঠাকে উদ্ধার করিয়া আনো, কী জানি হয়তো বাঁচিয়া আছে ।’ কেহই অগ্রসর হইল না । আমি বলিলাম, ‘যে-কেহ বাইবে প্রত্যেককে আমি পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব ।’ তখন কয়েকজন লোক নৌকা ডালাইয়া দিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিল, এবং মুহূর্তে স্বীলোকটি ক্রমশ চেতনা লাভ করিল । পুরস্কারের আশা না থাকিলে কেহই বাইত না ।

আর-একদিন আমি বোটে করিয়া একটা বড়ো বিল দিয়া আসিতেছিলাম। বিলের জল যেখানে নদীতে আগিয়া পড়ে সেখানে মাছ ধরিবার সুবিধা করিবার জন্য জেলেরা বড়ো বড়ো খোঁটা পুঁতিয়া জলের নির্গমনপথকে সংকীর্ণ করিয়া দেয়, তাহাতে জলধারার বেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে ; এইরূপ স্থানে অনেক বোঝাই নৌকাকে বিপন্ন হইতে দেখিয়াছি। এই সংকীর্ণ পথ পার হইবার কালে আমার বোট কোনোমতে খোঁটার আঘাত বাঁচাইতে গিয়া ভারি একটি সংকটের জায়গায় আটকাইয়া পড়িল। আট-দশ হাত দূরেই জেলেরা মাছ ধরিতেছিল। আমাদের সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে ডাকাডাকি করা গেল, তাহারা তাকাইয়াও দেখিল না। বোটের মাঝি পুরস্কার কবুল করিল। তাহারা ডাক বাড়াইবার প্রত্যাশায় বধিরতার ভাণ করিল। ডাক বাড়িয়া যখন বেশ একটা মোটা অঙ্কে উঠিয়াছে তখন জেলেদের শ্রবণশক্তির বাধা হঠাৎ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল। অথচ তাহাদেরই কৃতকর্মের ফল আমরা ভোগ করিতে বসিয়াছিলাম ; আমাদের দেশের কোনো পাঠককে এ কথা বলা বাহুল্য, যদি হাকিমের বোট হইত তাহা হইলে ইহাদের শ্রুতিশক্তির পরীক্ষায় অন্তরূপ ফল দেখা যাইত।

বোলপুরের বাজারে একটা দোকানে যখন আগুন লাগিয়াছিল তখন তোমাদের মনে আছে, আগুন নিবাইবার কাজে চারজন বিদেশী কাবুলি তোমাদের সাহায্য করিয়াছে ; পাড়ার লোককে ডাকিয়া সাড়া পাও নাই। মনে আছে, তাহাদের নিকট কলসী চাহিতে গিয়াছিলে তাহারা, পাছে তাহাদের কলস অপবিত্র হইয়া নষ্ট হয়, এজন্য দিতে চাহিল না।

আমরা আমাদের চারি দিকে এই-যে আত্মত্যাগের কার্পণ্য দেখিতে পাই, দৃষ্টান্ত-বাহুল্যের দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে না। কেননা, আমরা মুখে যে যাহাই বলি-না কেন, অন্তত মনে মনে আমাদের চরিত্রের এই দৈন্ত সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি।

আত্মত্যাগের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কি কোনো যোগ নাই। এটা কি ধর্মবলেরই একটা লক্ষণ নহে। আধ্যাত্মিকতা কি কেবল জনসঙ্গ বর্জন করিয়া শুচি হইয়া থাকে এবং নায় জপ করে। আধ্যাত্মিক শক্তিই কি মানুষকে বীৰ্য দান করে না।

টাইটানিক জাহাজ ডোবার ঘটনায়^১ আমরা এক মুহূর্তে অনেকগুলি মানুষকে মৃত্যুর সম্মুখে উজ্জল আলোকে দেখিতে পাইয়াছি। ইহাতে কোনো-একজন মাত্র মানুষের অসামান্যতা প্রকাশ হইয়াছে এমন নহে। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, যাহারা

লক্ষীর কোড়ে লালিত কোড়পতি, বাহারা টাকার জোরে চিরকাল নিজেকে অন্ত-সকলের চেয়ে বেশি বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে, ভোগে বাহারা বাধা পায় নাই এবং যোগে বিপদে বাহারা আপনাকে বাঁচাইবার সুযোগ অন্ত-সকলের চেয়ে সহজে লাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিয়া দুর্বলকে অক্ষমকে বাঁচিবার পথ ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে। এরূপ কোড়পতি এ জাহাজে কেবল এক-আধজন মাত্র ছিল না।

আকস্মিক উৎপাতে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিই সভ্য সমাজের সংঘম ছিন্ন করিয়া দেখা দিতে চায়, ভাবিবার সময় হাতে পাইলে মানুষ আত্মসম্বরণ করিতে পারে। টাইটানিক জাহাজে অন্ধকার রাত্রে কেহ বা নিদ্রার মধ্যে হঠাৎ জাগিয়া, কেহ বা আমোদ প্রমোদের মধ্য হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া, সম্মুখে অপঘাতমৃত্যুর কালো মূর্তি দেখিতে পাইল। তখন যদি ইহাই দেখা যায়, মানুষ পাগলের মতো হইয়া অক্ষমকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছে না, তবে বুঝিতে হইবে, এই বীরত্ব আকস্মিক নয়, ব্যক্তিগত নয়; সমস্ত জাতির বহুদিনের তপস্তার সহিত আধ্যাত্মিক শক্তি ভীষণ পরীক্ষায় মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করিল।

এই জাহাজডুবিতে একসঙ্গে নিবিড় করিয়া যে শক্তিকে দেখিয়াছি, যুরোপে সেই শক্তিকেই কি নানা দিকে নানা আকারে দেখি নাই। দেশহিতের ও লোকহিতের জন্য সর্বস্বত্যাগ ও প্রাণবিসর্জনের দৃষ্টান্ত কি সেখানে প্রত্যহই হাজার হাজার দেখা যায় না। সেই অজস্রসংখ্য পুণীভূত ত্যাগের দ্বারাই কি যুরোপীয় সভ্যতা প্রবাল-দীপের মতো মাথা তুলিয়া উঠে নাই।

কোনো সমাজে যথার্থ কোনো উন্নতিই হইতে পারে না বাহার ভিত্তি দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই দুঃখকে তাহারাই বরণ করিতে পারে না বাহারা মেটেরিয়ালিস্ট, বাহারা জড়বস্তুর দাস। বস্তুতেই বাহাদের চরম আনন্দ, বস্তুকে তাহারা ত্যাগ করিবে কেন। কল্যাণকে তাহারা আপনার প্রাণের চেয়ে কেন বড়ো করিয়া স্বীকার করিবে। শাস্ত্রবিহিত যে পুণ্যকে মানুষ পারলৌকিক বিষয়সম্পত্তির মতোই জানে সেই স্বার্থপর পুণ্যের জন্যও সে দুঃখস্বীকার করিতে পারে—কিন্তু যে পুণ্য শাস্ত্রবিধির সামগ্রী নহে, বাহা তীর্থযাত্রার দুঃখ নহে, বাহা শুভনক্ষত্রযোগের দান নহে, বাহা হৃদয়ের স্বাধীন প্ররোচনা, সেই দুঃখ, সেই মৃত্যুকে কি কখনো কোনো বস্তু-উপাসক গ্রহণ করিতে পারে।

যুরোপে দেশের জন্য, মানুষের জন্য, জ্ঞানের জন্য, প্রেমের জন্য, হৃদয়ের স্বাধীন আবেগে, সেই দুঃখকে, সেই মৃত্যুকে আমরা প্রতিদিনই বরণ করিতে দেখিয়াছি।

ইহার মধ্যে সমস্তটাই খাঁটি নহে, ইহার মধ্যে অনেকটা আছে বাহা বাহাদুরি, কিন্তু সেই অপবাদ দিয়া সত্যকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। কোনো কোনো রাতে চন্ডের চারি দিকে একটা জ্যোতির চক্ৰ দেখা যায়। আমরা জানি, তাহা চন্দ্র নহে, তাহা ছায়া, তাহা মিথ্যা। কিন্তু, চন্দ্র মাঝখানে না থাকিলে সেই চন্ডের ভাণটুকুও থাকিতে পারে না। সকল সমাজেই যেটি শ্রেষ্ঠ পদার্থ তাহাকে ঘিরিয়া, তাহার আলোক ধার করিয়া লইয়া, একটা ভাণের মণ্ডল সৃষ্টিত হইয়া থাকে। কিন্তু, সেই নকলটা আগলের প্রতিবাদ করে না, তাহারই সমর্থন করে। ভণ্ড সন্ন্যাসীকে দেখিয়া আমাদের দেশের সাধুসন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া বসিলে ঠকিতে হইবে।

যুরোপের বাহারা অসামান্য লোক তাঁহাদের কথা আমরা বইয়ে পড়িয়াছি, তাঁহাদিগকে কাছে দেখি নাই। কাছে যে দুই-একজনকে দেখিয়াছি যুরোপের জ্যোতিষমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহারা স্থান পান নাই। অনেক দিন হইল একটি সুইডেনের মানুষকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার নাম হামারুথেন^১। তিনি সেই দূরদেশে বসিয়া দৈবক্রমে রামমোহন রায়েব কি একটুকু পরিচয় কোনো একটা বইয়ে পাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এমন একটি ভক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার দারিদ্র্য সম্বন্ধে দেশ ছাড়িয়া তিনি বহু কষ্টে সমুদ্র পার হইয়া এই বাংলাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার ভাষা জানিতেন না, মানুষকে চিনিতেন না, তবু বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় লইয়া এই রামমোহন রায়েব দেশকেই তিনি বরণ করিয়া লইলেন। যে অল্প কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন, কী দুঃসহ ক্রেশ সহ করিয়া, কী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে, অথচ কী সম্পূর্ণ নব্বতার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, তিনি এই দেশের হিন্দুর জন্ত নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা বাহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা কখনোই ভুলিতে পারিবেন না। নিমন্তলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছিল; তদুপলক্ষ্যে, হিন্দুর শ্রাণ কলুষিত করা হইল বলিয়া, আমাদের কোনো সাপ্তাহিক পত্র কোড প্রকাশ করিয়াছিল।

ভগিনী নিবেদিতা^২ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি ভক্তি বহন করিয়া কিরূপ অদ্ভুত আত্মত্যাগের দ্বারা ভারতবর্ষের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিরুদ্ধ নাই।

১ জট্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশক ও 'বিশেষীকৃত অভিধি এবং দেশীয় অভিধা'

২ জট্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রকাশক ও 'ভগিনী নিবেদিতা'

এই দুই দৃষ্টান্তেই আমরা দেখিরাছি, এই দুটি ভক্ত এমন স্থানে এমন অবস্থার মধ্যে আত্মদান করিয়াছেন যেখানে তাঁহাদের জীবনের কোনো পূর্বাভাস্ত সহজ পথ তাঁহাদের সম্মুখে ছিল না ; যেখানে তাঁহাদের হৃদয়মনের আজন্মকালের সংস্কার পদে পদে কঠোর বাধা পাইরাছে ; যেখানে কেবল যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাহা নহে, পদে পদে আত্মোৎসর্গের পথ তাঁহাদের নিজেকে ধনর করিয়া চলিতে হইরাছে—কেননা, তাঁহাদের প্রবেশ চারি দিকেই অবরুদ্ধ ।

সত্যকে ভক্তি করিবার এই কষতা, এবং সত্যের জন্ত দুর্গম বাধা লঙ্ঘন করিয়া দিনের পর দিন আপনাকে অকুণ্ঠিতভাবে নিঃশেষে দান করিবার এই শক্তি, এ যে তাঁহাদের জাতীয় সাধনা হইতেই তাঁহারা পাইরাছিলেন । এই আশ্চর্য শক্তি কি বস্তু-উপাসনার সাধনা হইতে কেহ কোনোদিন লাভ করিতে পারে । ইহা কি যথার্থই আধ্যাত্মিক নহে । এবং জিজ্ঞাসা করি, এই শক্তি কি আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাই ।

কিন্তু, তাই বলিয়া আমাদের দেশে কি আধ্যাত্মিকতা নাই । আমি তাহা বলি না । এখানেও আধ্যাত্মিকতার একটা দিক প্রকাশ পাইরাছে । আমাদের দেশের ধারার সাধক তাঁহারা কেহ বা জানে, কেহ বা ভক্তিতে অধঃস্বরূপকে সমস্ত ষণ্ড-পদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করিতে পারেন । এইখানে জানের দিকে এবং ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে কম হইয়া আসিরাছে । এইজন্য আমাদের দেশের ধারার সাধুপুরুষ তাঁহারা চিত্রলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন ।

আমাদের দেশের মানবপ্রকৃতিতে এই শক্তিটি দেখিবার জন্ত যদি কোনো বিদেশী প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসেন তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃতার্থ হইবেন, এবং সম্ভবত তিনি আপনার প্রকৃতির ভিতরকার একটা অভাব পূরণ করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন ।

আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদেরকে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে ।

এ কথা শুনিলেই আমাদের দেশাভিমাত্রীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির—ইউরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অস্ত-সকলকে ছাড়াইয়া উঠিরাছে ।

আমি পূর্বেই বলিরাছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না । কেবল বস্তুসকলের উপরে কোনো জাতিরই উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে

কোনো জাতিই বলশাস্তি করে না। প্রদীপে অল্প তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্যে স্নানক হইয়া উঠিলেও দীপ জলে না— যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে।

আজ পৃথিবীকে যুরোপ শাসন করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিধাগী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না।

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াশক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যাসকালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধগভাতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্ভাস লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে ধর করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

যুরোপের যে শক্তি, তাহার বাহ্যরূপ বাহাই হউক-না কেন, তাহার আন্তর রূপ যে ধর্মবল সে সম্বন্ধে আবার স্নানে সন্দেহমাত্র নাই।

এই তাহার ধর্মবল অত্যন্ত সচেতন। তাহা মানুষের কোনো দুঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীনভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্বপ্রকার দুর্গতি মোচন করিবার জন্য নিত্যনিয়তই তাহা দুঃসাধ্য চেষ্টার নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে যে একটি স্বাধীন শুভবুদ্ধি আছে, যে বুদ্ধি মানুষকে স্বার্থভাগ করাইতেছে, আরাম হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে এবং অকুণ্ঠিত মৃত্যুর মুখে ডাক দিতেছে, তাহাকে শক্তি জোগাইতেছে কে। কোথায় সেই অমৃত আছে যাহা এই উদার মঙ্গলকামনাকে এমন করিয়া সন্তোষ রাখিয়াছে।

খৃষ্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ যুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে, সেটি কী। সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দ্বারা যে মানুষের প্রেমে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনায় করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহু শত বৎসর ধরিয়া নানা মত্রে অল্পটানে সংগীতে যুরোপ গুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর বর্মহানকে

অধিকার করিয়া বলিয়াছে বাহা চেতনারও অন্তরালবর্তী অতিচেতনার দেশ— সেইখানকার গোপন নিস্তরঙ্গতার মধ্য হইতে বাহুব্ধের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে— সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই বাহুব্ধের সমস্ত ঐশ্বৰ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সেইজন্ত আজ যুরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, বাহারী মুখে ধূস্টধর্মকে অমান্ত করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারিও সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিজাকে দুঃখকে এমন বীরের মতো বহন করে যে, তখনি বুঝা যায়, তাহারি নিজের অজান্তসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং স্বর্ষের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।

টাইটানিক জাহাজে বাহারি নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষায় চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারি সকলেই যে নির্ভাবান ও উপাসনারত খুঁটান তাহা নহে। এমন-কি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা আভ্যেবিকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারি কেবলমাত্র মতাস্তরগ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কী করিয়া। কোনো জাতির মধ্যে বাহারি তাপস তাঁহারি সে জাতির সকলের হইয়া তপস্তা করেন। এইজন্ত সেই জাতির পনেরো-আনা মৃতও যদি সেই তাপসদের গারে ধুলা দেয় তথাপি তাহারিও তপস্তার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে বাহুব্ধের ছোটো বড়ো সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা বতই অগ্রিয় হউক, তথাপি ইহা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের মধ্যে আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, বাহা বীরের জায়গাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে কী। আমরা বাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখপীড়িত বাহুব্ধের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই; দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। কুপণ ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলৌকিক সম্ভোগের লোভে পুণ্যকারী যে দুঃখভ্রত গ্রহণ করে, মুক্তিলোলুপ মুক্তির জন্ত যে দুঃখসাধন করে এবং ভোগী ভোগের জন্ত যে দুঃখকে বরণ করে তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই দৈন্তকেই

প্রকাশ করে। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই বার্থ্য ত্যাগের ঐশ্বর্য; তাহাতেই মানুষ কৃত্যকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের উর্ধ্বে মহীয়ান করিয়া তুলে।

এই দুঃখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যই এই দুঃখ। এই দুঃখসম্পন্নই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্তকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে, নারসাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ, দুঃখস্বীকার করিবার বল বাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।

ইহার একটা প্রমাণ এই, আমরা নিজের দেশকে নিজে লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের দেশের লোক কেহ কাহারও আপন হইল না, দেশ বাহাকে চায় সে সাড়া দেয় না। এখানকার জনসংখ্যা বড়ো কম নয়, কিন্তু সেই সংখ্যাবহুলতার তাহার শক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহার দুর্বলতাই ব্যক্ত করে।

তাহার প্রধান কারণ এই, আমরা দুঃখের দ্বারা পরস্পরকে আপন করিতে পারি নাই। আমরা দেশের মানুষকে কোনো মূল্য দিই নাই—মূল্য না দিয়া পাইব কী করিয়া। বা আপন গর্বের সম্ভানকেও অহরহ সেবা দুঃখের মূল্য দিয়া লাভ করেন। বাহাকেই আমরা সত্য বলিয়া মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করি তাহাকেই এই মূল্য আমরা স্বভাবতই দিয়া থাকি, কাহাকেও তাগিদ করিতে হয় না। চারি দিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে ‘সর্বভূতই এক’, সে একটা বাক্যমাত্র; সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরম শক্তি, বাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই বাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতত্ত্বপর প্রেম নহিলে আর-কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

যুরোপের ধর্ম যুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখতপস্তার হোমস্বি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত জাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন।

সেই দুঃসহ যজ্ঞহত্যাশন হইতে যে অমৃতের উদ্ভব হইতেছে তাহার জারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে ; ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যন্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না ; ইহা ভগ্নস্তার সৃষ্টি, এবং সেই ভগ্নস্তার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্মবল ।

সেইজন্ত দেখিতে পাই, বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ বহন প্রেমের সেই ভাগ্যধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখন সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল বাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি । রোগীদের জন্ত ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন-কি পশুদের জন্তও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখ-নিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল ; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সঙ্গতির জন্ত দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন । ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীৰবান মহৎ বহুভুজের দীক্ষা দান করিয়াছিল । সেইজন্তই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতে পারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল । তখন য়ুরোপের খৃস্টান সভ্যতা যুগের অতীত ছিল । ভারতবর্ষের সেই দুঃখভ্রম আত্মভ্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাণিত হইয়াছে । বাহিরে যদি কোথাও তাহার উদ্‌বোধন দেখিতে পার তবে আপনাকে কি তাহার আবার আপনি মনে পড়িবে না । আজ বাহা পরের ঘরে বিরাজ করিতেছে তাহাকেই কি তাহার আপনার সামগ্রী বলিয়া চেতনা হইবে না । শক্তির আগুন যেখানে প্রচুর পরিমাণে জলে সেখানে ছাইভস্মও প্রভূত হইয়া উঠে, এ কথা মনে রাখিতে হইবে । নির্জীবতার উত্তাপ অল্প, তাহার দায় সামান্য, তাহার দুর্গতির মূর্তিও অতি প্রলাভ । অশান্তির কোড এবং পাপের প্রচণ্ডতা য়ুরোপীয় সমাজে যেমন প্রত্যক্ষ হয় এমন আবার দেখে নহে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে ।

কিন্তু, তাহাকে তাহার উদাসীনভাবে মানিয়া লয় নাই । তাহা তাহাদের চিত্তকে অভিভূত করে নাই, বরঞ্চ নিরন্তর জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে । ম্যালেরিয়ার বাহন মশা হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজের ভিতরকার পাপ পর্বত সকল অমৃতের সঙ্গেই সেখানে হাতাহাতি লড়াই চলিতেছে, অমৃতের উপর বরাত দিয়া কেহ বসিয়া নাই ; নিজের প্রাণকেও সংকটাপন্ন করিয়া ধীরে ধীরে সংগ্রাম করিতেছে । সম্প্রতি London Police Courts-নামক একটি আদর্শ বই পড়িতেছিলাম । সেই গ্রন্থে

লগুন-রাজধানীর নীচের অঙ্ককার তলার দারিদ্র্যের মালিন্য ও পাপের পঙ্কিলতা উদ্ঘাটিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই চিত্র যতই নিদাক্ষণ হউক, ধূসর তাপসের অদ্ভুত ধৈর্য বীৰ্য ও করুণাপরায়ণ প্রেম সমস্ত বীভৎসতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া উজ্জল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গীতার একটি আশার বাণী আছে, স্বল্পপরিমাণ ধর্মও মহৎ ভয় হইতে জ্ঞান করে। কোনো সমাজে সেই ধর্মকে যতক্ষণ সম্ভব দেখা যায় ততক্ষণ সেখানকার ভূরিপরিমাণ দুর্গতির অপেক্ষাও তাহাকে বড়ো করিয়া জানিতে হইবে।

যুরোপে দুর্বল জাতির প্রতি শ্রামধর্মের ব্যভিচার দেখা যাইতেছে না এমন নহে, কিন্তু তাহাই একান্ত হইয়া নাই। সেই সময়েই সেই নিষ্ঠুর বলদৃপ্ত লুন্ডতার মধ্য হইতেই ধিকার ও ভৎসনা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। প্রবলের অজ্ঞায়েব প্রতিবাদ করিতে পারেন এবং প্রতিকার করিতে চাহেন এমন সাহসিক বীরও সেখানে অনেক আছেন। দূরবর্তী পরজাতির পক্ষ অবলম্বন করিয়া নির্ধাতন সহ্য করিতে কুণ্ঠিত নহেন, এমন দৃঢ়নিষ্ঠ সাধুব্যক্তির সেখানে অভাব নাই। ভারতবাসীরা স্বদেশের রাজ্যশাসনে প্রশস্ত অধিকার লাভ করেন, সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত ত্রুটিক্ষেপ ভারতবর্ষীয় আমাদের দেশে আছেন— কিন্তু দীক্ষা তাঁহারা কাহাদের কাছে পাইয়াছেন এবং যথার্থ সহায় তাঁহাদের কে। যাহারা আত্মীয়দের বিক্রম ও প্রতিকূলতা স্বীকার করিয়া স্বজাতির স্বার্থপরতার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করিবার জন্ত দেশের লোককে ধর্মের দোহাই দিতেছেন, তাঁহারা কোন্ দেশের মানুষ। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু সত্যদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প নহেন। কেননা, তাঁহাদের মধ্যেই তাঁহাদের শেষ নহে। দেশের মধ্যে গোচর এবং অগোচর তাঁহাদের একটি পরম্পরা আছে; তাঁহারা সকলেই এক কাজ করিতেছেন বা এক সময়ে আছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা এই সমাজের ভিতরকার শ্রামশক্তি। তাঁহারা এই ক্ষত্রিয়; পৃথিবীর সমস্ত দুর্বলকে কম হইতে জ্ঞান করিবার জন্ত তাঁহারা সহজ কবচ ধারণ করিয়াছেন। দুঃখ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্ত যিনি দুঃখ বহন করিয়াছিলেন, মৃত্যু হইতে মানুষকে অমৃতলোকে লইয়া যাইবার জন্ত যিনি মৃত্যু স্বীকার করিয়াছেন, সেই তাঁহাদের স্বর্গীয় গুরুর অপমানিত রক্তাক্ত দুর্গম পথে তাঁহারা সারি সারি চলিয়াছেন। সমস্ত জাতির চিত্তপ্রান্তরের মাঝখান দিয়া তাঁহারা এই অমৃতমন্দাকিনীর ধারা।

আমরা সর্বদাই নিজেকে এই বলিয়া সাধনা দিয়া থাকি যে, আমরা ধর্মপ্রাণ আধ্যাত্মিক জাতি, বাহিরের বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই; এইজন্যই বহির্বিশ্বেরই আমরা দুর্বল হইয়াছি। বাহিরের বৈশ্ব সমাজে আমাদের লজ্জাকে এমনি করিয়া আমরা

ধর্ম করিতে চাই। আমাদের অনেকেই যুগে আত্মাশ্রয় করিয়া বলিয়া থাকেন, দারিদ্র্যই আমাদের কুসংস্কার।

ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি বাহাদুরের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই কুসংস্কার। যে কুসংস্কার কোনো মূল্য নাই তাহা কুসংস্কারই নহে। এইজন্য ভাগ্যের দারিদ্র্যই কুসংস্কার, অভাবের দারিদ্র্য কুসংস্কার নহে; শিবের দারিদ্র্যই কুসংস্কার, অলসতার দারিদ্র্য কুসংস্কার। বাহাদুর পোট ভরিয়া ধাইতে পার না বলিয়া নিম্নত অবসাদে মগ্ন, বাহাদুর কোনোমতে প্রাণ বাঁচাইতে চায় অথচ প্রাণ বাঁচাইবার কঠিন উপায় গ্রহণ করিবার শক্তি নাই বলিয়া বাহাদুর বারবার ধূলার লুটাইয়া পড়ে, দারিদ্র্য বলিয়াই বাহাদুর সুযোগ পাইলে অন্য দারিদ্র্যকে শোষণ করে এবং অল্প বলিয়াই ক্রমশঃ পাইলে বাহাদুর অল্প অল্পকে আঘাত করে, কখনোই দারিদ্র্য তাহাদের কুসংস্কার নহে।

আমাদের এই-যে কুসংস্কার দারিদ্র্য অপমান ইহাকে কোনোমতেই আমাদের ধর্মপ্রাণতার পুরস্কার বলিয়া আমরা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রসারিত করিতে পারি নাই; তাহাকে ব্যক্তিগত উন্নতিসাধনার মধ্যে বন্ধ করিয়াছি, তাহার আশ্রানে সমস্ত মানুষকে একত্র করি নাই; যেখানে সমাজশাসনের অল্প উৎপাতের দ্বারা বিধিবিধানের পাথরের জাঁতার মানুষের বিচারশক্তি ও স্বাধীন মনোবুদ্ধিকে পিষিয়া সমস্তকে একাকার করিয়াছি সেইখানেই ধর্মবোধের সংকীর্ণতা ও অচেতনতাই আমাদেরকে জড়পিণ্ড করিয়া দাসত্বের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। আমরা এখনো মনে করিতেছি, আইনের দ্বারা আমাদের দুর্গতির প্রতিকার হইবে, রাষ্ট্রশাসনসভার আসন লাভ করিলে আমরা মানুষ হইয়া উঠিব— কিন্তু জাতীয় সমগ্ৰতা কলের সামগ্রী নহে, এবং মানুষের আত্মা বহুত্ব আপনায় ভিতর হইতে তাহার পূরা মূল্য চুকাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারিলে তত্বত্ব, নান্দ্র: পদা বিস্তৃত অর্থনায়।

তাই বলিতেছিলাম, তীর্থযাত্রার মানস করিয়াই যদি যুরোপে বাইতে হয় তবে তাহা নিশ্চয় হইবে না। সেখানেও আমাদের গুরু আছেন; সে গুরু সেখানকার মানবসমাজের অন্তরতম দিব্যশক্তি। সর্বত্রই গুরুকে প্রকারে গুরুে সন্মান করিয়া লইতে হয়; চোখ বেলিলেই তাঁহাকে দেখা যায় না। সেখানেও সমাজের যিনি প্রাণপুরুষ, অহঙ্কার ও অহংকার-বশত তাঁহাকে না দেখিয়া কিরিয়া আসা অসম্ভব নহে; এবং এমন একটা অদ্ভুত ধারণা লইয়া আসাও অসম্ভব নহে যে— ইংলণ্ডের প্রতাপ পার্লামেন্টের দ্বারা লুই হইতেছে— যুরোপের ঐশ্বর্য কারখানাঘরে প্রস্তুত হইতেছে এবং পাশ্চাত্য মহাদেশের সমস্ত বাহাদুর যুদ্ধের অস্ত্র, বাণিজ্যের জাহাজ এবং বাহুবলপুঞ্জের দ্বারা সংঘটিত। নিজের মধ্যে শক্তির সত্য অস্বীকারি বাহাদুর নাই অতি সহজেই সে মনে

করিয়া বসে, শক্তি বাহিরেই আছে এবং যদি কোনো স্বযোগে আমরাও কেবলমাত্র ঐ জিনিসগুলি দখল করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের অভাবপূরণ হয়। কিন্তু, যেনাহং নাশ্বতা শ্রাম্ কিমহং তেন সুধাম্—এ কথাটি যুরোপেরও অন্তরের কথা। যুরোপও নিশ্চয়ই জানে, রেল টেলিগ্রাফে কলে কারখানায় সে বড়ো নহে। এইজন্যই যুরোপ বীরের জায় সত্যত্রস্ত গ্রহণ করিয়াছে; বীরের জায় সত্যের জন্ত ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিতেছে; এবং যতই ভুল করিতেছে, যতই ব্যর্থ হইতেছে, ততই দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত নূতন করিয়া উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছে—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিতেছে না। মাঝে মাঝে অসম্মল দেখা দিতেছে, সংঘাতে সংঘর্ষে বহি জলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্রমহানে মাঝে মাঝে বিষণ্ণ উল্লসিত হইতেছে, কিন্তু মনকে তাহার কোনোমতেই মানিয়া লইতেছে না। অস্ত্র তাহাদের প্রস্তুত, সৈন্যদল তাহাদের নিতীক, এবং সত্যের দীকার তাহার। মৃত্যুজয়ী বল লাভ করিয়াছে। সত্যের সম্মুখীন হইতে আমরা আলস্ত করিয়াছি, সত্যের সাধনায় আমরা উদাসীন, আমরা ঘরগড়া বীধা-বীধনের মধ্যে আপাদমস্তক আপনাকে জড়াইয়া তাহাকেই সত্য আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছি। সেইজন্য বিপদের দিন যখন আসন্ন হয়, সত্য পক্ষা ব্যতীত যখন আমাদের আর গতি নাই, তখন আমরা কিছুতেই আপনাকে আগ্রস্ত করিতে পারি না, আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। তখনো খেলা করাকেই কাজ করা মনে করি, নকল করিয়াই আসলের ফল প্রত্যাশা করি, কৃত্রিম উৎসাহকে উদ্দীপ্ত রাখিতে পারি না, আরও কর্মকে শেষ করিতে পারি না এবং ভূরিপরিমাণ ভাবিকতা ও ভাবুকতার জালে জড়িত হইয়া বারম্বার ব্যর্থ হইতে থাকি। সেইজন্য সত্যের দাম্পিত্যকে বীরের জায় সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিবার দীক্ষা, সেই সত্যের প্রতি অবিচালিত প্রাণান্তিক নিষ্ঠা, জীবনের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদকে প্রাণপণ হুঃখের মূল্য দিয়া অর্জন করিবার সাধনা, এবং বুদ্ধি হ্রদয় ও কর্মে সকল দিক দিয়া মানুষের কল্যাণসাধন ও মানুষের প্রতি প্রজ্ঞা দ্বারা ভগবানের হুঃসাধ্য সেবাত্রস্ত গ্রহণ করিবার জন্ত তীর্থযাত্রীর পক্ষে যুরোপে যাত্রা কখনোই নিষ্পল হইতে পারে না। অবশ্য, যদি তাহার মনে প্রজ্ঞা থাকে এবং সর্বাদীণ যত্নশ্রমের পরিপূর্ণতাকেই যদি সে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

আমি জানি, যুরোপের সঙ্গে এক জায়গায় আমাদের স্বার্থের সংঘাত ঘটিয়াছে এবং সেই সংঘাতে আমাদেরকে অন্তরে বাহিরে অনেক স্থলে গভীর বেদনা পাইতে হইতেছে। সে বেদনা আমাদের আধ্যাত্মিক দৈবেরই হুঃখ এবং আমাদের লুক্কিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হইলেও তাহা বেদনা। আমাদের পক্ষে এই বেদনার উপলব্ধি দ্বারা তাহাদের ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় আমরা নানা আকারে পাইয়া থাকি।

ইহাও আমরা প্রতিদিন দেখিরাছি, তাহারা নিজের নীচতাকে উদ্ধৃত কপটতার দ্বারা গোপন করিয়াছে ও পরজাতীয়ের বাহ্যাত্মকে অন্ধতা ও অহংকারের দ্বারা অস্বীকার করিয়াছে। এই কারণেই আমাদের সেই ক্ষতবেদনা লইয়া যুরোপের সত্যকে দেখিতে ও তাহাকে গ্রহণ করিতে আমরা অন্তরের মধ্যে বাধা পাইয়া থাকি। তাহাদের ধর্মকেও আমরা অবিশ্বাস করি ও তাহাদের সত্যতাকে আমরা বস্তুজালজড়িত মূল-পদার্থ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। শুধু তাহাই নহে, আমাদের ভয় আছে, পাছে প্রবলের প্রবলতাকেই আমরা সত্যের আগুন দিয়া তাহার পূজা করি ও তাহার কাছে ধূলিলুপ্তিত হইয়া আপনাকে অপবিত্র করি; পাছে অন্তের গৌরবকে নিজের গৌরবের সহিত গ্রহণ করিতে না পারি; পাছে আত্ম-অবিশ্বাসের অবসাদে নিজের সত্যকে বিসর্জন দিয়া অল্পকরণের শূন্যতার মধ্যে পরের কারার ছায়া ও পরের ধর্মের প্রতিধ্বনি হইয়া জগৎ-সংসারে নিজেকে একেবারে ব্যর্থ করিয়া দিই; পাছে এইরূপ একটা অদ্ভুত ভ্রম করিয়া বসি যে, অন্তকে স্বীকার করিতে গিয়া নিজেকে অস্বীকার করিয়া বসাই যথার্থ ঔদার্যের পন্থা।

এই-সমস্ত বিষয়বিপদ আছে; সেইজন্যই এই পথে সত্যসন্ধানের যাত্রা তীর্থযাত্রা। সমস্ত অসত্যকে উত্তীর্ণ হইয়াই চলিতে হইবে; বাধার দুঃখকে সহ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে; আত্ম-অভিমানের ব্যর্থ বোঝাকে পচ্চাতে কেলিয়া বাইতে হইবে, অথচ আত্মগৌরবের পাথেরকে একান্ত যত্নে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। বস্তুত, অত্যন্ত বিষের দ্বারাই আমরা এই তীর্থযাত্রার পূর্ণ ফললাভের আশা করিতে পারি; কারণ বাহা সহজে পাই তাহা সচেতন হইয়া গ্রহণ করি না; অথচ কোনো মহৎ লাভের যথার্থ সকলতাই চেতনার পূর্ণতর বিকাশ, অর্থাৎ, আমরা বাহা-কিছু সত্যভাবে লাভ করি তাহার দ্বারা আপনাকেই সত্যতররূপে উপলব্ধি করি— তাহা যদি না করি, যদি বাহিরের বস্তুকেই বাহিরে পাই, তবে তাহা দ্বারা, তাহা বিখ্যা।

বোম্বাই শহর

বোম্বাই শহরটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া আসিবার জন্য কাল বিকালে বাহির হইরাছিলাম। প্রথম ছবিটা দেখিয়াই যেন হইল, বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চোরা আছে; কলিকাতার যেন কোনো চোরা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জোড়াতাড়ি দিয়া তৈরি হইরাছে।

আসল কথা, সমুদ্র বোম্বাই শহরকে আকার দিচ্ছে, নিজের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বেলাড়ুরি দিয়া তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সমুদ্রের আকর্ষণ বোম্বাইয়ের সমস্ত রাস্তা-গলির ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন সমুদ্রটা একটা প্রকাণ্ড কুংপিও, প্রাণধারাকে বোম্বাইয়ের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়া টানিয়া লইতেছে এবং ভরিয়া দিতেছে। সমুদ্র চিরদিন এই শহরটিকে বৃহৎ বাহিরের দিকে মুখ করিয়া রাখিয়া দিচ্ছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কলিকাতার মিলনের একটি বন্ধন ছিল গঙ্গা। এই গঙ্গার ধারাই হৃদয়ের বার্তাকে হৃদয় রহস্যের অভিমুখে বহিয়া লইয়া যাইবার খোলা পথ ছিল। শহরের এই একটি জানালা ছিল যেখানে মুখ বাড়াইলে বোঝা যাইত, জগৎটা এই লোকালয়ের মধ্যেই বদ্ধ নহে। কিন্তু, গঙ্গার প্রাকৃতিক মহিমা আর রহিল না, তাহাকে দুই তীরে এমনি আঁটাগাঁটা পোশাক পরাইয়াছে, এবং তাহার কোমরবন্ধ এমন কষিয়া বাঁধিয়াছে যে, গঙ্গাও লোকালয়েরই পেয়াদার মূর্তি ধরিয়াছে, গাধাবোট বোঝাই করিয়া পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তাহার যে আর-কোনো বড়ো কাজ ছিল তাহা আর বুঝিবার জো নাই। জাহাজের মাঙ্গলের কণ্টকারণে মকরবাহিনীর মকরের গুঁড় কোথায় লজ্জায় লুকাইল।

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না। পাটের কারবার তাহার বিশাল বস্তুর নীলকান্ত মণিটিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। তাই এই শহরের ধারে সমুদ্রের মূর্তিটি অক্লান্ত ; যেমন এক দিকে সে মানুষের কাজকে পৃথিবীময় ছড়াইয়া দিতেছে তেমনি আর-এক দিকে সে মানুষের আশ্রি হরণ করিতেছে, ঘোরতর কর্মের সম্মুখেই বিরাট একটি অবকাশকে মেলিয়া রাখিয়াছে।

তাই আমার ভারি ভালো লাগিল যখন দেখিলাম, শত শত নরনারী সাজসজ্জা করিয়া সমুদ্রের ধারে গিয়া বসিয়াছে। অপরাহ্নের অবসরের সময় সমুদ্রের ডাক কেহ অমান্ত করিতে পারে নাই। সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের কাজ, এবং সমুদ্রের কোলের কাছে ইহাদের আনন্দ। আমাদের কলিকাতার শহরে এক ইন্ডেন-গার্ডেন আছে, কিন্তু সে কৃপণের ঘরের মেয়ে, তাহার কণ্ঠে আশ্রয় নাই। সেই রাজপুরুষের তৈরি বাগান—সেখানে কত শাসন, কত নিষেধ। কিন্তু, সমুদ্র তো কাহারও তৈরি নহে, ইহাকে তো বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এইজন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই শহরের এমন নিত্যোৎসব। কলিকাতার কোথাও তো সেই অসংকোচ আনন্দের একটুকু স্থান নাই।

সবচেয়ে বাহা দেখিয়া হৃদয় জুড়াইয়া যায় তাহা এখানকার নরনারীর মেলা। নারীবল্লিত কলিকাতার দৈশ্চট। যে কতখানি তাহা এখানে আসিলেই দেখা যায়। কলিকাতায় আমরা যাহুযকে আখ্যান করিয়া দেখি, এইজন্য তাহার আনন্দরূপ দেখি না। নিশ্চয়ই সেই না-দেখার একটা দণ্ড আছে।

নিশ্চয়ই তাহা যাহুযের মনকে সংকীর্ণ করিতেছে, তাহার স্বাভাবিক বিকাশ হইতে বঞ্চিত করিতেছে। অপরাহ্নে স্বীপুরুষ ও শিশুরা সমুদ্রের ধারে একই আনন্দে মিলিত হইয়াছে, সত্যের এই একটি অভ্যস্ত স্বাভাবিক শোভা না দেখিতে পাওয়ার মতো ভাগ্যহীনতা যাহুযের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। যে ছুঃখ আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদেরকে অচেতন করিয়া রাখে, কিন্তু তাহার ক্ষতি প্রত্যাহই জমা হইতে থাকে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঘরের কোণের মধ্যে আমরা নরনারী মিলিয়া থাকি, কিন্তু সে মিলন কি সম্পূর্ণ। বাহিরে মিলিবার যে উদার বিশ্ব রহিয়াছে সেখানে কি সরল আনন্দে একদিনও আমাদের পরস্পর দেখাশোনা হইবে না।

আমাদের গাড়ি ম্যাথেরান পাহাড়ের উপরে একটা বাগানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছোটো বাগানটিকে বেটন করিয়া চারি দিকে বেধ পাতা। সেখানেও দেখি কুলদ্বীরা আত্মীয়দের সঙ্গে বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন। কেবল পার্শ্ব রমণী নহে, কপালে-সিংহুরের-ফোটা-পর্যায় মায়াটি মেয়েরাও বসিয়া আছেন— মুখে কেমন প্রশান্ত প্রসন্নতা। নিজের অন্তিমট। যে একটা বিষম বিপদ, সেটাকে চারি দিকের দৃষ্টি হইতে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়, এ ভাবনা লেশমাত্র তাঁহাদের মনে নাই। মনে মনে ভাবিলাম, সমস্ত দেশের মাথার উপর হইতে কত বড়ো একটা সংকোচের বোঝা নামিয়া গিয়াছে এবং তাহাতে এখানকার জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে কত দিকে সহজ ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর মুক্ত বায়ু ও আলোকে সঙ্গরূপ করিবার সহজ অধিকারটি লোপ করিয়া দিলে যাহুয নিজেই নিজের পক্ষে কিরূপ একটা অস্বাভাবিক বিষ হইয়া উঠে, তাহা আমাদের দেশের মেয়েদের সর্বদা সংকোচ অসহায়তা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। রেলোয়ে স্টেশনে আমাদের মেয়েদের দেখিলে, তাহাদের প্রতি সমস্ত দেশের বহুকালের নিষ্ঠুরতা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। ম্যাথেরানের এই বাগানে ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের বীডন-পার্ক ও গোলদিঘিকে মনে করিয়া দেখিলাম— তাহার সে কী লক্ষীছাড়া কপণতা।

প্রজাপতির দল যখন ফুলের বনে যথু খুঁজিয়া ফেরে তখন তাহারা যে বাবুয়ানা করিয়া বেড়ায় তাহা নহে, বস্তুত তখন তাহারা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা

আপিসে বাইবার কালো আচকান পরে না। এখানকার জনতার বেশভূষার যখন নানা রঙের সমাবেশ দেখি তখন আমার সেই কথা মনে পড়ে। কাজকর্মের ব্যস্ততাকে গায়ে পড়িয়া শ্রীহীন করিয়া তুলিবার যে কোনো একান্ত প্রয়োজন আছে আমার তো তাহা মনে হয় না। ইহাদের পাগড়িতে, পাড়ে, মেয়েদের শাড়িতে, যে বর্ণচ্ছটা দেখিতে পাই তাহাতে একটা জীবনের আনন্দ প্রকাশ পায় এবং জীবনের আনন্দকে আশ্রিত করে। বাংলাদেশ ছাড়াইয়া তাহার পরে অনেক দূর হইতে আমি এইটেই দেখিতে দেখিতে আসিয়াছি। চাষা চাষ করিতেছে কিন্তু তাহার মাথায় পাগড়ি এবং গায়ে একটা মেঝাই পরা। মেয়েদের তো কথাই নাই। আমাদের সঙ্গে এখানকার বাহিরের এই প্রভেদটি আমার কাছে সামান্য বলিয়া ঠেকিল না। কারণ, এই প্রভেদটুকু অবলম্বন করিয়া ইহাদের প্রতি আমার মনে একটি প্রকার সন্মতি হইল। ইহারা নিজেকে অবজ্ঞা করে না; পরিচ্ছন্নতা দ্বারা ইহারা নিজেকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। এটুকু মানুষের পরম্পরের প্রতি পরম্পরের কর্তব্য; এইটুকু আবরণ, এইটুকু সজ্জা প্রত্যেকের না থাকিলে মানুষের রিক্ততা অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া দেখা দেয়। আপনার সমাজকে কুদৃষ্ট দীনতা হইতে প্রত্যেকেই যদি রক্ষার চেষ্টা না করে তবে কত বড়ো একটা নৈখিল্য সমস্ত দেশকে বিশ্বের চক্ষে অপমানিত করিয়া রাখে, তাহা অভ্যাসের অগাধতা-বশতই আমরা বুঝিতে পারি না।

আর-একটা জিনিস বোম্বাই শহরে অত্যন্ত বড়ো করিয়া চোখে পড়িল। সে এখানকার দেশী লোকের ধনশালিতা। কত পার্সি মুসলমান ও গুজরাটি বণিকদের নাম এখানকার বড়ো বড়ো বাড়ির গায়ে খোদা দেখিলাম। এত নাম কলিকাতায় কোথাও দেখা যায় না। সেখানকার ধন চাকরিতে ও জমিদারিতে; এইজন্য তাহা বড়ো গ্লান। জমিদারির সম্পদ বহু অলের মতো; তাহা কেবলই ব্যবহারে ক্ষীণ ও বিলাসে দূষিত হইতে থাকে। তাহাতে মানুষের শক্তির প্রকাশ দেখি না; তাহাতে ধনাগমের নব নব তরঙ্গলীলা নাই। এইজন্য আমাদের দেশে যেটুকু ধনসঞ্চয় আছে তাহার মধ্যে অত্যন্ত একটা ভীকৃত্য দেখি। বাড়োয়ারি পার্সি গুজরাটি পাঞ্জাবিদের মধ্যে দানে মুক্তহস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু বাংলাদেশ সকলের চেয়ে অল্প দান করে। আমাদের দেশের চাহার খাতা আমাদের দেশের পোকের মতো— তাহার চরিত্রের স্থান নাই বলিলেই হয়। ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশ সচেতনভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস। এখানকার ধনীদের জীবনযাত্রা সরল অথচ ধনের মূর্তি উদার, ইহা দেখিয়া আনন্দবোধ হয়।

জলস্থল

আমরা ডাঙার মাছুষ, কিন্তু আমাদের চারি দিকে সমুদ্র। জল এবং স্থল এই দুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে মাছুষ। কিন্তু, মাছুষের প্রাণের মধ্যে এ কী সাহস। যে জলের কূল দেখিতে পাই না মাছুষ তাহাকেও বাধা বলিয়া মানিল না, তাহার মধ্যে ভাসিয়া পড়িল।

যে জল মাছুষের বন্ধু সেই জল ডাঙার মাঝখান দিয়াই বহে। সেই নদীগুলি ডাঙার ভগিনীদের মতো। তাহারা কত দূরের পাথর-বাধা ঘাট হইতে কাঁধে করিয়া জল লইয়া আসে; তাহারাই আমাদের তৃষ্ণা দূর করে, আমাদের অন্নের আয়োজন করিয়া দেয়। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কী বিবম বিরোধ। তাহার অগাধ জলরাশি সাহারার মরুভূমির মতোই পিপাসায় পরিপূর্ণ। আশ্চর্য, তবু সে মাছুষকে নিরস্ত করিতে পারিল না। সে বমরাজের নীল মহিষটার মতো কেবলই শিঙ ভুলিয়া মাথা ঝাঁকাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই মাছুষকে পিছু হঠাইতে পারিল না।

পৃথিবীর এই ছুইটা ভাগ—একটা আশ্রয়, একটা অনাশ্রয়; একটা স্থির, একটা চঞ্চল; একটা শান্ত, একটা ভীষণ। পৃথিবীর যে সন্তান সাহস করিয়া এই উভয়কেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছে সেই তো পৃথিবীর পূর্ণ সম্পদ লাভ করিয়াছে। বিয়ের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্যকে সে পাইল না। এইজন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে, চকলা লক্ষী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই।

বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন, লক্ষীর এই পণ। এইজন্যই মাছুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন। পার হইতে পারিলে তবে তিনি ধরা দিবেন। বাহারা কূলে বসিয়া কলশকে ঘুমাইয়া পড়িল, হাল ধরিল না, পাল যেলিল না, পাড়ি দিল না, তাহারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইল।

আমাদের আহাজ বখন নীল সমুদ্রের ক্রুদ্ধ কবরকে কেনিল করিয়া, সগর্বে পশ্চিম-দিগন্তের কূলহীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন এই কথাটাই আমি ভাবিতে লাগিলাম। স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, যুরোপীয় জাতিরা সমুদ্রকে যেদিন বরণ করিল সেইদিনই লক্ষীকে বরণ করিয়াছে। আর, বাহারা মাটি কামড়াইয়া পড়িল তাহারা আর অগ্রসর হইল না, এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেল।

মাটি যে বাধিয়া রাখে। সে অতি রেহীলা যাতার মতো সন্তানকে কোনোমতে দূরে বাইতে দেয় না। শাক-ভাত তরি-তরকারি দিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার, তাহার

পরে ঘনছায়াভলে শ্রামল অকলের উপর ঘুম পাড়াইয়া দেয়। ছেলে যদি একটু ঘরের বাহির হইতে চায় তবে তাহাকে অবেলা অথবা প্রভৃতি জুজুর ডর দেখাইয়া শাস্ত করিয়া রাখে।

কিন্তু, মানুষের যে দূরে যাওয়া চাই। মানুষের মন এত বড়ো যে, কেবল কাছটুকুর মধ্যে তাহার চলাফেরা বাধা পায়। জোর করিয়া সেইটুকুর মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গেলেই, তাহার অনেকখানি বাদ পড়ে। মানুষের মধ্যে বাহারা দূরে বাইতে পাইয়াছে তাহারাই আপনাকে পূর্ণ করিতে পারিয়াছে। সমুদ্রই মানুষের সম্মুখবর্তী সেই অতিদূরের পথ; দুর্লভের দিকে, দুঃসাধ্যের দিকে সেই তো কেবলই হাত তুলিয়া তুলিয়া ডাক দিতেছে। সেই ডাক শুনিয়া বাহাদের মন উতলা হইল, বাহারা বাহির হইয়া পড়িল, তাহারাই পৃথিবীতে জিতিল। ঐ নীলাম্বরানির মধ্যে কুকের বাশি বাজিতেছে, কুল ছাড়িয়া বাহির হইবার অন্ত ডাক।

পৃথিবীর একটা দিকে সমাপ্তির চেহারা, আর-একটা দিকে অসমাপ্তির। ডাঙা তৈরি হইয়া গিয়াছে; এখনো তাহার মধ্যে যেটুকু ডাঙাগড়া চলিতেছে তাহার গতি স্বচ্ছন্দ, চোখে পড়েই না। সেটুকু ডাঙাগড়ারও প্রধান কারিগর জল। আর, সমুদ্রের গর্ভে এখনো সৃষ্টির কাজ শেষ হয় নাই। সমুদ্রের মজুরি করে যে-সকল নদনদী তাহার দূর দূরান্তর হইতে বুড়ি বুড়ি কাদা বালি মাথায় করিয়া আনিতেছে। আর, কত লক্ষ লক্ষ শামুক বিহুক প্রবালকীট এই স্বাক্ষরিত সৃষ্টির উপকরণ অহোরাত্র জোগাইয়া দিতেছে। ডাঙার দিকে পাড়ি পড়িয়াছে, অস্তুত সেমিকোলন; কিন্তু সমুদ্রের দিকে সমাপ্তির চিহ্ন নাই। দিগন্তব্যাপী অনিশ্চয়তার চিরচঞ্চল রহস্যাকারে মধ্য কী যে ঘটিতেছে, তাহার ঠিকানা কে জানে। অশান্ত এবং অপ্রান্ত এই সমুদ্র; অনন্ত তাহার উদ্ভাস।

পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি এই সমুদ্রকে বিশেষভাবে বরণ করিয়াছে তাহার সমুদ্রের এই কুলহীন প্রয়াসকে আপন চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছে। তাহারাই এমন কথা বলিয়া থাকে, কোনো-একটা চরম পরিণাম মানবজীবনের লক্ষ্য নহে; কেবল অবিজ্ঞান-ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহার অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভয়ে কাঁপাইয়া পড়িয়া কেবলই নব নব সম্পদকে আহরণ করিয়া আনিতেছে। তাহার কোনো-একটা কোণে বাসা বাধিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। দূর তাহাদিগকে ডাকে; দুর্লভ তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। অসন্তোষের ঢেউ দিবারাজি হাজার হাজার হাতুড়ি পিটাইয়া তাহাদের চিত্তের মধ্যে কেবলই ডাঙাগড়ার আবৃত্ত আছে। রাজি আগিয়া যখন সমস্ত অগন্তের চোখে পলক টানিয়া দেয় তখনো তাহাদের

কারখানাঘরের দীপচন্দ্র নিমেষ ফেলিতে জানে না। ইহারা সমাপ্তিকে স্বীকার করিবে না; বিজ্ঞানের সঙ্গেই ইহাদের হাতাহাতি লড়াই।

আর, ডাঙার বাহারা বাগা বাধিয়াছে তাহারা কেবলই বলে, ‘আর নহে, আর দরকার নাই।’ তাহারা যে কেবল ক্ষুধার খাড়াটাকে সংকীর্ণ করিতে চাহে তাহা নহে, তাহারা ক্ষুধাটাকে হৃদয় মারিয়া নিকাশ করিয়া দিতে চায়। তাহারা যেটুকু পাইয়াছে তাহাকেই কোনোমতে স্বামী করিবার উদ্দেশে কেবলই চারি দিকে স্থানিচ্চিত্তের সনাতন বেড়া বাধিয়া তুলিতেছে। তাহারা মাথার দিয়া দিয়া বলিতেছে, ‘আর বাই কর, কোনোমতে সমুদ্র পার হইতে চেষ্টা করিও না। কেননা সমুদ্রের হাওয়া যদি লাগে, অনিচ্চিত্তের স্বাদ যদি পাও, তবে মানুষের মনের মধ্যে অসন্তোষের যে একটা নেশা আছে তাহাকে আর কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে।’ সেই অপরিচিত নৃতনের রাগিনী লইয়া কালো সমুদ্রের বাধির ডাক কোনো-একটা উতলা হাওয়ার বাহাতে ঘরের মধ্যে আসিয়া পৌছিতে না পারে, সেইজন্য কৃত্রিম প্রাচীরগুলোকে বত সমুদ্র করা সম্ভব সেই চেষ্টাই কেবল চলিতেছে।

কিন্তু, এই সমুদ্র ও ডাঙার স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া, তাহার বিরোধ ঘুচাইবার দিন আসিয়াছে বলিয়া মনে করি। এই দুয়ে মিলিয়াই মানুষের পৃথিবী। এই দুয়ের মধ্যে বিচ্ছেদকে আগাইয়া রাখিলেই, মানুষের বস্ত-কিছু বিপন্ন। তবে এতদিন এই বিচ্ছেদ চলিয়া আসিতেছে কেন। সে কেবল ইহারা হরগৌরীর মতো তপস্তার দ্বারা পরস্পরকে পাইবে বলিয়াই। ঐ-যে এক দিকে শ্রাবু দিগন্তরবেশে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন, আর-এক দিকে গৌরী নব নব বসন্তপুষ্পে আপনাকে সাজাইয়া তুলিতেছেন—স্বর্গের দেবতারা ইহাদেরই শুভযোগের অপেক্ষা করিয়া আছেন, নহিলে কোনো মঙ্গল-পরিণাম জন্মলাভ করিবে না।

আমরা ডাঙার লোকেরা ভগবানের সমাপ্তির দিককেই সত্য বলিয়া আশ্রয় করিয়াছি তাহাতে কতি হইত না; কিন্তু আমরা ডাঙার ব্যাপ্তির দিকটাকে একেবারেই মিথ্যা বলিয়া, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি। সত্যকে এক অংশে মিথ্যা বলিলেই তাহাকে অপরাংশেও মিথ্যা করিয়া তোলা হয়। আমরা স্থিতিকে আনন্দকে মানিলাম, কিন্তু শক্তিকে দুঃখকে মানিলাম না। তাই আমরা রানীকে অপমান করাতে রাজার ক্ষুব্ধ করিয়াও রক্ষা পাইলাম না; সত্য আবাদিগকে শত শত বৎসর ধরিয়া নানা আঘাতেই মারিতেছেন।

সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একান্ত সত্য করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সমাপ্তিকে কোনোমতেই মানিবে না, এই তাহাদের

পণ। এইজন্ত বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহরণ করিতেছে অথচ সন্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি ভ্রমজ্ঞানের দিকেও তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, সত্যের মধ্যে প্রমাস্থান বলিয়া কোনো পদার্থই নাই, আছে কেবল গমন। কেবলই হইয়া উঠা, কিন্তু কী যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকানা কোনো-খানেই নাই। ইহা এমন একটি সমুদ্রের মতো বাহার কূলও নাই, তলও নাই, আছে কেবল ঢেউ— বাহা পিপাসাও মেটায় না, কসলও ফলায় না, কেবলই দোলা দেয়।

আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর দুঃখকে বলিলাম মিথ্যা মায়ী; উহারা দেখিল দুঃখকে, আর আনন্দকে বলিল মিথ্যা মায়ী। কিন্তু, পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে তো কোনোটাই বাধ পড়িতে পারে না; পূর্ব পশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্বও মিথ্যা হয় পশ্চিমও মিথ্যা হয়। আনন্দাচ্ছাদিত ধর্ম্মানি ভূতানি আরম্ভে— অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সমস্ত-কিছু জন্মিতেছে— এ কথা যেমন সত্য, 'স তপোহতপাত' অর্থাৎ তপস্শ্রা হইতে, দুঃখ হইতেই সমস্ত-কিছু সৃষ্ট হইতেছে, এ কথা তেমনি সত্য। গায়কের চিন্তে দেশকালের অভীত গানের পূর্ণ আনন্দও যেমন সত্য আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য। এই আনন্দ এবং দুঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি, এই চিরপুরাতন এবং চিরনূতন, এই ধনধান্তপূর্ণ ভূমি ও দুঃখান্ধচকল সমুদ্র, উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করাই সত্যকে স্বীকার করা।

এইজন্ত দেখিতেছি, বাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্নত হইয়া উঠিয়া অপঘাতমুহুর অভিমুখে ছুটিতেছে, পদে পদেই তাহাদের জাহাজ কেবল আকস্মিক বিপ্লবের চোরা পাহাড়ের উপর গিয়া ঠেকিতেছে। আর বাহারা বিকাশকে মিথ্যা বলিয়া কেবলমাত্র চরমকেই মানিতে চায়, তাহারা নির্বীৰ্য ও জীর্ণ হইয়া এক শয্যা পড়িয়া অভিভূত হইয়া মরিতেছে।

কিন্তু, চলিতে চলিতে একদিন ঐ ডাঙার গাড়ি এবং সমুদ্রের জাহাজ যখন একই বন্দরে আসিয়া পৌছিতে এবং দুই পক্ষের মধ্যে পণ্যবিনিময় হইবে তখন উভয়ে বাঁচিয়া যাইবে। নহিলে কেবলমাত্র আপনার পণ্য দিয়া কেহ আপনার দায়িত্ব বুচাইতে পারে না; বিনিময় না করিতে পারিলে বাণিজ্য চলে না এবং বাণিজ্য না চলিলে লক্ষ্মীর দেখা পাওয়া যায় না।

এই বাণিজ্যের যোগেই মানুষ পরস্পর মিলিবে বলিয়াই, পৃথিবীতে ঐশ্বর্য দিকে দিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। একদা জীবরাজ্যে স্ত্রীপুরুষের বিভাগ ঘটাতোই যেমন দেখিতে দেখিতে বিচিত্র স্বধনুঃধের আকর্ষণের ভিতর দিয়া প্রাণীদের প্রাণসম্পদ আজ আশ্চর্যরূপে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তেমনি মানুষের প্রকৃতিও কেহ বা স্থিতিকে কেহ

বা গতিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করাতেই আজ আমরা এমন একটি মিলনকে আশা করিতেছি, মানুষের সত্যতাকে বাহ্য বিচিত্রভাবে সার্থক করিয়া তুলিবে।

আম্ব-সমুদ্র

১৬ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১২

সমুদ্রপাড়ি

বন্দর পার হইয়া জাহাজে গিয়া উঠিলাম। আরও অনেকবার জাহাজে চড়িয়াছি। প্রত্যেক বারেই প্রথমটা কেমন মনের মধ্যে একটা সংকোচ উপস্থিত হয়। সে সংকোচ অপরিচিত স্থানে অপরিচিত মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিবার সংকোচ নহে। জাহাজটার সঙ্গে নিজের জীবনের বিচ্ছেদ অত্যন্ত বেশি করিয়া অনুভব করি। এ জাহাজ বাহারা গড়িয়াছে, বাহারা চালাইতেছে, তাহারাই এ জাহাজের প্রভু—আমি টাকা দিয়া টিকিট কিনিয়া এখানে স্থান পাইয়াছি। এই সমুদ্রের চিরুহীন পথের উপর দিয়া কত বংশ ধরিয়া ইহাদের কত নাবিক আপনার জীবনের অন্ত রেখা রাখিয়া গিয়াছে; বারবার কত শত যত্নের দ্বারা তবে এই পথ ক্রমে সরল হইয়া উঠিতেছে। আমি যে আজ এই জাহাজে দিনে নির্ভয়ে জাহাজ বিহার করিতেছি ও রাতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতেছি, এই নির্ভরতা কি শুধু টাকা দিয়া কিনিবার জিনিস। ইহার পশ্চাতে স্তরে স্তরে কত চিন্তা কত সাহসের সঞ্চয় সমুচ্চ হইয়া রহিয়াছে; সেখানে আমাদের কোনো অর্থ জমা হয় নাই।

যখন এই ইংরেজ স্রীপুরুষদের দেখি, তাহার ডেকের উপর খেলিতেছে, ঘুমাইতেছে, হাস্তালাপ করিতেছে, তখন আমি দেখিতে পাই—ইহারা তো কেবলমাত্র জাহাজের উপরে নাই, ইহারা স্বজাতির শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আছে। ইহারা নিশ্চয় জানে বাহ্য করিবার তাহা করা হইয়াছে এবং বাহ্য করিবার তাহা করা হইবে, সেজন্য ইহাদের সমস্ত জাতি জীবন রহিয়াছে। যদি প্রাণসংশয়-সংকট উপস্থিত হয় তবে কেবল যে কাপ্তেন আছে তাহা নহে, ইহাদের সমস্ত জাতির প্রকৃতিগত উদ্ভম ও নিরলস সতর্কতা শেষ মুহূর্ত পর্বত যত্নের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা সেই দৃঢ় ক্ষেত্রের উপর এমন প্রকৃতিগত প্রসন্নচিত্তে সঞ্চরণ করিতেছে, চারি দিকের ভয়ঙ্কর প্রতি আক্কেপ করিতেছে না। এই জাহাজের ইহারা নিজেরা বাহ্য দিয়াছে তাহাই পাইতেছে—আর আবহা বাহ্য দিই নাই তাহাই লইতেছি; স্তব্ধ সমুদ্র পার হইতে হইতে সেনা রাখিয়া রাখিয়া বাইতেছি। তাই জাহাজে

ডেকের উপরে ইংরেজ বাজীদের সঙ্গে একত্র মিলিয়া বসিতে আমার মন হইতে কিছুতে সংকোচ ঘুচিতে চায় না।

ডাঙার বসিয়া অনেক বিলাতি জিনিস ব্যবহার করিয়া থাকি, সেজন্য মনের মধ্যে এমনতরো দৈন্ত বোধ হয় না ; জাহাজে আমরা আরও যেন কিছু বেশি লইতেছি। এ তো শুধু কলকারখানা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আছে। জাহাজ বাহারা চালাইতেছে তাহারা নিজের সাহস দিয়া, শক্তি দিয়া পার করিতেছে ; তাহাদের যে মনুষ্যত্বের উপর ভর দিয়া আছি নিজেদের মধ্যে তাহারই যদি কোনো পরিচয় থাকিত তবে যে টাকাটা দিয়া টিকিট কিনিয়াছি তাহার ঋণ্যমানির সঙ্গে অন্য মূল্যের আওয়াজটাও মিশিয়া থাকিত। আজ মনের মধ্যে এই বড়ো একটা বেদনা বাজে যে, উহার প্রাণ দিয়া চালাইতেছে আর আমরা টাকা দিয়া চলিতেছি, ইহার মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড সমুদ্র পড়িয়া রহিল তাহা আমরা কবে কোন্ কালে পার হইতে পারিব ! এখনো আরম্ভ করা হয় নাই, এখনো অকাতরে কত প্রাণ দেওয়া বাকি রহিয়াছে— এখনো কত বন্ধন ছিঁড়িতে হইবে, কত সংস্কার দলিতে হইবে, সে কথা যখন ভাবি তখন বুঝিতে পারি, আজ গোটাকয়েক খবরের কাগজের নৌকা বানাইয়া তাহারই খেলার পালের উপর আমরা যে বক্তৃতার ফুঁ লাগাইতেছি তাহাতে আমাদের কিছুই হইবে না।

কুলকিনারার বন্ধন ছাড়াইয়া একেবারে নীল সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। ভয় ছিল, ডাঙার জীব সমুদ্রের দোলা সহিতে পারিব না— কিন্তু, আরব-সমুদ্রে এখনো মৈত্রেয় মাতামাতি আরম্ভ হয় নাই। কিছু চঞ্চলতা নাই তাহা নহে, কারণ, পশ্চিমের উজান হাওয়া বহিয়াছে, জাহাজের মুখের উপর ঢেউয়ের আঘাত লাগিতেছে, কিন্তু এখনো তাহাতে আমার শরীরের অন্তর্বিভাগে কোনো আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে নাই। তাই সমুদ্রের সঙ্গে আমার প্রথম সস্তাষণটা প্রণয়সস্তাষণ দিয়াই শুরু হইয়াছে। মহাসাগর কবির কবিতুকুকে ঝাঁকানি দিয়া নিঃশেষ করিয়া দেন নাই, তিনি যে ছন্দে মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন আমার রক্তের নাচ তাহার সঙ্গে দিয়া তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে। যদি হঠাৎ খেয়াল যায় এবং একবার তাঁহার সহস্র উদ্ভূত হস্তে তাণ্ডবনৃত্যের রঙ্গ বোল বাজাইতে থাকেন, তাহা হইলে আর মাথা তুলিতে পারিব না। কিন্তু, ভাবখানা দেখিয়া মনে হইতেছে, ভীক ভক্তের উপর এ বাজার তাঁহার সেই অট্টহাস্তের তুমুল পরিহাস প্রয়োগ করিবেন না।

তাই জাহাজের রেলিং ধরিয়া জলের দিকে তাকাইয়া আমার দিন কাটিতেছে। গুরুপক্ষের শেষ দিকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। যেমন সমুদ্র তেমনি সমুদ্রের

উপরকার রাজি ; শির হইয়া পাড়াইয়া দুই অন্তরীনের স্তম্ভর মিলনটি দেখিতে থাকি ; স্তম্ভের সঙ্গে চকলের, নীরবের সঙ্গে মৃদয়ের, দিগন্তব্যাপী আলোপ চূপ করিয়া শুনিয়া লই। জাহাজের দুই ধারে অলস কেনরাশি কাটিয়া কাটিয়া পড়ে, তাহার ভদ্রীটি আমার দেখিতে বড়ো স্তম্ভর লাগে। ঠিক মনে হয়, যেন জাহাজটাকে স্তম্ভের বীজকোষের মতো করিয়া তাহার দুই পাশে সাদা পাপড়ি মুহূর্তে মুহূর্তে বিকশিত হইয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সম্মুখে আমার নিস্তর রাজ্যে এই মহাসমুদ্রের সুগভীর কললীলা, আর পশ্চাতে আমার এই জাহাজের যাত্রীদের অবিভ্রাম হাঙ্গালাপ আয়োদ আহ্লাদ। যতবার আমি জাহাজে আসিয়াছি প্রত্যেক বারেই আমার এই কথাটি মনে হইয়াছে যে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনটুকুর চারি দিকেই যে-একটি অক্ষর অনন্ত রহিয়াছেন, তাহার দিকে এই যাত্রীদের এক মুহূর্তও তাকাইবার অবকাশ নাই। জীবনের প্রতি ইহাদের আগ্রহি এত অত্যন্ত বেশি যে, জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার নিকট হইতে যতটুকু দূরে যাওয়া আবশ্যক ইহারা এক মুহূর্তের ক্ষণও ততটুকু দূরে বাইতে পারে না। এইজন্য ইহাদের ধর্মোপাসনা যেন একটা বিশেষ আয়োজনের ব্যাপার, নিজেকে যেন এক জায়গা হইতে বিশেষভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া কণকালের ক্ষণ আর-এক জায়গায় লইয়া বাইতে হয়। এ জাহাজ যদি ভারতবাসী যাত্রীদের জাহাজ হইত তাহা হইলে দিনের সমস্ত কাজকর্ম-আয়োদ-আহ্লাদের অত্যন্ত মাঝখানেই দেখিতে পাইতাম মানুষ অসংকোচে অনন্তকে হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিতেছে ; সমস্ত হাসিগল্পের মাঝে মাঝেই নিতান্ত সহজেই ধর্মসংগীত ধ্বনিত হইয়া উঠিত। সন্ধ্যার সঙ্গে অসীম, জীবের সঙ্গে শিব যে একেবারে মিলিয়া আছেন। দুইয়ের সহযোগেই যে সত্য সর্বত্র পরিপূর্ণ, এই চিন্তাটা আমাদের চিন্তের মধ্যে এত সহজ হইয়া আছে যে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনো সংকোচমাত্র নাই। কিন্তু, এই ইংরেজ যাত্রীরা তাহাদের হাঙ্গালাপের কোনো-একটা ছেদে ধর্মসংগীত গাহিতেছে, এ কথা মনে করিতেই পারি না এবং ইহারা যদি ডেকের উপর জুয়া খেলিতে খেলিতে হঠাৎ কোনো-এক সময়ে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায় যে ইহাদের স্বজাতীয় কেহ চৌকিতে বসিয়া উপাসনা করিতেছে, তবে নিশ্চয়ই তাহাকে পাগল বলিয়া মনে করিবে এবং সকলেই মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিবে। এইজন্যই ইহাদের জীবনের মধ্যে আধ্যাত্মিক সচেতনতার একটি সহজ স্তম্ভ ত্রি দেখিতে পাই না— ইহাদের কাজকর্ম-হাঙ্গালাপের মধ্যে কেবলই এক-দিক-দেঁধা একটা ভীষণতা প্রকাশ পায়।

এই জাহাজটার মধ্যে কী আশ্চর্য আয়োজন। এই-যে জাহাজ দেশকালের সঙ্গে

অহরহ লড়াই করিতে করিতে চলিয়াছে, তাহার সমস্ত রহস্যাট্টা আমাদের গোচর নহে। তাহার লৌহকঠিন হৃৎপিণ্ড উঠিতেছে পড়িতেছে, দিনরাত সেই ধুকধুক স্পন্দন অমৃতত্ব করিতেছি। যেখানে তাহার অঠরানল জলিয়াছে এবং তাহার নাড়ির মধ্যে উত্তপ্ত বাষ্পের বেগ আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, সেখানকার প্রচণ্ড শক্তির সমস্ত উদ্ভোগ আমাদের চোখের আড়ালে রহিয়াছে। আমাদের উপরিতলে এই প্রচুর অবকাশ ও আলস্যের মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি স্নানাহারের সময় জ্ঞাপন করিতেছে। এই-যে দেড়শো-দুইশো যাত্রীর আহারবিহারের আয়োজন—এ কোথায় হইতেছে সেই কথা ভাবি। সেও চোখের আড়ালে। তাহারও শব্দমাত্র শুনি না, গন্ধমাত্র পাই না। আহারের টেবিলে গিয়া যখন বসি, সমস্ত হুসজ্জিত, প্রস্তুত। ভোজ্যসামগ্রীর পরিবেষণের দ্বারা যেন নদীর প্রবাহের মতো অনায়াসে চলিতে থাকে।

ইহার মধ্যে যেটা বিশেষ করিয়া ভাবিবার কথা সেটা এই যে, ইহারা লেশমাত্র অসুবিধাকেও মানিয়া লইতে চায় না; এতবড়ো একটা সমুদ্রে পাড়ি—নাহয় আহারবিহারে কিছু টানাটানিই হইল, নাহয় ষোড়ামুটি রকমেই কাজ সারিয়া লওয়া গেল। কিন্তু তা নয়; ইহারা কোনো ওজরকেই ওজর বলিয়া গণ্য করিবে না; ইহারা সকল অবস্থাতেই আপনার সকল রকমের দাবিকে সর্বোচ্চ সৌম্য টানিয়া রাখিতে চায়। তাহার কল হইবে যে, অবশেষে সেই অসম্ভব দাবিও মেটে। দাবি করিবার সাহস যাহাদের নাই তাহারাই কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া দিন কাটায়—তাহারাই বলে, অর্ধঃ ত্যজতি পণ্ডিতঃ। তাহাতে হয় এই যে, সেই অর্ধের মধ্য হইতেও কেবলই অর্ধ বাদ পড়িয়া যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যেই ক্রমাগত পণ্ড হইতে থাকেন।

কিন্তু, সমস্ত সুবিধাই লইব, এ দাবি করিয়া বসিয়া কী প্রকাণ্ড ভার বহন করিতে হয়! প্রত্যেক সামান্য আরাগের ব্যবস্থা কত যত্ন জায়গা জুড়িয়া বসে! এই ভার বহন করিবার শক্তি ইহাদের আছে, সেখানে ইহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে। এই উপলক্ষে আমার মনে পড়ে আমাদের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। সেখানেও ছশো লোকের জন্ত চার বেলাকার খাওয়া জোগাড় করিতে হয়। কিন্তু প্রয়াসের সীমা নাই, জোর চারটে হইতে রাত্রি একটা পর্যন্ত ইাকডাকের অবধি দেখি না। অথচ, ইহার মধ্যে নিতান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু নাই বলিলেও হয়। আয়োজনের ভার বখাসাধ্য কম করা গিয়াছে, কিন্তু আবর্জনার ভার কিছুমাত্র কমে না। গোলমাল বাড়িয়া চলে, যয়লা জমিতে থাকে—ভাতের ফেন, তরকারির খোসা এবং উচ্ছিষ্টাবশেষ লইয়া কী করা যায় তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। ক্রমে সে সমস্তে ভাবনা পরিহার করিয়া জড়

প্রকৃতির উপর বরষা দিয়া কোনোক্রমে দিন কাটানো যায়। এ কথা কিছুতেই আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না যে, ইহা কিছুতেই চলিবে না। কারণ, তাহা বলিতে গেলেই ভার বহন করিতে হয়। শেষকালে গোড়ার গিয়া দেখি, সেই ভার বহন করিবার ভয়না এবং শক্তি আমাদের নাই, এইজন্য আমরা কেবলই ক্লেশ এবং অসুবিধা বহন করি কিন্তু দায়িত্ব বহন করিতে চাই না।

একজন উচ্চপদস্থ রেলোয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সহযাত্রী আছেন ; তিনি আমাদের বলিতেছিলেন, ‘চাষি ভালো প্রকৃতি নানা ছোটোখাটো প্রয়োজনের জিনিস আমি রেলোয়েবিভাগের জন্য এই দেশ হইতেই সংগ্রহ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু, বরাবর দেখিতে পাই, তাহার মূল্য বেশি অথচ জিনিস তেমন ভালো নয়।’ এ দিকে পণ্যত্রয়ের দাম এবং বেতনের পরিমাণ বাড়িয়াই চলিয়াছে অথচ এখানে যে-সমস্ত দ্রব্য উপর হইতেছে পৃথিবীর বাজারদরের সঙ্গে তাহা ভাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না। তিনি বলিলেন, যুরোপীয় কর্তৃত্বে এ দেশে যে-সমস্ত কারখানা চলিতেছে এ দেশের লোকের উপর তাহার প্রভাব অতি সামান্য। আর, দেশীয় কর্তৃত্বে যেখানে কাজ চলে সেখানে দেখিতে পাই, পুরা কাজ আদায় হয় না—মাল্লের যতখানি শক্তি আছে তাহার অধিকাংশকেই খাটাইয়া লইবার যেন ভেজ নাই। এইজন্যই মাল্লের পরিমাণ অল্প হওয়া সত্ত্বেও মূল্য করিতে চায় না। কেননা, মাল্লের যতগুলি খাটিতেছে শক্তি ততটা খাটিতেছে না।

এ কথাটা শুনিতে অগ্রিম লাগে, কিন্তু দেশের দিকে তাকাইয়া দেখিলে সর্বত্রই এইটেই চোখে পড়ে। আমাদের দেশে সকল কাজই ক্লেশাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার একটিমাত্র কারণ, যোলো-আনা মাল্লকে আমরা পাই না। এইজন্য আমাদের দেশে বেশি লোক লইয়া কারবার করিতে হয়, অথচ বেশি লোককে ঠিক ব্যবস্থায় চালাইয়া করা এবং তাহাদের পেট ভরাইয়া দেওয়া আমাদের শক্তির অতীত। এইজন্য কাজের চেয়ে কাজের উৎপাদ অনেকগুলি বেশি হইয়া উঠে, আমাদের চেয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং ভরসীতে ছিন্ন ক্রমে এত দেখা দেয় যে দাঁড়-টানার চেয়ে জল-ছেঁচাতেই বেশি শক্তি ব্যয় করিতে হয়—আমাদের দেশে যে-কেহ যে-কোনো কাজে হাত দিয়াছে তাহাকে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

আমি সেই ইঞ্জিনিয়ারটিকে বলিলাম, ‘তোমাদের দেশে যৌথ কারবার ও কল-কারখানার গুণেই কি জিনিসের মূল্য কম হইতেছে না।’ তিনি বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কিন্তু কোনো দেশে যৌথ কারবার আগে এবং উন্নতি তাহার পরে, এমন কথা বলা যায় না। মাল্লের যখন যৌথ কারবারে মিলিবার উপযুক্ত হয় তখন যৌথ

কারবার আপনিই ঘটিয়া উঠে। তিনি कहিলেন, ‘আমি যাজ্ঞাজের দিকে দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশীয় যৌথ কারবারের উৎপত্তি ও বিলুপ্তি দেখিয়াছি। দেখিতে পাই, অস্থানটার প্রতি যে লম্বালুটি অর্থাৎ যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার প্রয়োজন তাহা কাহারও নাই, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে নিজের দিকে তাকায়। ইহাতে কখনোই কোনো জিনিস বাধিতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাণপণ লম্বালুটি যদি জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবে সমস্ত সম্মিলিত শুভাশুভান সম্ভবপর হয়।’

কথাটা আমার মনে লাগিল। অস্থানের দ্বারা মঙ্গলসাধন করা যায়, এ কথাটা সত্য নহে— গোড়াতেই যাহুয আছে। আমাদের দেশে একজন যাহুযকে আশ্রয় করিয়া এক-একটা কাজ জাগিয়া উঠে; তাহার পরে সেই কাজকে যাহারা গ্রহণ করে তাহারা তাহাকে যতটা আশ্রয় করে ততটা আশ্রয় দেয় না। কারণ, তাহারা কাজের দিকে তেমন করিয়া তাকায় না যেমন করিয়া নিজের দিকে তাকায়। কথায় কথায় তাহাদের মৃষ্টি শিথিল হইয়া পড়ে, বাধাকে তাহারা অতিক্রমের চেষ্টা না করিয়া বাধাকে ত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়, এবং কেবলই মনে করিতে থাকে, ইহার চেয়ে আর কোনোরূপ অবস্থা হইলে ইহার চেয়ে আরও ভালো ফল পাওয়া যাইত। এমনি করিয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়— একটা হইতে পাঁচটা টুকরা দাঁড়ায় এবং পাঁচটাই ব্যর্থ হয়। ভালোমনে বাধাবিপত্তি সমস্তটাকে বীরের মতো স্বীকার করিয়া আরও কর্মকে একান্ত লম্বালুটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বহন করিবার অধ্যবসায় বতদিন আমাদের সাধারণের চিত্তে না জাগিবে ততদিন সম্মিলিত হিতাশুভান ও যৌথ বাণিজ্য আমাদের দেশে একেবারে অসম্ভব হইবে।

এই লম্বালুটি, ইহা বুদ্ধিগত নহে, ইহা হৃদয়গত, জীবনগত। সমস্ত অপূর্ণতার ভিতর দিয়া যাহুয নিজেকে কিসের জোরে বহন করে। একটা জীবনের গভীর আকর্ষণে। লাভ-লোকসানের সমস্ত হিসাব সেই জীবনের টানের কাছে লম্বু। এমনটা যদি না হইত তবে কথায় কথায় সামান্য কারণে, সামান্য ক্ষতিতে, সামান্য অসন্তোষে, যাহুয আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লইত। সেইরূপ যে কর্ষে আমরা জীবনকে নিয়োগ করিয়াছি তাহার প্রতি যদি আমাদের জীবনগত নিষ্ঠা না থাকে, তাহার প্রতি যদি আমাদের একটা বেহিসাবি আকর্ষণ না থাকে, তাহার প্রতি অপরাহত শ্রদ্ধা লইয়া আমরা যদি পরাভবের দলেও দাঁড়াইতে না পারি, যদি যুদ্ধের মুখেও তাহার জয়-পতাকাকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরিবার বল না পাই, যদি অভিমুখ্যের মতো বাহ্যের মধ্য হইতে বাহির হইবার বিজ্ঞাটাকে আমরা একেবারে অগ্রাহ্য না করি, তাহা হইলে আমরা কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিব না, রক্ষা করিতেও পারিব না। ‘ইহা

আমাদের অভাব ইহা আমারই' এই কথাটাকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত লাভক্ষতি, সমস্ত হারজিতের মধ্যে প্রাণপণে বলিবার শক্তি সর্বাগ্রে আমাদের চাই ; তাহার পরে যে-কোনো অমুঠানকেই আশ্রয় করি-না কেন, একদিন না একদিন বিয়সমুজ্জ পার হইতে পারিব ।

নিরতিশয় কর্মের প্রয়াসের দ্বারা যুরোপের জীবন জীর্ণ হইতেছে, এই কথাটা আজকাল পশ্চিমদেশেও শোনা যায় এবং এই কথাটা একেবারে মিথ্যাও নহে । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, যুরোপ কোনো অভাব কোনো অসুবিধাকেই কিছুমাত্র মানিবে না, এই তাহার পণ । নিজের শক্তির উপরে তাহার অকুণ্ঠ বিশ্বাস । সেই বিশ্বাস থাকাতেই তাহার শক্তি পূর্ণ গৌরবে কাজ করিতেছে এবং অসাধ্য সাধন করিয়া তুলিতেছে । কিন্তু, তবুও শক্তির সীমা আছে । বাতিও খুব বড়ো করিয়া জ্বালাইব অথচ সলিতাও জ্বল করিব না, এ তো কোনোমতেই হয় না ।

এইজন্য পশ্চাত্যদেশে জীবনযাত্রার দাবি এক দিকে যত বাড়িতেছে আর-এক দিকে ততই সে দাহ করিতেছে । আরামকে সুবিধাকে কোথাও খর্ব করিব না পণ করিয়া বসাতে তাহার বোঝা কেবলই প্রকাণ্ড বড়ো হইয়া উঠিতেছে । এই বোঝা তো কোনো-একটা জায়গায় চাপ দিতেছে । যেখানে সেই চাপ পড়িতেছে সেখানে যে পরিমাণে দুঃখ অন্নিতেছে সে পরিমাণে ক্ষতিপূরণ হইতেছে না । এইজন্য ভার-সামগ্র্যস্তোর প্রয়াস আরম্ভ ভূমিকম্পের আকারে সমস্ত পীড়িত সমাজের ভিতর হইতে ক্ষণে ক্ষণে মাথা তুলিবার উপক্রম করিতেছে । মানুষের সুবিধাকে সৃষ্টি করিবার জন্য কল কেবলই বাড়িয়া চলিতেছে এবং মানুষের জায়গা কল জুড়িয়া বসিতেছে । কোথায় ইহার অন্ত ? মানুষ আপনাকে আপনার অভাবপূরণের যত্ন করিয়া তুলিতেছে— কিন্তু, সেই আপনাকে সে পাইবে কোন্ অবসরে ? যেমন করিয়াই হউক, এক জায়গায় তাহাকে দাঁড়ি টানিয়া দিয়া বলিতেই হইবে, 'এই রহিল আমার উপকরণ, এখন আমাকে আমার উদ্ধার করা চাই । বাহাতে আমার আবশ্যক তাহা আমাকে অবশ্য জোগাইতে হইবে, কিন্তু এ-সমস্ত আমার আবশ্যক নাই ।'

অর্থাৎ, মানুষের উত্তম যখন কেবলই একটানা চলিতে থাকে তখন সে একটা জায়গায় আসিয়া আপনাকে আপনি ব্যর্থ করিয়া বসে । পূর্ণতার পথ সোজা পথ নহে । সেইজন্য আজ যুরোপের বাহা বেদনা আমাদের যেমন কখনোই তাহা নহে । যুরোপ তাহার বেহকে সম্পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে । আমাদের আত্মা বেহ হারাইয়া প্রেতের মতো পৃথিবীতে নিফল হইয়া ফিরিতেছে । সেই আত্মার বাহ্য প্রতিষ্ঠা কোথায় ? তাহার মধ্যে যে ঈশ্বরের সাধন্য আছে, সে

আপনার ঐশ্বর্য বিস্তার না করিয়া বাঁচে না। সে যে আপনাকে নানা দিকে প্রকাশ করিতে চায়—রাজ্যে, বাণিজ্যে, সমাজে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে—এখানে সেই প্রকাশের উপকরণ কই? সেই উপকরণের প্রতি তাহার কর্তৃত্ব কোথায়? দেখিতেছি, তাহার কলেবর এক জায়গায় যদি বাঁধে তো আর-এক জায়গায় আলগা হইয়া পড়ে—কণকালের ক্ষুদ্র যদি তাহা নিবিড় হইয়া দাঁড়ায় তবে পরক্ষণেই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। তাই আজ যেমন করিয়াই হউক, আমাদেরকে এই দেহতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে; যেমন করিয়া হউক, আমাদেরকে এই কথাটা বুঝিতে হইবে যে, কলেবরহীন আত্মা কখনোই সত্য নহে—কেননা, কলেবর আত্মারই একটা দিক। তাহা গতির দিক, শক্তির দিক, স্রুতার দিক—কিন্তু তাহারই সহযোগে আত্মার স্থিতি, আনন্দ, অমৃত। এই কলেবরহস্তির অসম্পূর্ণতাতেই আমাদের দেশের শ্রীহীন আত্মা শতাব্দীর পর শতাব্দী হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। বাহিরের সত্যকে দূরে ফেলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা কেবলই অবাধে স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছে। সে আপনার ওজন হারাইয়া ফেলিতেছে, এইজন্য তাহার অন্ধ বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নাই, কোনো পরিমাণ নাই; এইজন্য কোথাও বা সত্যকে লইয়া সে মায়ায় মতো খেলা করিতেছে, কোথাও বা মায়াকে লইয়া সে সত্যের মতো ব্যবহার করিতেছে।

আরব-সমুদ্র

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

যাত্রা

একদিন মানুষ ছিল বুনো, ঘোড়াও ছিল বনের জন্ত। মানুষ ছুটিতে পারিত না, ঘোড়া বাতাসের মতো ছুটিত। কী স্বন্দর তাহার ভয়, কী অবাধ তাহার স্বাধীনতা। মানুষ চাহিয়া দেখিত, আর তাহার ঈর্ষা হইত। সে ভাবিত, 'ঐরকম বিদ্যাংগামী চারটে পা যদি আমার থাকিত তাহা হইলে দূরকে দূর মানিতাম না, দেখিতে দেখিতে দিগ্দিগন্তর জয় করিয়া আসিতাম।' ঘোড়ার সর্বাঙ্গে যে-একটি ছুটিবার আনন্দ ক্ষুদ্র তালে নৃত্য করিত সেইটের প্রতি মানুষের মনে মনে তারি একটা লোভ হইল।

কিন্তু, মানুষ শুধু-শুধু লোভ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে। 'কী করিলে ঘোড়ার চারটে পা আমি পাইতে পারি' পাছের তলার বসিয়া এই কথাই সে ভাবিতে

লাগিল। এমন অদ্ভুত ভাবনাও মানুষ ছাড়া আর-কেহ ভাবে না। ‘আমি দুই-পা-ওয়ালা খাড়া জীব, আমার চার পায়ের সংস্থান কি কোনোমতেই হইতে পারে। অতএব, চিরদিন আমি এক-এক পা ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিব আর ঘোড়া শুড়-বুড় করিয়া ছুটিয়া চলিবে, এ বিধানের অন্যথা হইতেই পারে না।’ কিন্তু, মানুষের অন্তঃকমন এ কথা কোনোমতেই মানিল না।

একদিন সে ফাঁস লাগাইয়া বনের ঘোড়াকে ধরিল। কেশর ধরিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিয়া নিজের দেহের সঙ্গে ঘোড়ার চার পা জুড়িয়া লইল। এই চারটে পাকে সম্পূর্ণ নিজের বশ করিতে তাহার বহুদিন লাগিয়াছে, সে অনেক পড়িয়াছে, অনেক মরিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই দশে নাই। ঘোড়ার গতিবেগকে সে ডাকাতি করিয়া লইবেই এই তাহার পণ। তাহারই জিহ্বা হইল। মনঃগামী মানুষ ক্রতগমনকে বাধিয়া ফেলিয়া আপনার কাজে খাটাইতে লাগিল।

ডাঙার চলিতে চলিতে মানুষ এক জায়গায় আসিয়া দেখিল সম্মুখে তাহার সমুদ্র, আর তো এগোইবার জো নাই। নীল জল, তাহার তল কোথায়, তাহার কূল দেখা যায় না। আর, লক্ষ লক্ষ ঢেউ তরুণী তুলিয়া ডাঙার মানুষদের শাসাইতেছে; বলিতেছে, ‘এক পা যদি এগোও তবে দেখাইয়া দিব, এখানে তোমার জারিজুরি খাটিবে না।’ মানুষ তীরে বসিয়া এই অকূল নিবেধের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু, নিবেধের ভিতর দিয়া একটা বস্তু আহ্বানও আসিতেছে। তরুণীরা অটহাস্তে নৃত্য করিতেছে— ডাঙার মাটির মতো কিছুতেই তাহাদিগকে বাধিয়া রাখিতে পারে নাই। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ লক্ষ ইচ্ছার ছেলে যেন ছুটি পাইয়াছে— চীৎকার করিয়া, যাতায়াতি করিয়া, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটিতেছে না; পৃথিবীটাকে তাহারা যেন ফুটবলের গোলার মতো লাথি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া আকাশে উড়াইয়া দিতে চায়। ইহা দেখিয়া মানুষের মন তীরে বসিয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে না। সমুদ্রের এই মাতুনি মানুষের রক্তের মধ্যে করতাল বাজাইতে থাকে। বাধাহীন জলরাশির এই দিগন্তবিহীন মুক্তিকে মানুষ আপন করিতে চায়। সমুদ্রের এই দূরত্বজয়ী আনন্দের প্রতি মানুষ লোভ দিতে লাগিল। ঢেউগুলার মতো করিয়াই দিগন্তকে লুঠ করিয়া লইবার জন্য মানুষের কামনা।

কিন্তু, এমন অদ্ভুত সাধ মিটিবে কী করিয়া; এই তীরের রেখাটা পর্বত মানুষের অধিকারের সীমা— তাহার সমস্ত ইচ্ছাটাকে এই দাঁড়ির কাছে আসিয়া শেষ করিতে হইবে। কিন্তু, মানুষের ইচ্ছাকে বেখানে শেষ করিতে চাওয়া যায় সেইখানেই সে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। কোনোমতেই সে বাধাকে চরম বলিয়া মানিতে চাহিল না।

অবশেষে একদিন বুনো ঘোড়াটার মতোই সমুদ্রের কেনকেনের খরিশা মাছুষ তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিল। ক্রুদ্ধ সাগর পিঠ নাড়া দিল ; মাছুষ কত ডুবিল, কত মরিল, তাহার সীমা নাই। অবশেষে একদিন মাছুষ এই অবাধ্য সাগরকেও আপনার সঙ্গে জুড়িয়া লইল। তাহার এক কূল হইতে আর-এক কূল পর্যন্ত মাছুষের পায়ের কাছে আগিয়া মাথা হেঁট করিয়া দিল।

বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মাছুষটা যে কিরকম, আজ আমরা জাহাজে চড়িয়া তাহাই অনুভব করিতেছি। আমরা তো এই একটুখানি জীব, তরুণীর এক প্রান্তে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু দূর দূর বহুদূর পর্যন্ত সমস্ত আমার সঙ্গে মিলিয়াছে। যে দূরকে আজ রেখামাত্রও দেখিতে পাইতেছি না তাহাকেও আমি এইখানে স্থির দাঁড়াইয়া অধিকার করিয়া লইয়াছি। বাহা বাধা তাহাই আমাকে পিঠে করিয়া লইয়া অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সমস্ত সমুদ্র আমার, যেন আমারই বিরাট শরীর, যেন তাহা আমার প্রসারিত ডানা। বাহা-কিছু আমাদের বাধা তাহাকেই আমাদের চলিবার পথ, আমাদের মুক্তির উপায় করিয়া লইতে হইবে, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ আছে। বাহারা এই আদেশ মানিয়াছে তাহারাই পৃথিবীতে ছাড়া পাইয়াছে। বাহারা মানে নাই এই পৃথিবীটা তাহাদের পক্ষে কারাগার। নিজের গ্রামটুকু তাহাদিগকে বেড়িয়াছে, ঘরের কোণটুকু তাহাদিগকে বাধিয়াছে, প্রত্যেক পা ফেলিতেই তাহাদের শিকল কন্ডক করে।

মনের আনন্দে চলিতেছি। ভয় ছিল, সমুদ্রের দোলা আমার শরীরে সহিবে না। সে ভয় কাটিয়া গেছে। যেটুকু নাড়া খাইতেছি তাহাতে আঘাত করিতেছে না, যেন আদর করিতেছে। সমুদ্র আমাকে কোলে করিয়া বহিয়া চলিয়াছে— স্বপ্ন বালককে তাহার পিতা ঘেমন করিয়া লইয়া যায় তেমনি সাবধানে। এই স্বপ্ন এ যাত্রায় এখন পর্যন্ত আমার চলিবার কোনো পীড়া নাই, চলিবার আনন্দই ভোগ করিতেছি।

কেবলমাত্র এই চলিবার আনন্দটুকুই পাইব বলিয়া আমি বাহির হইয়াছি। অনেক দিন হইতে এই চলিবার, এই বাহির হইয়া পড়িবার, একটা বেগ আমাকে উত্তলা করিয়া তুলিতেছিল। অনেক দিন আমাদের আশ্রয়ের বাড়িতে দোতলার বারান্দায় একলা বসিয়া যখন আমাদের সামনের শালগাছগুলার উপরের আকাশের দিকে তাকাইয়াছি তখন সেই আকাশ দূরের দিকে তাহার তরুণী বাড়াইয়া দিয়া আমাকে সংকেত করিয়াছে। যদিও সেই আকাশটি নীরব তবু দেশদেশান্তরের বস্তু অপরিচিত গিরিনদী-অরণ্যের আহ্বান কত দিগ্দিগন্ত হইতে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়া এই আকাশের নীলিমাতে পরিপূর্ণ করিয়াছে। নিঃশব্দ আকাশ বহুদূরের সেই-সমস্ত বর্ষাধ্বনি,

সেই-সমস্ত কলগুন, আবার কাছে বহন করিয়া আনিত। আবার কেবলই বলিত, 'চলো, চলো, বাহির হইয়া এসো।' সে কোনো প্রয়োজনের চলা নহে, চলার আনন্দেই চলা।

প্রাণ আপনি চার চলিতে ; সেই তাহার ধর্ম। না চলিলে সে যে মৃত্যুতে গিয়াঠেকে। এইজন্য নানা প্রয়োজনের ও খেলার ছুতার সে কেবল চলে। পদ্মার চরে শরভের সময়ে তো হাঁসের দল দেখিয়াছ। তাহারা কোন্ দুর্গম হিমালয়ের শিখরবেষ্টিত নির্জন সরোবরতীরের নীড় ছাড়িয়া কত দিনরাত্রি ধরিয়া উড়িতে উড়িতে এই পদ্মার বালুতটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। শীতের দিনে বাস্প বরফে ভীষণ হইয়া উঠিয়া হিমালয় তাহাদিগকে তাড়া লাগাইয়া দেয়— তাহারা বাসা বদল করিতে চলে। সুতরাং সেই সময়ে হাঁসদের পক্ষে দক্ষিণপথে যাত্রার একটা প্রয়োজন আছে বটে। কিন্তু, তবু সেই প্রয়োজনের অধিক আর-একটা জিনিস আছে। এই-যে বহু দূরের গিরি নদী পার হইয়া উড়িয়া যাওয়া, ইহাতে এই পাখিদের ভিতরকার প্রাণের বেগ আনন্দলাভ করে। ক্ষণে ক্ষণে বাসা বদল করিবার ডাক পড়ে, তখনই সমস্ত জীবনটা নাড়া খাইয়া আপনাকে আপনি অহুত্ব করিবার সুযোগ পায়।

আমার ভিতরেও বাসা বদল করিবার ডাক পড়িয়াছিল। যে বেড়নের মধ্যে বসিয়া আছি সেখান হইতে আর-একটা কোথাও যাইতে হইবে। চলো, চলো, চলো। ঝরনার মতো চলো, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো চলো, প্রভাতের পাখির মতো চলো, অকণোদয়ের আলোর মতো চলো। সেইজন্যই তো পৃথিবী এমন বৃহৎ, অগৎ এমন বিচিত্র, আকাশ এমন অসীম। সেইজন্যই তো বিশ্ব জুড়িয়া অণু পরমাণু নৃত্য করিতেছে এবং অগণ্য নক্ষত্রলোক আপন-আপন আলোকের শিবির লইয়া প্রাক্তরচারী বেহুয়িনদের মতো আকাশের ভিতর দিয়া যে কোথায় চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। চিরকালের মতো কোনো একই জায়গায় বাসা বাধিয়া বসিব, বিশ্বের এমন ধর্মই নহে। সেইজন্যই মৃত্যুর ডাক আর কিছুই নহে, সেই বাসাবদলের ডাক। জীবনকে কোনোমতেই সে কোনো সনাতন প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে দিবে না— জীবনকে সেই জীবনের পথে অগ্রসর করিবে বলিয়াই মৃত্যু।

তাই আমি আজ চলিয়াছি ; রূপকথার রাজপুত্র যেমন হঠাৎ একদিন অকারণে সাত সমুদ্র পার হইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িত, তেমনি করিয়া আমি আজ বাহিরে চলিয়াছি। রাজকন্যা বুঝাইয়া পড়িয়াছে, সে বুঝ ভাঙে না ; সোনার কাঠি চাই। একই জায়গায় একই প্রাণের মধ্যে বসিয়া বসিয়া জীবনের মধ্যে জড়তা আসে ; সে অচেতন হইয়া পড়ে ; সে কেবল আপনার শয্যাটুকুকেই আঁকড়িয়া থাকে ;

এই বৃহৎ পৃথিবীকে বোধ করিতেই পারে না ; তখন সোনার কাঠি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ; তখনি দূরে পাড়ি দেওয়া চাই ; তখন এমন একটা চেতনার দয়কার যাঁহা আমাদের চোখের কানের মনের ক্ষুধা যারে কেবলই নূতন-নূতন নূতনের আঘাত দিতে থাকিবে— যাঁহা আমাদের জীর্ণ পর্দাটাকে টুকরা টুকরা করিয়া চিরনূতনকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে । কী বৃহৎ, কী সুন্দর, কী উন্মুক্ত এই জগৎ ! কী প্রাণ, কী আলোক, কী আনন্দ ! মানুষ এই পৃথিবীকে ঘিরিয়া ফেলিয়া কত রকম করিয়া দেখিতেছে, ভাবিতেছে, গড়িতেছে ! তাহার প্রাণের, তাহার মনের, তাহার কল্পনার লীলাক্ষেত্র কোনোখানে ফুরাইয়া গেল না । পৃথিবীকে বেঁটন করিয়া মানুষের এই-যে মনোলোক ইহার কী অফুরান ও অসুত বৈচিত্র্য । সেই-সমস্তকে লইয়াই যে আমার এই পৃথিবী । এইজন্যই এই-সমস্তটিকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখিবার জন্য মনের মধ্যে আহ্বান আসে ।

এই বিপুল বৈচিত্র্যকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশেষে দেখিবার সাধ্য ও অবকাশ কাহারও নাই । বিশ্বকে দর্শন করিব বলিয়া তাহার সম্মুখে বাহির হইতে পারিলেই দর্শনের কল পাওয়া যায় । যদিও এক হিসাবে বিশ্ব সর্বত্রই আছে তবু আলস্ত ছাড়িয়া, অভ্যাস কাটাইয়া, চোখ মেলিয়া, যাজ্ঞা করিলে তবেই আমাদের দৃষ্টিশক্তির জড়িয়া কাটায়া যায় এবং আমাদের প্রাণ উদ্বেষিত হইয়া বিশ্বপ্রাণের স্পর্শ উপলব্ধি করে । যে নিষ্ঠুর, যে নিরুদ্ভয়, সে লোক সেই জিনিসকেই হারাইয়া বসে যাঁহা একেবারেই হাতের কাছে আছে । তাই নিকটের ধনকে দূর করিয়া দূরে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেই তাহাকেই অত্যন্ত নিবিড় করিয়া পাওয়া যায় । আমাদের সমস্ত ভ্রমণেরই ভিতরকার আসল উদ্দেশ্যটি এই— যাঁহা আছেই, যাঁহা হারাইতে পারেই না, তাহাকেই, কেবলই প্রতি পদে ‘আছে আছে আছে’ বলিতে বলিতে চলা— পুরাতনকে কেবলই নূতন নূতন করিয়া সমস্ত মন দিয়া ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাওয়া ।

লোহিত সমুদ্র

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

আনন্দরূপ

আজ সকালে জাহাজের ছাদের উপর বেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। 'আকাশের পাতুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিয়ার মাঝখান দিয়া পশ্চিম দিগন্ত হইতে যুদ্ধীতল বাতাস আসিতেছিল। আমার ললাট মাধুর্যে অভিষিক্ত হইল। আমার মন বলিতে লাগিল, 'এই তো তাঁহার প্রসাদসুধার প্রবাহ।'

সকল সময় মন এমন করিয়া বলে না। অনেক সময় বাহিরের সৌন্দর্যকে আমরা বাহিরে দেখি— তাহাতে চোখ জুড়ায়, কিন্তু তাহাকে অন্তরে গ্রহণ করি না। ঠিক যেন অমৃতফলকে আত্মাণ করি, তাহার স্বাদ লই না।

কিন্তু সৌন্দর্য যেদিন অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ স্পর্শ করে সেইদিন তাহার মধ্য হইতে অসীম একেবারে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তখনই সমস্ত মন এক মুহূর্তে গান গাহিয়া উঠে, 'নহে, নহে, এ শুধু বর্ণ নহে, গন্ধ নহে— এই তো অমৃত, এই তাঁহার বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।'

আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই-যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আছে কোন্‌খানে। ইহা কি জলে। ইহা কি বাতাসে। এই ধারণার অতীতকে কে ধারণ করিতে পারে।

ইহাই আনন্দ, ইহাই প্রসাদ। ইহাই দেশে দেশে, কালে কালে, অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়াইয়া দিতেছে, মন হরণ করিতেছে— ইহা আর কিছুতেই ফুরাইল না। ইহারই অমৃতস্পর্শে কত কবি কবিতা লিখিল, কত শিল্পী শিল্প রচনা করিল, কত জননীর হৃদয় স্নেহে গলিল, কত প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল হইয়া উঠিল— সীমার বন্ধ রহে রহে ভেদ করিয়া এই অসীমের অমৃত-কোয়ারা কত লীলাতেই যে লোকে লোকে উৎসাদিত প্রবাহিত হইয়া চলিল তাহার আর অন্ত দেখি না— অন্ত দেখি না। তাহা আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য।

ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্। রূপ এখানে শেষ কথা নহে, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নহে। এই-যে রূপের মধ্য দিয়া আনন্দ, মৃত্যুর মধ্য দিয়া অমৃত। শুধুই রূপের মধ্যে আসিয়া মন ঠেকিল, মৃত্যুর মধ্যে আসিয়া চিন্তা ফুরাইল, তবে অগতে অমৃতগ্রহণ করিয়া কী পাইলাম! বস্তুকে দেখিলাম, সত্যকে দেখিলাম না!

আমার কি কেবলই চোখ আছে, কান আছে। আমার মধ্যে কি সত্য নাই, আনন্দ নাই। সেই আমার সত্য দিয়া আনন্দ দিয়া যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অগতের দিকে চাহিয়া

দেখি তখনি দেখিতে পাই, সম্মুখে আমার এই তরঙ্গিত সমুদ্র— এই প্রবাহিত বায়ু—
 এই প্রসারিত আলোক— বস্তু নহে, ইহা সমস্তই আনন্দ, সমস্তই মীমাংসা, ইহার সমস্ত
 অর্থ একমাত্র তাঁহারই মধ্যে আছে ; তিনি এ কী দেখাইতেছেন, কী বলিতেছেন,
 আমি তাহার কীই বা জানি ! এই আকাশপ্রাণী আনন্দের সহস্রলক্ষ ধারা যেখানে এক
 মহাশ্রোতে মিলিয়া আবার তাঁহারই এই স্বপ্নের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছে সেইখানে
 মুহূর্তকালের ক্ষণ দাঁড়াইতে পারিলে এই সমস্ত-কিছুর মহৎ অর্থ, ইহার পরম
 পরিণামটিকে দেখিতে পাইতাম । এই-যে অচিন্তনীয় শক্তি, এই-যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য,
 এই-যে অপরিমিত সত্য, এই-যে অপরিমেয় আনন্দ, ইহাকে যদি কেবল মাটি এবং জল
 বলিয়া জানিয়া গেলাম তবে সে কী ভয়ানক ব্যর্থতা, কী মহতী বিনষ্টি । নহে নহে, এই
 তো তাঁহার প্রসাদ, এই তো তাঁহার প্রকাশ, এই তো আমাকে স্পর্শ করিতেছে, আমাকে
 বেঁটন করিতেছে, আমার চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজাইতেছে, আমাকে বাঁচাইতেছে,
 আমাকে জাগাইতেছে, আমার মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়া ডাক দিতেছে, আমাকে
 পলে পলে যুগযুগান্তরে পরিপূর্ণ করিতেছে ; শেব নাই, কোথাও শেব নাই, কেবলই
 আরও আরও আরও ; তবু সেই এক, কেবলই এক, সেই আনন্দময় অমৃতময় এক ! সেই
 অতল অকূল অধঃ নিস্তর নিঃশব্দ সুগভীর এক— কিঙ্ক, কত তাহার ঢেউ, কত তাহার
 কমলসংগীত !

প্রাণ ভরিষে, তুষা হরিষে

যোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ !

তব ভুবনে, তব ভবনে

যোরে আরো আরো আরো দাও স্থান !

আরো আলো আরো আলো

যোর নয়নে, প্রভু, ঢালো !

স্বরে স্বরে বাঁধি পুরে

তুমি আরো আরো আরো দাও তান !

আরো বেদনা, আরো বেদনা,

যোরে আরো আরো দাও চেতনা !

দ্বার ছুটায়, বাধা টুটায়

যোরে করো জ্ঞান, যোরে করো জ্ঞান !

আরো প্রেমে, আরো প্রেমে

যোর আমি ডুবে থাক নেমে !

স্বাধারে আপনারে

ভূমি আরো আরো আরো করো দান।

লোহিত সমুদ্র

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

কেবল মানুষই বলে, আশার অস্ত নাই। পৃথিবীর আর-কোনো জীব এমন কথা বলে না। আর-সকল প্রাণী প্রকৃতির একটা সীমার মধ্যে প্রাণ ধারণ করে এবং তাহার মনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাও সেই সীমাকে মানিয়া চলে। জন্তুদের আহার বিহার নিজের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের সীমাকে লঙ্ঘন করিতে চায় না। এক জায়গায় তাহাদের সাধ মেটে এবং সেখানে তাহারা ক্ষান্ত হইতে জানে। অভাব পূর্ণ হইলে তাহাদের ইচ্ছা আপনি থামিয়া যায়, তাহার পরে আবার সেই ইচ্ছাকে তাড়না করিয়া জাগাইবার জন্ত তাহাদের দ্বিতীয় আর-একটা ইচ্ছা নাই।

মানুষের প্রকৃতিতে আশ্চর্য এই দেখা যায়, একটা ইচ্ছার উপর সওয়ায় হইয়া আর-একটা ইচ্ছা চাপিয়া আছে। পেট ভরিয়া গেলে খাইবার ইচ্ছা যখন আপনি মিটিয়া যায়, তখনো সেই ইচ্ছাকে জোর করিয়া জাগাইয়া রাখিবার জন্ত মানুষের আর-একটা ইচ্ছা তাগিদ করিতে থাকে। সে কোনোমতে চাটুনি খাইয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিয়া, আহারের অবসর ইচ্ছাকে প্রয়োজনের উর্ধ্বেও চালনা করিতে থাকে।

ইহাতে মানুষের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কারণ, ইহা স্বাভাবিক ইচ্ছা নহে। স্বাভাবিক ইচ্ছা সহজেই আপন প্রাকৃতিক স্বভাবের সীমার মধ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। আর, মানুষের এই অস্বাভাবিক ইচ্ছা কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে চায় না। তাহার মধ্যে একটা কী আছে যে কেবলই বলিতেছে— আরও, আরও, আরও!

কিন্তু, যাহাতে মানুষের ক্ষতি করিতে পারে সে ইচ্ছা মানুষের থাকে কেন। নিজের এই দুঃস্বপ্ন ইচ্ছাটার দিকে তাকাইয়াই মানুষ বিশ্বব্যাপারে একটা শয়তানের কল্পনা করিয়াছে। যিহুদি পুরাণের প্রথম নরনারী যখন স্বর্গোচ্চানে ছিল তখন ঈশ্বর তাহাদের ইচ্ছাকে প্রকৃতির সীমার মধ্যে বাধিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'ইহার মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকিও। প্রাণের রাজ্যই তোমাদের রহিল, জ্ঞানের রাজ্য লোভ দিয়ো না।' স্বর্গোচ্চানের প্রত্যেক জীবজন্তুই সেই সন্তোষের সীমার মধ্যেই বদ্ধ রহিল; কেবল

মামুষই বলিল, 'যাহা পাওয়া গেছে তাহার চেয়ে আরও পাওয়া চাই।' এই-যে আরো'র দিকে সে পা বাড়াইল এ বড়ো বিষয় রাজ্য। এখানে স্বাভাবিক পরিস্থিতির কোনো সীমা কোথাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া নাই, এইজন্য কোন্ দিকে কত দূর পর্যন্ত যে যাওয়া যায় তাহার পরামর্শদাতা পাওয়া শক্ত। এইজন্য এই অতৃপ্তির পথহীন রাজ্যে মরিবার আশঙ্কা চারি দিকেই বিকীর্ণ। এমন ভয়ানক ক্ষেত্রে মামুষকে দুর্নিবার বেগে যে টানিয়া আনিল মামুষ তাহাকে গালি দিয়া বলিল 'শয়তান'।

কিন্তু, রাগই করি আর যাই করি, জগতে শয়তানকে তো মানিতে পারি না। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, মামুষের এই-যে ইচ্ছার উপরে আরো'র জন্য আরও একটা ইচ্ছা ইহা তাহার বাহিরের দিক হইতে একটা শক্তির আক্রমণ নহে। ইহাকে মামুষ রিপু বলে বলুক, কিন্তু এই ইচ্ছাই তাহার স্বার্থ মানবস্বভাবগত ইচ্ছা। সুতরাং যতক্ষণ এই ইচ্ছাকে সে জয়ী করিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহার কিছুতেই শাস্তি নাই— ততক্ষণ তাহাকে কেবলই আঘাত খাইয়া খাইয়া ঘুরিয়া মরিতে হইবে।

কিন্তু, এই আরো'র ইচ্ছাকে সে জয়ী করিবে কেমন করিয়া। আহা করিলে পেট তাহার ভরিবেই, ভোগ করিলে এক জামগায় তাহার নিবৃত্তিতে আসিয়া ঠেকিতেই হইবে— আরো'র ইচ্ছাকে সেখানে কোনো-একটা সীমায় আসিয়া হার মানিতেই হইবে। শুধু হার মানা নয়, সে জামগায় সে দুঃখ পাইবে এবং দুঃখ ঘটাইবে। ব্যাধি আসিবে, বিকৃতি আসিবে, সে নিজেকে এবং অন্তকে বাধা দিতে থাকিবে। কেননা, প্রকৃতি যেখানে সীমা টানিয়াছেন তাহাকে লঙ্ঘন করিতে গেলেই শাস্তি আছে।

শুধু তাই নয়। প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আমাদের এই আরো'র ইচ্ছাকে দৌড় করাইতে গেলেই পরস্পরের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে হয়। যেটুকু আমার আছে তাহার চেয়ে বেশি লইতে গেলেই যেটুকু তোমার আছে তাহার উপর হাত দিতে হয়। তখন, হয় গোপনে ছলনা নয় প্রকাশ্যে গায়ের জোর আশ্রয় করিতে হয়। তখন দুর্বলের মিথ্যাচার ও প্রবলের দৌরাখো সমাজ লণ্ডতও হইতে থাকে।

এমনি করিয়াই পাপ আসে, বিনাশ আসে। কিন্তু, এই পাপ যদি না আসিত তবে মামুষ পথ দেখিতে পাইত না। এই আরো'র অতৃপ্তি যেখানে তাহাকে টানিয়া লইয়া যায় সেখানে যদি পাপের আগুন জলে, তবে ঘোড়াটাকে কোনোমতে বাগ মানাইয়া ফিরাইয়া আনিবার কথা মনে আসে। এইজন্য মনুষ্যলোকে অসংখ্য সকল শিকার উপরে সেই সাধনাটা প্রচলিত বাহাতে ঐ আরো'র ইচ্ছাটাকে বশে আনা যায়। কেননা, মামুষকে দেখি ঐ একটা ভয়ংকর বাহন দিয়াছেন, ও আমাদের কোথায় লইয়া গিয়া যে কেলে তাহার ঠিকানা নাই। উহার মুখে লাগাম পরাও, উহাকে চালাইতে

শিখ। কিন্তু তাই বলিয়া উহার দানাপানি একেবারে বন্ধ করিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিলে চলিবে না। কেননা, এই আরো'র ইচ্ছাই মানুষের স্বার্থ বাহন।

প্রয়োজনসাধনের ইচ্ছা জন্তদের বাহন। এইটে না থাকিলে তাহাদের জীবনযাত্রা একেবারেই চলিত না। এই ইচ্ছাটাই প্রাকৃতিক জীবনের মূল ইচ্ছা। ইহাই দুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যেখানে বাধা পায় সেইখানেই জন্তদের দুঃখ, যেখানে তাহার পূরণ হয় সেইখানেই তাহাদের সুখ। তাই দেখা যায়, জন্তদের সুখ দুঃখ আছে কিন্তু পাপপুণ্য নাই।

কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই-যে আরো'র ইচ্ছা ইহা আরামের ইচ্ছা নহে, সুখের ইচ্ছা নহে, বস্তুত ইহা দুঃখেরই ইচ্ছা। মানুষ যে কেবলই প্রাণকে তৃচ্ছ করিয়া আপন জ্ঞান প্রেম ও শক্তি-রাজ্যের উত্তরমেক ও দক্ষিণমেক আবিষ্কার করিবার জন্ত বারবার বাহির হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার সুখের সাধনা নহে। ইহা তাহার কোনো বর্তমান প্রয়োজন-সাধনের ইচ্ছা নহে।

বস্তুত মানুষের মধ্যে এই-যে দুই স্তরের ইচ্ছা আছে ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর-একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা বাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা বাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা। আশ্চর্য এই যে মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়। তখন সে সুখ-সুবিধা-প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে, 'আমি সুখ চাহি না, আমি আরো'কেই চাই ; সুখ আমার সুখ নহে, আরো'ই আমার সুখ।' তখন সে বলে, 'ভূমৈব সুখম্।'

সুখ বলিতে বাহা বুঝায় তাহা ভূমা নহে। ভূমা সুখ নহে, আনন্দ। সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ ভেদনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে। এমন-কি, দুঃখের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থক করে, আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্তাই আনন্দের তপস্তা।

তাই দেখিতেছি, অস্ফাট জন্তদের দ্বারা মানুষের নীচের ইচ্ছাটা দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা, আর উপরের ইচ্ছাটা দুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দলাভের ইচ্ছা। এই ইচ্ছাই কেবলই আমাদের কাছে বলিতেছে, 'নায়ে সুখমন্তি, ভূমাশ্বেব বিজিগামিতব্যঃ।'।

তাই প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে আপন সহজ বোধটুকু লইয়া জন্ত দুঃখনিবৃত্তিচেষ্টার সনাতন গতির মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিল। মানুষ তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান প্রেম শক্তির কোনো

সীমাতেই বন্ধ হইতে চাহিল না ; সে বলিল, ‘অভ্যাগকে নহে, সংস্কারকে নহে, প্রথাকে নহে, আমি ভূমাকে জানিব।’

তাই যদি হয় তবে এই আরো’র ইচ্ছাকে, এই আনন্দের ইচ্ছাকে, এত করিয়া বশে আনিবার জন্য মানুষের এমন প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন কী ছিল। এই প্রকাণ্ড ইচ্ছার প্রবল স্রোতে চোখ বুজিয়া আত্মসমর্পণ করিলেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব সার্থক হইত।

ইচ্ছাকে বল্গাবদ্ধ করিবার প্রধান কারণ এই যে, দুটা ইচ্ছার অধিকারনির্ণয় লইয়া মানুষকে বিষম সংকটে পড়িতে হইয়াছে। আমাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনের একটা ক্ষেত্র আছে, সেখানে আমরা সীমাবদ্ধ। সেখানে আমাদের বাসনাকে তাহার সহজ সীমার চেয়ে জোর করিয়া টানিয়া বাড়াইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। এই সীমানার বেড়াটা কিছু পরিমাণে স্থিতিস্থাপক, এইজন্য কিছু দূর পর্যন্ত তাহা টান সম্ভব। দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই টান কেবলই বাড়াইতে গেলে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়, ব্যাবিলনের সৌধচূড়া ভাঙিয়া পড়ে ; আমাদের আরো-ইচ্ছার মন্বদণ্ডকে ঐ দিকেই পাক দিতে গেলে ব্যাধি বিকৃতি ও পাপের বিষ মথিত হইয়া উঠে।

দেখা যাইতেছে, মানুষের অহমের দিকটাই সংকীর্ণ। সেখানে অতিরিক্ত পরিমাণে যাহাই গ্রহণ করিতে চাও তাহাই বোঝা হইয়া উঠে। নিজের স্বপ্ন, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষমতাকে অপরিমিত করিবার চেষ্টা আত্মহত্যার চেষ্টা। ও জায়গায় ভূমার ভর একেবারেই সম্ভব না। আহা-বিহারে স্বার্থসাধনে ভূমা অতি বীভৎস।

এই কারণে মানুষের এই আরো’র ইচ্ছাটা যখন যত হস্তীয়ার মতো তাহার কণ্ঠধ্বজ অহমের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তাহার বিষম বিপদ। কেবল যদি তাহাতে নিজের ও অন্তের দুঃখ আনিত তাহা হইলেও কথা ছিল না। কিন্তু, ইহার দুর্গতি তাহার চেয়ে আরও অনেক বেশি। ইহাতে পাপ আনে ; দুঃখের পরিমাপে তাহার পরিমাপ নহে। কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি, কেবলমাত্র দুঃখের দ্বারা মানুষের ক্ষতি হয় না— এমন-কি, দুঃখের দ্বারা মানুষের মঙ্গল হইতে পারে— কিন্তু, পাপই মানুষের পরম ক্ষতি।

ইহার উঁটা দিকটাও দেখো। মানুষের প্রয়োজনের ইচ্ছা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ সাংসারিক ইচ্ছা যখন স্বার্থের ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পরমার্থের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন সেও বড়ো কুংসিত। তখন সে কেবলই পুণ্যের হিসাব রাখিতে থাকে। যাহা পূর্ণ-আনন্দ, যাহা সকল ফলাফলের অতীত, তাহাকে ফলাফলের অঙ্কে গণভাগ করিয়া গণনা করিতে থাকে। এবং সেই গণনার উপর নির্ভর করিয়া মানুষ অহংকৃত হইয়া উঠে, কেবলই বাহ্যিকতার জালে জড়াইয়া পড়ে এবং স্বার্থপর গুটিতাকে রূপণের

ধনের মতো সংকীর্ণ গতির মধ্যে অত্যন্ত সাবধানে জমা করিয়া তুলিতে থাকে। তখন সে কুমার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ সাংসারিকের মতো নিজের একটা বেড়া তুলিয়া দিয়া বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। ইহাও পাপের আর-এক মূর্তি। ইহা আধ্যাত্মিককে বাহ্যিক ও পরমার্থকে স্বার্থ করিয়া তোলা।

মানুষের মনে এই-যে একটা পাপের বোধ আসে সে জিনিসটা কী তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমাদের যে মহতী ইচ্ছা আমাদেরকে কুমার দিকে লইয়া যাইবে তাহাকে ঠিক বিপরীত পথে ক্ষুদ্র অহমের অভিযুখে টানিয়া আনিলে কেবল যে দুঃখ ঘটে তাহা নহে—এমন-কি, স্থলবিশেষে দুঃখ না ঘটিলেও পারে—তাহাতে আমরা কুমাকে হারাই। আমাদের বড়োর দিক, আমাদের সত্যের দিক, নষ্ট হইয়া যায়; জন্তর পক্ষে তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কিন্তু মানুষের পক্ষে ভেমন বিনাশ আর-কিছু নাই। এই বিনাশের বোধ সকলের চিন্তে সমান নহে, এমন-কি কারও কারও চিন্তে অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু, মোটের উপর সমগ্র মানবের মনে এই পাপের বোধ দুঃখ-বোধের চেয়ে অনেক বড়ো হইয়া আছে। এতই বড়ো যে বহু দুঃখের দ্বারা মানুষ এই পাপকে ক্ষম করিতে চায়। পাপ-নামক শব্দের দ্বারা মানুষ নিজের যে-একটি গভীরতম দুর্গতিকে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছে, ইহার দ্বারাই মানুষ আপনার সত্যতম পরিচয় দিয়াছে।

সে পরিচয়টি এই যে, সৌম্যবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র নহে, অনন্তের মধ্যেই মানুষের আনন্দ; অহমের দিকই মানুষের চরম সত্যের দিক নহে, ব্রহ্মের দিকেই তাহার সত্য। মানুষ আপনার মধ্যে যে-একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনোমতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্তার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিন্তাকে আনন্দময় মুক্তির অভিযুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেমভক্তি ও পবিত্রতার মানুষের সমস্ত চেতনাধারাকে এক অপরিণীত অতলম্পর্শ অমৃতপারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরম গতিকে বাহা-কিছু বাধা দেয়, বাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্ট।

লোহিত সমুদ্র

২৩ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩১২

অন্তর বাহির

ভোরে ক্যাবিনে বিছানার যখন প্রথম ঘুম ভাঙিয়া গেল গবাকের ভিতর দিয়া দেখিলাম, সমুদ্রে আত্ম ডেউ দিয়াছে ; পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে । কান পাতিয়া তরঙ্গের কলশক শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল, কোন্-একটা অদৃশ্যে গান বাজিয়া উঠিতেছে । সে গানের শব্দ যে মেঘগর্জনের মতো প্রবল তাহা নহে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত ; কিন্তু, যেমন মৃদঙ্গ-করতালের বলবান শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তান সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে বাজিতে থাকে, তেমনি সেই ধীর গভীর সুরের অবিরাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছলিত হইতেছিল । শেষকালে এমন হইল, আমার মনের মধ্যে যে সুর শুনিতেছিলাম তাহাই কণ্ঠে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম । কিন্তু, এরূপ চেষ্টা একটা দৌরাখ্যা ; ইহাতে সেই বড়ো সুরটির শাস্তি নষ্ট করিয়া দেয় ; তাই আমি চূপ করিলাম ।

একটা কথা আমার মনে হইল, প্রভাতে মহাসমুদ্র আমার মনের যন্ত্রে এই-যে গান জাগাইল তাহা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে । তাহাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জলবাতাসের শব্দের অঙ্কুরণ বলিতে পারি না । তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ; তাহা একটি গান ; তাহাতে সুরগুলি ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আর-একটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদঘাটিত হইতেছিল ।

অথচ আমার মনে হইতেছিল, তাহা স্বতন্ত্র কিছুই নহে, তাহা এই সমুদ্রের বিপুল শব্দোচ্ছ্বাসেরই অন্তরতর ধ্বনি ; এই গানই পূজামন্দিরের সুগন্ধি ধূপের ধূমের মতো আকাশকে রঙে রঙে পূর্ণ করিয়া কেবলই উপরে উঠিতেছে । সমুদ্রের নিখাসে নিখাসে যাহা উচ্ছলিত হইতেছে তাহার বাহিরে শব্দ, তাহার অন্তরে গান ।

বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ অস্বরূপতার যোগ নহে ; বরঞ্চ দেখিতে পাই, সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ । দুই মিলিয়া আছে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে মিল যে কোন্‌খানে তাহা ধরিবার জো নাই । তাহা অনির্বচনীয় মিল ; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণযোগ্য মিল নহে ।

চোখে লাগিতেছে স্পন্দনের আঘাত, আর মনে দেখিতেছি আলো ; দেখে ঠেকিতেছে বস্তু, আর চিন্তে জাগিতেছে সৌন্দর্য ; বাহিরে ঘটতেছে ঘটনা, আর অন্তরে ডেউ খেলাইয়া উঠিতেছে সুখদুঃখ । একটার আয়তন আছে, তাহাকে বিশ্লেষণ করা যায় ; আর-একটার আয়তন নাই, তাহা অখণ্ড । এই-যে ‘আমি’ বলিতে যাহাকে

বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত দূর গন্ত্য, কত যত্নের চিন্তা ও অত্নভূতি, অথচ এই-সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে-একটি জিনিস আপন সমগ্রতার প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আশি এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতিরূপ মাত্র নহে, বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারা সে ব্যক্ত হইতেছে।

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্য তাঁহাদের সেই চেষ্টা অত্নকরণের ভিতর দিয়া কখনোই সফল হইতে পারে না। অনেক সময়ে অভ্যাসের মোহে আমাদের বোধের মধ্যে জড়তা আসে। তখন, আমরা যাহাকে দেখিতেছি কেবলমাত্র তাহাকেই দেখি। প্রত্যক্ষ রূপ যখন নিজেকেই চরম বলিয়া আমাদের কাছে আত্মপরিচয় দেয় তখন যদি সেই পরিচয়টাকেই মানিয়া লই তবে সেই জড় পরিচয়ে আমাদের চিন্তা জাগে না। তখন পৃথিবীতে আমরা চলি, ফিরি, কাজ করি, কিন্তু পৃথিবীকে আমরা চিন্তাধারা গ্রহণ করি না। কারণ, এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিন্তার সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্ঘাটিত করিবার কাজেই কবিতা গুণীরা নিযুক্ত।

এইজন্য তাঁহারা আমাদের অভ্যস্ত রূপটির অত্নসরণ না করিয়া তাহাকে খুব একটা নাড়া দিয়া দেন। তাঁহারা এক রূপকে আর-এক রূপের মধ্যে লইয়া গিয়া তাহার চরমতার দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেন। চোখে দেখার সামগ্রীকে তাঁহারা কানে শোনার জায়গায় দাঁড় করান, কানে শোনার সামগ্রীকে তাঁহারা চোখে দেখার রেখার মধ্যে রূপান্তরিত করিয়া ধরেন। এমনি করিয়া তাঁহারা দেখাইয়াছেন জগতে রূপ জিনিসটা ক্রমসত্য নহে, তাহা রূপকমাত্র; তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিজ্ঞান।

আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে স্বর বাধিয়া বলিলেন, ইহা সকালবেলাকার গান। কিন্তু, তাহার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলিবার কী মানে হইল। তাহার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অত্নকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরের সঙ্গে এই সংগীতকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা বার্থ হইবে।

আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে। আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ন সারাহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত

হইয়াছে। সে রাগিণীর সবগুলি সকলের কাছে ঠিক লাগিবে কি না জানি না। অস্তুত আমি সারঙ রাগকে মধ্যাহ্নকালের সুর বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। তা হউক, কিন্তু বিশেষের খাসমহলের গোপন নহবতখানায় যে কালে কালে ঝড়ুতে ঝড়ুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অস্তরালে যে-একটি গভীরতর অস্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই জানাইতেছে।

যুরোপের বড়ো বড়ো সংগীতরচিতারা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো দিক দিয়া তাঁহাদের গানে বিশ্বের সেই অস্তরের বার্তাই প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহাদের রচনার সঙ্গে যদি ভেদন করিয়া পরিচয় হয় তবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। আপাতত যুরোপীয় সংগীতসভার বাহির-দেউড়িতে বাজে লোকের ভিড়ের মধ্যে ঘেটুকু শোনা যায় তাহার সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আমার মনে উঠিয়াছে।

আমাদের জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ধ্যার সময় গান-বাজনা করিয়া থাকেন। যখন সেরূপ বৈঠক বসে আমিও সেই ঘরের এক কোণে গিয়া বসি। বিলাতি গান আমার স্বভাবত ভালো লাগে বলিয়াই যে আমাকে টানিয়া আনে তাহা নহে। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, ভালো জিনিস ভালো লাগার একটা সাধনা আছে। বিনা সাধনায় যাহা আমাদের কাছে মুগ্ধ করে তাহা অনেক সময়েই মোহ এবং যাহা নিরস্ত করে তাহাই যথার্থ উপাদেয়। সেইজন্য যুরোপীয় সংগীত আমি শুনিবার অভ্যাস করি। যখন আমার ভালো না লাগে তখনো তাহাকে অশ্রদ্ধা করিয়া চুকাইয়া দিই না।

এ জাহাজে একজন যুবক ও দুই-একজন মহিলা আছেন, তাঁহারা বোধ হয় মন্দ গান করেন না। দেখিতে পাই, শ্রোতারা তাঁহাদের গানে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। যেদিন সভা বিশেষ রূপে অমিয়া উঠে সেদিন একটির পর একটি করিয়া অনেকগুলি গান চলিতে থাকে। কোনো গান বা ইংলণ্ডের গৌরবগর্ব, কোনো গান বা হস্তাশ্রয় প্রণয়িনীর বিদায়সংগীত, কোনো গান বা প্রেমিকের প্রেমনিবেদন। সবগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আমি এই দেখি, গানের সুরে এবং গায়কের কণ্ঠে পদে পদে খুব একটা জোর দিবার চেষ্টা। সে জোর সংগীতের ভিতরকার শক্তি নহে, তাহা যেন বাহিরের দিক হইতে প্রয়াস। অর্থাৎ, হৃদয়বেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের বোঁক দিয়া খুব করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া দিবার চেষ্টা।

ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের হৃদয়যোজ্ঞাসের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই আমাদের কণ্ঠস্বরের বেগ কখনো বৃহ কখনো প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু, গান তো স্বভাবের নকল নহে; কেননা, গান আর অভিনয় তো এক জিনিস নয়। অভিনয়কে যদি গানের

সঙ্গে মিলিত করি তবে গানের বিত্তম্ব শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাই জাহাজের সেলুনে বসিয়া যখন ইহাদের গান শুনি তখন আমার কেবলই মনে হইতে থাকে, হৃদয়ের ভাবটাকে ইহারা যেন ঠেলা দিয়া, চোখে আড়ল দিয়া দেখাইয়া দিতে চায়।

কিন্তু, সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না। প্রেমিক ঠিকটি কেমন করিয়া অনুভব করিতেছে তাহা তো আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই। বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্নজাতীয়। কারণ, বাহিরের দিকে যাহা আবেগ, অন্তরের দিকে তাহাই সৌন্দর্য। ঈশ্বরের স্পন্দন ও আলোকের প্রকাশ যেমন স্বতন্ত্র, ইহাও তেমনি স্বতন্ত্র।

আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া কাঁদি ও হাস্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করি, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু, হৃদয়ের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের ও সুখের গানে হাস্য-ধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে, তবে তাহাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নাই। বস্তুত যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি বরিয়া পড়ে না এবং হাস্তের ভিতরকার হাস্যটি ধনিয়া উঠে না, সেইখানেই সংগীতের প্রভাব। সেইখানে মানুষের হাসিকান্নার ভিতর দিয়া এমন একটা অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেখানে আমাদের সুখহৃদয়ের সুরে সমস্ত গাছপালা নদীনির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্বহৃদয়সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।

কিন্তু, সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়া, কোঁক দিয়া, হৃদয়াবেগের নকল করিতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা গুণানামা আছে, কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নহে।

অভিনয়-জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি কোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি কোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। যত্নমকে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতার কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গ্যে অবদম্বিত প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা-

সাক্ষাৎসাক্ষ্য মতো বাড়াইয়া বলে। সংঘম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের ফ্রামলেট ও ব্রাইড অফ লামার্মুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। একরূপ অসংযত আভিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।

আর্ট-জিনিসটাতে সংঘমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ, সংঘমই অস্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। মানবজীবনের সাধনাতেও, যাহারা আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান তাহারাও বাহ্য উপকরণকে সংক্ষিপ্ত করিয়া সংঘমকে আশ্রয় করেন। এইজন্য আত্মার সাধনায় এমন একটি অদ্ভুত কথা বলা হইয়াছে : ত্যক্তেন ভূমীধাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। আর্টেরও চরম সাধনা ভূমার সাধনা। এইজন্য প্রবল আঘাতের দ্বারা হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংঘমের দ্বারা তাহা আমাদের কাছে অস্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য। যাহা চোখে দেখিতেছি তাহাকেই নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর খুব মোটা তুলির দাগা বুলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া আমাদের কাছে ছেলে-ভুলাইবে না।

এই প্রবলতার কোঁক দিয়া আমাদের মনকে কেবলই ধাক্কা মারিবার চেষ্টা যুরোপীয় আর্টের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায়। মোটের উপর যুরোপ বাস্তবকে ঠিক বাস্তবের মতো করিয়া দেখিতে চায়। এইজন্য যেখানে ভক্তির ছবি আঁকা দেখি সেখানে দেখিতে পাই, হাত দুখানি জোড় করিয়া মাথা আকাশে তুলিয়া চোখের তারা দুটি উল্টাইয়া ভক্তির বাহ্য ভঙ্গিমা নিরতিশয় পরিস্ফুট করিয়া আঁকা। আমাদের দেশে যে-সকল ছাত্র বিলাতি আর্টের নকল করিতে যায় তাহারা এইপ্রকার ভঙ্গিমার পছন্দ ছুটিয়াছে। তাহারা মনে করে, বাস্তবের উপর জোরের সঙ্গে কোঁক দিলেই যেন আর্টের কাজ সুসিদ্ধ হয়। এইজন্য নারদকে আঁকিতে গেলে তাহারা যাজ্ঞার দলের নারদকে আঁকিয়া বসে— কারণ, ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো তাহাদের সাধনা নহে; যাজ্ঞার দলে ছাড়া আর তো কোথাও তাহারা নারদকে দেখে নাই।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীক পিল্লীরা তাপস বুকের মূর্তি গড়িয়াছিল। তাহা উপবাসজীর্ণ কৃশ শরীরের বখাষ প্রতিকল্প; তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির

হিসাব গণনা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় শিল্পীও তাপস বুকের মূর্তি গড়িয়াছিল, কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব ইতিহাস নাই। তাপসের আস্তর মূর্তির মধ্যে হাড়গোড়ের হিসাব নাই; তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্য নহে। তাহা বাস্তবকে কিছুমাত্র আয়ত দেয় নাই বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে। ব্যবসায়ী আর্টিস্ট বাস্তবের সাক্ষী, আর শ্রমী আর্টিস্ট সত্যের সাক্ষী। বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাঙ্গাকে ধব করিতেই হইবে; বাহিরের রূপটাকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হইবে, ‘তুমি চরম নও, তুমি পরম নও, তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র।’

আরব-সমুদ্র

২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

খেলা ও কাজ

কুমধ্য-সাগরের প্রথম ঘাট পোর্ট-সৈয়দ। এইখান হইতে আমাদিগকে যুরোপের পারে পাড়ি দিতে হইবে। সন্ধ্যার সময় আমরা বন্দরে পৌঁছিলাম। শহরের বাতায়নগুলিতে তখন আলো জলিয়াছে। আরোহীদিগকে ডাঙার পৌছাইয়া দিবার জন্য ছোটো ছোটো নোকা এবং মোটর-বোট ঝাঁকে ঝাঁকে চারি দিকে আসিয়া আমাদের আহ্বান ঘিরিয়াছে। পোর্ট-সৈয়দের দোকান-বাজার ঘুরিবার জন্য অনেকেই সেখানে নাশিলেন। আমি সেই ভিড়ের মধ্যে নাশিলাম না। আহ্বানের রেলিঙ ধরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। অন্ধকার সমুদ্র এবং অন্ধকার আকাশ—দুইয়ের সংগমস্থলে অল্প একটুখানি জাহগার যাহুব আপনার আলো কমটি জ্বলাইয়া রাজিকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে।

পোর্ট-সৈয়দে অনেকগুলি নূতন আরোহী উঠিবার কথা। পুরাতনের দল এই সংবাদে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। আর-সমস্ত নূতনকে যাহুব খুজিয়া বাহির করে, কিন্তু নূতন যাহুব। এমন উদ্বেগের বিষয় আর-কিছুই নাই। সে কাছে আসিলে তাহার সঙ্গে ভিড়ের বাহিরে বোঝাপড়া করিয়া লইতেই হইবে। সে তো কেবলমাত্র কৌতুহলের বিষয় নহে। তাহার মন লইয়া সে অস্ত্রের মনকে ঠেলাঠেলি করে। যাহুবের ভিড়ের মতো এমন ভিড় আর নাই।

পোর্ট-সৈয়দে যাহারা জাহাজে চড়িল তাহারা আর সকলেই ফরাসি। আমাদের ডেক এখন মাহুবে মাহুবে ভরিয়া গিয়াছে। এখন পরস্পরের দেহতরী বাঁচাইয়া চলিতে হইলে রীতিমত মাঝিগিরির প্রয়োজন হয়।

সকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ডেকের উপর যুরোপীয় নরনারীদের প্রতিদিনের কালব্যাপন আমি আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, এবারও দেখিতেছি। প্রথমটাই চোখে পড়ে, ইহারা সর্বদাই চঞ্চল হইয়া আছে। এতটা চঞ্চল্য আমাদের অভ্যস্ত নহে। আমাদের গরম দেশে আমরা কোনোমতে ঠাণ্ডা থাকিতে চাই— চোখের সামনে অস্ত্র কেহ অস্থিরতা প্রকাশ করিলেও আমাদের গরম বোধ হয়। ‘চূপ করো, স্থির থাকো, মিছামিছি কাজ বাড়াইয়ো না’ ইহাই আমাদের সমস্ত দেশের অঙ্গশাসন। আর, ইহারা কেবলই বলে, ‘একটা-কিছু করা থাক।’ এইজন্য ইহারা ছেলে বুড়া সকলে মিলিয়া কেবলই দাপাদাপি করিতেছে। হাসি গল্প খেলা আমাদের বিরাম নাই, অবসান নাই।

অভ্যাসের বাধা সরাইয়া দিয়া আমি যখন এই দৃশ্য দেখি আমার মনে হয়, আমি যেন বাহু প্রকৃতির একটা লীলা দেখিতেছি। যেন ঝরনা ঝরিতেছে, যেন নদী চলিতেছে, যেন গাছপালা বাতাসে মাতামাতি করিতেছে। আপনার সমস্ত প্রয়োজন সারিয়াও প্রাণের বেগ আপনাকে নিঃশেষ করিতে পারিতেছে না; তখন সে আপনার সেই উদ্ভূত প্রাচুর্যের দ্বারা আপনাকেই আপনি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা যখন ছোটো ছেলেকে কোথাও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই তখন কিছু খেলনার আয়োজন রাখি; নহিলে তাহাকে লাঙ্গ রাখা শক্ত হয়। কেননা, তাহার প্রাণের স্রোত তাহার প্রয়োজনের সীমাকে ছাপাইয়া চলিয়াছে। সেই উচ্ছলিত প্রাণের বেগ আপনার লীলার উপকরণ না পাইলে অধীর হইয়া উঠে। এইজন্যই ছেলেদের বিনা কারণে ছুটাছুটি করিতে হয়, তাহারা যে চেষ্টামেচি করে তাহার কোনো অর্থই নাই এবং তাহাদের খেলা দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তির হাসি আসে এবং কাহারও কাহারও বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু, তাহাদের এই খেলার উৎপাত আমাদের পক্ষে যত বড়ো উপদ্রব হউক, খেলা বন্ধ করিলে উপদ্রব আরও গুরুতর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই।

এই-যে যুরোপীয় যাত্রীরা জাহাজে চড়িয়াছে, ইহাদের জন্তও কতরকম খেলার আয়োজন রাখিতে হইয়াছে তাহার আর সংখ্যা নাই। আমাদের যদি জাহাজ থাকিত তাহা হইলে তাঙ্গ পাশা প্রভৃতি অত্যন্ত ঠাণ্ডা খেলা ছাড়া এ-সমস্ত ঘোড়খাপের খেলার ব্যবস্থা করার দিকে আমরা দৃকপাতমাত্র করিতাম না। বিশেষতঃ কয় দিনের জন্ত পথ

চলার মুখে এ-সমস্ত অনাবশ্যক বোঝা নিশ্চয়ই বর্জন করিতাম এবং কেহ তাহাতে কিছু মনেও করিত না।

কিন্তু, যুরোপীয় রাজাদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য খেলা চাই। তাহাদের প্রাণের বেগের মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যবহারের অতিরিক্ত যন্ত্র একটা পরিশিষ্ট ভাগ আছে, তাহাকে চূপ করিয়া বসাইয়া রাখিবে কে। তাহাকে নিয়ন্ত ব্যাপৃত রাখা চাই। এইজন্য খেলনার পর খেলনা জোগাইতে হয় এবং খেলার পর খেলা সৃষ্টি করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখার প্রয়োজন।

তাই দেখি, ইহারা ছেলেবুড়ো কেবলই ছট্‌ফট এবং বাতামাতি করিতেছে। সেটা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক বলিয়া প্রথমটা কেমন অদ্ভুত ঠেকে। মনে ভাবি, বয়স্ক লোকের পক্ষে এ-সমস্ত ছেলেমানুষি নিরর্থক অসংযমের পরিচয়মাত্র। ছেলেদের খেলার বয়স বলিয়াই খেলা তাহাদিগকে শোভা পায়; কাজের বয়সে এতটা খেলার উৎসাহ অত্যন্ত অসংগত।

কিন্তু, যখন নিশ্চয় বুঝিতে পারি যুরোপীয়ের পক্ষে এই চাকল্য এবং খেলার উচ্চম নিতান্তই স্বভাবসংগত, তখন ইহার একটি শোভনতা দেখিতে পাই। ইহা যেন বসন্ত-কালের অনাবশ্যক প্রাচুর্যের মতো। যত ফল ধরিবে তাহার চেয়ে অনেক বেশি মুকুল ধরিয়াকে। কিন্তু, এই অনাবশ্যক ঐশ্বর্য না থাকিলে আবশ্যকে পদে পদে কুপণতা ঘটিত।

ইহাদের খেলার মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জার বিষয় নাই। কেননা, এই খেলা অলসের কালযাপন নহে; কেননা, আমরা দেখিয়াছি, ইহাদের প্রাণের শক্তি কেবলমাত্র খেলা করে না। কর্মক্ষেত্রে এই শক্তির নিরলস উচ্চম, ইহার অপ্রতিহত প্রভাব। কী আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে ইহারা সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া বিপুল কর্মজাল বিস্তার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহার পশ্চাতে শরীর ও মনের কী অপরিমিত অধ্যবসায় নিযুক্ত। সেখানে কোথাও কিছুমাত্র জড়ত্ব নাই, নৈথিল্য নাই; সতর্কতা সর্বদা জাগ্রত; স্বযোগের তিলমাত্র অপব্যয় দেখা যায় না।

যে শক্তি কর্মের উত্তোকে আপনাকে সর্বদা প্রবাহিত করিতেছে সেই শক্তিই খেলার চাকল্যে আপনাকে তরঙ্গিত করিতেছে। শক্তির এই প্রাচুর্যকে বিজ্ঞের মতো অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাই মানুষের ঐশ্বর্যকে নব নব সৃষ্টির মধ্যে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। ইহা নিজেকে দিকে দিকে অনায়াসে অজস্র ত্যাগ করিতেছে, সেইজন্যই নিজেকে বহুগুণে কিরিয়া পাইতেছে। ইহাই সাম্রাজ্য বাণিজ্য বিজ্ঞানে সাহিত্যে কোথাও কোনো সীমা মানিতেছে না, দুর্লভের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করিতেছে।

এই-ষে উত্তম শক্তি, যাহার এক দিকে ক্রীড়া ও অস্ত্র দিকে কর্ম, ইহাই যথার্থ স্তম্ভর। রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্যের প্রকাশ দেখিতে পাই সেখানে আমরা এক দিকে দেখি সাজসজ্জা লীলামাধুর্য, আর-এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী। বস্তুত, শক্তিই সৌন্দর্যরূপে আপনাকে প্রকাশ করে, আর শক্তিহীনতাই শৈথিল্য ও অব্যবহার মধ্য দিয়া কেবলই কদম্বতার পঙ্কের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। কদম্বতাই মানুষের শক্তির পরাভব; এইখানেই অস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, অন্ধ সংস্কার; এইখানেই মানুষ বলে, ‘আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম, এখন অদৃষ্টে যাহা করে।’ এইখানেই পরম্পরে কেবল বিচ্ছেদ ঘটে, আরকু কর্ম শেষ হয় না, এবং যাহাই গড়িয়া তুলিতে চাই তাহাই বিগ্নিষ্ট হইয়া পড়ে। শক্তিহীনতাই যথার্থ শ্রীহীনতা।

আমি জাহাজের ডেকের উপরে ইহাদের প্রচুর আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেও ইহাই দেখিতে পাই। ইহাদের সমস্ত খেলাধুলার ভিতরে ভিতরে স্বভাবতই একটি বিধান দেখা দেয়। এইজন্য ইহাদের আমোদ-প্রমোদও কোনোমতে বিপুল হইয়া উঠে না। যথাসময়ে যথাবিহিত উদ্বেগ প্রত্যেককেই পরিয়া আসিতে হয়। পরম্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের ভিতরে ভিতরে নিয়ম প্রচ্ছন্ন আছে; সেই নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করিবার জো নাই। বিধানের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে বলিয়াই ইহাদের আমোদ-আহ্লাদ এমন উচ্ছ্বসিত প্রবল বেগে বিপত্তি বাঁচাইয়া প্রবাহিত হইতে পারে।

এই ডেকের উপরে আর কেহ নহে, কেবল আমাদের দেশের লোকে মিলিত হইয়াছে, সে দৃশ্য আমি মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। প্রথমেই দেখা যাইত, কোনো একই ব্যবস্থা দুইজনের মধ্যে খাটিত না। আমাদের অভ্যাস ও আচরণ পরম্পরের সঙ্গে আপনার মিল করিতে জানে না। যুরোপীয়দের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র, আর-একটা জায়গা আছে যেখানে ইহারা সকলের। যেখানে ইহারা স্বতন্ত্র সে জায়গাটা ইহাদের প্রাইভেট। সেখানটা প্রচ্ছন্ন। সেখানে সকলের অব্যবহিত অধিকার নাই এবং সেই অনধিকারকে সকলেই সহজেই মানিয়া চলে। সেখানে তাহারা নিজের ইচ্ছা ও অভ্যাস অনুসারে আপনার ব্যক্তিগত জীবন বহন করে। কিন্তু, যখনই সেখান হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসে তখনই সকলের বিধানের মধ্যে ধরা দেয়— সে জায়গায় কোনোমতেই তাহারা আপনার প্রাইভেটকে টানিয়া আনে না। এই দুই বিভাগ স্থলপট থাকাতাই পরম্পর মেলাবেশা ইহাদের পক্ষে এত সহজ ও স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে এই বিভাগ নাই বলিয়া সমস্ত এলোমেলো হইয়া যায়, কেহ কোনোখানে সীমা মানিতে চায় না। আমরা এই ডেক পাইলে নিজের

প্রয়োজন-মত চলিতাম। পৌটলা-পুঁটলি যেখানে সেখানে ছড়াইয়া রাখিতাম। কেহ বা দাঁড়ন করিতাম, কেহ বা যেখানে খুশি বিছানা পাতিয়া পথ মোখ করিয়া নিজা দিতাম, কেহ বা হাঁকার জল ফিরাইতাম ও কলিকাটা উপুড় করিয়া ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় ঢালিয়া দিতাম, কেহ বা চাকরকে দিয়া শরীর দলাইয়া সশব্দে তেল মাখিতে থাকিতাম। ঘটিবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়িয়া থাকিত তাহার ঠিকানা পাওয়া বাইত না, এবং ভাকাতাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকিত না। ইহার মধ্যে যদি কেহ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনিতে চেষ্টাযাত্র করিত তাহা হইলে অত্যন্ত অপমান বোধ করিতাম এবং মহা রাগারাগির পালা পড়িয়া বাইত। তাহার পরে অন্য লোকের যে লেখাপড়া কাজকর্ম থাকিতে পারে, কিছা মাঝে মাঝে সে তাহার অবসর ইচ্ছা করিতে পারে, সে সম্বন্ধে কাহারও চিন্তাযাত্র থাকিত না— হঠাৎ দেখা বাইত, যে বইটা পড়িতেছিলাম সেটা আর-একজন টানিয়া লইয়া পড়িতেছে; আমার দূরবীনটা পাঁচ জনের হাতে হাতে ফিরিতেছে, সেটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিবার কোনো ভাগিদ নাই; অনায়াসেই আমার টেবিলের উপর হইতে আমার খাতাটা লইয়া কেহ টানিয়া দেখিতেছে, বিনা আহ্বানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গল্প জুড়িয়া দিতেছে, এবং রসিক ব্যক্তি সমস্র অসমস্র বিচার না করিয়া উচ্চৈশ্বরে গান গাহিতেছে, কণ্ঠে স্বরমাধুর্যের অভাব থাকিলেও কিছুযাত্র সংকোচ বোধ করিতেছে না। যেখানে যেটা পড়িত সেখানে সেটা পড়িয়াই থাকিত। যদি ফল খাইতাম তবে তাহার খোসা ও বিচি ডেকের উপরেই ছড়ানো থাকিত, এবং ঘটিবাটি চাটয় মোছা গলাবন্দ হাজার বার করিয়া খোজাখুজি করিতে করিতেই দিন কাটিয়া বাইত।

ইহাতে যে কেবল পরস্পরের অসুবিধা ঘটিত তাহা নহে, সুখ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য চারি দিক হইতে অন্তর্ধান করিত। ইহাতে আমোদ-আহ্লাদও অব্যাহত হইত না এবং কাজকর্মের তো কথাই নাই। যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মানিয়া সফল হয় সেই শক্তিই আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে নিয়মকে রক্ষা করিয়া তাহাকে সরস ও সুস্বাদু করিয়া তোলে। বোদ্ধা যেমন স্বভাবতই আপনার ভুলোয়ারকে ভালোবাসিয়া ধারণ করে, শক্তিমান তেমনি স্বভাবতই নিয়মকে আন্তরিক প্রীতিসহ সহিত রক্ষা করে। কারণ, ইহাই তাহার অন্ত; শক্তি যদি নিয়মকে না মানে তবে আপনাকেই ব্যর্থ করে।

শক্তি এই-যে নিয়মকে মানে সে কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য। আর, শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে; তখন সে ডরে হোক, লোভে হোক, বা কেবলযাত্র চিরাত্ম্যালের জড়ত্ব-বশত হোক,

নিয়মকে নতুহাঙ্গ হইয়া শিরোধার্য করিয়া লয়। কিন্তু, যেখানে সে বাধা নয়, যেখানে কেবল নিজের খাতিরেই নিয়ম স্বীকার করিতে হয়, দুর্বলতা সেইখানেই নিয়মকে ফাঁকি দিয়া নিজেকে ফাঁকি দেয়। সেখানেই তাহার সমস্ত কুশী ও বদুচ্ছাকৃত।

যে দেশে মানুষকে বাহিরের শাসন চালনা করিয়া আসিয়াছে, যেখানেই মানুষের স্বাধীন শক্তিকে মানুষ শ্রদ্ধা করে নাই এবং রাজা গুরু ও শাস্ত্র বিনা যুক্তিতে মানুষকে তাহার হিতসাধনে বলপূর্বক প্রবৃত্ত করিয়াছে, সেখানেই মানুষ আত্মশক্তির আনন্দে নিয়মপালনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। মানুষকে বাধিয়া কাজ করানো একবার অভ্যাস করাইলেই, বাধন কাটিয়া আর তাহার কাছে কাজ পাওয়া যায় না। এইজন্য যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মতো মানি, যেখানে মানি না সেখানে দাসের মতোই ফাঁকি দিই। সেইজন্য যখন আমাদের সমাজের শাসন ছিল তখন জলাশয়ে জল, চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা, পাশুশালায় আশ্রয় সহজে মিলিত ; যখন সামাজিক বাহু শাসন শিথিল হইয়াছে তখন আমাদের রাস্তা নাই, ঘাট নাই, জলাশয়ে জল নাই, সাধারণের অভাব দূর ও লোকের হিতসাধন করিবার কোনো স্বাভাবিক শক্তি কোথাও উদ্‌বোধিত হইয়া কাজ করিতেছে না। হয় আমরা দৈবকে নিন্দা করিতেছি নয় সরকার-বাহাদুরের মুখ চাহিয়া আছি।

কিন্তু, এ-সকল বিষয়ে কোন্টা যে কার্য এবং কোন্টা কারণ তাহা ঠাহর করিয়া বলা শক্ত। বাহারা বাহিরে নিয়মকে অবাধে পৃথল করিয়া পরে বাহিরের নিয়ম তাহাদিগকেই বাধে ; বাহারা নিজের শক্তির প্রাবল্যে সে নিয়মকে কোনোমতেই অকৃতাবে স্বীকার করিতে পারে না তাহারাই আপনার আনন্দে আপনার নিয়মকে উদ্‌ঘাতিত করিবার অধিকার লাভ করে। নতুবা, এই অধিকারকে হাতে তুলিয়া দিলেই ইহাকে ব্যবহার করা যায় না। স্বাধীনতা বাহিরের জিনিস নহে ভিতরের জিনিস, সুতরাং তাহা কাহারও কাছে হইতে চাহিয়া পাইবার জো নাই। যতক্ষণ নিজের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা আমরা সেই স্বাধীনতাকে লাভ না করি ততক্ষণ নানা আকারে বাহিরের শাসন আমাদের চোখে ঠুলি দিয়া ও গলায় দড়ি বাধিয়া চালনা করিবেই। ততক্ষণ আমরা মুখে বাহাই বলি, কাজের বেলায় আপনি আপনি হইতেই যেখানে সুযোগ পাইব সেখানেই অন্যের প্রতি অসুশাসন প্রবর্তিত করিতে চাহিব। রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার-লাভের বেলায় যুরোপীয় ইতিহাসের বচন আওড়াইব, আর সমাজনৈতিক গৃহনৈতিক ক্ষেত্রে কেবলই ঘোষ্ঠ যিনি তিনি কনিষ্ঠের ও প্রবল যিনি তিনি দুর্বলের অধিকারকে সংকুচিত করিতে থাকিব। আমরা যখন কাহারও ভালো করিতে চাহিব সে আমরাই নিজের মতে, আবারই নিজের নিয়মে ; বাহার ভালো,

করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভালো হইতে দিতে আমরা সাহস করি না। এমনি করিয়া দুর্বলতাকে আমরা অস্থিরতার মধ্যে পোষণ করিতে থাকি, অথচ সবলের অধিকারকে আমরা বাহিরের দিক হইতে স্বপ্নলব্ধ দৈবসম্পত্তির মতো লাভ করিতে চাই।

এইজন্যই পয়স বেদনার সহিত দেখিতেছি, যেখানেই আমরা সম্মিলিত হইয়া কোনো কাজ করিতে গিয়াছি, যেখানেই নিজেদের নিয়মের দ্বারা নিজেদের কোনো প্রতিষ্ঠানকে চালনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি, সেখানেই পদে পদে বিচ্ছেদ ও শৈথিল্য প্রবেশ করিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিতেছে। বাহিরের কোনো শত্রুর হাত হইতে নহে, কিন্তু অন্তরের এই শক্তিহীনতা শ্রীহীনতা হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করা, ইহাই আমাদের একটিমাত্র সমস্যা। যে নিয়ম যাহুযের গলার হার তাহাকে পায়ের বেড়ি করিয়া পরিব না, এই কথা একদিন আমাদের সমস্ত মনের সঙ্গে বলিতে হইবে। এই কথা স্মৃতি করিয়া জানিতে হইবে যে, সত্যকে যেমন করিয়া হউক মানিতেই হইবে— কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখন তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখন তাহা দুঃখ। অন্তরে সত্যকে মানিবার শক্তি যখন না থাকে তখন বাহিরে তাহার শাসন প্রবল হইয়া উঠে। সেজন্য যেন বাহিরকেই খিকার দিয়া নিজেকে অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টা না করি।

লগুনে

সমুদ্রের পালা শেষ হইল। শেষ দুই দিন প্রবল বেগে বাতাস উঠিল; তাহাতে সমুদ্রের আন্দোলনের সমতালে আমাদের আভ্যন্তরিক আলোড়ন চলিতে লাগিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, ইহাতে সমুদ্রের অপরাধ নাই, কাণ্ডেরই দোষ। যেদিন পৌছিবার কথা ছিল তাহার দুই দিন পরে পৌছিলাম। বরুণদেব নিশ্চয়ই এই দুর্বলাস্তঃকরণ বাদ্রীটির জন্য ঠিকমত হিগাব করিয়া বড়-বাতাসের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন— কিন্তু, যাহুযের হিগাব ঠিক রহিল না।

মার্সেলুস হইতে এক ঘোড়ো পারিসে আসিয়া এক দিনের মতো হাঁপ ছাড়িলাম। শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক লাফ করিয়া কেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। আনাহারের পর একটা মোটর-গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে : দেখিলে মনে হয়, পারিস সমস্ত যুরোপের খেলাঘর। এখানে রজশালার প্রদীপ আর নেবে না। চারি দিকে আমোদ-আহ্লাদের বিরাট আয়োজন। মানুষকে খুশি করিবার জন্য সুন্দরী পারিস-নগরীর কতই সাজসজ্জা। এই কথাই কেবল মনে হয়, মানুষকে খুশি করাটা সহজে সারিবার কোনো চেষ্টা নাই।

যখন পৃথিবীতে রাজাদের একাধিপত্যের দিন ছিল তখন প্রমোদের চূড়ান্ত ছিল কেবল রাজারই ঘরে। এখন সমস্ত মানুষ রাজা। এই সমগ্র মানুষের বিলাসভবনটি কী প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার জন্য কত দাস যে অহোরাত্র খাটিয়া মরিতেছে তাহার সীমা নাই। ইহার জন্য প্রত্যহ কত আহাজ, কত রেলগাড়ি বোঝাই করিয়া পৃথিবীর কত দুর্গম দেশ হইতে উপকরণ আসিতেছে তাহার ঠিকানা কে রাখে।

এই মানুষ-রাজার আমোদ এমন প্রকাণ্ড, এমন বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাকে অলস বিলাসীর প্রমোদের সঙ্গে তুলনা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা প্রবল চিন্তের প্রবল আমোদ ; যে সহজে সন্তুষ্ট হইতে চায় না তাহাকে খুশি করিবার দুঃসাধ্য সাধন। বহু লোক ভোগ করিতে করিতে এবং বহু লোক ভোগ জোগাইতে জোগাইতে এই প্রমোদ-পারাবারের মধ্যে ডুলাইয়া মরিতেছে, কিন্তু তবুও মোটের উপরে ইহার ভিতর হইতে মানুষের যে একটা বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা বাইতেছে তাহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না।

রবিবারের দিন ক্যালে হইতে সমুদ্রে পাড়ি দিয়া ভোভারে পৌছিলাম। সেখানে ইংরেজ যাত্রীর সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে চড়িয়া বসিলাম তখন মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ হইল। মনে হইল, আত্মীয়দের মধ্যে আসিয়াছি। ইংরেজের যে ভাষা জানি। মানুষের ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ইংরেজের ভাষা যখনি পাইয়াছি তখনি ইংরেজের মন পাইয়াছি। যাহা জানা যায় তাহাতেই আনন্দ। ক্রমে আমার পক্ষে কেবল চোখের জানা ছিল, কিন্তু হৃদয়ের জানা হইতে বঞ্চিত ছিলাম— সেইজন্যই আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। ভোভারে পা দিতেই আমার মনে হইল, সেই ব্যাঘাত আমার কাটিয়া গেল ; যেখানে দাঁড়াইলাম সেখানে কেবল যে মাটির উপর দাঁড়াইলাম তাহা নহে, মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

অনেক কাল পরে লগুনে আসিলাম। তখনো লগুনের রাস্তায় যথেষ্ট ভিড় দেখিয়াছি, কিন্তু এখন মোটর-গাড়ির একটা নৃতন উপসর্গ জুটিয়াছে। তাহাতে শহরের ব্যস্ততা আরও প্রবলভাবে মূর্তিবান হইয়া উঠিয়াছে। মোটর-রথ, মোটর-বিশ্বব্দ (অস্বিচাষ), মোটর-মালগাড়ি লগুনের নাড়ীতে নাড়ীতে শতধারার ছুটিয়া

চলিতেছে। আমি ভাবি, লগুনের সমস্ত রাস্তার ভিতর দিয়া কেবলমাত্র এই চলিবার বেগ পরিমাণে কী ভয়ানক প্রকাণ্ড! যে মনের বেগের ইহা বাহুমূর্তি তাহাই বা কী ভীষণ! দেশ-কালকে লইয়া কী প্রচণ্ড বলে ইহারা টানাটানি করিতেছে। পথ দিয়া পদাতিক যাহারা চলিতেছে প্রতিদিন তাহাদের সতর্কতা তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। মন অল্প যে-কোনো ভাবনাই ভাবুক-না কেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের এই বিচিত্র গতিবিধির সঙ্গে তাহাকে প্রতিনিয়ন্ত আপোষ করিয়া চলিতে হইবে। হিসাবের ভুল হইলেই বিপদ। হিংস্র পক্ষর হাত হইতে পরিজ্ঞান পাইবার প্রয়াসে হরিণের সতর্কতাবৃত্তি যেমন প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, চারি দিকে ব্যস্ততার ভাড়া খাইয়া খাইয়া এখানকার মানুষের সাবধানতা তেমনি অসামান্য তীক্ষ্ণতা লাভ করিতেছে। ক্ষত দেখা, ক্ষত শোনা ও ক্ষত চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার শক্তি কেবলই বাড়িয়া উঠিতেছে। দেখিতে শুনিতে ও ভাবিতে বাহার সময় লাগে সেই এখানে হঠিয়া যাইবে।

ক্রমে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটিতেছে। যে বন্ধু ও প্রীতি পাইতেছি তাহা বিদেশীর হাত হইতে পাইতেছি বলিয়া আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান হইয়া উঠিতেছে; মানুষ যে মানুষের কত নিকটের তাহা দূরত্বের মধ্য দিয়াই নিবিড়তর করিয়া অনুভব করা যায়।

ইতিমধ্যে একদিন আমি 'নেশন' পত্রের মধ্যাহ্নভোজে আহূত হইয়াছিলাম। নেশন এখানকার উদারপন্থীদের প্রধান সাপ্তাহিক পত্র। ইংলণ্ডে যে-সকল মহাত্মা স্বদেশ ও বিদেশ, স্বজাতি ও পরজাতিকে স্বার্থপরতার খুঁটা বাটখারায় মাপিয়া বিচার করেন না, অন্ত্যায়কে যাহারা কোনো ছুতার কোথাও আশ্রয় দিতে চান না, যাহারা সমস্ত মানবের অকৃত্রিম বন্ধু, নেশন তাঁহাদেরই বাণী বহন করিবার জন্ত নিযুক্ত।

নেশন পত্রের সম্পাদক ও লেখকেরা সপ্তাহে একদিন মধ্যাহ্নভোজে একত্র হন। এখানে তাঁহারা আহার করিতে করিতে আলোচনা করেন ও আহারান্তে আগামী সপ্তাহের প্রবন্ধের বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রের লেখকেরা সকলেই পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার অসামান্য ব্যক্তি। সেদিন ইহাদের আলোচনা-ভোজে স্থান পাইয়া আমি বড়োই আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে বলিয়া আমার বারবার কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, ইহারা সকলেই জানেন ইহাদের প্রত্যেকেরই একটি সত্যকার দায়িত্ব আছে। ইহারা কেবল বাক্য রচনা করিতেছেন না, ইহাদের প্রত্যেক প্রবন্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রীর হালটাকে ডাইনে বা বায়ে কিছু-না-কিছু টান দিতেছেই। এমন অবস্থায় লেখক

লেখার মধ্যে আপনার সমস্ত চিন্তকে প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের দেশে খবরের কাগজে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই; আমরা লেখকের কাছে কোনো দাবি দাবি করি না, এই কারণে লেখকের শক্তি সম্পূর্ণ আলস্য ত্যাগ করে না ও ফাঁকি দিয়া কাজ সারিয়া দেয়। এইজন্য আমাদের সম্পাদকেরা লেখকদের শিক্তা ও সতর্কতার কোনো প্রয়োজন দেখেন না, যে-সে লোক বাহা-তাহা লেখেন এবং পাঠকেরা তাহা নির্বিচারে পড়িয়া যান। আমরা সত্যক্ষেত্রে চাষ করিতেছি না বলিয়াই আমাদের মস্তুরীতে শস্ত-অংশ অতি সামান্য দেখা যায়—মনের খাত্ত পূরাপুরি জন্মিতেছে না।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনাসভা আমি দেখিয়াছি; তাহাতে কথার চেয়ে কণ্ঠের জোর কত বেশি! এখানে কিরূপ প্রশস্ত ভাবে এবং কিরূপ প্রণিধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক চলিতে লাগিল। মতের অনৈক্যের দ্বারা বিষয়কে বাধা না দিয়া তাহাকে অগ্রসরই করিয়া দিল। অনেক মিলিয়া কাজ করিবার অভ্যাস ইহাদের মধ্যে কত সহজ হইয়াছে তাহা এই ক্ষণকালের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম। ইহাদের কাজ শুরুতর, অথচ কাজের প্রণালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় লেশমাত্র নাই। ইহাদের রথ প্রকাণ্ড, তাহার গতিও দ্রুত, কিন্তু তাহার চাকা অনায়াসে ঘোরে এবং কিছুমাত্র শব্দ করে না।

বন্ধু

লগুনে আসিয়া একটা হোটেলে আশ্রয় লইলাম; মনে হইল, এখানকার লোকালয়ের দেউড়িতে আনাগোনার পথে আসিয়া বসিলাম। ভিতরে কী হইতেছে খবর পাই না, লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও হয় না—কেবল দেখি, মানুষ বাইতেছে আর আসিতেছে। এইটুকুই চোখে পড়ে, মানুষের ব্যস্ততার সীমা পরিসীমা নাই; এত অত্যন্ত বেশি দরকার কিসের তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এই প্রচণ্ড ব্যস্ততার ধাক্কাটা কোন্‌খানে গিয়া লাগিতেছে, তাহাতে কতি করিতেছে কি বুদ্ধি করিতেছে তাহার কোনো হিসাব কেহ রাখিতেছে কি না কিছুই জানি না। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজে, আহ্বানের স্থানে গিয়া দেখি—এক-একটা ছোটো টেবিল ঘেরিয়া দুই-তিনটি করিয়া স্ত্রীপুরুষ নিঃশব্দে আহার করিতেছে; পাত্র হাতে দীর্ঘকাল পরিবেশক গভীরমুখে দ্রুতপদে কিগ্রহস্তে পরিবেষণ করিয়া চলিয়াছে; কেহ কেহ বা থাইতে থাইতেই খবরের কাগজ পড়া সারিয়া লইতেছে; তাহার পরে ঘড়িটা খুলিয়া একবার

ডাকাইয়া, টুপিটা মাথায় চাপিয়া দিয়া, হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছে ; ঘর খুল হইতেছে । কেবল আহারের সময় বারকয়েক কয়েকজন মানুষ একত্র হয়, তাহার পরে কে কোথায় যায় কেহ তাহার ঠিকানা রাখে না । আমার কোনো প্রয়োজন নাই ; সকলের দেখাদেখি যিখ্যা এক-একবার ঘড়ি খুলিয়া দেখি, আবার ঘড়ি বন্ধ করিয়া পকেটে রাখি । যখন আহারেরও সময় নয়, নিদ্রারও সময় নহে, তখন হোটেল যেন ডাডায় বাধা নৌকায় যতো—তখন যদি সেখানে থাকিতে হয় তবে কেন যে আছি তাহার কোনো কৈফিয়ত ভাবিয়া পাওয়া যায় না । বাহাদের বাসস্থান নাই, কেবল কর্মস্থানই আছে, তাহাদেরই পক্ষে হোটেল মানায় । বাহারা আমার মতো নিতান্ত অনাবশ্যক লোক তাহাদের পক্ষে বাসের আরোজনটা এমনতরো পাইকারি রকমের হইলে পোষায় না । জানলা খুলিয়া দেখি, জনশ্রোত নানা দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে । মনে মনে ভাবি, ইহারা যেন কোন্-এক অদৃষ্ট কারিগরের হাতুড়ি । যে জিনিসটা গড়িয়া উঠিতেছে সেটাও মোটের উপর অদৃষ্ট ; যন্ত্র একটা ইতিহাসের কারখানা ; লক্ষ লক্ষ হাতুড়ি দ্রুত প্রবল বেগে লক্ষ লক্ষ জাহাঙ্গীর আসিয়া পড়িতেছে । আমি সেই এজিনের বাহিরে দাড়াইয়া চাহিয়া থাকি—ক্ষুধার স্টীমে চালিত সম্ভব হাতুড়িগুলি হুনিবায় বেগে ছুটিতেছে, ইহাই দেখিতে পাই ।

বাহারা বিদেশী, প্রথম এখানে আসিয়া এখানকার ইতিহাসবিধাতার এই অতি-বিপুল মানুষ-কলের চেহারাটাই তাহাদের চোখে পড়ে । কী দাহ, কী শব্দ, কী চাকার ঘূর্ণি । এই লগুন শহরের সমস্ত গতি, সমস্ত কর্মকে একবার চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করি—কী ভয়ঙ্কর অধ্যবসায় । এই অবিভ্রাম বেগ কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে আঘাত করিতেছে এবং কোন্ অব্যক্তকে প্রকাশের অভিমুখে জাগাইয়া তুলিতেছে ।

কিন্তু, মানুষকে কেবল এই যন্ত্রের দিক হইতে দেখিয়া তো দিন কাটে না । যেখানে সে মানুষ সেখানে তাহার পরিচয় না পাইলে কী করিতে আসিলাম ! কিন্তু, মানুষ যেখানে কল সেখানে দৃষ্টি পড়া যত সহজ, মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তত সহজ নহে । ভিতরকার মানুষ আপনি আসিয়া সেখানে ডাকিয়া না লইয়া গেলে প্রবেশ পাওয়া যায় না । কিন্তু, সে তো থিয়েটারের টিকিট কেনার মতো নহে ; সে দাম দিয়া মেলে না, সে বিনা মূল্যের জিনিস ।

আমার সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগ ঘটিয়া গেল—আমি একজন বন্ধু'র দেখা

পাইলাম। বাগানের মধ্যে গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বহু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ। এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বহু হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে সজ্ঞান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বহু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই। বহু হইতে গেলে সজ্ঞান করিতে হয়। অত্যাশ্চর্য্য সকল দানের মতো এ দানেরও একটা তহবিল দরকার, কেবলমাত্র ইচ্ছাই যথেষ্ট নহে। বহু হইতে জ্যোতি যেমন সহজেই ঠিকরিয়া পড়ে তেমনি বিশেষ ক্ষমতামণ্ডলী মানুষের জীবন হইতে সজ্ঞ আপনি বিচ্ছিন্নিত হইতে থাকে। প্রীতিতে প্রসন্নতাতে সেবাতে ভক্ত-ইচ্ছাতে এবং করুণাপূর্ণ অন্তরঙ্গত্বতে জড়িত এই-যে সহজ সজ্ঞ, ইহার মতো দুর্লভ সামগ্রী পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। কবি যেমন আপনার আনন্দকে ভাষায় প্রকাশ করেন, তেমনি যাহারা স্বভাববদ্ধ তাঁহারা মানুষের মধ্যে আপন আনন্দকে প্রতিদিনের জীবনে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

আমি এখানে যে বহুটিকে পাইলাম তাঁহার মধ্যে এই আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়ার অব্যাহত ক্ষমতা আছে। এইরূপ বহুত্বধনে ধনী লোককে লাভ করীর সুবিধা এই যে, একজনকে পাইলেই অনেককে পাওয়া যায়। কেননা, ইহাদের জীবনের সকলের চেয়ে প্রধান সক্ষম মনের মতো মানুষ-সক্ষম।

ইনি একজন সুবিখ্যাত চিত্রকর; ইনি অল্পকাল পূর্বে অল্পদিনের জন্য ভারতবর্ষে গিয়াছিলেন। সেই অল্পকালের মধ্যে ইনি ভারতবর্ষের বর্মস্থানটি দেখিয়া লইয়াছেন। হৃদয় দিয়া দেখা চোখে দেখারই মতো— ইহা বিশ্লেষণের ব্যাপার নহে, স্মরণ্যং ইহাতে বেশি সময় লাগে না। হৃদয়দৃষ্টি সম্বন্ধে কত অনাচ্ছাদ ভারতবর্ষে জীবন কাটাইয়া দিতেছে; তাহারা আমাদের দেশের সেই আলোকটিকেই দেখিল না বাহাকে দেখিলে আর সমস্তকেই অনায়াসে দেখা যায়। বাহাদের দেখিবার চোখ আছে তাহাদের অল্পকালের পরিচয় অঙ্কের চিরজীবনের পরিচয়ের চেয়ে বেশি।

ভারতবর্ষে ইহার সঙ্গে আমার কলকালের জন্য আলাপ হইয়াছিল। ইহার সজ্ঞময়তা সর্বদাই এমন অবোধে প্রকাশ পায় যে তখনি আমার চিত্ত ইহার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারিব এই লোভটি যুরোপে বাজার সময় আমাকে সকলের চেয়ে টানিয়াছিল।

ইহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিবা যাত্রা এক যুহুর্ভে হোটেলের দেউড়ি পার হইয়া গেলাম— কেহ আর বাধা দিবার রহিল না। তিফের ঠেলাঠেলিতে যেখানে তাবাসা ভালো

করিয়া দেখা যায় না, সেখানে বাপ যেমন ছোটো ছেলেকে নিজের কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার জায়গা করিয়া দেন, তেমনি লণ্ডন শহর দুই-এক জায়গায় আপনার উচ্চ কাঁধের উপর ফাঁকা জায়গা রাখিয়া দিয়াছে ; তাহার যে-সব ছেলেরা ভিড়ের লোকের মাথা ছাড়াইয়া আরও দূরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে চায় তাহাদের পক্ষে এই জায়গাগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে। লণ্ডনের হাম্পস্টেড-হীথ, সেই জাতের একটি উচ্চ পাহাড়ে প্রান্তর ; লণ্ডন এইখানে আপনার হইতে আপনাকে যেন তুলিয়া ধরিয়াছে। এখানে শহরের পাষাণহৃদয়ের একটি প্রান্ত এখনো নবীন ও স্বাভাবিক আছে, এবং তাহার ভয়ংকর আগিসের ভিড়ের মধ্যে এই জায়গাটিতে এখনো তাহার খোলা আকাশের জানলার ধারে একলা বসিবার আসন পাতা আছে।

আমার বন্ধুর বাড়িটির পিছন দিকে ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোটো একটুকরা বাগান আছে। ঐটুকু বাগান আনন্দিত ছোটো ছেলের আঁচলটির মতো ফুলের সৌন্দর্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সেই বাগানের দিকে মুখ করিয়া তাহাদের বৈঠকখানা-ঘরের সংলগ্ন একটি লম্বা বারান্দা অপরাপ্ত ফুলের স্তবকে আয়োজিত গোলাপের লতার অর্ধপ্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। এই বারান্দায় আমি যখন খুশি একখানা বই হাতে করিয়া বসি, তাহার পরে আর বই পড়িবার কোনো প্রয়োজন বোধ করি না। ইহার দুটি ছোটো ছেলে ও ছোটো মেয়ের মধ্যে বাল্যবয়সের চিরানন্দময় নবীনতার উজ্জ্বল দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগে। আমাদের দেশের ছেলেদের সঙ্গে ইহাদের আমি একটা গভীর প্রভেদ দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, যেন আমরা অত্যন্ত পুরাতন যুগের মানুষ ; আমাদের দেশের শিশুরাও যেন কোথা হইতে সেই পুরাতনদের বোঝা পিঠে করিয়া এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা ভালোমানুষ, তাহাদের গতিবিধি সংযত, তাহাদের বড়ো বড়ো কালো চোখ দুটি করুণ— তাহারা বেশি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না, আপনার মনেই যেন তাহার সীমাংসা করিতে থাকে। আর এই-সব ছেলেরা পৃথিবীর নবীনযুগের মহলে জন্মিয়াছে ; তাহারা জীবনের নবীনতার আশ্বাসে মাতিয়া উঠিয়াছে ; তাহাদের সমস্তই ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইতে হইবে, এইজন্য সব জায়গাতেই তাহাদের চকল পা ছুটিতে চায় এবং সকল জিনিসেই তাহাদের চকল হাত গিয়া পড়ে। আমাদের দেশের ছেলেদেরও একটা স্বাভাবিক চকলতা আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অচকলতার ভাব্যকর্ষণ তাহাকে সর্বদাই যেন অনেকটা পরিমাপে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সেই অদৃষ্ট ভারটা নাই বলিয়া ইহাদের জীবন ভরণ বরনার মতো কলশকে নৃত্য করিতে করিতে কেবলই যেন বিক্ষমিক করিয়া উঠিতেছে।

আমাদের বন্ধুর গৃহিণীও বন্ধুবৎসলা। তাঁহার স্বামীর বিদ্বত বন্ধুগণ সবে তাঁহাকে স্ত্রীর কর্তব্য পালন করিতে হয়। তাহাদের সেবা বন্ধ করা, তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধকে সর্বাংশে হ্রাসরূপে হস্ত করিয়া তোলা, রোগে শোকে তাহাদের সংবাদ লওয়া ও সাহায্য করা, ইহা তাঁহার সাংসারিক কর্তব্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইহা তো কেবল স্বজনসমাজের আত্মীয়তা নহে, ইহা বন্ধুসমাজের আত্মীয়তা— এই বৃহৎ আত্মীয়তার মর্মস্থলে সাধী স্ত্রীর যে আগুন তাহা এ দেশে শূন্য নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমার বন্ধুটি স্বভাববদ্ধ— তাঁহার বন্ধুত্বের প্রতিভা অসামান্য। ইহার পক্ষে বন্ধুত্ব জিনিগটি সত্য বলিয়াই ইহাকে বিশেষ যত্নে বন্ধু বাছিয়া লইতে হয়। যে লোক খাটি আর্টিস্ট্ নয় সে যেমন কেবলমাত্র দস্তর বস্তার অস্ত্র ঘর সাজাইবার উপলক্ষ্যে যেমন-তেমন ছবি বাঁধাইয়া দেয়ালে টাঙাইয়া কোনোমতে শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারে কিন্তু যে লোক খাটি আর্টিস্ট্, ছবি বাহার পক্ষে সত্যবস্ত, সে স্বভাবতই বাজে ছবি দিয়া ঘর ভরিতে পারে না, সে আপনার স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির দ্বারা ছবি বাছিয়া লয়— ইনিও তেমনি কেবলমাত্র বাজে পরিচিতবর্গের সামাজিক ভাবের দ্বারা আপনাকে আক্রান্ত করেন নাই। ইহার সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ আছে সকলেই ইহার বন্ধু এবং সকলেই শ্রুণী এবং বিশেষভাবে সমাদরের যোগ্য।

এমনতরো বরণ্য বন্ধুগণকে যিনি আপনার চার দিকে ধরিয়া রাখিতে পারেন তাঁহার যে বিশেষ গুণের দরকার সে কথা বলাই বাহুল্য। ইনি রসজ্ঞ। যৌমাছি যেমন ফুলের মধুকোষের গোপন রাস্তাটি অনায়াসে বাহির করিতে পারে ইনিও তেমনি রসের পথে অনায়াসে প্রবেশ করেন; ভালো জিনিগকে একেবারেই দ্বিধাবিহীন জোয়ের সঙ্গে ধরিতে পারেন। ভালো লাগা এবং ভালো বলায় সম্বন্ধে অনেক লোকেই একটা ভীকতা আছে, 'পাছে ভুল করিয়া অপদস্থ হই' এ ভয় তাহার। ছাড়িতে পারে না। এইজন্য ভালোকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার বেলায় তাহার। বরাবর অস্ত্র লোকের পিছনে পড়িয়া যায়। ইহার বোধশক্তির মধ্যে একটি বথার্থ প্রবলতা আছে বলিয়াই ইহার সেই ভয় নাই। এমনি করিয়া তিনি যে যৌমাছির মতো কেবলমাত্র মধুরসটিকেই আহরণ করিতে আনেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে ফুলটিকেও ভালোবাসিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। তিনি ভোগী নহেন, তিনি প্রেমিক। এইজন্য তিনি গ্রহণও করেন, তিনি দানও করেন।

অপরিচয় হইতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করিবার মতো সময় আমার ছিল না। আমার শক্তিও অল্প। বরাবর কোণে থাকা অভ্যাস বলিয়া নিজের জোরে তিফ্ঠ ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ইচ্ছিত জায়গাটিতে পৌছানোর চেষ্টা

করিতেও আমি পারি না। তা ছাড়া ইংরেজি ভাষার সদর দরজার চাবিটা আমার হাতে নাই ; আমাকে কেবলই বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে হয়— ভেমন করিয়া পথ চলা একটা ব্যাঘাত, ভেমনভাবে আপনার স্বভাবকে রক্ষা করিয়া চলা যায় না। নিজেকে অবাধে পরিচিত করিবার শক্তি না থাকিলে অন্তের সহজ পরিচয় পাওয়া সম্ভবপর হয় না। সুতরাং কিছুকাল এখানকার মোটর-গাড়ির দানবরথের চাকা বাঁচাইবার চেষ্টায় প্রাস্ত হইয়া অবশেষে এখানকার পথ হইতেই ফিরিতাম, আমার সেই নদী-বাহুপাশে-ঘেরা বাংলাদেশের শব্দরোজালোকিত আমন-ধানের খেতের ধারে। এমন সময় প্রবেশ করিলেন বন্ধু, পর্দা তুলিয়া দিলেন। দেখিলাম আসন পাতা, দেখিলাম আলো জলিতেছে ; বিদেশীর অপরিচয়ের মত বোকাটা বাহিরে রাখিয়া, পথিকের ধূলিলিপ্ত বেশ ছাড়িয়া ফেলিয়া, এক মুহূর্তেই ভিড়ের মধ্য হইতে নিভৃতে আগিয়া প্রবেশ করিলাম।

কবি য়েট্‌স্

ভিড়ের মাঝখানেও কবি য়েট্‌স্' চাপা পড়েন না, তাঁহাকে একজন বিশেষ কেহ বলিয়া চেনা যায়। যেমন তিনি তাঁহার দীর্ঘ শরীর লইয়া মাথায় প্রায় সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহার যেন সকল বিষয়ে একটা প্রাচুর্য আছে, এক জায়গায় সৃষ্টিকর্তার সৃজনশক্তির বেগ প্রবল হইয়া ইহাকে যেন ফোয়ারার মতো চারি দিকের সমতলতা হইতে বিপুলভাবে উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিয়াছে। সেইজন্য মেহে মনে প্রাণে ইহাকে এমন অজস্র বলিয়া বোধ হয়।

ইংলণ্ডের বর্তমান কালের কবিদের কাব্য যখন পড়িয়া দেখি তখন ইহাদের অনেক-কেই আমার মনে হয়, ইহারা বিশ্বজগতের কবি নহেন। ইহারা সাহিত্যজগতের কবি। এ দেশে অনেক দিন হইতে কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি চলিতেছে, হইতে হইতে কাব্যের ভাষা উপমা অলংকার ভঙ্গী বিস্তর জমিয়া উঠিয়াছে। শেষকালে এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কবিদের জন্ত কাব্যের মূল প্রত্যয়ে মাহুষের না গেলও চলে। কবিরা যেন ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছে ; অর্থাৎ, প্রাণ হইতে গান করিবার প্রয়োজনবোধই তাহাদের চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল গান হইতেই গানের উৎপত্তি চলিতেছে। যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ

জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে ; আবেগ তখন প্রত্যক্ষ ও গভীর ভাবে হৃদয়ের সামগ্রী না হওয়াতে সে সরল হয় না ; সে আপনাকে আপনি বিশ্বাস করে না বলিয়াই বলপূর্বক অতিশয়ের দিকে ছুটিতে থাকে ; নবীনতা তাহার পক্ষে সহজ নহে বলিয়াই আপনার অপূর্বতা-প্রমাণের জন্য কেবলই তাহাকে অভূতের সন্ধানে ফিরিতে হয় ।

ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের সঙ্গে শ্বইনবর্নের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথাটা বোঝা সহজ হইবে । ঐহারা জগতের কবি নহেন, কবিত্বের কবি, শ্বইনবর্ন তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভার অগ্রগণ্য । কথার নৃত্যলীলায় ইহার এমন অসাধারণ নৈপুণ্য যে, তাহারই আনন্দ তাঁহাকে মাতোয়ারা করিয়াছে । ধ্বনি-প্রতিধ্বনির নানাবিধ রঙিন স্তায় তিনি চিত্রবিচিত্র করিয়া ঘোরতর টকটকে রঙের ছবি গাঁথিয়াছেন ; সে-সমস্ত আশ্চর্য কীর্তি, কিন্তু বিশ্বের উপর তাহার প্রশস্ত প্রতিষ্ঠা নহে ।

বিশ্বের সঙ্গে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ সংঘাতে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কাব্যসংগীত বাজিয়া উঠিয়াছিল । এইজন্য তাহা এমন সরল । সরল বলিয়া সহজ নহে । পাঠকেরা সহজে তাহা গ্রহণ করে নাই । কবি যেখানে প্রত্যক্ষ অভূতভূতি হইতে কাব্য লেখেন সেখানে তাহার লেখা গাছের ফুলফলের মতো আপনি সম্পূর্ণ হইয়া বিকাশ পায় । সে আপনাকে ব্যাখ্যা করে না ; অথবা নিজেকে মনোরম বা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তুলিবার জন্য সে নিজের প্রতি কোনো জববদাশি করিতে পারে না । সে যাহা সে তাহা হইয়াই দেখা দেয় ; তাহাকে গ্রহণ করা, তাহাকে ভোগ করা পাঠকেরই গরজ ।

নিজের অভূতভূতি ও সেই অভূতভূতির বিষয়ের মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ-পদার্থের প্রয়োজন ও ব্যবধান না রাখিয়া কোনো কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেন, বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনের রসকে তাহারা নিঃসংশয় ভরসার সহিত নিজের হৃদয়ের ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন ; তাহারাই নিজের সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যের সমস্ত কৃত্রিমতাকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করিয়া থাকেন ।

একদিন ইংরেজি সাহিত্যের কৃত্রিমতার যুগে বার্নস্‌ জন্মিয়াছিলেন । তিনি তাঁহার সমগ্র হৃদয় দিয়া অভূতভব করিয়াছিলেন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন । এইজন্য তখনকার বাধা দস্তরের বেড়া ভেদ করিয়া কোথা হইতে যেন কইলঙের অব্যবহৃত হৃদয় কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে আসিয়া অসংকোচে আসন গ্রহণ করিল ।

এখনকার কাব্যসাহিত্যের যুগে কবি যেইন্‌ যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছেন, তাহারও গোড়াকার কথাটা ঐ । তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক কাব্যের প্রতিধ্বনির পহার না গিয়া কবির নিজের হৃদয়কে প্রকাশ করিয়াছে । ঐ-যে ‘নিজের হৃদয়’ বলিলাম ও কথাকে একটু বুঝিয়া লইতে হইবে । হীরার টুকরা যেমন আকাশের

আলোককে প্রকাশ করার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মানুষের হৃদয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সত্য প্রকাশই পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখন সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে প্রতিফলিত করিতে পারে তখন সেই আলোকে সে প্রকাশ পায় ও সেই আলোককে সে প্রকাশ করে। কবি য়েইসের কাব্যে আয়র্লণ্ডের হৃদয় ব্যক্ত হইয়াছে।

এ কথাটাকেও আর-একটু পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত। একই পূর্বের আলো নানা যেষের উপর পড়িয়াছে কিন্তু যেষগুলির অবস্থা ও অবস্থান অনুসারে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ফলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু, এই রঙের ভিন্নতা পরস্পরের বিরুদ্ধ নহে; তাহারা আপন আপন বৈচিত্র্যের দ্বারা সকলের সঙ্গে সকলে মিলিতে পারিতেছে। রঙ-করা তুলা প্রাণপণে যেষের নকল করিয়াও মিলিতে পারিত না।

তেমনি আয়র্লণ্ডই বলা, স্কটলণ্ডই বলা, বা অন্য যে-কোনো দেশই বলা, সেখানকার জনসাধারণের চিত্তে বিশ্বজগতের আলো এমন করিয়া পড়ে যাহাতে সে একটা বিশেষ রঙ ফলাইয়া তুলে। বিশ্বমানবের চিত্তাকাশ এমনি করিয়াই বর্ণবৈচিত্র্যে সূক্ষ্ম হইয়া উঠিতেছে।

কবি ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মানুষ সেই দেশের হৃদয়ের রঙ দিয়া তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে সূক্ষ্ম করিয়া প্রকাশ করেন। সকলেই যে করিতে পারেন তাহা বলি না, কিন্তু যিনি পারেন তিনি ধন্য। আয়ারের দেশে বৈকব-পদাবলি বাঙালি-কাব্য রূপেই বিশ্বকাব্য। তাহা বিশ্বের জিনিস বিশ্বকে দিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের একটা রস যোগ করিয়া দিতেছে; নিজের একটি রূপের পায়ে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।

সংসারের রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে কবচ পরিতে হয়; তাহাকে সংসারের সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে পড়ে পড়ে চারি দিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে। কিন্তু, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যাহার কাজ, আবরণের অভাবই তাহার বখাৰ্শ সজ্জা। কবি য়েইসের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার ঐ কথাই বনে হইতেছিল। এই একটি মানুষ, ইনি নিজের চিত্তের অব্যাহত স্পর্শশক্তি দিয়া জগৎকে গ্রহণ করিতেছেন। মানুষ নানা শিক্ষার ভিত্তর দিয়া, অভ্যাসের ভিত্তর দিয়া, অহঙ্করণের ভিত্তর দিয়া, যেমন করিয়া চারি দিকে দেখে এ দেখা তেমন দেখা নহে।

যখন কোনো মানুষ এই প্রকার অব্যাহত জীব জগৎকে দেখে ও তাহার ধবংসের তখন দেখিতে পাই মানুষের পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার একটা মিল আছে;

তাহা ঝাপছাড়া নহে। বাহ্যিক সুরল চক্ষে দেখিয়াছে সকলেই এমনি করিয়া দেখিয়াছে। বৈদিক কবিরাজ জলে স্থলে প্রাণকে দেখিয়াছেন, হৃদয়কে দেখিয়াছেন। নদী মেঘ উষা অগ্নি ঝড়, বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে নহে, ইচ্ছাময় মূর্তিরূপে তাঁহাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের জীবনের মধ্যে স্বপ্নদুঃখের যে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় তাহাই যেন নানা অপরূপ ছন্দবেশে ভুলোকে ও ছ্যালোকে আপন লীলা বিস্তার করিয়াছে। যেমন আমাদের চিত্তে তেমনি সমস্ত প্রকৃতিতে। হাসিকান্নার বেদনা, চাওয়া পাওয়া এবং হারানোর খেলা, যেমন আমাদের এই ছোটো হৃদয়টিতে তেমনি তাহাই খুব প্রকাণ্ড করিয়া এই মহাকাশের আলোক-অন্ধকারের রঙ্গমঞ্চে। তাহা এত বৃহৎ যে তাহাকে আমরা একসঙ্গে দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা জল দেখি, মাটি দেখি, কিন্তু সমস্তটার ভিতরকার বিপুল খেলাটাকে দেখিতে পাই না। কিন্তু, মানুষ যখন শিক্ষা ও অভ্যাসের ঠুলির ভিতর দিয়া দেখে না, যখন সে আপনার সমস্ত হৃদয় মন জীবন দিয়া দেখে, তখন সে এমন একটা বেদনার লীলাকে সব কায়গাতেই অনুভব করে যে, তাহাকে গল্পের মধ্য দিয়া, রূপকের মধ্য দিয়া ছাড়া প্রকাশ করিতে পারে না। মানুষ যখন জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে আপনারই খুব একটা বড়ো পরিচয় পাইতেছিল—এইটে একরকম করিয়া বুঝিতেছিল যে, সমস্ত জগতের মধ্যে বাহা নাই তাহা তাহার নিজের মধ্যেও নাই, বাহা তাহার মধ্যে আছে তাহাই বিপুল আকারে বিশ্বের মধ্যে আছে—তখন সে কবির দৃষ্টি অর্থাৎ হৃদয়ের দৃষ্টি জীবনের দৃষ্টিতে সমস্তকে দেখিতে পাইয়াছিল; তাহা অক্ষিপোলক ও স্নায়ুশিরা ও মস্তিষ্কের দৃষ্টি নহে। তাহার সত্যতা তথ্যগত নহে; তাহা ভাবগত, বেদনাগত। তাহার ভাষাও সেইরূপ; তাহা সুরের ভাষা, রূপের ভাষা। এই ভাষাই মানবসাহিত্যে সকলের চেয়ে পুরাতন ভাষা। অথচ, আজও যখন কোনো কবি বিশ্বকে আপনার বেদনা দিয়া অনুভব করেন তখন তাঁহার ভাষার সঙ্গে মানুষের পুরাতন ভাষার মিল পাওয়া যায়। এই কারণে বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের পৌরাণিক কাহিনী আর-কোনো কাজে লাগে না; কেবল কবির ব্যবহারের পক্ষে তাহা পুরাতন হইল না। মানুষের নবীন বিশ্বাসভূতি ঐ কাহিনীর পথ দিয়া আনাগোনা করিয়া ঐখানে আপন চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অনুভূতির সেই নবীনতা বাহার চিত্তকে উদ্ভোধিত করে সে ঐ পুরাতন পথটাকে স্বভাবতই ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়।

কবি যেহেতু আয়ত্নেই সেই পৌরাণিক পথ দিয়া নিজের কাব্যধারাকে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছিল বলিয়াই এই পথে তিনি এমন অসামান্য খ্যাতি উপার্জন করিতে পারিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবনের দ্বারা

এই জগৎকে স্পর্শ করিতেছেন ; চোখের দ্বারা জানেন দ্বারা নহে। এই জগৎকে তিনি কেবল বস্তুজগৎ রূপে দেখেন না ; ইহার পর্বেতে প্রান্তরে ইনি এমন একটি লীলাবয় সত্তাকে অল্পভব করেন বাহা ধ্যানের দ্বারাই গয়া। আধুনিক সাহিত্যে অভ্যস্ত প্রণালীর যথা দিয়া তাহাকে প্রকাশ করিতে গেলে তাহার রস ও প্রাণ নষ্ট হইয়া যায় ; কারণ, আধুনিকতা জিনিসটা আসলে নবীন নহে, তাহা জীর্ণ ; সর্বদা ব্যবহারে তাহাতে কড়া পড়িয়া গেছে, সর্বত্র তাহা সাদা দেয় না ; তাহা ছাই-চাপা আগুনের যতো। এই আগুন জিনিসটা ছাইয়ের চেয়ে পুরাতন অথচ তাহা নবীন ; ছাইটা আধুনিক বটে কিন্তু তাহাই জরা। এই জগৎ সর্বত্রই দেখিতে পাই, কাব্য আধুনিক ভাবকে পাশ কাটাইয়া চলিতে চায়।

সকলেই জানেন, কিছুকাল হইতে আয়ারলণ্ডে একটা স্বাদেশিকতার বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের শাসন সকল দিক হইতেই আয়ারলণ্ডের চিত্তকে অভ্যস্ত চাপা দিয়াছিল বলিয়াই এই বেদনা এক সময়ে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন হইতে এই বেদনা প্রধানত পোলিটিকাল বিদ্রোহ-রূপেই আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। অবশেষে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা চেষ্টা দেখা দিল। আয়ারলণ্ড আপনায় চিত্তের স্বাভাব্য উপলব্ধি করিয়া তাহাই প্রকাশ করিতে উদ্ভূত হইল।

এই উপলক্ষ্যে আমাদের নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে পোলিটিকাল অধিকার-লাভের একটা চেষ্টা শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। দেখা গিয়াছে, এই চেষ্টার বাহারা নেতা ছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই দেশের ভাষাসাহিত্য-আচারব্যবহারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল না। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ ছিল না বলিলেই হয়। দেশের উন্নতিসাধনের জন্ত তাঁহাদের বাহা-কিছু কারবার সমস্তই ইংরেজি ভাষায় ও ইংরেজি গবর্নমেন্টের সঙ্গে। দেশের লোককে লইয়া যে দেশের কোনো কাজ করিতে হইবে, সে দিকে তাঁহাদের দৃষ্টিমাত্রই ছিল না।

কিন্তু সোভাগ্যক্রমে, অল্পত বাংলাদেশে, আয়রা সাহিত্যের ভিতর দিয়া নিজের চিত্তকে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান গৌরব এই যে, তিনি বঙ্গসাহিত্যে এমন একটি যুগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন যখন বাঙালি আপনায় কথা আপনায় ভাষায় বলিয়া আনন্দ ও গর্ব অল্পভব করিতে পারিয়াছিল। তাহার আগে আয়রা স্কুলের বালক ছিলার ; অভিধান ও ব্যাকরণ বিলাইয়া ইংরেজি ইক্সপ্লের এন্সেলুসাইজ লিখিতার ; নিজের ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিতার। হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা ক্ষমতা দেখিতে পাইলার। আমাদেরও যে একটা

সাহিত্য হইতে পারে এবং তাহাতেই যে স্বার্থভাবে আমাদের যনের ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারে ইহা আমরা অস্বত্ব করিলাম। এই-যে শুরু হইল এইখানেই ইহার শেষ হইল না। ইহার আগে চোখ বুজিয়া আমরা বলিয়াছিলাম, আমাদের কিছুই নাই ; এখন হইতে খোঁজ পড়িয়া গেল আমাদের কী আছে। বন্দর্শনেই গোড়ার দিকে ঘাহারা কঁৌ ও মিলুকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন তাঁহারাও অবশেষে দেশের ধর্মকেই সেই রাজ্যসন দিবার জন্ত দলে-বলে উজোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উত্তমের স্রোত নানা শাখা-প্রশাখায় এখনো অগ্রসর হইতেছে। রাজসভার ভারতবর্ষীয় অমাত্যসংখ্যা বাড়াইতে হইবে, আমাদের এ ইচ্ছা সাধন হওয়া রাজ্য হাতে ; কিন্তু আমাদের মন স্বাধীন হইয়া আপনার পথে আপন সফলতার অভিযুগে অগ্রসর হইবে, এই ইচ্ছা সকল হওয়া আমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমরা যে-কেহ যে-কোনো দিকে নিজের চেষ্টায় নিজের শক্তিকে সার্থক করিতে পারিব, সেই লোকই দেশের আত্মশক্তি-উপলব্ধিকে প্রদত্ত করিয়া দিব। সেই উপলব্ধির আনন্দই আমাদের উন্নতিপথযাত্রার একমাত্র সঞ্চল।

শক্তি-উপলব্ধির গোড়ায় যে প্রবল অহংকার জাগিয়া উঠে তাহাতে সত্য-উপলব্ধির যথেষ্ট ব্যাঘাত করে। তাহা আমাদের আপনাকে শিখাইবার চেয়ে আপনাকে ভুলাইবার দিকেই বেশি ঝোক দেয়। তাহা সীচ্চার সঙ্গে খুঁটাকে সমান মূল্য দিয়া সীচ্চাকে অপমানিত করে। সে এ কথা জুলিয়া যায় যে, কী আমার নাই এইটে স্থনির্দিষ্ট করিয়া জানার দ্বারাতেই কী আমার কাছে সেইটে স্থম্পষ্ট করিয়া জানা যায়। সেই স্থম্পষ্ট করিয়া জানাই আমাদের শক্তিসাভের একমাত্র পন্থা। অহংকার আত্ম-উপলব্ধির সীমাকে ঝাপসা করিয়া দিয়াই আমাদেরকে দুর্বলতা ও ব্যর্থতার দিকে লইয়া যায়। আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা সত্যের উপর। স্থতরাং অহংকারের দ্বারা তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। সত্যের দুর্গপ্রাচীরে ঠেকিয়া ঠেকিয়া অহংকার যতই পরাস্ত হইতে থাকে ততই আমরা আপনাকে জানিতে থাকি।

আমাদের দেশের যতো আয়র্লণ্ডেও আপনার চিত্তশক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্ত একটা উত্তম কিছুকাল হইতে কাজ করিতেছে। সেই উত্তমের প্রথম প্রকাশের মধ্যে স্বতাবতই বিস্তর কেন্দ্রিতা দেখা দেয় ; তাহা অনেকসময় ওজন রাখিতে না পারিয়া অস্বত্বরূপে হান্তকর হইয়া উঠে ; আয়র্লণ্ডেও যে সেসময় খটিয়াছিল তাহা আইরিশ বিখ্যাত লেখক জর্জ্‌ ম্যুরের Hail and Farewell -নামক বই পড়িলে কতকটা বুঝা যায়।

যাহা হউক, আয়র্লণ্ড-নিজের চিত্তবাতন্য প্রকাশ করিবার চেষ্টায় নিজের ভাষা কথা কাহিনী ও পৌরাণিকতাকে অবলম্বন করিবার যে উদ্যোগ করিয়াছে সেই উদ্যোগের মধ্যে এক-একজন অসামান্য লোকের প্রতিভা আপনার যথার্থ ক্ষেত্র পাইয়াছে। কবি য়েট্‌স্ তাঁহাদেরই মধ্যে একজন। ইনি আয়র্লণ্ডের বাণীকে বিশ্বসাহিত্যে জয়যুক্ত করিতে পারিয়াছেন।

য়েট্‌স্ যখন সাহিত্যক্ষেত্রে আয়র্লণ্ডের জয়পতাকা বহন করিয়া আনিলেন তাহার কিছুদিন পূর্ব হইতে আয়র্লণ্ডে সাহিত্যের উদ্ভব দুর্বল হইয়াছিল। তখন আয়র্লণ্ডে পোলিটিকাল বিদ্রোহের দিন ঘুচিয়া গিয়া পোলিটিকাল বাঁকা চালের কাল আসিয়াছিল; তখন দেশে ভাবের শক্তিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া কূটবুদ্ধিরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

য়েট্‌সের কোনো একজন সমালোচক লিখিতেছেন—

এমন সময়ে রণদূত আর-একবার আসিয়া দেখা দিল; এবার দুর্দাম হৃদয়বেগের বিদ্রোহবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনো সামাজিক প্রলয়যুগের বজ্রধ্বনি শুনা গেল না। যে সর্বজনীন মানবাত্মা আপনাকে আপনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, এবং মাহুষের জগতে বাহার গোপন অঙ্গুলি সমস্ত বড়ো বড়ো ভাঙাগড়ার রহস্যকে গিয়া স্পর্শ করিতেছে, সেই আত্মতৃপ্ত মানবাত্মার বিরূপ বিপুল শাস্তি আকাশকে অধিকার করিল। নিজের মধ্যে মানবহৃদয়ের পূর্ণতর বন্ধনমোচন প্রকাশ করিয়া য়েট্‌স্ আর-একবার গভীরতর ও সূক্ষ্মতর শক্তির সহিত বিদ্রোহের বাণীকে জাগ্রত করিলেন। এবার বাহিরের কোলাহল নহে, এবার কবি মানবাত্মার অন্তরের কথা বলিলেন— তাহাই আয়র্লণ্ডের কথা এবং সমস্ত মাহুষের কথা। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিলেন এবং পকাশ বছর পূর্বে যে কবিস্বরীতি প্রচলিত ছিল তাহা পরিহার করিলেন। কিন্তু, তিনি রচনার যে প্রণালীকে অবশেষে সম্পূর্ণতা দান করিলেন তাহা পুরাতন কবিদিগের রচনারীতিরই উৎকর্ষসাধন। তাঁহার কবিত্ব প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়াছে এবং ধ্বনিমাধুর্যের অন্তরতর সংগীতটিকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে। যে-সকল চিন্তাসামগ্রীকে তিনি তাঁহার প্রথম কালের অতুলনীয় শ্রীতি-কাব্যে গাঁথিয়া তুলিয়াছেন তাহা তাঁহার পূর্বতন ক্রয়িত-পিতামহদের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তরাধিকার; তাহা এই প্রকাশমান বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতি মাহুষ ও দেবতার পরম একাটিকে উদ্ধার করিয়াছে।

সমালোচক লিখিতেছেন—

It was with the publication of *The Wanderings of Oisín*—in

1889, if I remember aright,— that Yeats sprang into the front rank of contemporary poets, and threatened to add to the august company of the immortals. In the qualities by which he succeeded—an exquisitely delicate music, intensity of imaginative conviction, intimacy with natural and (dare I say?) supernatural manifestations—he was typically Celtic.

এই imaginative conviction কথাটা যেটুকু সঘনো অত্যন্ত সত্য। কল্পনা তাঁহার পক্ষে কেবল লীলার সামগ্রী নহে, কল্পনার আলোকে তিনি বাহ্য দেখিয়াছেন তাহার সত্যতাকে তিনি জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার হাতে কল্পনা-জিনিসটি কেবলমাত্র কবিত্বব্যবসায়ের একটা হাতিয়ার নহে, তাহা তাঁহার জীবনের সামগ্রী; ইহার দ্বারাই বিশ্বজগৎ হইতে তিনি তাঁহার আত্মার খাণ্ড পানীয় আহরণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে নিভৃতে যতবার আমার আলাপ হইয়াছে ততবার এই কথাই আমি অনুভব করিয়াছি। তিনি যে কবি তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়া জানিবার স্বযোগ এখনো আমার সম্পূর্ণরূপে ঘটে নাই, কিন্তু তিনি যে কল্পনালোকিত হৃদয়ের দ্বারা তাঁহার চতুর্দিককে প্রাণবানরূপে স্পর্শ করিতেছেন তাহা তাঁহার কাছে আসিয়াই আমি অনুভব করিতে পারিতেছি।

৩৭ আলফ্রেড প্লেস
সাউথ কেমিংটন, লণ্ডন
১৯ ভাদ্র ১৩১৯

স্টপ্‌ফোর্ড ব্রক

আমার কোনো রচনা পড়িয়া লোকের ভালো লাগিয়াছে, ইহাতে খুশি হওয়া লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করি না। বস্তুত, খুশি হই নাই এ কথা বলার মতো অহংকার আর কিছুই নাই। যখন কোনো বই ছাপাইয়াছি তখন তাহার মধ্যে একটা আশা প্রচ্ছন্ন আছে যে, এ বই লোকের ভালো লাগিবে। যদি সেটাকে অহংকার বলা যায় তবে সেই বই-ছাপানোটাই অহংকার।

আমি কোনো-একটা অবকাশের কালে নিজের কতকগুলি কবিতা ও গান ইংরেজি পক্ষে তর্জমা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ইংরেজি লিখিতে পারি এ অভিমান

আমার কোনোকালেই নাই ; অতএব ইংরেজি রচনার বাহবা লইবার প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু, নিজের আবেগকে বিদেশী ভাষার মুখ হইতে আমার একটুখানি মুক্তন করিয়া গ্রহণ করিবার যে সুখ তাহা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। আমি আর-এক বেশ পরাইয়া নিজের হৃদয়ের পরিচয় লইতেছিলাম।

আমি বিলাতে আসার পর এই তর্জমাগুলি যখন আমার বন্ধুর হাতে পড়িল, তিনি বিশেষ সমাদর করিয়া সেগুলি গ্রহণ করিলেন। এবং তাহার কয়েক বণ্ড কপি করাইয়া এগানকার কয়েকজন সাহিভ্যিককে পড়িতে দিলেন। আমার এই বিদেশী হাতের ইংরেজিতে আমার এই লেখাগুলি তাঁহাদের ভালো লাগিয়াছে। বোধ হয় তাহার একটা কারণ এই যে, ইংরেজি রচনার শক্তি আমার এতটা প্রবল নহে বাহাতে আমার তর্জমা হইতে বিদেশী রসটুকুকে আমি একেবারে নিঃশেষে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি।

স্টপ্‌ফোর্ড ক্রকের হাতে আমার এই তর্জমাগুলির একটি কপি পড়িয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যে তিনি একদিন আমাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ, বোধ করি তাঁহার বয়স সত্তর বছর পার হইয়া গিয়াছে। তাঁহার একটা পায়ের রক্ত-প্রণালীতে প্রদাহের যতো হইয়াছে, তন্মত তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ; সেই পা একটা চৌকির উপর তিনি তুলিয়া বসিয়া আছেন। বার্ষিক্য কোনো কোনো মাহুষকে পরাভূত করিয়া পদানত করে, আমার কোনো কোনো মাহুষের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুর যতো বাস করে। ইহার শরীরমানে বার্ষিক্য তাহার জয়পতাকা তুলিতে পারে নাই। আশ্চর্য ইহার নবীনতা। আমার বার বার মনে হইতে লাগিল, বৃদ্ধের মধ্যে যখন যৌবনকে দেখা যায় তখন তাহাকে সকলের চেয়ে ভালো করিয়া দেখা যায়। কেননা, সেই যৌবনই সত্যিকার জিনিস ; তাহা শরীরের রক্তমাংসের সহিত জীর্ণ হইতে জানে না ; তাহা রোগতাপকে আপনার জোরেই উপেক্ষা করিতে পারে। তাঁহার দেহের আয়তন বিপুল, তাঁহার মুখশ্রী সুন্দর ; কেবল তাঁহার পীড়িত পায়ের দিকে তাকাইয়া মনে হইল, অর্জুন যখন দ্রোণাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রণামনিবেদনের স্বরূপ প্রথম তীর তাঁহার পায়ের তলায় ফেলিয়াছিলেন, তেমনি বার্ষিক্য তাহার যুদ্ধ-আরম্ভের প্রথম তীরটা ইহার পায়ের কাছে নিক্ষেপ করিয়াছে।

বিধাতা যে জীবনটা ইহাকে দান করিয়াছেন সেটাকে সকল দিক হইতে আনন্দের সামগ্ৰী করিয়া দিয়াছেন ; ছবি কবিতা, প্রকৃতির সৌন্দর্য, এবং লোকালয়ে মানব-জীবনের বিচিত্র লীলা, সকলের প্রতিই তাঁহার চিত্তের ঔৎসুক্য প্রবল। চারি দিকের জগতের এই স্পর্শাত্মকুতি, এই রসগ্রহণের শক্তি তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কমিয়া আসে নাই। এই গ্রহণের শক্তিই তো যৌবন।

ইহার ধর্মোপদেশ ও কাব্যসমালোচনা আমি পূর্বেই পড়িয়াছি। সেদিন দেখিলাম, ছবি আঁকাতেও ইহার বিলাস। ইহার আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ঘরের কোণে অনেক জমা হইয়া আছে। এগুলি সব মন হইতে আঁকা। আমার চিত্রশিল্পী বন্ধু এই ছবিগুলি দেখিয়া বিশেষ করিয়া প্রশংসা করিলেন। এ ছবিগুলি যে প্রদর্শনীতে দিবার বা লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাহা নহে, ইহা নিতান্তই মনের লীলা মাত্র। সেই কথাই আমি ভাবিতেছিলাম— ইহার বয়স অনেক হইয়াছে, লেখাও অনেক লিখিতে হয়, শরীরও সম্পূর্ণ সুস্থ নহে, কিন্তু ইহাতেও ইহার উদ্ভবের শেষ হয় নাই। জীবনীশক্তির প্রবলতা এত কাজের সঙ্গে খেলা করিবারও অবকাশ পায়। বস্তুত এই খেলার দ্বারাই প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় কাজের চারি দিকে একটা মুক্তির ক্ষেত্রেই মানুষের ঐশ্বর্য। এ দেশে তাহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই সেইটে লক্ষ্য করি। তাঁহারা যেটা লইয়া প্রধানত নিযুক্ত আছেন সেইটেতেই তাঁহাদের জীবনের সমস্ত জায়গা একেবারে ঠাঙ্গিয়া ধরে নাই; চারি দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে, সেইখানে তাঁহাদের বিহার। খুব বড়ো বৈজ্ঞানিককে দেখিয়াছি, তাঁহার প্রধান শখ চীনদেশের চিত্রকলা। ইহাদের জীবনের তহবিলে বাড়তির ভাগ অনেকটা থাকে। ব্যবসায় ইহাদের অনেকের পক্ষেই একটা অংশমাত্র। আপিসঘর ইহাদের বাসগৃহের একটামাত্র ঘর।

অনেক সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরের তলার একটা ছোটো কামরায় ইহার সঙ্গে দেখা হইল। অনেকক্ষণ আমাদের দুইজনের নিমৃত্ত আলাপের অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা হইতে আমি এইটে বুঝিলাম যে, খৃষ্টানধর্মের বাহ্য কাঠামো, যেটাকে ইংরেজি ভাষায় বলে creed, কোনোকালে তাহার যেমনই প্রয়োজন থাক, এখন তাহাতে ধর্মের বিশুদ্ধ রসপ্রবাহের বাধা ঘটাইতেছে। মানুষের মন যখন আপনার আশ্রয়কে ছাড়াইয়া বাড়িয়া উঠে তখন সেই আশ্রয়ের মতো শত্রু তাহার আর কেহ নাই। এ দেশে ধর্মের প্রতি অনেকের মন যে বিমূখ হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ, ধর্মের এই বাহিরের আয়তনটা। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার এই কবিতাগুলিতে কোনো ধর্মের কোনো creed-এর কোনো গন্ধ নাই; ইহাতে এগুলি আমাদের দেশের লোকের বিশেষ উপকারে লাগিবে বলিয়া আমি মনে করি।'

কথায় কথায় তিনি এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি কি না। আমি বলিলাম, আমাদের বর্তমান জন্মের বাহিরের অবস্থা সবকিছু কোনো স্থনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই এবং সে সবকিছু আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু, যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনো হইতেই

পারে না যে, আমার জীবনধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একেবারেই ধাপছাড়া জিনিস— ইহার আগেও এমন কখনো ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না, যে কারণ-বশত জীবনটা বিশেষ মেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। পরীক্ষা জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেছে, এইটাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পূর্বজন্মে কোনো মানুষ পণ্ড ছিল এবং পরজন্মেই সে পণ্ডমেহ ধরিতে এ কথাও আমি মনে করিতে পারি না। কেননা, প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায়; সেই ধারার হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত। স্টপ্‌ফোর্ড ক্রক বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরে বিশ্বাসটাকে সংগত মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তখনি তাহার সমস্তর ভাবটা পরম্পরগ্রথিত হইয়া আমাদের মনে উদ্ভিত হয়; শেষ না করিলে সকল সময় সেই স্মৃতিটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া এক-একটা জন্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছি; গাঁথা শেষ হইলেই যে একেবারেই ফুরাইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু একটা পালা শেষ হইয়া যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

এখানকার যে-সকল চিন্তামূল ও ভাবুক লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে সকলেরই মধ্যে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাঁহারা অন্তায় ও অবিচারকে সত্যই ঠেলিয়া ফেলিতে চান। এ কথা বলা বাহুল্য মনে হইতে পারে, কিন্তু বাহুল্য নহে। যে জাতি বহুদূরবিস্তৃত অধীন দেশকে শাসন করে এবং সেই-সকল অধীন দেশের সহিত বাহাদুরের নানাবিধ স্বার্থের সম্বন্ধ জড়িত, পরজাতির সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান-অজ্ঞানের বোধ যান না হইয়া থাকিতে পারে না। অল্প জাতিকে বহুদিন সম্ভব অধীনস্থ করিয়া রাখা নানা কারণে বাহার নিজের পক্ষে প্রয়োজনীয়, মানবস্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহার ধর্মবোধ কখনোই অক্ষুণ্ণ থাকে না। যে শুভবুদ্ধি-দ্বারা মানুষ স্বজাতির স্বাধীনতাকে প্রেষ্ঠ মূল্য দিয়া থাকে, অন্যকে অধীন রাখিবার ইচ্ছা যতই প্রবল হয় ততই সেই শুভবুদ্ধিকেই মানুষ দুর্বল করিয়া ফেলে। অথচ, এই শুভবুদ্ধিই জাতীয় উন্নতির পক্ষে মানুষের চরম সম্বল।

এমন অবস্থায় যখন এখানকার বনৌষীসম্প্রদায়ের মধ্যে এক দলকে দেখিতে পাই বাহারা জাতীয় স্বার্থপরতা অপেক্ষা জাতীয় জ্ঞানপরতাকেই সমাদর করিয়া থাকেন,

তখন বুদ্ধিতে পারি, দেহের মধ্যে এক দিকে ব্যাধির প্রবেশদ্বারও যেমন খোলা আছে তেমনি আর-এক দিকে স্বাস্থ্যতত্ত্বও উদ্ভবের সহিত কাজ করিতেছে। যতক্ষণ এই জিনিসটি আছে ততক্ষণ আশা আছে। এই শুভবুদ্ধিটিকে এখানকার ভাবুক লোকদের অনেকের মধ্যে অমুভব করা যায়।

এখানে ভাবের ক্ষেত্র এবং কাজের কারখানা পাশাপাশি আছে। এখানে রাষ্ট্রনীতির সিংহাসন ও ধর্মনীতির বেদী পরস্পর নিকটবর্তী। এইজন্য উদ্ভবের সহযোগে এখানকার দুই চাকার রথ চলিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা সময় আসে যখন কাজের ঘোঁড়ায় ভাবের হাওড়াকে একেবারে কালো করিয়া তোলে ; তখন এখানে কাব্য সাহিত্যেও পালোয়ানি আফালনে তাল ঠুকিবার আওয়াজটাই সমস্ত সংগীতকে চাকিয়া ফেলিতে চায় ; হঠাৎ তখন দেশের রক্তের মধ্যে Jingo-বিষ প্রবল হইয়া উঠে এবং সেই চোখরাঙানির দিনে লোকে যজ্ঞক্ষেত্রের উচ্চতর সাধনাকে ধর্মভীরু দুর্বলের কাপুরুষতা বলিয়াই গণ্য করে। কিন্তু, সেই উন্নত বিকারের সময়েও ধর্মবুদ্ধি একেবারে হাল ছাড়িয়া দেয় না ; সেইজন্য বোয়ার-যুদ্ধের দিনেও এখানেও একদল লোক ছিলেন যাহারা সমস্ত দেশের আক্রোশকে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াও স্ত্রীর জয়ধ্বজাকে উপরে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহারাই দেশের হাতে মার খাইয়াও, দেশবিষেবী অপবাদ সহ্য করিয়াও, দেশের পাপকালনের কাজে অপরাধিতচিত্তে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু, ভারতবর্ষে ইংরেজের যে শাসনতন্ত্র আছে সেটা একেবারে যোরতর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে। সেই কাজের বিষকে শোধিত করিতে পারে এমনতরো ভাবের হাওড়া সেখানে প্রবল নহে। এই কারণে এই বিষ ভিতরে ভিতরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। যে ইংরেজ অল্পবয়সে কোনোমতে একটা কঠিন পরীক্ষা পাস করিয়া সেখানে রাজ্য চালনা করিতে যান তিনি একেবারে সেখানকার বিবাক্ত তপ্ত হাওড়ার ভিতরে গিয়া প্রবেশ করেন। সেখানে কষতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের বোহ মজার মধ্যে জড়িত হইয়া যায়, এবং প্রেস্টিজের অভিমান ধর্মের কাছেও মাথা হেঁট করিতে চায় না। অথচ, সেইখানেই ইংলণ্ডের সেই ভাবুকগণের সংসর্গ নাই যাহারা বিকৃতিনিবারণের বড়ো যন্ত্রগুলিকে সর্বদা আবৃত্তি করিতে পারেন। এইজন্য ভারতবর্ষীয় ইংরেজ আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখে ; এইজন্য ভারতবর্ষের বড়ো পরিচর্যা কোনোমতেই ভারতবর্ষের ইংরেজ লাভ করে না। আমরা তাহাদের কাছে অত্যন্ত ছোটো ; আমাদের সাহিত্য, আমাদের ধর্মশ্রাবণ, আমাদের স্বদেশহিতৈষিতার সাধনা তাহাদের কাছে একেবারেই নাই। আমরা তাহাদের বাজারের ধরিত্রীর, আগিলের কেরানি, বারিস্টারের বাবু, আদালতের আসামি করিয়াছি। তাহারা পূর্ণ

মানবচিন্তা দিয়া আমাদের মধ্যে না, আমাদেরও পূর্ণ মানবপরিচয় তাহারা পায় না। এ অবস্থায় শাসনসংরক্ষণ কাজের ব্যবস্থা সমস্তই খুব পাকা হইতে পারে, কিন্তু তাহার চেয়ে বড়ো জিনিসটা নষ্ট হয়। কারণ, মনুল তো শৃঙ্খলা নহে; এবং মানুষের কাছ হইতে কোনো ভালো জিনিস পাইলে সেই সঙ্গে যদি মানুষকেও না পাই তবে সে দান আমরা সমস্ত মনগ্রাণ দিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; সুতরাং সে দান না দাতাকে ধন্য করে, না গ্রহীতাকে পরিতৃপ্ত করিয়া তোলে।

ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ

বাহিরের ভিড়ের মধ্য হইতে আমি যেন অন্তরের ভিড়ের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিলাম, এইরূপ আমার মনে হইল। এ দেশের যাহারা লেখক, যাহারা চিন্তাশীল, তাহাদের সংস্রবে যতই আসিলাম ততই অমুভব করিতে লাগিলাম, ইহাদের চিন্তার পথে ভাবের ঠেলাঠেলি অত্যন্ত প্রবল।

ইহাদের সমাজ সকলের শক্তিকে যে পূর্ণবেগে আকর্ষণ করিতেছে, বাহিরে লোকের ছুটাছুটি, মোটর-যানের হুড়াহুড়িতে তাহা স্পষ্টই চোখে পড়ে। কাহারও সময় নাই; তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে হইবে; এ সমাজ কাহাকেও পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতে দিবে না; যে একটু পিছাইয়া পড়িবে তাহাকেই হার মানিতে হইবে। এই সম্মুখে ছুটিবার ভয়ংকর ব্যগ্রতা যখন দেখি তখন মনে মনে ভাবি, সম্মুখে সে কে বসিয়া আছে। সে ডাক দেয় কিন্তু দেখা দেয় না। নীল সমুদ্রের মতো বহুদূরে তাহার ঢেউয়ের উপর ঢেউ নিশিদিন হাত তুলিতেছে, কিন্তু কোথায় কোন্ পর্বতশিখরের গুহাগহ্বর হইতে ঝরনাগুলি পানলের মতো ব্যস্ত হইয়া, ডাহিনে বায়ে ছুড়ি পাখরগুলাকে কোনোমতে ঠেলিয়াঠলিয়া, কাহাকেও কোনো ঠিকানা জিজ্ঞাসা না করিয়া, উর্ধ্বাঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে।

বাহিরের কাজের ক্ষেত্রে এই যেমন ইকাইকি দৌড়াদৌড়ি, চিন্তার ক্ষেত্রে ঠিক ভেয়ানিই। কত হাজার হাজার লোক যে উর্ধ্বাঙ্গে চিন্তা করিয়া চলিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। দৈনিক কাগজে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, বহুভাসভায়, শিক্ষা-শালায়, পার্লামেন্টে, পুঁথিতে, চটিতে যনের ধান্না অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে। মানসিক শক্তি যাহার যে রকমের এবং যে পরিমাণে আছে তাহার সমস্তটার উপর টান পড়িয়াছে। 'চাই আরও চাই', দেশের মর্যাদান হইতে এই একটা ডাক সর্বদা সর্বত্র পৌছিতেছে। এত বড়ো একটা ডাকে কাহারও সবুজ সঙ্কে না, ক্ষণকাল চূপ করিয়া

থাকিতে হইলে মন উত্তলা হইয়া উঠে। দেশের এই মানসভাণ্ডারে যে লোক একবার একটা কিছু জোগাইয়াছে তাহার আর নিকৃতি নাই; সে লোকের উপর আরো'র তাগিদ পড়িল; খেজুরগাছের মতো বৎসরের পর বৎসরে কাটের পর কাট চলিতে থাকে; কোনো বারে রসের একটু কমতি বা বিরাম পড়িলে সে পাড়াসুদ্ধ লোকের প্রশ্নের বিষয় হইয়া উঠে।

কাজেই এখানকার মনোরাজ্যটা যদি চোখে দেখিবার হইত তবে দেখিতাম, সদর রাস্তায় এবং গলিতে, আপিস-পাড়ায় এবং বারোয়ারি-তলায় হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেছে; ভিড় ঠেলিয়া চলা দায়। সেখানেও কেহ বা পায়ে হাঁটিয়া চলে, কেহ বা মোটরগাড়ি হাঁকায়; কেহ বা মজুরি করে, কেহ বা মহাজনি করিয়া থাকে; কিন্তু সকলেই বিষম ব্যস্ত। ভোরবেলা হইতে রাত দুপুর পর্যন্ত চলাচলের অন্ত নাই।

কথাটা নূতন নহে। আমাদের দেশের তজ্জালস নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নেও আমরা অর্ধেক চোখ বুজিয়া আন্দাজ করিতে পারি, এ দেশের চিন্তার হাটে কী ভয়ংকর কোলাহল এবং ঠেলাঠেলি। কিন্তু, সেই ভিড়ের চাপটা নিজের মনের উপর যখন ঠেলা দেয় তখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি তাহার বেগ কতখানি। এ দেশে যাহারা মনের কারবার করেন তাঁহাদের কাছে আসিলে সেই বেগটা বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

ইহাদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব বেশি দিনেরও নয়, খুব অন্তরঙ্গও নয়, ক্ষণকালের দেখাসাক্ষাৎ মাত্র। কিন্তু, সেই সময়টুকুর মধ্যে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আমি বারম্বার বিস্মিত হইয়াছি, সেটা ইহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা। মন ইলেকট্রিক আলোর তারের মতো সর্বদা যেন প্রস্তুত হইয়াই আছে, বোতামটি টিপিয়া মাত্র তখনি জলিয়া উঠে। আমাদের প্রদীপের আলোর ব্যবহার; সলিতা পাকাইয়া, তেল ঢালিয়া, চকমকি ঠুকিয়া কাজ চালাইয়া থাকি—বিশেষ কোনো তাগিদ নাই, স্তব্ধতাং দেহি হইলে কিছুই আসে যায় না। অতএব, আমাদের বেকরপ অভ্যাস তাহাতে আমার পক্ষে এই ইলেকট্রিক আলোর ক্ষিপ্রতা সম্পূর্ণ নূতন।

এখনকার কালের সুবিখ্যাত লেখক 'ওয়েল্‌স্' সাহেবের ছই একখানি নভেল ও আমেরিকার সভ্যতা সম্বন্ধে একখানা বই পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। তাহাতেই জানিতাম, ইহার চিন্তাশক্তি ইম্পাণ্ডের তরবারির মতো যেমন ঝকঝক করে তেমনি তাহা ধরদার। আমার বন্ধু যেদিন ইহার সঙ্গে এক-দিনারে আমাকে নিয়ন্ত্রণ করেন সেদিন আমার মনের মধ্যে কেমন একটু ভয় ছিল। আমার মনে ছিল, সংসারের ধরতর বুদ্ধি

জিনিসটাতে নিশ্চয়ই অনেক কাজ হয়, কিন্তু তাহার সংশব হয়তো আরামের নহে।

যাহা হউক, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ইহার সঙ্গে অনেক কণের জন্ত আলাপ-পরিচয় হইল। প্রথমেই আশ্চর্য হইলাম যখন দেখা গেল মানুষটি সম্ভারজাতীয় নহে, সম্পূর্ণ যোগাযোগ। দেখিতে পাইলাম, ইহার প্রথমতা চিন্তার, কিন্তু প্রকৃতিতে নয়। আসল কথা, মানুষের প্রতি ইহার আন্তরিক দরদ আছে, অস্ত্রায়ের প্রতি বিষেষ এবং মানুষের সার্বজনীন উন্নতির প্রতি অমুরাগ আছে; সেইটে থাকিলেই মানুষের মন কেবলমাত্র চিন্তার তুব্ড়িবাঙ্গি করিয়া স্থব পায় না। এই দেশে সেইটে একটা মস্ত জিনিস, মানুষ এখানে সর্বদা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া আছে; মানুষের সম্বন্ধে এখানে ঔৎসুক্যের অস্ত নাই। মানুষের প্রতি উদাসীনতার অভাবেই ইহাদের মন এমন প্রচুরশক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। কেননা, শুধু বীজে ও মাটিতে ফসল ভালো হয় না, জমিতে সর্বদা রস থাকা চাই; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরন্তন রস বাহাতে করিয়া মনের সকলরকম ফসল একেবারে অপৰ্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে। আমাদের দেশে আমি অনেক শক্তিশালী লোক দেখিয়াছি, মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের হৃদয়ের সংশব সুগভীর ও সর্বদা বিদ্যমান নহে বলিয়াই তাঁহারা আপনার সাধ্যকে পূর্ণভাবে সাধিত করিয়া তুলিতে পারেন না। মানুষ তাঁহাদের কাছে ভেমন করিয়া চাহিতেছে না বলিয়াই মানুষের ধন তাঁহারা পূরা পরিমাণ বাহির করিতে পারিতেছেন না। বিরল-বসতি লোকালয়ে মানুষ নিজের নিতান্ত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু ফলায় না এবং তাহারও অনেক নষ্ট হয়, ফেলা যায়। আমাদের সেইরূপ বিরলে বাস; মানুষ ছাঁকিয়া বাঁকিয়া আমাদের হৃদয়মনকে আকর্ষণ করিতেছে না। সেইজন্য আমরা অনেকে চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু সে চিন্তা আলস্ত ঘুচাইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না; অনেকের হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয় ছেলেপুলে ভাইপো ভাগনের বাহিরে খাটিবার ক্ষেত্র পায় না।

যাহাই হউক, ওয়েল্‌সের সঙ্গে কথা কহিতে গিয়া এইটে বুঝিতে পারিলাম, ইহাদের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তির অবলম্বন মানুষ; এইজন্য তাহা শিকারীর শিকার-ইচ্ছার মতো কেবলমাত্র শক্তির খেলা নহে। এইজন্য ইহাদের চিন্তার যে তীক্ষ্ণতা তাহা ছুরির তীক্ষ্ণতার মতো নহে—তাহা সজীব তীক্ষ্ণতা, তাহা দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা; তাহার সঙ্গে হৃদয় আছে, জীবন আছে।

আম-একটা জিনিস দেখিয়া বারবার বিস্মিত হইলাম, সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সে ইহাদের চিন্তার কিপ্রভা। আমার বন্ধুর সঙ্গে ওয়েল্‌সের যতক্ষণ কথা চলিল

ততক্ষণ পদে পদে কথাবার্তার প্রবাহ উজ্জল চিন্তার কথায় বল্মলু করিতে লাগিল। কথায় সঙ্গে কথায় স্পর্শে আপনি ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে, মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় না। ইহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদের মন প্রস্তুত হইয়াই আছে। ইহারা যে চিন্তা করিতেছেন তাহা নহে, চারি দিকের ঠেলায় ইহাদের নিয়ত চিন্তা করাইতেছে; তাই ইহাদের মন ছুটিতে ছুটিতেও ভাবিতে পারে এবং ভাবিতে ভাবিতেও কথা কহিয়া যায়। ইহাদের ব্যক্তিগত মনের পশ্চাতে সমস্ত দেশের মন আগিয়া আছে; চিন্তার ঢেউ, কথার কম্পন কেবলই নানা দিক হইতে নানা আকারে পরস্পরের চিন্তকে আঘাত করিতেছে। ইহাতে মনকে আগ্রত ও মুখরিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আমার বন্ধু চিত্রশিল্পী, কথার কারবার তাঁহার নহে। তাঁহার সঙ্গে আমার অনেকদিন অনেক আলাপ হইয়াছে; সর্বদা ইহাই লক্ষ্য করিয়াছি, যে কথাটাই ইহার সম্মুখে উপস্থিত হয় তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইনি জোরের সঙ্গে ভাবিতে পারেন ও জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন। সে জোর কিছুমাত্র গায়ের জোর নহে, তাহা চিন্তার জোর। ইহার অমুভূতিশক্তিও দ্রুত এবং প্রবল। যেটা ভালো লাগিবার জিনিস সেটাকে ভালো লাগিতে ইহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না, সে সম্বন্ধে ইহাকে আর-কাহারও মুখাপেক্ষা করিতে হয় না; যেটাকে গ্রহণ করিতে হইবে সেটাকে ইনি একেবারেই অসংশয়ে গ্রহণ করেন। মানুষকে ও মানুষের শক্তিকে গ্রহণ করিবার সহজ ক্ষমতা ইহার এমন প্রবল বলিয়াই ইনি ইহার দেশের নানা শক্তিশালী নানা শ্রেণীর লোককে এমন করিয়া বন্ধুত্বপাশে বাঁধিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা কেহ বা কবি, কেহ সমালোচক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ দার্শনিক, কেহ গুণী, কেহ জ্ঞানী, কেহ রসিক, কেহ রসজ্ঞ; তাঁহারা সকলেই বিনা বাধায় এক ক্ষেত্রে মিলিবার মতো লোক নহেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সকলেই মিলিতে পারিয়াছেন।

আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া আমার ইহাই মনে হইতে থাকে, অনেক বিষয়েই ইহাদিগকে এখন আর গোড়া হইতেই ভাবিতে হয় না; ইহারা অনেক কথা অনেক দূর পর্যন্ত ভাবিয়া রাখিয়াছেন। ভাবনার প্রথম ধাক্কাতেই যত বিলম্ব, তখনি জড়ত্ব ভাঙিতে সময় লাগে; কিন্তু যখন তাহা কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে তখন তাহার পক্ষে চলা সহজ। ইহাদের দেশে ভাবনা জিনিসটা চলার মুখেই আছে; তাহার ঢাকা আপনিই সরে। মানুষের চিন্তার অধিকাংশ বিষয়ই মাক-মাস্তার। এইজন্য ইহাদের কোনো শিক্ত লোকের সঙ্গে যখন আলাপ করা যায় তখন একেবারেই স্ফুটিত কথার ধারা পাওয়া যায়, এবং সেই ধারা দ্রুতগতিশীল।

যেখানে চিন্তার এমন একটা বেগ আছে সেখানে চিন্তার আনন্দ যে কতখানি তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। সেই আনন্দ এখানকার শিক্ষিতসমাজের সামাজিকতার একটি প্রধান অঙ্গ। এখানকার সামাজিক মেলামেশার মধ্যে চিন্তার লীলা আপনার বিহারক্ষেত্র রচনা করিতেছে। চিন্তার সঙ্গর কেবল বক্তৃতায় এবং বই লেখায় নহে, তাহা যাহুয়ের সঙ্গে যাহুয়ের দেখা-সাক্ষাতে। অনেক সময় ইহাদের আলাপ শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইয়াছে, এ-সব কথা লিখিয়া রাখিবার মিনিস, ছড়াইয়া ফেলিবার নহে। কিন্তু, যাহুয়ের মন কুপণতা করিয়া কোনো বড়ো ফল পাইতে পারে না। যেখানে ছড়াইয়া ফেলিবার যোগ্যতা নাই সেখানে ভালো করিয়া কাজে লাগাইবার যোগ্যতাও নাই। প্রত্যেক বীজের হিসাব রাখিয়া টিপিয়া টিপিয়া পুঁতিতে গেলে বড়ো রকমের চাষ হয় না। দরাজ হাতে ছড়াইয়া ছড়াইয়া চলিতে হয়, তাহাতে অনেকটা নিষ্ফল হইয়াও মোটের উপর লাভ পাড়ায়। এইজন্য চিন্তার চর্চায় সেই আনন্দ থাকা চাই যাহাতে সে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হইয়া উন্মিত্তে পারে। আমাদের দেশে চিন্তার সেই আনন্দলীলার অভাবটাই সকল দৈন্তের চেয়ে বেশি বলিয়াঠেকে।

কেম্‌ব্রিজের কলেজ-ভবনে একজন অধ্যাপকের বাড়িতে নিযুক্ত হইয়া আমি দিন দুয়েক বাস করিয়াছিলাম। ইহার নাম লোয়েস ডিকিন্সন। ইনিই ‘জন্ চীনাযানের পত্র’ বইখানির লেখক। সে বইখানি বখন প্রথম বাহির হয় তখন আমাদের দেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের একটা প্রবল হাওয়া দিয়াছিল। সমস্ত যুরোপের চিন্তা যেমন একই সভ্যতানুজ্ঞের চারি দিকে দানা বাধিয়াছে তেমনি করিয়া একদিন সমস্ত এশিয়া এক সভ্যতার বৃক্ষের উপর একটি শতদলপদ্ম হইয়া বিশ্ববিধাতার চরণতলে নৈবেদ্যরূপে আগিয়া উঠিবে, এই কল্পনা ও কামনা আশাদিগকে যাতাইয়া তুলিতেছিল। সেই সময়ে এই ‘চীনাযানের পত্র’ বইখানি অবলম্বন করিয়া আমি এক মস্ত প্রবন্ধ লিখিয়া সভায় পাঠ করিয়াছিলাম।^১ তখন জানিতাম, সে বইখানি সভ্যই চীনাযানের লেখা। যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম; তিনি চীনাযান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, তিনি ভাবুক, অতএব তিনি ‘সকল দেশের যাহুয়। যে দুইদিন ইহার বাসায় ছিলাম ইহার সঙ্গে প্রায় নিরন্তর আমার কথাবার্তা হইয়াছে। স্রোতের সঙ্গে স্রোত যেমন অনায়াসে যেথায় যেথায় অশ্রান্ত আনন্দে তাঁহার চিন্তাবেগের টানে আমার চিন্তা ধাবিত হইয়া চলিতেছিল। ইহা বিশেষ কোনো উপার্জন বা লাভের ব্যাপার নহে; ইহা

১ চীনাযানের চিঠি: বঙ্গবর্ষ, ১৩০১ আষাঢ়, পৃ. ১৫১-১২। প্রবন্ধটি “মহুয়ায় লাইব্রেরির সংস্কৃত ‘আলোচনা সমিতি’র বিশেষ অধিবেশনে” প্রবীক্ষণার্থ পাঠ করিয়াছিলেন।

কোনো বিশেষ বিষয়ের বই পড়া বা কলেজের বক্তৃতা শোনার কাজ করে না ; ইহা মনের চলার আনন্দ । যেমন বসন্তে সমস্তই কেবল ফল ও ফুল নহে, তাহার সঙ্গে দক্ষিণের হাওয়া আছে, সেই হাওয়ার উত্তাপে ও আন্দোলনে ফুলের আনন্দবিকাশ সম্পূর্ণ হইতে থাকে, তেমনি এখানকার মনোবিকাশের চারি দিকে যে একটা আলাপের বসন্তহাওয়া বহিতেছে, বাহাতে গন্ধ ব্যাপ্ত হইতেছে ও বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে, বাহাতে প্রাণের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের উৎসব দিগ্দিগন্তরূপে মাতাইয়া তুলিতেছে, এই সহস্র চিন্তাশীল অধ্যাপকের গ্রন্থমণ্ডিত বাগাটুকুর মধ্যে আমি তাহারই একটা প্রবল স্পর্শ পাইলাম । ইহার সঙ্গে এক সময়ে যখন এখানকার একজন বিখ্যাত গণিত-অধ্যাপক রাসেল সাহেব^১ আসিয়া মিলিত হইলেন তখন তাঁহাদের আলাপের আন্দোলন আমার মনকে পদে পদে অভিহিত করিয়া আনন্দিত করিয়া তুলিল । গণিতের তেজে কাহারও মন দৃঢ় হইয়া শুকাইয়া যায়, কাহারও মন আলোকিত হইয়া উঠে । রাসেল সাহেবের মন যেন প্রথর আলোকে দীপ্যমান । সেই চিন্তার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপ্ত হান্তরশ্মি মিলিত হইয়া আছে, সেইটে আমার কাছে সবচেয়ে সরস লাগিল । রাত্রে আহারের পর আমরা কলেজের বাগানে গিয়া বসিতাম সেখানে একদিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত প্রাচীন তরুসভার গভীর নীরবতার মধ্যে এই দুই অধ্যাপক বকুর আলাপ আমি শুনিতেছিলাম । আলাপের বিষয় বহুদ্রব্যাপী । তাহার মধ্যে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, সকলরকম জিনিসই ছিল । আমার কাছে সেই রাত্রির স্মৃতিটি বড়ো রমণীয় । এক দিকে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির আকাশ-ছোড়া নিস্তরতা, আর এক দিকে তাহারই মাঝখান দিয়া মানুষের চকল মন আপনার তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া সমস্ত বিশ্বকে বাহুবন্ধনে বাঁধিবার জন্ত অভিগারে চলিয়াছে । যেন পর্বতমালা স্থির নিশ্চল গাভীরূপে সহিত আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহারই পায়ে কাছটা ঘিরিয়া ঘিরিয়া নির্ঝরিনী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাকে কেহই ধামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না ; তাহার কলোচ্ছ্বাস কেবলই প্রবল করিতেছে, এবং গভীর গিরিকন্দরগুলা তাহারই ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে যুবরিত হইয়া উঠিতেছে । প্রকৃতি এবং চিন্তা এই দুইয়ের যোগ আমি সেই প্রাচীন বিস্তারের পুরাতন বাগানে বসিয়া অনুভব করিতেছিলাম । বৃহৎ বিশ্বের নীরবতা মানুষের মধ্যেই বাণী-আকারে আপনাকে অবিস্তার প্রকাশ করিতেছে ; এই বাণীষোভেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তাহার নিরন্তর আনন্দ, ইহাই আমি সেদিন নিবিড়রূপে উপলব্ধি করিলাম । আমার মনে হইতে লাগিল, জগতে অন্ধকারের মহাসত্তা অতিবিপুল । অনন্ত আকাশে সেই

মহাঙ্ককার আপনাকে আলোকের লীলার ব্যস্ত করিতেছে ; সেই আলোকের আঘাত চকল, তাহা সর্বদা কম্পমান ; তাহা কোথাও বা শিখার, কোথাও বা ক্ষুণ্ণিহে, কোথাও বা ক্ষণকালের জন্ত, কোথাও বা দীর্ঘকালের জন্ত উজ্জল হইয়া উঠিতেছে ; কিন্তু এই চকল আলোকমালাই অবিচলিত মহৎ অঙ্ককারের বাণী । মানুষের চিত্তের চকল ধারাটিও তেমনি বিশাল বিশ্বের এক প্রান্ত দিয়া নানা পথে আঁকিয়া-বাঁকিয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া কেবলই বিশ্বকে প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়াছে । যেখানে সেই প্রকাশ পরিপূর্ণ ও প্রসঙ্গ সেইখানেই বিশ্বের চরিতার্থতা আনন্দে ও ঐশ্বর্যের সমারোহে উৎসবময় হইয়া উঠিতেছে । নিশ্চয়ই স্নাতক ছই বন্ধুর বৃহৎ কঠোর কথাবার্তার আশি মানুষের মনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বের সেই আনন্দ, সেই ঐশ্বর্য অম্লভব করিতেছিলাম ।

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাদ্রি

সকল সময়েই মানুষ যে নিজের যোগ্যতা বিচার করিয়া বৃত্তি অবলম্বন করিবার সুযোগ পায় তাহা নহে— সেইজন্য পৃথিবীতে কর্মরথের চাকা এমন কঠোর স্বরে আর্তনাদ করিতে করিতে চলে । যে মানুষের মূর্খির দোকান খোলা উচিত ছিল সে ইচ্ছল-মাস্টারি করে, পুলিশের দারোগা হওয়ার জন্ত যে লোক স্টেট হইয়াছে তাহাকে পাদ্রির কাজ চালাইতে হয় । অন্য ব্যবসারে এইরূপ উল্টাপাল্টাতে খুব বেশি কতি করে না, কিন্তু ধর্মব্যবসারে ইহাতে বড়োই অঘটন ঘটাইয়া থাকে । কারণ, ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ যথাসম্ভব সত্য হইতে না পারিলে তাহাতে কেবল যে ব্যর্থতা আনে তাহা নহে, তাহাতে অমঙ্গলের সৃষ্টি করে ।

খৃষ্টানধর্মের আদর্শের সঙ্গে এ দেশের মানবপ্রকৃতির এক জায়গায় খুব একটা অসামঞ্জস্য আছে, খৃষ্টানশাস্ত্রোপদিষ্ট একান্ত নম্রতা ও দাক্ষিণ্য এ দেশের স্বভাব-সংগত নহে । প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে লড়াই করিয়া নিজেকে জয়ী করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের যুক্ত প্রাচীনকাল হইতে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হইয়া আসিয়াছে ; সেইজন্য সৈন্তদলে ইহাদের ভক্তি হওয়া উচিত ছিল তাহারা যখন পাদ্রির কাজে নিযুক্ত হয় তখন ধর্মের বড় গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া লাল টকটকে হইয়া উঠে । সেইজন্য যুরোপে আমরা সকল সময়ে পাদ্রিদিগকে শান্তির পক্ষে, সার্বজনিক ঋণপরতার পক্ষে দেখিতে পাই না । যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহারা বিশেষভাবে ঈশ্বরকে

নিজেদের মূলপতি করিয়া দাঁড় করায় এবং ঈশ্বরোপাসনাকে রক্তপাতের ভূমিকারূপে ব্যবহার করে।

অনেক সময়েই দেখা যায়, ইহারা বাহাদিগকে হীনেন বলে তাহাদের প্রতি সত্যবিচার করিতে ইহারা অক্ষম। যেন তাহারা খৃষ্টানের ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর-কোনো দেবতার সৃষ্টি, সুতরাং তাহাদিগকে নিশ্চিত করিতে পারিলে যেন নিজের ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়, এই রকমের একটা ভাব তাহাদের মনে আছে। এই বিকৃততা, এই উগ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা পাত্রি অশ্রু ধর্মের লোককে সর্বদা পীড়া দিয়াছে। তাহারা অস্বাভাবী সৈন্তদলের মতো অশ্রুকে আঘাত করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছে।

তাই ভারতবর্ষে পাত্রিদের সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা এই বিকৃততার ধারণা। তাহারা যে আমাদের সঙ্গে অভ্যস্ত পৃথক, এইটেই আমরা অস্বীকার করিয়াছি। তাহারা আমাদের খৃষ্টান করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজেদের সঙ্গে আমাদের মিলাইয়া লইতে প্রস্তুত নহে। তাহারা আমাদের জয় করিবে, কিন্তু এক করিবে না। এক জাতির সঙ্গে আর-এক জাতিকে মিলাইবার ভার ইহাদেরই লওয়া উচিত ছিল। বাহাতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা করিয়া সুবিচার করিতে পারে, সেই সেতু বাধিয়া দেওয়া তো ইহাদেরই কাজ। কিন্তু, তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। খৃষ্টান পাত্রিরা অখৃষ্টান জাতির ধর্ম সমাজ ও আচার-ব্যবহারকে যতদূর সম্ভব কালিমালিপ্ত করিয়া দেশের লোকের কাছে চিত্রিত করিয়াছে। এমন কোনো জাতি নাই বাহার হীনতা বা শ্রেষ্ঠতাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখানো যায় না। অথচ ইহাই নিশ্চিত সত্য যে, সকল জাতিকেই তাহার শ্রেষ্ঠতার দ্বারা বিচার করিলেই তাহাকে সত্যরূপে জানা যায়। হৃদয়ে প্রেমের অভাব এবং আত্মগরিমাই এই বিচারের বাধা। বাহারা ভগবানের প্রেমে জীবনকে উৎসর্গ করেন তাহারা এই বাধাকে অতিক্রম করিবেন, ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু, অশ্রু জাতিকে হীন করিয়া দেখাইয়া পাত্রিরা খৃষ্টান অখৃষ্টানের মধ্যে যতবড়ো প্রবল ভেদ ঘটাইয়াছে এমন বোধ হয় আর-কেহই করে নাই। অশ্রুকে দেখিবার বেলায় তাহারা ধর্মব্যবসায়ের সাম্প্রদায়িক কালো চশমা পরিয়াছে। বিভেদতা ও বিজিত জাতির মাঝখানে একটা প্রচণ্ড অভিমান স্বভাবতই আছে, তাহা শক্তির অভিমান— সুতরাং পরস্পরের মধ্যে বাহুবোচিত মিলনের সেই একটা যন্ত অস্তরায়— পাত্রিরা সেই অভিমানকে ধর্ম ও সমাজনীতির দিক হইতেও বড়ো করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই খৃষ্টানধর্মও নানা প্রকারে আমাদের মিলনের একটা বাধা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের পরস্পরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু, এমন সাধারণভাবে কোনো সমাজায় সম্বন্ধে কোনো কথা বলা চলে না, তাহার

প্রমাণ পাইয়াছি। এখানে আসিয়া একজন খৃস্টান পাদ্রির সহিত আমার আলাপ হইয়াছে যিনি পাদ্রির চেয়ে খৃস্টান বেশি— ধর্ম ধাঁহার মধ্যে ব্যবসায়িক মূর্তি ধরিয়া উগ্ররূপে দেখা দেয় নাই, সমস্ত জীবনের সহিত হৃদয়নির্মিত হইয়া একাধি পাইতেছে। এমন মানুষকে কেহ মনে করিতে পারে না যে ‘ইনি আমাদের পক্ষের লোক নহেন, ইনি অন্য দলের’। ইহাই অত্যন্ত অমূল্য করি, ইনি মানুষ— ইনি সত্যকে মঙ্গলকে সকল মানুষের মধ্যে দেখিতে আনন্দ বোধ করেন— তাহা খৃস্টানেরই বিশেষ সম্পত্তি মনে করিয়া দাঁড়া করেন না। আরও আশ্চর্যের বিষয়, ইহার কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে। সেখানে খৃস্টানের পক্ষে যথার্থ খৃস্টান হইবার মত একটা বাধা আছে— কারণ, সেখানে তিনি রাজা। সেখানে রাষ্ট্রনীতি ধর্মনীতির সপত্নী। অনেক সময়ে তিনিই স্বয়ংরানী। এইজন্য ভারতবর্ষের পাদ্রি ভারতবাসীর সমগ্র জীবনের সঙ্গে সমবেদনার যোগ রাখিতে পারেন না। একটা মন্ত আয়গায় আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের জাতীয় স্বার্থের সংঘাত আছে এবং এক আয়গায় তাঁহারা তাঁহাদের গুরু উপদেশ শিরোধার্য করিয়া শির নত করিতে পারেন না। তিনি নম্রতা দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সেটা স্বর্গরাজ্যের নীতি। ইহারা মর্ত্যরাজ্যের অধীশ্বর।

আমি ধাঁহার কথা বলিতেছি ইনি যেভারেও এওঁস। ভারতবর্ষের লোকের কাছে ইহার পরিচয় আছে। তিনি আপনার মধ্যে যে ইংরেজ রাজা আছে তাহাকে একেবারে হার মানাইয়াছেন এবং আমাদের আপন হইবার পবিত্র অধিকার লাভ করিয়াছেন। খৃস্টানধর্ম যেখানে সমগ্র জীবনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে সেখানে যে কী মানুষ এবং উদারতা তাহা ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়াকে আমি বিশেষ সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করি।

ইনিই একদিন আমাকে বলিলেন, ‘দেশে কিরিবার পূর্বে এখানকার গৃহস্থবাড়ি তোমাকে দেখিয়া বাইতে হইবে। শহরে তাহার অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে— পল্লীগ্রামে না গেলে তাহার ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।’ ইহার একজন বন্ধু স্টাফোর্ডশিরের এক পল্লীতে পাদ্রির কাজ করিয়া থাকেন; তাঁহারই বাড়িতে এওঁস সাহেব কিছুদিন আমাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অগস্ট মাস এ দেশে গ্রীষ্ম-ঋতুর অধিকারের মধ্যে গণ্য। সে সময়ে শহরের লোক পাড়ারগায়ে ছাওয়া থাইয়া আসিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। আমাদের দেশে এমন অব্যাহতভাবে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে পাই, সেখানে আকাশ এবং আলোক এমন প্রচুররূপে আমাদের পক্ষে স্থলভ যে, তাহার সঙ্গে যোগসাধনের জন্য বিশেষ ভাবে আমাদের কোনো আয়োজন করিতে হয় না। কিন্তু এখানে প্রকৃতিকে

তাঁহার ঘোমটা খুলিয়া দেখিবার জন্য লোকের মনের ঔৎসুক্য কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। ছুটির দিনে ইহারা যেখানে একটু খোলা মাঠ আছে সেইখানেই দলে দলে ছুটিয়া যায়— বড়ো ছুটি পাইলেই শহর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এমনি করিয়া প্রকৃতি ইহাদিগকে চলাচলের মুখে রাখিয়াছে, ইহাদিগকে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দেয় না। ছুটির ট্রেনগুলি একেবারে লোকে পরিপূর্ণ। বসিবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেই শহরের উড়ু মানুষের কাকের সঙ্গে মিশিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

গম্যস্থানের স্টেশনে আমাদের নিমন্ত্রণকর্তা তাঁহার খোলা গাড়িটি লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। গাড়িতে বসন চড়িলাম তখন আকাশে মেঘ। ছায়াচ্ছন্ন প্রভাতের আবরণে পল্লীপ্রকৃতি স্নানমুখে দেখা দিল। অল্প কিছুদূর যাইতেই বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বাড়িতে গিয়া বসন পৌছিলাম গৃহস্থামিনী তাঁহার আগুন-জ্বালা বসিবার ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়িটি পুরাতন পাত্রিনিবাস নহে। ইহা নূতন-তৈরি। গৃহসংলগ্ন ভূমিখণ্ডে বৃদ্ধ তরুশ্রেণী বহুদিনের ধারাবাহিক মানবজীবনের বিলুপ্ত স্মৃতিকে পল্লব-পুষ্পের অক্ষুট ভাষায় মর্মরিত করিতেছে না। বাগানটি নূতন, বোধ হয় ইহারাই প্রস্তুত করিয়াছেন। ঘন সবুজ তৃণক্ষেত্রের ধারে ধারে বিচিত্র রঙের ফুল ছুটিয়া কাঙাল চক্ষুর কাছে অক্ষয় সৌন্দর্যের অব্যবহিত অল্পসল্প খুলিয়া দিয়াছে। গ্রীষ্ম-ঋতুতে ইংলণ্ডে ফুলপল্লবের যেমন সরসতা ও প্রাচুর্য এমন তো আমি কোথাও দেখি নাই। এখানে মাটির উপরে ঘাসের আশ্রয়ণ যে কী ঘন ও তাহা কী নিবিড় সবুজ তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাড়িটির ঘরগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন; লাইব্রেরি সুপাঠ্য গ্রন্থে পরিপূর্ণ; শিতরে বাহিরে কোথাও লেশমাত্র অব্যবহৃত চিহ্ন নাই। এখানকার ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে এই জিনিসটাই বিশেষ করিয়া আমার মনে লাগিয়াছে। ইহাদের ব্যবহারের আরাধনের ও গৃহসজ্জার উপকরণ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, অথচ ঘরের প্রত্যেক সামান্য জিনিসটির প্রতি গৃহস্থের চিন্তা সতর্কভাবে আগ্রহ আছে। নিজের চারি দিকের প্রতি নৈখিল্য যে নিজেরই অবমাননা তাহা ইহারা খুব বুঝে। এই আগ্রহ আত্মদানের ভাবটি ছোটোবড়ো সকল বিষয়েই কাজ করিতেছে। ইহারা নিজের মনুষ্যগৌরবকে খাটো করিয়া দেখে না বলিয়াই নিজের ঘরবাড়িকে যেমন সর্বপ্রযত্নে তাঁহার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, তেমনি নিজের প্রতিবেশকে সমাজকে দেশকে সকল বিষয়ে সকল দিক হইতে সম্মার্জন করিয়া তুলিবার জন্য ইহাদের প্রয়াস অহরহ উদ্ভূত হইয়া রহিয়াছে। একটি

জিনিগটাকে ইহারা কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই বাপ করিতে চায় না।

বিকালের দিকে আমাকে লইয়া গৃহস্থানী উট্টম সাহেব বেড়াইতে বাহির হইলেন। তখন বৃষ্টি ধামিয়াছে, কিন্তু আকাশে মেঘের অবকাশ নাই। এখানকার পুরুষেরা যেমন কালো টুপি মাথায় দিয়া মলিন বর্ণের কোর্তা পরিয়া বেড়ায়, এখানকার দেবতাও সেইরকম অত্যন্ত গম্ভীর ভাববেশে আচ্ছন্ন হইয়া দেখা দিলেন। কিন্তু, এই ঘনগাম্ভীর্যের জারাতলেও এখানকার পল্লীজীবী সৌন্দর্য ঢাকা পড়িল না। শুশ্রূষণীর বেড়ায় দ্বারা বিভক্ত চেউ-খেলানো প্রান্তরের প্রগাঢ় স্তম্ভলিমা হুই চক্ষুকে স্নিগ্ধতার অভিযুক্ত করিয়া দিল। জায়গাটা পাহাড়ে বটে কিন্তু পাহাড়ের উগ্র বন্ধুরতা কোথাও নাই—আমাদের দেশের রাগিনীতে যেমন সুরের গায়ে সুর বিড়ের টানে চলিয়া পড়ে, এখানকার মাটির উজ্জ্বলগুলি ভেমনি ঢালু হইয়া পরস্পর গায়ে গায়ে বিলিয়া রহিয়াছে; ধরিত্রীর সুরবাহারে যেন কোন দেবতা নিঃশব্দ রাগিনীতে মেঘমল্লারের গং বাজাইতেছেন। আমাদের দেশের যে-সকল প্রদেশ পার্বত্য, সেখানকার যেমন একটা উদ্ভত মহিমা আছে এখানে তাহা দেখা যায় না। চারি দিকে চাহিয়া দেখিলে যেন হয়, বস্তু প্রকৃতি এখানে সম্পূর্ণ পোষ মানিয়াছে। যেন মহাদেবের বাহন বৃষ—ধরীরটি নখর চিকণ, নন্দীর ভরুনী-সংকত মানিয়া তাহার পাশের কাছে শিঙ নাখাইয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া আছে, প্রকুর তপোবিয়ের ভয়ে হাচাধনিও করিতেছে না।

পথে চলিতে চলিতে উট্টম সাহেব একজন পথিকের সঙ্গে কিছু কালের কথা আলাপ করিয়া লইলেন। ব্যাপারটা এই—স্থানীয় চাষী গৃহস্থদিগকে নিজেদের ভিটার চারি দিকে খানিকটা করিয়া বাগান করিতে উৎসাহ দিবার জন্য, ইহারা একটি কমিটি করিয়া উৎকর্ষ অঙ্গসারে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অল্পদিন হইল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই পথিকটি পুরস্কারের অধিকারী হইয়াছে। উট্টম সাহেব আমাকে কয়েকটি চাষী গৃহস্থের বাড়ি দেখাইতে লইয়া গেলেন। তাহার প্রত্যেকেই নিজের কুটারের চারি দিকে বহু যত্নে খানিকটা করিয়া ফুলের ও তরকারির বাগান করিয়াছে। ইহারা সমস্ত দিন মাঠের কাজে খাটিয়া সন্ধ্যার পর বাড়ি কিরিয়া এই বাগানের কাজ করে। এমন করিয়া গাছপালার প্রতি ইহাদের এমন একটা আনন্দের টান হয় যে, এই অতিরিক্ত পরিশ্রম ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহার আর-একটি সূক্ষ্ম এই যে, এই উৎসাহ যদের নেশাকে খেদাইয়া রাখে। বাহিরকে রমণীয় করিয়া ফুলিবার এই চেষ্টার নিজের অন্তরকেও ক্রমশ সৌন্দর্যের সুরে বাঁধিয়া তোলা হয়। এখানকার পল্লীবাসীর সঙ্গে উট্টম সাহেবের হিতাহিতানের সম্বন্ধ আরও নানা দিক হইতে দেখিয়াছি। এইপ্রকার মঙ্গলপ্রভে-নিঃসৃত-উৎসর্গ-করা জীবন যে কী সূক্ষ্ম তাহা ইহাকে দেখিয়া অস্বত্ব করিয়াছি।

ভগবানের সেবার অমূল্যরূপে ইহার জীবন পরিপূর্ণ মধুর কালের মতো নহ্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ঘরের মধ্যে ইনি একটি পুণ্যের প্রদীপ জালিয়া রাখিয়াছেন; অধ্যয়ন ও উপাসনার দ্বারা ইহার গার্হস্থ্য প্রতিদিন ধৌত হইতেছে; ইহার আতিথ্য যে কিরূপ সহজ ও সুন্দর তাহা আমি ভুলিতে পারিব না।

এই-যে এক-একটি করিয়া পাত্রি কয়েকটি গ্রামের কেন্দ্র হইয়া বসিয়া আছেন, ইহার সার্থকতা এবার আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই সর্বদেশব্যাপী বাহুবল চেষ্টার দ্বারা নিত্য গণগ্রামগুলির মধ্যে একটা উন্নতির প্রয়াস জাগ্রত হইয়া আছে। এইরূপে ধর্ম এ দেশে শুভকর্ম-আকারে চারি দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। একটি বৃহৎ ব্যবস্থার সূত্রে এ দেশের সমস্ত লোকালয় মালার মতো গাঁথা হইয়াছে। আমাদের মতো বাহারা এইপ্রকার সর্বজনীন ব্যবস্থার অভাবে পীড়িত হইতেছে তাহারাই জানে ইহা কতবড়ো একটি কল্যাণ।

মাছুষ এমন কোনো নিখুঁত ব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া গড়িয়া রাখিতে পারে না বাহার মধ্যে কোনো ভণ্ডামি, কোনো অনর্থ, কোনো কালে প্রবেশ করিবার পথ না পায়। এ দেশের ধর্মমত ও ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে এখনকার উন্নতিশীল কালের কিছু কিছু অসামঞ্জস্য ঘটিতেছে, এ কথা সকলেই জানে। আমি এখানকার অনেক ভালো লোকের মুখে শুনিয়াছি, ভজনালয়ে যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়াছে। যে-সকল কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব তাহাকে অসম্ভাবে স্বীকার করিবার পাশে তাঁহারা লিপ্ত হইতে চান না। এইরূপে দেশপ্রচলিত ধর্মমত নানা স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়াতে ধর্মের আত্মরূপে তাঁহারা সর্বান্তেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ সময়েই নানা কপটাচার বৃদ্ধ ধর্মমতকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে আরও যোগাত্মক করিয়া তোলে। আজকালকার দিনে নিঃসন্দেহই চার্চের মধ্যে এমন অনেক পাত্রি আসন গ্রহণ করিয়াছেন বাহারা বাহা বিশ্বাস করেন না তাহা প্রচার করেন, এবং বাহা প্রচার করেন তাহাকে কার্যক্ৰমে বিশ্বাস করিবার অন্ত নিজেই তোলাইবার আয়োজন করিতে থাকেন। এই বিধা যে সমাজকে নানা প্রকারে আঘাত করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরদিনই গোঁড়ামি ধর্মের সিংহদ্বারকে এমন সংকীর্ণ করিয়া ধরে বাহাতে করিয়া ক্ষুদ্রতাই প্রবেশ করিবার পথ পায়, মহত্ব বাহিরে পড়িয়া থাকে। এইরূপে যুরোপে বাহারা জানে প্রাণে ক্ষময়ে বহু তাঁহারা অনেকেই যুরোপের ধর্মতত্ত্বের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। এ অবস্থা কখনোই কল্যাণকর হইতে পারে না।

কিন্তু, যুরোপকে তাহার প্রাণশক্তি রক্ষা করিতেছে। তাহা কোনো একটা জায়গায় আটকা পড়িয়া বসিয়া থাকে না। চলা তাহার ধর্ম—পত্রের বেগে সে

আপনার বাধাকে কেবলই আঘাত করিয়া কম করিতেছে। খৃস্টান-ধর্মমত যে পরিমাণে সংকুচিত হইয়া এই ঘোড়ের বেগকে বাধা দিতেছে সেই পরিমাণে যা ধাইয়া তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। সেই প্রক্রিয়া প্রত্যহই চলিতেছে; অবশেষে এখনকার মনীষীরা তাহাকে খৃস্টানধর্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছেন তাহা নিজের মূল আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়াছে। তাহা জিন্দবাদ মানে না, যিহুকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে না, খৃস্টানপুরাণ-বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনার তাহার আস্থা নাই, তাহা মধ্যযুগাদীও নহে। যুরোপের ধর্মপ্রকৃতির মধ্যে একটা খুব আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। অন্তএব ইহা নিশ্চিত, যুরোপ কখনোই আপনার সনাতন ধর্মমতকে আপনার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির চেয়ে নীচে স্থান দিয়া পড়িতে দিয়া নিজেকে এত বড়ো একটা বোকার চিরকাল ভাবাক্রান্ত করিয়া রাখিবে না।

যাহাই হউক, পাত্রিয়া এই-যে ধর্মমতের জাল দিয়া সমস্ত দেশকে বেঁধেন করিয়া বসিয়া আছে, ইহাতে সময়ে সময়ে দেশের উন্নতিকে কিছু কিছু বাধা দেওয়া সম্ভব মোটের উপর ইহাতে যে দেশের ভিতরকার উচ্চ স্তরকে বাধিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের এই কাজ ছিল। কিন্তু, ব্রাহ্মণের কর্তব্য বর্ণগত হওয়াতে তাহা স্বভাবতই আপন কর্তব্যের দায়িত্ব হারাইয়া কেলিয়াছে। ব্রাহ্মণের কর্তব্যের আদর্শ যতই উচ্চ হইবে ততই তাহা বিশেষ যোগ্য ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষা ও ক্রমতার উপর নির্ভর করিবে—যখনি সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে এই দায়িত্বকে বংশগত করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখনি আদর্শকে যতদূর সম্ভব ধর্ম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ধর্মের জন্মগ্রহণের দ্বারাই বাস্তব ব্রাহ্মণ হইতে পারে, এই নিত্যস্ব স্বভাববিরুদ্ধ মিথ্যার বোকা আমাদের সমাজ চোখ বুজিয়া বহন করিয়া আসাতেই তাহার ধর্ম প্রাণহীন ও প্রথাগত অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণকে সমাজ ভক্তি করিতে বাধ্য হইয়াছে সে ব্রাহ্মণ চরিত্রে ও ব্যবহারে ভক্তিভাজন হইবার জন্ত নিজেকে বাধ্য মনে করে না; সে কেবলমাত্র পৈতাম্য লাগামের দ্বারা সমাজকে চালনা করিয়া তাহাকে নানা দিকে কিরূপ হীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে, তাহা অভ্যাসের অন্ধতা-বশতই আমরা বুঝিতে পারি না। এখানে প্রত্যেক পাত্রিই যে অকৃত্রিম নিষ্ঠার সহিত খৃস্টানধর্মের আদর্শ নিজের জীবনে গ্রহণ করিয়াছে এ কথা আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু ইহারা বংশগত পাত্রি নহে, সমাজের কাছে ইহাদের জবাবদিহি আছে, নিজের চরিত্রকে আচরণকে ইহারা কলুষিত করিতে পারে না—হুতরাং আর-কিছুই না হোক, সেই নির্মল চরিত্রের, সেই ধর্ম নৈতিক সাধনার স্মৃতিকে যথাসাধ্য দেশের কাছে ইহারা ধরিয়া রাখিয়াছে। পাশ্বে যাহাই বলুক, ব্যবহারতঃ

অধারিক ক্রান্তিকে দিয়া ধর্মকর্ম করাইতে আমাদের সমাজের কিছুমাত্র লজ্জা সংকট নাই। ইহাতে ধর্মের সঙ্গে পুণ্যের আন্তরিক বিচ্ছেদ না ঘটিয়া থাকিতে পারে না— ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বকে আমরা প্রত্যহ অবমানিত করিতেছি। এখানে অধারিক পাত্রিকে সমাজ কখনোই কমা করিবে না; সে পাত্রি হয়তো ভক্তিমান না হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে চরিত্রবান হইতেই হইবে—এই উপায়েই সমাজ নিজের মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান রক্ষা করিতেছে এবং নিঃসন্দেহই চরিত্রসম্পাদে তাহার পুরস্কার লাভ করিতেছে।

ভাই বলিতেছিলাম, এখানকার পাত্রির দল সমস্ত দেশের জন্য একটা ধর্ম নৈতিক মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু, সেইটুকুতেই তো সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নহে। সমস্ত দেশের সামনে কণে কণে যে বড়ো বড়ো ধর্মসম্রাট উপস্থিত হয় খৃষ্টের বাণীর সঙ্গে সুর মিলাইয়া পাত্রিরা তো তাহার সীমাংসা করেন না। দেশের চিত্তের মধ্যে খৃষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবার যে ভার তাঁহারা লইয়াছেন, এইখানে পদে পদে তাহার ব্যত্যয় দেখিতে পাই। যখন বোয়ার-যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তখন সমস্ত দেশের পাত্রিরা তাহার বিরূপ বিচার করিয়াছিলেন। এই-যে পারশ্বকে ছুই টুকরা করিয়া কুটিয়া ফেলিবার জন্য যুরোপের ছুই মোটা মোটা গৃহিণী ষটি পাত্রিরা বসিয়াছেন—পাত্রিরা চূপ করিয়া আছেন কেন। ভারতবর্ষে কুলিসংগ্রহ ব্যাপারে, কুলি খাটাইবার ব্যবস্থার, সেখানকার শাসনতন্ত্রে, সেখানে দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে এমন কি কোনো অবিচার ঘটে না বাহাতে খৃষ্টের নাম লইয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া দুর্বল অপমানিতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারেন। তেমন স্বর্গীয় দৃষ্ট কি আমরা দেখিয়াছি। ইংরেজিতে ‘পরসার বেলায় পাকা টাকার বেলায় বোকা’ বলিয়া একটা চলতি কথা আছে, বড়ো বড়ো খৃষ্টানদেশের ধর্মনৈতিক আচরণে আমরা তাহার পরিচয় প্রতিদিন পাইতেছি; তাঁহারা ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শকে আঁট করিয়া রাখিতে চান অথচ সমস্ত জাতি বাহুবল হইয়া এমন-সকল প্রকাণ্ড পাপাচরণে নির্লজ্জভাবে প্রবৃত্ত হইতেছেন বাহাতে হৃদয়ব্যাপী দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া ছবিবহু দুঃখদুর্গতির সৃষ্টি করিতেছে; এমন দুর্দিনে অনেক মহাত্মাকে স্বজাতির এই সর্বজনীন সমতানির বিরুদ্ধে নির্ভয়ে লড়িতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পাত্রি কমজন। এমন-কি, গণনা করিলে দেখা যাইবে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রচলিত খৃষ্টানধর্মে আস্থাবান নহেন। অথচ চার্চের চিরপ্রথা-সম্বন্ধে কোনো বাহু পূজাবিধিতে সামান্য একটু নড়চড় ঘটাইলে সমস্ত পাত্রিসমাজে বিবর হনুসুল পড়িয়া যায়। এইজন্যই কি দিও তাঁহার রক্ত দিয়াছিলেন। অগভীর সমুদ্রে ইহা কোন্ হুসয়ারীর প্রচার করিতেছে। খৃষ্টানদেশের

পাথির দল স্বজাতির ধর্ম-তহবিলের সিকিণয়সা আধনয়সা আগলাইয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু বড়ো বড়ো 'কোম্পানির কাগজ' ফুঁকিয়া দিবার বেলায় তাঁহাদের হাঁশ নাই। তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাকে কড়ির মূল্যে সম্মান করেন ও মোহরের মূল্যে অপমানিত করিয়া থাকেন, ইহাই প্রতিদিন দেখিতেছি। পাথিদের মধ্যে এমন মহদাশয় আছেন যাহারা অকৃত্রিম বিশ্ববদ্ধ, কিন্তু সে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বাহাদুর্য্য। কিন্তু, দলের দিকে তাকাইলে এই কথা মনে আসে যে, ধর্মকে দলের হাতে সমর্পণ করিলে তাহাকে খানিকটা পরিমাণে দলিত করা হয়ই। ইহাতেও একপ্রকার জাত তৈরি করা হয়, তাহা বংশগত জাতের চেয়ে অনেক বিষয়ে ভালো হইলেও তাহাতে জাতের বিষ খানিকটা থাকিয়া যায় ও তাহা জমিয়া উঠিতে থাকে। ধর্ম মানুষকে মুক্তি দেয়, এইজন্য ধর্মকে সকলের চেয়ে মুক্ত রাখা চাই; কিন্তু, ধর্ম যেখানে দলের বেড়ায় আটকা পড়ে সেখানেই জন্ম তাহার ছোটো দিকটাই বড়ো দিকের চেয়ে বড়ো হইয়া উঠে, বাহিরের জিনিস অন্তরের জিনিসকে আচ্ছন্ন করে ও বাহ্য সাময়িক তাহা নিত্যকে পীড়া দিতে থাকে। এইজন্যই সমস্ত দেশ জুড়িয়া পাথির দল বসিয়া থাকা সত্ত্বেও নিদাক্ষণ দৃশ্যবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করিতে রাষ্ট্রনৈতিক অধিনায়কদের লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না; তাঁহাদের সেই পুণ্যজ্যোতি নাই যাহার সম্মুখে এই-সকল বিরাট পাপের কলঙ্কালিয়া সর্বসমক্ষে বীভৎসরূপে উদ্ঘাটিত হয়।

সংগীত

আমরা গ্রীষ্ম-ঋতুর অবসানের দিকে এ দেশে আসিয়া পৌছিরাছি, এখন এখানে সংগীতের আসর ভাঙিবার মুখে। কোনো বড়ো ওস্তাদের গান বা বাজনার রৈঠক এখন আর নাই। এখানকার নিকুঞ্জে গ্রীষ্মকালে পাখিরা নানা সমুদ্র পায় হইয়া আসে, আবার তাহারা সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়। মানুষের সংগীতও এখানে সকল ঋতুতে বাজে না; তাহার বিশেষ কাল আছে, সেই সময়ে পৃথিবীর নানা ওস্তাদ নানা দিক হইতে আসিয়া এখানে সংগীতসরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

আমাদের দেশেও একদিন এইরূপ গীতবাত্তের পরব ছিল। পূজাপার্বণের সময় বড়ো বড়ো ধনীদের বাড়িতে নানা দেশের সঙ্গীতীরা আসিয়া জুটিত। সেই-সকল সংগীতসভার দেশের সাধারণ লোকের প্রবেশ অস্বাধিক ছিল। তখন লক্ষী সরস্বতী একত্র মিলিতেন এবং সংগীতের বসন্তসরোবর সমস্ত দেশের স্বরদের উপর দিয়া প্রবাহিত

হইত। সকল দেশেই একদিন বুনিয়াদি ধনীরাই দেশের শিল্প সাহিত্য সংগীতকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে। যুরোপে এখন গণসাধারণ সেই বুনিয়াদি বংশের স্থান অধিকার করিয়াছে; আমাদের দেশে বারোয়ারি-দ্বারা যেটা ঘটিয়া থাকে সেইটে যুরোপের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বারোয়ারিই এখানে ওস্তাদ আনাইয়া গান শোনে; বারোয়ারির কুপাতেই নিরস কবির দৈন্ত মোচন হয়, এবং চিত্রকর ছবি আঁকিয়া লক্ষীর প্রসাদ লাভ করে। কিন্তু, আমাদের দেশে বর্তমান কালে ধনীদেব ধনের কোনো দায়িত্ব নাই; সে ধনের দ্বারা কেবল ল্যাক্সারিস অস্কার হামিলটন হার্মান এবং মাকিন্টশ-বাবু কোম্পানিরই মুনফা বৃদ্ধি হইয়া থাকে; এ দিকে গণসাধারণেরও না আছে শক্তি, না আছে রুচি। আমাদের দেশে কলাবধুকে লক্ষীও ভ্যাগ করিয়াছেন, গণেশের ঘরেও এখনও তাঁহার স্থান হয় নাই।

আমার ভাগ্যক্রমে এবারে আমি লওনে আগার কয়েক সপ্তাহ পরেই ক্রিস্টল-প্যালাসের গীতশালায় হ্যাণ্ডেল-উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ সংগীতরচয়িতা হ্যাণ্ডেল জর্মান ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডেই তিনি অধিকাংশ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। বাইবেলের কোনো কোনো অংশ ইনি সুরে বসাইয়াছিলেন, সেগুলি এ দেশে বিশেষ আদর পাইয়াছে। এই গীতগুলিই বহুশত বহুযোগে বহুশত কণ্ঠে মিলিয়া হ্যাণ্ডেল-উৎসবে গাওয়া হইয়া থাকে। চারি হাজার স্ত্রী ও গায়কে মিলিয়া এবারকার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই উৎসবে আমি উপস্থিত ছিলাম। বিরাট সভাপ্রহের গ্যালারিতে স্তরে স্তরে গায়ক ও বাদক বসিয়া গিয়াছে। এত বৃহৎ ব্যাপার যে ছবিনের সাহায্য ব্যতীত স্পষ্ট করিয়া কাহাকে দেখা যায় না, মনে হয় যেন পুঞ্জ পুঞ্জ মানুষের মেঘ করিয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষ গায়কেরা উদার মূদার ও তার সুরের কণ্ঠ অল্পসারে ভিন্ন ভিন্ন স্রোতে বসিয়াছে। একই রঙের একই রকমের কাপড়; সবস্বচ্ছ মনে হয়, প্রকাণ্ড একটা পটের উপর কে যেন লাইনে লাইনে পশমের বুনিয়াদ করিয়া গিয়াছে।

চার হাজার কণ্ঠ ও যন্ত্রে সংগীত জাগিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে একটি সুর পথ ভুলিল না। চার হাজার সুরের ধারা নৃত্য করিতে করিতে একসঙ্গে বাহির হইল, তাহারা কেহ কাহাকেও আঘাত করিল না। অথচ সমতান নহে, বিচিত্র তানের বিপুল সম্মিলন। এই বহুবিচিত্রকে এমনভাবে অনিন্দনীয় সুসম্পূর্ণতার এক করিয়া তুলিবার মধ্যে যে একটা বৃহৎ শক্তি আছে, আমি তাহাই অস্বস্তব করিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম। এত বড়ো বৃহৎ ক্ষেত্রে অন্তরে বাহিরে এই জাগ্রত শক্তির কোথাও কিছুমাত্র উদাস নাই, ভয় নাই। আসন বসন হইতে আরম্ভ করিয়া গীতকলার

পারিপাট্য পৰ্যন্ত সৰ্বত্র তাহার অযোয বিধান প্রত্যেক অংশটিকে সমগ্র সম্বন্ধে মিলাইয়া নিরন্তরিত করিতেছে।

যাথে যাথে ছাপানো প্রোগ্রাম খুলিয়া গানের কথা সম্বন্ধে মিলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু, মিল যে দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এতবড়ো একটা একাও ব্যাপার গড়িয়া তুলিলে সেটা যে একটা স্বল্পের জিনিস হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাহিরের আয়তন বৃহৎ বিচিত্র ও নির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভাবের রসটি চাপা পড়িয়াছে। আমার মনে হইল, বৃহৎ বাহবন্ধ সৈন্তদল ঘেমন করিয়া চলে এই সংগীতের গতি সেইরূপ ; ইহাতে শক্তি আছে, কিন্তু লীলা নাই।

কিন্তু, তাই বলিয়া সমস্ত যুরোপীয় সংগীত পদার্থটাই যে এই শ্রেণীর, তাহা বলিলে সত্য বলা হইবে না। অর্থাৎ, যুরোপীয় সংগীতে আকারের নৈপুণ্যই প্রধান, ভাবের রস প্রধান নহে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, সংগীতের রসস্থায় যুরোপকে কিরূপ মাতাইয়া তোলে। ফুলের প্রতি যোমাছির আগ্রহ দেখিলেই বুঝা যাইবে ফুলে যথু আছে, সে যথু আমার গোচর না হইতেও পারে।

যুরোপের সম্বন্ধে আমাদের দেশের সংগীতের এক জারগার মূলতঃ প্রভেদ আছে, সে কথা সত্য। হার্মনি বা স্বরসংগতি যুরোপীয় সংগীতের প্রধান বন্ধ, আর রাগরাগিণীই আমাদের সংগীতের মুখ্য অবলম্বন। যুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্বসংগীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্রের তান সহস্রধারায় উজ্জ্বলিত হইতেছে, একটি আর-একটির প্রতিধ্বনি নহে, প্রত্যেকেরই নিজের বিশেষত্ব আছে অথচ সমস্তই এক হইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি, জগতের সেই বহু রূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে স্বর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু, নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান চলিতেছে ; সেই গানের তানলয়টিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিককে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের সংগীত সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন, সেই এক—বাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, বাহা আকাশে শুদ্ধ হইয়া আছে। চিরধাবমান বিচিত্রের সম্বন্ধে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলা, ইহাই যুরোপীয় প্রকৃতি ; আর চিরনিশ্চল একের দিকে কান পাতিয়া, মন রাখিয়া, আপনাকে শাস্ত করা, ইহাই আমাদের স্বভাব।

আমাদের দেশের সংগীতে কি ইহাই আমরা অনুভব করি না। যুরোপের সংগীতে দেখিতে পাই, বাহুর সমস্ত চেউ-খেলার সম্বন্ধে তাহার তাল-মানের যোগ আছে,

মাসুকের হাসিকান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সঙ্গ । আমাদের সংগীত মাসুকের জীবন-
লীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে । যুরোপের সংগীতে
মাসুকের আগনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের ঝাড়ে লগ্ননে বিচিত্র করিয়া
জ্বলাইয়াছে ; আমাদের সংগীতে দিগন্ত হইতে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে ।
সেইজন্য বারবার ইহা অমুভব করিয়াছি, আমাদের সংগীত আমাদের সুখদুঃখকে
অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায় । আমাদের বিবাহের রাতে রশ্মনচৌকিতে সাহানা
বাজে । কিন্তু, সেই সাহানার তানের মধ্যে প্রমোদের ঢেউ খেলে কোথায় । তাহার
মধ্যে যৌবনের চাকল্য কিছুমাত্র নাই, তাহা গভীর, তাহার মিড়ের ডাঁজে ডাঁজে
করণা । আমাদের দেশে আধুনিক বিবাহে সানাইয়ের সঙ্গে বিলাতি ব্যাণ্ড বাজানো
বড়োমাসুকের বর্বরতার একটা অঙ্গ । উভয়ের প্রভেদ একেবারে স্থম্পষ্ট । বিলাতি
ব্যাণ্ডের সুরে মাসুকের আমোদ-আহ্লাদের সমারোহ ধরনী কাঁপাইয়া তুলিতেছে ;
যেমন লোকজনের ভিড়, যেমন হাস্যলাপ, যেমন গাঙ্গসজ্জা, যেমন ফুলপাতা-আলোকের
ঘটা, ব্যাণ্ডের সুরের উচ্ছ্বাসও ঠিক তেমনি । কিন্তু, বিবাহের প্রমোদসভাকে চারি
দিকে বেষ্টিত করিয়া যে অন্ধকার রাত্রি নিস্তব্ধ হইয়া আছে, যেখানে লোকলোকান্তরের
অনন্ত উৎসব নীরব নক্ষত্রসভায় প্রশান্ত আলোকে দীপ্যমান, সাহানার সুর সেইখানকার
বাণী বহন করিয়া প্রবেশ করে । আমাদের সংগীত মাসুকের প্রমোদশালার সিংহদ্বারটা
ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে ।
আমাদের সংগীত একের গান, একলার গান— কিন্তু তাহা কোণের এক নহে, তাহা
বিশ্বব্যাপী এক ।

হার্মনি অতিমাত্র প্রবল হইলে গীতটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং গীত যেখানে
অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে চায় সেখানে হার্মনিকে কাছে আসিতে দেয় না । উভয়ের
মধ্যে এই বিচ্ছেদটা কিছুদিন পর্যন্ত ভালো । প্রত্যেকের পূর্ণপরিণত রূপটিকে পাইবার
জন্য কিছুকাল প্রত্যেকটিকে স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ দেওয়াই উচিত । কিন্তু, তাই বলিয়া
চিরকালই তাহাদের আইবুড় খাকাটাকে প্রেম বলিতে পারি না । বয় ও কন্ঠা যতদিন
যৌবনের পূর্ণতা না পায় ততদিন তাহাদের পৃথক হইয়া বাড়িতে দেওয়াই ভালো, কিন্তু
তার পরেও যদি তাহারা মিলিতে না পারে তবে তাহারা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে । গীত
ও হার্মনির যে মিলিবার দিন আসিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই । সেই মিলনের
আয়োজনও শুরু হইয়াছে ।

গ্রামে হুপ্তায় বিশেষ একদিন হাট বসে, বৎসরে বিশেষ একদিন মেলা হয় ।
সেইদিন পরম্পরের পণ্যবিনিময় করিয়া মাসুকের বাহার বাহা অভাব আছে তাহা

মিটাইয়া লয়। মানুষের ইতিহাসেও তেমনি এক-একটা যুগে হাটের দিন আসে ; সেদিন যে যার আপন আপন সামগ্রী বুঝিতে করিয়া আনিয়া পরের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে আসে। সেদিন মানুষ বুঝিতে পারে, একমাত্র নিজের উপর জিনিসে মানুষের দৈন্ত দূর হয় না ; বুঝিতে পারে, নিজের ঐশ্বৰ্যের একমাত্র সার্থকতা এই যে, তাহাতে পরের জিনিস পাইবার অধিকার জন্মে। এইরূপ যুগকে যুরোপের ইতিহাসে রেনেসাঁসের যুগ বলিয়া থাকে। পৃথিবীতে বর্তমান যুগে যে রেনেসাঁসের হাট বসিয়া গেছে এত বড়ো হাট ইহার আগে আর-কোনোদিন বসে নাই। তাহার প্রধান কারণ, আজ পৃথিবীতে চারি দিকের রাস্তা যেমন খোলসা হইয়াছে এমন আর-কোনোদিন ছিল না।

কিছুদিন পূর্বে একজন মনোবী আমাকে বলিয়াছিলেন, যুরোপে ভারতবর্ষীয় রেনেসাঁসের একটা কাল আসন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ভাণ্ডারে যে সম্পদ সঞ্চিত আছে হঠাৎ তাহা যুরোপের নজরে পড়িতেছে এবং যুরোপ অশ্রুভব করিতেছে, সেগুলিতে তাহার প্রয়োজন আছে। এতদিন ভারতবর্ষের চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য যুরোপের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিল ; এখন তাহার বিশেষ একটি মহিমা যুরোপ দেখিতে পাইয়াছে।

অতি অল্পকাল হইল ভারতবর্ষীয় সংগীতের উপরও যুরোপের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমি ভারতবর্ষে থাকিতেই দেখিয়াছি, যুরোপীয় শ্রোতা তন্ময় হইয়া স্বরবাহারে বাগেলী রাগিনীর আলাপ শুনিতেছেন। একদিন দেখিলাম, একজন ইংরেজ শ্রোতা একটি সভায় বসিয়া দুইজন বাঙালি যুবকের নিকট সামবেদের গান শুনিতেছেন। গায়ক দুইজন বেদমন্ত্রে ইমনকল্যাণ ভৈরবী প্রভৃতি বৈঠকি স্বর বোগ করিয়া তাঁহাকে সামগান বলিয়া শুনাইতেছেন। তাঁহাকে আমার বলিতে হইল, এ জিনিসটাকে সামগান বলিয়া গ্রহণ করা চলিবে না। দেখিলাম, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত বাহুল্য ; কারণ, তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। আমাকে তিনি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে বলিলে আমি অল্প যেটুকু জানি সেই অল্পসারে আবৃত্তি করিলাম। তখনি তিনি বলিলেন, এ তো বহুবর্ষেদের আবৃত্তির প্রণালী। বস্তুত আমি বহুবর্ষেদের মতই আবৃত্তি করিয়াছিলাম। বেদগান হইতে আরম্ভ করিয়া ঋগ-যজুর্-সাম-রাগ যান লয় তিনি তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছেন— তাঁহাকে সহজে কঁাকি দিবার জো নাই। ইনি ভারতবর্ষীয় সংগীত সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন।

ক্রীমতী মড মেকার্থির লেখা মডার্ন-রিভিউ পত্রিকার মাঝে মাঝে বাহির হইয়াছে। শিশুকাল হইতেই সংগীতে ইহার অসামান্য প্রতিভা। নব বৎসর বয়স হইতেই ইনি প্রকান্ত সভায় বেহালা বাজাইয়া শ্রোতাদিগকে বিম্বিত করিয়াছেন। স্তূর্তাগ্যক্রমে

ইহার হাতে স্রাব্ধটিত পীড়া হওয়াতে ইহার বাজনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইনি ভারতবর্ষে থাকিয়া কিছুকাল বিশেষভাবে দক্ষিণভারতের সংগীত আলোচনা করিয়াছেন; ইনিও সে সময়ে বই লিখিতে প্রবৃত্ত আছেন।

একদিন ডাক্তার কুমারস্বামীর এক নিমন্ত্রণপত্রে পড়িলাম, তিনি আমাকে রতন দেবীর গান শুনাইবেন। রতন দেবী কে বুঝিতে পারিলাম না; ডাবিলাম কোনো ভারতবর্ষীয় মহিলা হইবেন। দেখিলাম তিনি ইংরেজ মেয়ে, যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়াছি সেইখানকার তিনি গৃহস্থামিনী।

মেজের উপর বসিয়া কোলে ডব্বরা লইয়া তিনি গান ধরিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। এ তো ‘হিলিহিলি পনিয়া’ নহে; রীতিমত আলাপ করিয়া তিনি কানাড়া মালকোষ বেহাগ গান করিলেন। তাহাতে সমস্ত হুহুহ মিড় এবং তান লাগাইলেন, হাতের ইঙ্গিতে তাল দিতে লাগিলেন; বিলাতি সম্ভারজনী বুলাইয়া আমাদের সংগীত হইতে তাহার ভারতবর্ষীয় বারো-আনা পরিমাণ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিলেন না। আমাদের ওস্তাদের সঙ্গে প্রভেদ এই যে ইহার কণ্ঠস্বরে কোথাও যেন কোনো বাধা নাই; শরীরের মুদ্রা বা গলার স্বরে কোনো কষ্টকর প্রয়াসের লক্ষণ দেখা গেল না। গানের মূর্তি একেবারে অক্ষুণ্ণ অক্লান্ত হইয়া দেখা দিতে লাগিল।

এ দেশে এই যাহারা ভারতবর্ষীয় সংগীতের আলোচনার প্রবৃত্ত আছেন, ইহারা যে কেবলমাত্র কোতূহল চরিতার্থ করিতেছেন তাহা নহে; ইহারা ইহার মধ্যে একটা অপূর্ব সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছেন—সেই রসটিকে গ্রহণ করিবার জন্য, এমন-কি, সম্ভবমত আপনাদের সংগীতের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য ইহারা উৎসুক হইয়াছেন। ইহাদের সংখ্যা এখনো নিতান্তই অল্প সম্ভেদ নাই, কিন্তু আগুন একটা কোণেও যদি লাগে তবে আপনার তেজে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে।

এখানকার লগুন একাডেমি অফ ম্যাজিকের অধ্যক্ষ ডাক্তার ইয়র্কট্টারের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষীয় সংগীতের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। যাহাতে লগুনে এই সংগীত আলোচনার একটা উপায় ঘটে সেজন্য আমার নিকট তিনি বারবার উৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কোনো ভারতবর্ষীয় ধনী রাজা কোনো বড়ো ওস্তাদ বীণাবাদককে এখানে কিছুকাল রাখিতে পারেন তাহা হইলে, তাঁহার মতে, বিস্তর উপকার হইতে পারে।

উপকার আমাদেরই সবচেয়ে বেশি। কেননা, আমাদের শিল্পসংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার যোগ নিতান্তই কীণ হইয়া আসিয়াছে। নদীতে যখন ডাটা পড়ে তখন কেবল পাক বাহির হইয়া পড়িতে

থাকে ; আমাদের সংগীতের স্রোতধিনীতে জোয়ার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমরা আজকাল তাহার তলদেশের পঙ্কিলতার মধ্যে লুটাইতেছি। তাহাতে স্রোতের উল্টা কান্ন হয়। আমাদের ঘরে ঘরে গ্রামোফোনে যে-সকল সুর বাজিতেছে, থিয়েটার হইতে যে-সকল গান শিখিতেছি, তাহা শুনিতেই বুঝিতে পারি, আমাদের চিত্তের দারিদ্র্যে কদম্বতা যে কেবল প্রকাশমান হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে, সেই কদম্বতাকেই আমরা অজ্ঞের ভ্রমণ বলিয়া ধারণ করিতেছি। সস্তা খেলো জিনিসকে কেহ একেবারে পৃথিবী হইতে বিদায় করিতে পারে না ; একদল লোক সকল সমাজেই আছে, তাহাদের সংগতি তাহার উর্ধ্বে উঠিতে পারে না— কিন্তু, যখন সেই-সকল লোকেই দেশ ছাইয়া ফেলে তখনই সন্ন্যস্তী সস্তা দ্রব্যের কলের পুতুল হইয়া পড়েন। তখন আমাদের সাধনা হীনবল হয় এবং সিদ্ধিও ভ্রমরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং এখন গ্রামোফোন ও কম্পর্ট-পার্টির আগাছায় দেশ দেখিতে দেখিতে ছাইয়া যাইবে ; যে সোনার কসলের চাম দরকার সে কসল দ্বারা যাইতেছে।

একদিন আমাকে ডাক্তার কুমারস্বামী বলিয়াছিলেন, ‘হয়তো এমন সময় আসিবে যখন তোমাদের সংগীতের পরিচয় লইতে তোমাদিগকে যুরোপে যাইতে হইবে।’ আমাদের দেশের অনেক জিনিসকেই যুরোপের হাত হইতে পাইবার জন্য আমরা হাত পাতিয়া বসিয়াছি। আমাদের সংগীতকেও একবার সমুদ্রপার করিয়া তাহার পরে যখন তাহাকে ফিরিয়া পাইব তখনই হয়তো ভালো করিয়া পাইব। আমরা বহুকাল ঘরের কোণে কাটাইয়াছি, এইজন্য কোনো জিনিসের বাজারদর জানি না ; নিজের জিনিসকে বাচাই করিয়া লইব, কোন্‌খানে আমাদের গৌরব তাহা নিশ্চিত করিয়া বুঝিব, সে শক্তি আমাদের নাই।

যেখানে মানুষের সকল চেষ্টাই প্রচুর প্রাণশক্তি হইতে নিবৃত্ত নানা আকারে উৎসারিত হইতেছে, যেখানে মানুষের সমস্ত সম্পদ জীবনের বৃহৎ কারবারে খাটিতেছে এবং মুনফায় বাড়িয়া চলিয়াছে, সেইখানে আপনাদের সামগ্রীকে না আনিলে, সেই চলতি কারবারের সঙ্গে যোগ দিতে না পারিলে, আমরা আপনার পরিচয় পাইতে পারিব না ; সুতরাং আমাদের অনেক শক্তি কেবল নষ্ট হইতে থাকিবে। পাছে যুরোপের সংসর্গে আমরা আপনাকে বিস্মৃত হই, এই ভয়ের কথাই আমরা শুনিয়া আসিতেছি ; কিন্তু তাহা সত্য নহে, তাহার উল্টা কথাই সত্য। এই প্রবল সজীব শক্তির প্রথম সংঘাতে কিছুকালের জন্য আমরা দিশা হারাইয়া থাকি, কিন্তু শেষকালে আমরা নিজের প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া পাই। যুরোপের প্রাণবান সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের প্রাণকে আগাইয়াছে। তাহা বতাই বলবান হইয়া উঠিতেছে

ভতই-অনুকরণের হাত এড়াইয়া আমাদেরকে আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমাদের শিল্পকলার সম্প্রতি যে উদ্‌বোধন দেখা বাইতেছে তাহার মূলেও যুরোপের প্রাণশক্তির আঘাত রহিয়াছে। আমার বিশ্বাস, সংগীতেও আমাদের সেই বাহিরের সংস্রব প্রয়োজন হইয়াছে। তাহাকে প্রাচীন দস্তরের লোহার সিঁদুক হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বের হাতে ভাড়াইতে হইবে। যুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে ভালো করিয়া পরিচয় হইলে তবেই আমাদের সংগীতকে আমরা সত্য করিয়া, বড়ো করিয়া, ব্যবহার করিতে শিখিব। ক্রোধের বিষয়, সংগীত আমাদের শিক্ষিত লোকের শিক্ষার অভ্য নহে; আমাদের কলেজ-নামক কেরানিগিরির কারখানাঘরে শিল্পসংগীতের কোনো স্থান নাই, এবং আশ্চর্যের কথা এই যে, যে-সকল বিদ্যালয়কে আমরা স্মারকশাল নাম দিয়া স্থাপন করিয়াছি সেখানেও কলাবিদ্যার কোনো আসন পাতা হইল না। মানুষের সামাজিক জীবনে ইহার প্রয়োজন যে কত বড়ো, নোট মুদ্রা করিতে করিতে, ভিগ্রি নিতে নিতে, সেই বোধটুকু পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ হারাইয়া বসিয়াছি। এইজন্য সংগীত আজ পর্যন্ত সেই-সকল অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই বন্ধ যাহাদের সম্মুখে বিশ্বের প্রকাশ নাই; যাহারা অক্ষয় স্ত্রীলোকের মতো নিজের সমস্ত ধনকে গহনা গড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কেবল বহন করিতেই পারে, সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে না; এমন-কি, ব্যবহারের কথার আভাস দিলেই তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠে— মনে করে, ইহা তাহাদের সর্বস্ব খোঁওয়াইবার পক্ষ।

অতএব, আমাদের ধন যখন আমরা ভালো করিয়া ব্যবহার করিতে পারিলাম না তখন যাহারা পারে তাহারা একদিন ইহাকে নিজের ব্যবসারে খাটাইবে, ইহাকে বিশ্বের কাজে লাগাইবার পথে আনিবে। আমাদেরকে সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পরে গর্ব করিব, আমাদের বাহা আছে অগস্ত্য এমন আর কাহারও নাই; সেই গর্ব করিবার উপকরণও অন্য লোককে জোগাইয়া দিতে হইবে।

সমাজভেদ

আমরা যখন বিলাতে যাত্রা করি তখন সেটা কেবল দেশ হইতে দেশান্তরে যাওয়া নয়, আমাদের পক্ষে সেটা একটা নূতন সংসারে প্রবেশ করা। জীবনযাত্রার বাহ্য প্রভেদগুলোতে বড়ো-একটা-কিছু আসে-যায় না। আমাদের সঙ্গে বসনে-ভূষণে আহায়ে-বিহারে বিদেশীয় সাদৃশ্য থাকিবে না, সেটা তো ধরা কথা, স্বভাবঃ সেখানে বিশেষ বাধে

না। কিন্তু, কেবল জীবনযাত্রার নহে, জীবনতত্ত্বে একটা জায়গায় আমাদের গভীরতর অধিল আছে, সেইখানেই দিকনির্ণয় করা হঠাৎ আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে।

জাহাজে উঠিয়াই আমরা প্রথম সেটা অনুভব করিতে শুরু করি। বুঝিতে পারি, এখন হইতে আমাদের আর-এক সংসারের নিয়মে চলিতে হইবে। হঠাৎ এতখানি পরিবর্তন যাহুকের পক্ষে অপ্রিয়— এইজন্যই আমরা সেটাকে ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করি না, কোনোমতে মানিয়া চলি কিবা যেন যেন বিরক্ত হইয়া বলি, ইহাদের চাল-চলনটা অত্যন্ত বেশি কৃত্রিম।

আসল কথা, ইহাদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক ব্যবহার যে প্রভেদ আছে সেইটেই গুরুতর। পরিবার এবং পল্লীমণ্ডলীর সীমার আসিয়া আমাদের সমাজ ধামিয়াছে। সেই সীমার মধ্যেই পরম্পরের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বাধা নিয়ম আছে। সেই সীমার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমাদের কী করিতে আছে এবং কী করিতে নাই তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই নিয়মগুলির মধ্যে অনেক কৃত্রিমতাও আছে, অনেক স্বাভাবিকতাও আছে।

কিন্তু, যে সমাজের প্রতি লক্ষ করিয়া এই নিয়মগুলি তৈরি হইয়াছে সেই সমাজের পরিধি বড়ো নহে এবং সে সমাজ আত্মীয়সমাজ। সুতরাং আমাদের আবশ্যকীয়তাগুলি ঘোরো রকমের। বাবার সামনে ভাবাক ধাইতে নাই, গুরুঠাকুরের পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দেওয়া কর্তব্য, ভাস্করকে দেখিলে যুধ আবৃত করা চাই এবং মাঝাঝুকের নিকটসংস্রব বর্জনীয়। এই পরিবার বা পল্লীমণ্ডলীর বাহিরে যে নিয়মের ধারা চলিয়াছে তাহা ঘোড়ের উপর বর্ণভেদমূলক।

বলিতে গেলে বর্ণাশ্রমের পূজ্য আমাদের পল্লীসমাজ ও পরিবারমণ্ডলীকে হারের মতো গাঁথিয়া তুলিয়াছে। আমরা একটা সমাজগোষ্ঠিতে আসিয়াছি। ভারতবর্ষ তাহার সমাজে সমস্তার একটা সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া বসিয়াছে এবং যেন করিয়াছে, এই ব্যবস্থাকে চিরকালের মতো পাকা করিয়া রাখিতে পারিলেই তাহার আর-কোনো ভাবনা নাই। এইজন্য বর্ণাশ্রমপূজ্যের দ্বারা পরিবার-সমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার বিধানকে সকল দিক হইতে দৃঢ় করিবার দিকেই আধুনিক ভারতবর্ষের সমস্ত চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে যে সমস্যা ছিল ভারতবর্ষ তাহার একটা-কোনো সমাধানে আসিয়া পৌছিতে পারিয়াছিল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বিচিত্র আভির বিরোধকে সে এক রকম করিয়া মিটাইয়াছে, বিচিত্র শ্রেণীর বিরোধকে সে এক রকম করিয়া ঠাণ্ডা করিয়াছে; বুদ্ধিভেদের দ্বারা ভারতবর্ষে প্রতিযোগিতার দাবীকে নিবৃত্ত

করিয়াছে এবং ধন ও কমতার পার্থক্য যে অভিমানকে সৃষ্টি করে আভিভেদের বেড়ার দ্বারা তাহার সংঘাতকে সে ঠেকাইয়াছে। এক দিকে যদিও ভারতবর্ষ সমাজের নেতা ব্রাহ্মণদের সহিত অন্ত বর্ণের স্বাতন্ত্র্যকে সর্বপ্রকার উপায়ে অভ্যভেদী করিয়া তুলিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি সমস্ত সুখসুবিধা-শিক্ষাদীক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য নানাবিধ ছোটোবড়ো প্রণালী বিস্তারিত করিয়া দিয়াছে। এইজন্য ভারতবর্ষে ধনী দ্বারা ভোগ করে নানা উপলক্ষ্যে সর্বসাধারণে তাহার অংশ পায় এবং জনসাধারণকে আশ্রয় দিয়া ও পরিতুষ্ট করিয়াই কমতানালীর কমতা খ্যাতিলাভ করে। আমাদের দেশে ধনী-দরিদ্রের প্রচণ্ড সংঘাতের কোনো কারণ নাই, এবং অক্ষমকে আইনের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিবারও বিশেষ প্রয়োজন ঘটে নাই।

পাশ্চাত্যসমাজ পারিবারিক সমাজ নহে; তাহা জনসমাজ, তাহা আমাদের সমাজের চেয়ে ব্যাপ্ত। ঘরের মধ্যে ততটা পরিমাণে সে নাই ততটা পরিমাণে সে বাহিরে আছে। আমাদের দেশে পরিবার বলিতে যে জিনিস বোঝায় তাহা যুরোপে বাঁধে নাই বলিয়াই যুরোপের মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এই ছড়াইয়া-পড়া সমাজের স্বভাবই এই— এক দিকে তাহার বাঁধন যেমন আলগা আর-এক দিকে তাহা তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ় হইয়া পড়ে। তাহা গন্তরচনার মতো। পশ্চ ছন্দের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়া চলে বলিয়া তাহার বাঁধনটি সহজ; কিন্তু গন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এইজন্যই এক দিকে সে স্বাধীন বটে আর-এক দিকে তাহার পদক্ষেপ যুক্তির দ্বারা, চিন্তাবিকাশের বিচিত্র নিয়মের দ্বারা, বড়ো করিয়া বাঁধা।

ইংরেজি সমাজ বিস্তৃত ক্ষেত্রে আছে বলিয়া এবং তাহার সমস্ত কারবারকে বাহিরে প্রসারিত করিয়া ফাঁদিতে হইয়াছে বলিয়াই, নানা সামাজিক বিধানের দ্বারা তাহাকে সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিতে হইয়াছে। আটপৌরে কাপড় পরিবার সময় তাহার অঙ্গ। তাহাকে সাজিয়া থাকিতে হয়, কেননা সে আত্মীয়সমাজে নাই। আত্মীয়েরা কহা করে, সহ করে, কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে প্রশ্রয় প্রত্যাশা করা যায় না। প্রত্যেককে প্রত্যেক কাজে ঠিক সময়মত চলিতেই হয়, নহিলে পরস্পর পরস্পরের ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। রেলের লাইন যদি আমার একলার হয় অথবা আমার গুটিকয়েক ভাইবন্ধুর অধিকারে থাকে, তাহা হইলে যেমন খুশি গাড়ি চালাইতে পারি এবং পরস্পরের গাড়িকে ইচ্ছামত যেখানে-সেখানে যখন-তখন দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারি। কিন্তু, সাধারণের রেলের রাস্তায় যেখানে বিস্তর গাড়ির আনাগোনা সেখানে পাঁচ মিনিট সময়ের ব্যতিক্রম হইলেই নানা দিকে গোল বাধিয়া যায় এবং তাহা সহ্য করা শক্ত হয়। আমাদের অত্যন্ত ঘোরো সমাজ বলিয়াই অথবা সেই ঘোরো অত্যাশ

আমাদের যজ্ঞাগত বলিরাই, পরম্পরের সন্ধে আমাদের ব্যবহারে দেশকালের বন্ধন নিতান্তই আলগা— আমরা যথেষ্টা আমরা জুড়িয়া বসি, সময় নষ্ট করি, এবং ব্যবহারের বাধাবাধিকে আত্মীয়তার অভাব বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকি। ইংরেজি সমাজে ওইখানেই সব-প্রথমে আমাদের বাধে; সেখানে বাহ্য ব্যবহারে আপন ইচ্ছামত বাঁহা-তাঁহা করিয়া সকলের কাছ হইতে ক্রমা প্রত্যাশা করিবার অধিকার কাহারও নাই। গড়ে সকলের বাহাতে সুবিধা সেইটের অঙ্গুসরণ করিয়া ইহারা নানা বন্ধন স্বীকার করিয়াছে। ইহাদিগকে দেখাসাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণ-আয়ত্ত্ব বেষত্বা আদম্ব-অভ্যর্থনার নিয়ম পাকা করিয়া রাখিতে হইয়াছে। বাহা বস্ত্ত আত্মীয়সমাজ নহে সেখানে আত্মীয়সমাজের টিলা নিয়ম চালাইতে গেলেই সমস্ত অত্যন্ত বীভৎস হইয়া পড়ে এবং জীবনযাত্রা অসম্ভব হইয়া উঠে।

যুরোপের এই ব্যাপক সমাজ এখনও কোনো সমাধানের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে নাই। তাহা আচারে ব্যবহারে বাহিরের দিকে একটা বাধাবাধির মধ্যে আপনাকে সংবৃত্ত ও স্রীসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সমাজের ভিতরকার শক্তিগুলি এখনও আপনাদিগকে কোনো একটা ঐক্যাত্ম্যে বাধিয়া পরম্পরের সংঘাত সম্পূর্ণ বাঁচাইয়া চলিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। যুরোপ কেবলই পরীক্ষা পরিবর্তন এবং বিম্বের ভিতর দিয়া চলিতেছে। সেখানে স্ত্রীলোকের সঙ্গে পুরুষের, ধর্মসমাজের সঙ্গে কর্মসমাজের, রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির, কারবারী-দলের সঙ্গে যক্ষ্ম-দলের কেবলই ক্রম বাধিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের মতো তাহার বাহা হইবার তাহা হইয়া যায় নাই— এখনও তাহার আয়েশগিরি অগ্নি-উল্কারের জন্ত প্রস্তুত আছে।

কিন্তু, আমরাই সমস্ত সমস্তার সমাধান করিয়া, সমাজব্যবস্থা চিরকালের মতো পাকা করিয়া, যুতদেহের মতো সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি, এ কথা বলিলে চলিবে কেন। সময় উত্তীর্ণ হইলেও ব্যবস্থাকে কিছুদিনের মতো খাড়া রাখিতে পারি, কিন্তু অবস্থাকে তো সেইসঙ্গে বাধিয়া রাখিতে পারি না। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরা যুখায়ুধি হইয়া দাঁড়াইয়াছি, এখন ঘোরো সমাজ লইয়া আর আমাদের চলিতেই পারে না— ইহারা কেবলমাত্র বাপ দাদা খুঁড়া নহে, ইহারা বাহিরের লোক, ইহারা দেশ-বিদেশের বাহুধ; ইহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইলে সতর্ক ও সচেত হইতেই হইবে; অশ্রমবন্ধ হইয়া, চিলেচালা হইয়া যদি চলিতে বাই তবে একদিন অচল হইয়া উঠিবেই।

আমরা সনাতন প্রচার দোহাই দিয়া গর্ব করি, কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে যে, ভারতবর্ষের সমাজ ইতিহাসের মধ্য দিয়া উদ্ভূত হয় নাই। ভারতবর্ষকেও

অবস্থাতেই নব নব বিপ্লবের তাড়নার অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই—এবং ইতিহাসে তাহার চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু, তাহার চলা একেবারে শেষ হইয়াছে, এখন হইতে অনন্তকাল সে সনাতন হইয়া বলিয়া থাকিবে, এমন অক্লান্ত কথা মুখে উচ্চারণ করিতেও চাই না। এক-একটা বড়ো বড়ো বিপ্লবের পর সমাজের ক্রান্তি আসে ; সেই সময় সে বার বন্ধ করিয়া, আলো নিভাইয়া, ঘুমের আয়োজন করে। বৌদ্ধবিপ্লবের পর ভারতবর্ষ শক্ত নিয়মের হড়কার সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করিয়া একেবারে স্থির হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার ঘুম আসিয়াছিল। কিন্তু ইহাকে অনন্ত ঘুম বলিয়া গর্ব করিলে সেটা হান্তকর অথচ সঙ্কল্প হইয়া উঠিবে। ঘুম ভাঙলেই ভালো যতক্ষণ রাজি থাকে— বাহিরে যতক্ষণ লোকের ভিড় নাই, বড়ো বড়ো দোকান-বাজার যতক্ষণ বন্ধ। কিন্তু, সকালে যখন চারি দিকে হাঁকডাক পড়িয়া গেছে, তুমি চূপচাপ পড়িয়া থাকিলেও আর-কেহ যখন চূপ করিয়া নাই, তখন সনাতন দরজা আটে-ঘাটে বন্ধ করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ঠকিতে হইবে।

রাজিকালের বিধান সাদাসিধা ; তাহার আয়োজন স্বল্প ; তাহার প্রয়োজন সামান্য। এইজন্য সমস্ত ব্যবস্থা বেশ সহজেই সম্পূর্ণ করিয়া, নিরুদ্ধবিদ্র হইয়া চোখ বোজা করিয়া হয় ; তখন যেখানে যেটি রাধি সেখানে সেটি পড়িয়া থাকে, কারণ, নাড়া দিবার কেহ নাই। দিনের বেলাকার ব্যবস্থা তত সহজ নহে ; এবং তাহা ভোরের বেলা একবারের মতো সারিয়া ফেলিয়া তাহার পর সমস্ত দিনটা নিশ্চিন্ত হইয়া তাবাক ধাইতে থাকা চলে না। ঘাড়ের উপর কাজ আসিয়া পড়ে, নূতন নূতন চেষ্টা করিতেই হয়, এবং বাহিরের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজের জীবনযাত্রাকে বনাইতে না পারিলে খাওয়া-দাওয়া কাজকর্ম সমস্তেরই ব্যাঘাত ঘটিতে থাকে।

কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষ অত্যন্ত বাঁধা নিয়মের নিশ্চল ব্যবস্থার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাজিধাপন করিয়াছে। সেই অবস্থাটা পতীয় আরামের বলিয়াই সেটা যে চিরকালই আরামের হইবে তাহা নহে। আঘাত সবচেয়ে কঠিন বেদনাজনক যখন তাহা ঘুমন্ত শরীরের উপর আসিয়া পড়ে। দিনের বেলা সেই আঘাতের সময়। এইজন্য দিনে আগিয়া থাকাই সবচেয়ে আরামের।

ইচ্ছা করি আর না করি, সর্বদে আশ্রয় জড়াইয়া থাক আর না থাক, আমাদের জাগ্রত সময় আসিয়াছে। আমরা সমাজের ভিতর হইতে ও বাহির হইতে আঘাত পাইতেছি, দুঃখ পাইতেছি। আমরা দৈন্তে দুর্ভিক্ষে পীড়িত। সমাজব্যবস্থার ভাঙন ধরিয়াছে ; একায়বর্তী পরিবার খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতেছে ; এবং সমাজে জাগরণের পর ক্রমশই এমন খাটো হইয়া আসিতেছে যে, ‘স্বাধীনসমাজ’ প্রভৃতি সভা-

সমিতির সাহায্যে আশ্রয় চীংকারশব্দে আপনাকে খোঁষণা করিয়া আপনার দুর্বলতা সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। পরীক্ষামাজের পকারেস্ত-প্রথা গবর্নমেন্টের চাপরাশি গলার বাধিয়া আত্মহত্যা করিয়া কুত হইয়া পরীর বুকে চাপিতেছে; দেশের অগ্রে টোলের আর পেট ভরিতেছে না, হুভিকের দ্বারে একে একে তাহার সন্মুখি অঙ্গসজ্জার পরণাপন্ন হইতেছে; দেশের ধনী-মানীরা জয়স্থানের বাতি নিবাইয়া দিয়া কলিকাতার মোটরগাড়ি চড়িয়া কিরিতেছে; এবং বড়ো বড়ো কুলশীল আপনার বখাসবন্দ এবং কল্যাণকে লইয়া বি.এ.পাস-করা বরের পায়ে বুধা বাধা খুঁড়িয়া মরিতেছে। এই-সমস্ত দুর্লক্ষণের অন্ত কলিযুগকে বিদেশীরাজাকে বা স্বদেশী ইংরেজিনবিশকে গালি দিয়া কোনো ফল নাই। আসল কথা, আমাদের দিনের বেলাকার প্রকৃতি তাহার চাপরাশি পাঠাইয়াছেন; আমাদের সনাতন শরনাগার হইতে সে আমাদের টানিয়া বাহির না করিয়া ছাড়িবে না। জোর করিয়া চোখ বুজিয়া আমরা অকালে রাত্রি শ্রবণ করিতে পারিব না। যে পৃথিবী আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাকে আমাদের ঘরে আহ্বান করিয়া আনিতেই হইবে; যদি আদর করিয়া তাহাকে না আনি তবে সে আমাদের দ্বার ভাঙিয়া প্রবেশ করিবে। দ্বার কি এখনি ভাঙে নাই।

অতএব, আবার একবার আমাদের নতুন করিয়া সমস্তসম্বন্ধের অন্ত ভাবিতে হইবে। যুরোপের নকল করিয়া সে কাজ চলিবে না; কিন্তু, যুরোপের কাছ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা করা এবং নকল করা একই কথা নহে। বস্ত্ত, ঠিকভাবে শিক্ষা করিলেই নকল করার ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অন্তকে সত্যরূপে না জানিলে নিজেকে কখনোই সত্যরূপে জানা যায় না।

কিন্তু, বাহ্য বলিতেছিলাম সে কথাটা এই যে, আমাদের ঘোরো চিলাচালা অভ্যাস লইয়া যুরোপীয় সমাজে আমাদের অভ্যাস বাধে। কোনোমতেই প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারি না। যেন হয়, সকলেই আমাদের ঠেলিয়া চলিয়া বাইতেছে, কেহ আমার অন্ত কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতেছে না। আমরা আদর-আবদারের জীব, আত্মীয়সমাজের বাহিরে আমাদের বড়ো বিপত্তি। আমি এখানে আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আমাদের ঘরের ছেলের পরের বাড়িতে প্রবেশের অভ্যাস নাই বলিয়াই আমাদের অধিকাংশ ছাত্র এখানে আসিয়া পড়া শ্রবণ করে, কিন্তু এখানকার সমাজের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না। এখানকার সমাজ বড়ো বলিয়াই এখানকার সমাজের দ্বার বেশি। সেই দ্বার খোঁকার করিলে তবে এখানকার লোকের সঙ্গে সমাজের ক্ষেত্রে আমাদের মিল হইতে পারে। সেই মিল না খুঁটিলে এখানকার সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। কারণ, এখানকার সবচেয়ে বড়ো সত্য এখানকার সমাজ।

বস্তুত, এখানকার সবচেয়ে বড়ো বীরত্ব বড়ো মহত্ব এখানকার সমাজের ক্ষেত্রে, মুক্তক্ষেত্রে নহে। প্রস্তুত সমাজের উপযোগী ত্যাগ এবং আত্মসম্মান এখানে পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে ; এইখানে ইহারা মানুষ হইতেছে, এবং নানা পথে মানুষের কাছে আপনাকে দান করিবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায় নিজের দেশেও স্কুলের শিক্ষাকেই শিক্ষা বলিয়া গণ্য করে—বৃহৎ সমাজের শিক্ষা হইতে বঞ্চিত ; এখানেও আসিয়া যদি তাহার স্কুলের কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেবলমাত্র কলের সামগ্রী হইয়া বাহির হইয়া যায়, এখানকার সমাজে প্রত্যক্ষ মনুষ্যত্বের জন্মস্থানে প্রবেশ না করে, তবে বিদেশে আসিয়াও বঞ্চিত হইবে।

সীমার সার্থকতা

এ কথা মাঝে মাঝে শুনিয়াছি যে, কবিত্বের মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ সার্থকতা নাই। জীবনের সাধনাকে কাব্যালংকারের ক্ষেত্র হইতে সংসারে কর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করিলে তাহা সত্যের দৃঢ়তা লাভ করে না।

মাঝে মাঝে অবসাদের দিনে নিজের এ কথা ভাবিয়াছি। কিন্তু আমি জানি, এরূপ চিন্তা মনের মধ্যে মরোচিকা-বিস্তার মাত্র। মানুষের যে রিপু তাহার কানে মিথ্যাময় জপ করে, লোভ তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য। সে মানুষকে এই কথা বলে, ‘তুমি যাহা তাহার মধ্যে সত্য নাই, তাহার বাহিরেই সত্য।’

কিন্তু, উপনিষৎ বলিয়াছেন : মা গৃধঃ কস্তাশ্বিনম্। কাহারও ধনে লোভ করিও না। অর্থাৎ, তোমার সীমার বাহিরে যাহা আছে তাহার পশ্চাতে চিন্তকে ও চেষ্টাকে ধাবিত করিও না।

কেন করিব না ওই শ্লোকে সে কথাটাও বলা আছে। উপনিষৎ বলিতেছেন, তিনিই সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া আছেন ; অতএব, বাহার মধ্যে তিনি আছেন, যাহা তাহার দান, তাহার মধ্যে কোনো অভাবই নাই। নিজের মধ্যে যখন ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করি না তখনই মনে করি, ঐশ্বর্য পরের মধ্যেই আছে। কিন্তু, যে দীনতাবশত ঐশ্বর্যকে নিজের মধ্যে পাই নাই সেই দীনতাবশতই তাহাকে অন্ত্র পাইবার আশা নাই।

সীমা আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমন সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনই আমরা যার কাছে পড়ি। তখনই আমরা

এমন একটা ভুল করিয়া বসি যে, আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই বুঝি আমরা অসীমকে পাইব— যেন আত্মহত্যা করিলেই অমরজীবন পাওয়া যায়। যেন আমি না হইয়া আর-কিছু হইলেই আমি ধন্ত হইব। কিন্তু, আমি হওয়াও বা আর-কিছু হওয়া যে তাহাই, সে কথা মনে থাকে না। আমার এই আমার মধ্যে যদি ব্যর্থতা থাকে তবে অন্ত কোনো আমিত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। আমার ঘটের মধ্যে ছিদ্র থাকাতো যদি জল বাহির হইয়া যায়, তবে সে জলের দোষ নহে। দুধ ঢালিলেও সেই দশা হইবে, এবং বধু ঢালিলেও তথৈবচ।

জীবনে একটিমাত্র কথা ভাবিবার আছে যে, আমি সত্য হইব। আমি কবি হইব কি কর্মী হইব কি আর-কিছু হইব, সেটা নিতান্তই ব্যর্থ চিন্তা। সত্য হইব এ কথার অর্থই এই, কোথায় আমার সীমা সেটা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিব। দুঃখান্বিত প্রলোভনে সেইটে সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব।

অহংকারকে যে আমরা রিপু বলি, লোভকে যে আমরা রিপু বলি, তাহার কারণ এই— আমাদের সীমা সম্বন্ধে সে আমাদের ঠিকটা বুঝিতে দেয় না। সে আমাদের আপনাকে জানার তপস্যায় বাধা দিয়া কেবলই বলিতে থাকে, ‘তুমি যাহা তুমি তাহার চেয়ে আরও বেশি অথবা অন্ত-কিছু।’ ইহা হইতে পৃথিবীতে যত দুঃখ, যত বিষেয, যত কাড়াকাড়ি-হানাহানির সৃষ্টি হইতে থাকে এমন আর কিছুতেই না। যাহা মিথ্যা তাহাকেই প্রায়ের জোরে সত্য করিতে গিয়া পৃথিবীতে যত-কিছু অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়।

সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতিমান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে মঙ্গল নাই। ভ্রমকে আমাদের পাইতেই হইবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের সুখ।

কিন্তু, নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরে না, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে আমরা অসীমকে খর্ব করিয়া থাকি। এ কথা সত্য, এক সীমার মধ্যে অন্ত সীমাবদ্ধ পদার্থ সম্পূর্ণ স্থান পায় না। কিন্তু, অসীমের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তিনি একটি বালুকণার মধ্যেও অসীম। এইজন্য একটি বালুকণাকেও যখন সম্পূর্ণরূপে সর্বভোভাবে আয়ত্ত করিতে যাই তখন দেখি, বিশ্বকে আয়ত্ত না করিলে তাহাকে পাইবার জো নাই; কারণ, এক আয়গায় নিখিলের সম্মুখে সে অবিচ্ছেদ্য, তাহার এমন একটা দিক আছে যে দিকটাতে কিছুতেই তাহাকে ধেষ করা যায় না।

আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ, সেই অসীমেরই আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন ; সেই সীমার মধ্যেই তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার। তাঁহার সেই নিকেতনকে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে বেশি করিয়া পাইব, এমন কথা মনে করাই ভুল।

গোলাপ-ফুলের মধ্যে সৌন্দর্যের একটি অসীমতা আছে তাহার কারণ, সে সম্পূর্ণরূপেই গোলাপ-ফুল— সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ, কোনো অনিশ্চিততা নাই। এইজন্যই গোলাপ-ফুলের মধ্যে এমন একটি আবির্ভাব সম্পন্ন হইয়াছে বাহ্য চক্ষুস্বর্ষের মধ্যে, বাহ্য জগতের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে। সে স্থানিষ্ঠ সত্যরূপে গোলাপ-ফুল বলিয়াই সমস্ত জগতের সঙ্গে তাহার আত্মীয়তা সত্য।

বস্তুত সম্প্রতিতাই বার্থতা ; সুতরাং সেইখানেই কুমার প্রকাশ প্রতিহত, কুমার আনন্দ প্রচ্ছন্ন। তাঁহার আনন্দ রূপগ্রহণের দ্বারাই সার্থক। অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সৃষ্টি। এইজন্য জগৎসৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই স্বাক্ষর হইয়া উঠিতেছে ; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসারযাত্রা। কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।

এইজন্যই আপনাকে স্পষ্ট করিয়া পাওয়াই মানুষের সাধনা। স্পষ্ট করিয়া পাওয়ার অর্থ ই সীমাবদ্ধ করিয়া পাওয়া। যখন নানা পথে নানা দুরাশার বিক্ষিপ্ততা হইতে নিজেকে সংহত করিয়া সীমার মধ্যে আপনাকে স্পষ্ট করিয়া দাঁড় করানো যায়, তখন জীবনের সার্থকতাকে লাভ করি।

সাঁতার যতক্ষণ না শিখি ততক্ষণ এলোমেলো হাত পা ছোঁড়া চলে। ভালো সাঁতার যেমনি শিখি অমনি আমাদের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হইয়া আসে এবং তাহা সৃষ্টি হইয়া প্রকাশ পায়। পারি যখন শুধু তখন সৃষ্টি দেখিতে হয়, কারণ, তাহার শুড়ার মধ্যে বিধা নাই, তাহা স্থানিষ্ঠ অর্থাৎ তাহা আপনার নিশ্চিত সীমাকে পাইয়াছে। এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য ; এবং সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে স্রষ্ট হওয়াই কদৰ্ঘতা, তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।

কাব্যালংকার তখনি বার্থ যখনি তাহা বিধা, অর্থাৎ যখনি তাহা আপনার সীমাকে না পাইয়া আর-কিছু হইবার চেষ্টা করিতেছে। তখনি সে ভ্রম করে ; তখনি সে ছোটোকে বড়ো করিয়া দেখায়, বড়োকে ছোটো করিয়া আনে। তখনি তাহা কথার কথাবাজ, তাহা সৃষ্টি নহে। কিন্তু, কবি যেখানে সত্য, যেখানে সে আপনার অসীমকে আপনার সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে, আপনার আনন্দকে আপনার শক্তির মধ্যে সৃষ্টিদান করে, সেখানে সে সৃষ্টি করে। জগতের সকল সৃষ্টির মধ্যেই

তাহার স্থান। সত্যকর্মী যে কর্মের সৃষ্টি করে, সত্যসাধক যে জীবনের সৃষ্টি করে, সকলেরই সঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে আসন লইবার অধিকার তাহার। কার্ণাইল প্রভৃতি বাক্যরচকেরা বাক্যের চেয়ে কাজকে যে বড়ো স্থান দিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাহার অর্থ এই যে, তাঁহারা মিথ্যা বাক্যের চেয়ে সত্য কাজকে গৌরব দান করিতে চান। সেইসঙ্গে এ কথাও বলা উচিত, মিথ্যা কাজের চেয়ে সত্য বাক্য অনেক বড়ো।

আসল কথাই এই, সত্য যে-কোনো আকারেই প্রকাশ পাক-না কেন তাহা একই; তাহাই মানুষের চিরসম্পদ। যেমন টাকা যেখানে সত্য, অর্থাৎ শক্তি যেখানে টাকা-আকারে প্রকাশ পায়, সেখানে সে টাকা কেবলমাত্র টাকা নহে, তাহা অন্নও বটে, বস্ত্রও বটে, শিক্ষাও বটে, স্বাস্থ্যও বটে; শুধু সে টাকা সত্য মূল্যের সীমায় স্থনির্দিষ্টরূপে বদ্ধ বলিয়াই আপনার নির্দিষ্ট সীমাকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ সে আপনার সত্য মূল্যের দ্বারা আপনার বাহিরের বিবিধ সত্য পদার্থের সহিত যোগযুক্ত হয়। তেমনি সত্য কবিতার সঙ্গে মানুষের সকলপ্রকার সত্য সাধনার যোগ ও সমতুল্যতা আছে। সত্য কবিতা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের মধ্যে কবিতা আকারেই থাকে না। তাহা মানুষের প্রাণের মধ্যে মিলিত হইয়া কর্মীর কর্ম ও তাপসের তপস্কার সহিত যুক্ত হইতে থাকে। এ কথা নিঃসন্দেহ যে, কবির কবিতা যদি পৃথিবীতে না থাকিত তবে মানবজীবনের সকলপ্রকার কর্মই অসম্প্রকার হইত। কারণ, মানুষের সত্য বাক্য চিরদিনই মানুষের সত্য কর্মের সহিত মিলিত হইতেছে, তাহাকে শক্তি দিতেছে, মূর্তি দিতেছে, তাহার পথকে লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে।

অতএব, এই কথাটি আমাদের বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য সীমাকে পাওয়াই সত্য অসীমকে পাওয়ার একমাত্র পন্থা। নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই নিজের অসীমকে লঙ্ঘন করা হয়। পৃথিবীতে কবিতার বা কর্ম বা ধর্মসাধনায় যে-কোনো মানুষ সত্য হইয়াছে তাহার সহিত অপর সাধারণের প্রভেদ এই যে, সে অসীমের সীমাকে স্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিয়াছে, অল্প সকলে সীমাত্রষ্ট অস্পষ্টতার মধ্যে যেমন-তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অস্পষ্টতাই তুচ্ছ। নদী যখন আপন তটসীমাকে পায় তখন সে অসীম সমুদ্রের অভিমুখে ছুটিয়া যাইতে পারে; যদি সে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আরও বড়ো হইবার জন্য আপনার তটকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলেই তাহার গতি বন্ধ হইয়া যায় এবং সে তুচ্ছ বিলের মধ্যে, অন্ডার মধ্যে, ছড়াইয়া পড়ে।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, আপনার সত্য সীমার মধ্যে আবদ্ধ হওয়া সংকীর্ণতা

নহে, নিশ্চেষ্টতা নহে। বস্তুত, সেই সীমার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বারাই বাহ্যিক উদ্যম হয়, সেই সীমার মধ্যে বিধৃত হওয়ার বারাই বাহ্যিকের চেটা বেগবান হইয়া উঠে। ব্যক্তি ব্যক্তি-হওয়ার বারাই বাহ্যিকের মধ্যে গণ্য হয় ; জাতি জাতীয়ত্ব-লাভের বারাই সর্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে। যে জাতি জাতীয়তা লাভ করে নাই সে বিশ্বজাতীয়তাকে হারাইয়াছে। যে লোক বড়ো লোক সেই লোকই সকলের চেয়ে বিশেষ করিয়া নিজেকে পাইয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে পাইয়াছে তাহার আর অভ্যুত্থান মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জো নাই ; সে আপনার কাজ পাইয়াছে, সে আপনার স্থান পাইয়াছে, সে আপনার আনন্দ পাইয়াছে ; নদীর মতো সে বিনা বিধায় আপনার বেগে আপনিই চলিতে থাকে, তাহার সত্য সীমাই সত্য পরিণামের দিকে তাহাকে সহজে চালনা করিয়া লইয়া যায়।

আবিরাবীৰ্য্য এধি। যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি আমার মধ্যে, আমারই সীমার মধ্যে, প্রকাশিত হউন, ইহাই আমাদের সত্য প্রার্থনা। যদি আমার সীমাকে অবজ্ঞা করি তবে সেই অসীমের প্রকাশকে বাধা দিব। পাহি মাং নিত্যম্। আমাকে সর্বদা রক্ষা করো। আমার সত্যের মধ্যে, সীমার মধ্যে আমাকে রক্ষা করো ; আমি যেন সীমার বাহিরে আপনাকে হারাইয়া না ফেলি। আমি যাহা পূর্ণরূপে তাহাই হইয়া যেন তোমার প্রসন্নতাকে, তোমার আনন্দকে সুস্পষ্টরূপে নিজের মধ্যে অনুভব করি। অর্থাৎ, আমার যে সীমার মধ্যে তোমার বিলাস সেই সীমাকেই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমি যেন নিজের জীবনকে কৃতার্থ করিতে পারি, ইহাই আমার অস্তিত্বের মূলগত অন্তরতর প্রার্থনা।

লওন

সীমা ও অসীমতা

ধর্ম শব্দের গোড়াকার অর্থ, যাহা ধরিয়া রাখে। religion শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে বুঝা যায় তাহারও মূল অর্থ, যাহা বাধিয়া তোলে।

অতএব, এক দিক দিয়া দেখিলে দেখা যায়, বাহ্যিক ধর্মকে বন্ধন বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ধর্মই বাহ্যিকের চেটার কেন্দ্রকে সীমাবদ্ধ করিয়া সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বন্ধনকে স্বীকার করা, এই সীমাকে লাভ করাই বাহ্যিকের চরম সাধনা।

কেননা সীমাই সৃষ্টি। সীমারেখা যতই সুবিহিত সুস্পষ্ট হয় সৃষ্টি ততই সত্য ও সুন্দর হইতে থাকে। আনন্দের স্বভাবই এই, সীমাকে উদ্ভিন্ন করিয়া তোলা।

বিধাতার আনন্দ বিধানের সীমার সমস্ত সৃষ্টিকে বাধিয়া তুলিতেছে। কর্মীর আনন্দ, কবির আনন্দ, শিল্পীর আনন্দ— কেবলই স্ফুটন্তরূপে সীমা রচনা করিতেছে।

‘ধর্ম ও মাহুষের মনুষ্যত্বকে তাহার সত্য সীমার মধ্যে স্ফুটন্তর করিয়া তুলিবার’ শক্তি। সেই সীমাটি যতই সহজ হয়, ততই সুবাস্ত হয়, ততই তাহা সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। মাহুষ ততই শক্তি ও স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য লাভ করে, মাহুষের মধ্যে আনন্দ ততই প্রকাশমান হইয়া উঠে।

ধর্মের সাহায্যে মাহুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে, অথচ সেই ধর্মের সাহায্যেই মাহুষ আপনার অসীমকে খুঁজিতেছে। ইহাই আশ্চর্য। বিশ্বসংসারে সমস্ত পূর্ণতার মূলেই আমরা এই কথা দেখিতে পাই। বাহা ছোটো করে তাহাই বড়ো করে, বাহা পৃথক করিয়া দেয় তাহাই এক করিয়া আনে, বাহা বাধে তাহাই মুক্তিদান করে; অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত, এই কথা যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে সেইখানেই বস্তু অসম্পূর্ণ। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যস্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্নততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু, আসল কথা এই, অসীম হইতে বিমুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিমুক্ত অসীমও মায়া।

যে গান আপনার সুরের সীমাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছে সে গান কেবলমাত্র সুরসমষ্টিকে প্রকাশ করে না— সে আপনার নিয়মের দ্বারাই আনন্দকে, সীমার দ্বারাই সীমার চেয়ে বড়োকে ব্যস্ত করে। গোলাপ-ফুল সম্পূর্ণরূপে আপনার সীমাকে লাভ করিয়াছে বলিয়াই সেই সীমার দ্বারা সে একটি অসীম সৌন্দর্যকে প্রকাশ করিতে থাকে। এই সীমার দ্বারা গোলাপ-ফুল প্রকৃতিরাজ্যে একটি বস্তুবিশেষ, কিন্তু ভাবরাজ্যে আনন্দ। এই সীমাই তাহাকে এক দিকে বাধিয়াছে, আর-এক দিকে ছাড়িয়াছে।

এইজন্যই দেখিতে পাই, মাহুষের সকল শিক্ষারই মূলে সংঘের সাধনা। মাহুষ আপনার চেষ্টাকে সংঘত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে, ভাবনাকে বাধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পারে। সেই কারণেই সুনিপুণ যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছে এবং মানিয়াছে। সেই লোকই নিজের জীবনকে সুন্দর করিতে পারিয়াছে যে তাহাকে সংঘত করিয়াছে। এবং সত্যী স্ত্রী যেমন সত্যীত্বের সংঘের দ্বারাই আপনার প্রেমের পূর্ণ চরিতার্থতাকে লাভ করে, তেমনি যে

মানুষ পবিত্রচিত্ত, অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছাকে সত্য সীমার বাধিয়াছে, সেই তাঁহাকে পায় যিনি সাধনার চরম ফল, যিনি পরম আনন্দস্বরূপ।

এই ধর্মকে বন্ধনরূপে দুঃখরূপে স্বীকার করা হইয়াছে ; বলা হইয়াছে, ধর্মের পথ শাণ্ডিত্য ক্ষুরধারের মতো দুর্গম। সে পথ যদি অসীমবিস্তৃত হইত তবে সকল মানুষই যেমন-তেমন করিয়া চলিতে পারিত, কাহারও কোথাও কোনো বাধাবিপত্তি থাকিত না। কিন্তু, সে পথ স্থানিষ্ঠিত নিয়মের সীমার দৃঢ়রূপে আবদ্ধ, এইজন্যই তাহা দুর্গম। ঐশ্বর্যরূপে এই সীমা-অনুসরণের কঠিন দুঃখকে মানুষের গ্রহণ করিতেই হইবে। কারণ, এই দুঃখের দ্বারাই আনন্দ প্রকাশমান হইতেছে। এইজন্যই উপনিষদে আছে, তিনি তপস্তার দুঃখের দ্বারাই এই বাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন।

কবি কীটস্ বলিয়াছেন, সত্যই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যই সত্য। সত্যই সীমা, সত্যই নিয়ম, সত্যের দ্বারাই সমস্ত বিধৃত হইয়াছে ; এই সত্যের অর্থাৎ সীমার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সমস্ত উচ্ছ্বল হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অসীমের সৌন্দর্য এই সত্যের সীমার মধ্যে প্রকাশিত।

সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বন্ধন করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নাই বাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই বিখ্যা।

কিন্তু মানুষের ধর্ম মানুষকে বলিতেছে, 'তুমি আপনার সীমাকে পাইলেই অসীমকে পাইবে। তুমি মানুষ হও ; সেই মানুষ হওয়ার মধ্যেই তোমার অনন্তের সাধনা সফল হইবে।' এইখানেই আমাদের অভয়, আমাদের অব্যত। যে সীমার মধ্যে আমাদের সত্য সেই সীমার মধ্যেই আমাদের চরম পরিপূর্ণতা। এইজন্যই উপনিষৎ বলিয়াছেন, ইনিই ইহার পরমা গতি, ইনিই ইহার পরমা সম্পৎ, ইনিই ইহার পরম আশ্রয়, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। অসীমতা এবং সীমা, ইনি এবং এই— একেবারেই কাছাকাছি ; ছুই পাখি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিত্তিকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ, সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি, উভয়ের উভয়কে নহিলে নয়।

মানুষ কখনো কখনো ঈশ্বরকে দূর স্বর্গরাজ্যে সরাইয়া দিয়াছে। অতিনি মানুষের ঈশ্বর ভয়ংকর হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই ভয়ংকরকে বশ করিবার জন্য ভয়ংকর মানুষ নানা মন্ত্রকর্ম আচার-অহুষ্ঠান পুরোহিত ও যথাস্থের শরণাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, মানুষ

যখন তাঁহাকে অন্তরতর করিয়া আনিয়াছে তখন তাহার ভর বুচিয়াছে, এবং বধ্যস্থকে সরাইয়া দিয়া প্রেমের বোনে তাঁহার সঙ্গে যিগিতে চাহিয়াছে।

মাহুষ কখনো কখনো সীমাকে সকলপ্রকার দুর্ভাব দিয়া গালি পাড়িতে থাকে। তখন সে স্বভাবকে পীড়ন করিয়া ও সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া, অসম্ভব ব্যাঘাতের দ্বারা অসীমের সাধনা করিতে প্রবৃত্ত হয়। মাহুষ তখন মনে করে, সীমা জিনিগটা যেন তাহার নিজেরই জিনিস, অতএব তাহার মুখে চুনকালি মাখাইলে সেটা আর-কাহারও গারে লাগে না। কিন্তু, মাহুষ এই সীমাকে কোথা হইতে পাইল। এই সীমার অসীম রহস্য সে কীই বা জানে। তাহার সাধ্য কী সে এই সীমাকে লঙ্ঘন করে।

মাহুষ যখন জানিতে পারে সীমাতেই অসীম, তখনি মাহুষ বুঝিতে পারে—এই রহস্যই প্রেমের রহস্য; এই তত্ত্বই সৌন্দর্যতত্ত্ব; এইখানেই মাহুষের গৌরব; আর, যিনি মাহুষের ভগবান, এই গৌরবেই তাঁহারও গৌরব। সীমাই অসীমের ঐশ্বর্য, সীমাই অসীমের আনন্দ; কেননা সীমার মধ্যেই তিনি আপনাকে দান করিয়াছেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিতেছেন।

লগুন

শিক্ষাবিধি

এখানে আগিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া-ভূনিয়া বুঝিয়া লইব—শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কিনা তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্ত পাকা করিয়া মাহুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আত্মসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; আর-এক দল বলিতেছে, সচেতনভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত এ দৃষ্ট কোনোদিনই মিটিবে না—কেননা, মাহুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দৃষ্ট সত্য; সুখও

তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয় ; শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই ; এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত । এ কথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও ; কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য । কারণ জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না—অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা ভাগিদে সে নদীর মতো ঝাঁকিয়া-ঝাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না ; অতএব, তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থানপরিবর্তন করিতে হয় । এখন তাহার পক্ষে বাহা মধ্যরেখা আর-একসময় তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা ; এক জাতির পক্ষে বাহা প্রান্তপথ আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ । নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে, কখনো শান্তি আসে ; কখনো ধনসম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার উর্টার দিন উপস্থিত হয় ; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্নত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিস্রুত হইয়া পড়ে । এমন অবস্থায় মানুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশ্লিষ্ট । মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসাম্যকেন্দ্রের পথ সে বাছিয়া লয় । যে মানুষের নিজের পরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয় ; কিন্তু, মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাত হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে । যুরোপের ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপন-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে । ইহাদের চিন্তা যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংশ্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে ।

অতএব, চিন্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয় । কিন্তু, বেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পার না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো একজন বা একদল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না । নানা লোকের নানা চেষ্টার সম্বন্ধে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে । এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা ।

কিন্তু, যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাধা প্রথা হইতে এক-চুল সরিয়া গেলে জাতি হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা ।

সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতেছেই এবং ঘটবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না— অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রাখার পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে ভেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনভরো। যেমন, নদী সরিয়া যাইতেছে কিন্তু বাধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে, খেরানৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট ; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নাযিলে খোকা নাপিত বন্ধ। সুতরাং ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদের দিতেছে না ; আমাদের দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্বকালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে বে বড়ো বিস্তার সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, সুতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই ; একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ভালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সম্মতি দাবি নাই— এখনো সে মানুষকে বলিতেছে, ‘ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।’ বাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই ; মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন-অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। উপস্থার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধূলিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল -সম্মত মানিতেই হইবে, অথচ পাখিটা সরিয়া গেছে। দানাপানি নিরন্তর জোগাইতেছি অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোয়াকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সজ্জরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা

মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিশু শুধুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু শুধু শিশুকে শুধু দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না; এবং শুধু পুরাকালের বিদ্বত ভাষায় শিশুকে উপদেশ দিতেছে, শিশুর তাহা গ্রহণ করিবার মতো প্রজ্ঞাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এই কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে, ব্যবহারতঃ যথেষ্টাচার করো কিন্তু প্রকাশতঃ তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই। এমনতরো মিথ্যাচার মানুষকে দ্বায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার প্রজ্ঞা অল্প পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাধিয়া রাখে, তাহা হইলে সমাজের পনেরো-আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জা বোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প, অতএব সত্যকে প্রকাশে স্বীকার করিবার দণ্ড বেখানে অসম্বন্ধরূপে অতিমাত্রা সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়, মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে অথচ সেই মুহূর্তেই অমানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্য বিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মানুষ কত অসাধারণরূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ বেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতনকালের ব্যবস্থা বেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বন্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রস্তুত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে; তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বন্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের

মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিস্তার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের ছড়ি কুড়াইয়া ভিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের ধান্ত নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সাংসারিক বিজ্ঞানবাদের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিজ্ঞানবাদের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না। ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অস্ব কথ্য মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য শস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বীধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলম্ব্য সত্য আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল, এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুদ্ধিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন; তাহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্যস্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বীধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ডসন, ডেভিড হেয়ার, ইহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না; তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া-প্রবেশের উপায় ছিল; তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আগুন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিস্তার কেন্দ্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রকৃতি বাহ পন্থায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো কল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উত্তমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে বাহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাহাদের সবচেয়ে

প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও কণে কণে বথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। ‘জাতীয়’ নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা-কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব না— তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন অলের দ্বারাই অলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না— সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখন সে মানুষ না হইয়া মাস্টারমশায় হইতে চায়; তখন সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরুশিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সম্ভবমেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের বথার্থ তার পিতা-মাতার উপর। কিন্তু, পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতাই, অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাवশ্যক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না; তাহা স্রেফ শ্রেয় ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকষলের জারক রস; তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাवশ্যক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষায় মতো ভয়ংকর তার আর-কিছুই নাই; তাহা যনকে বস্তুটা ঘের তাহার চেয়ে পিছিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থার আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিমান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিন্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া

হটক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই ; তাহার পরিবর্তে প্রাণীকৃত বটিকা গিলাইয়া কোনো কষিরাজ আমাদেরকে রক্ষা করিতে পারিবেন না ।

চ্যান্সফোর্ড,

৩১ জুলাই ১৯১২

লক্ষ্য ও শিক্ষা

আমার কোনো-এক বন্ধু^১ কলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন । তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে-সব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, বাহ্যিক জীবনে ইহা এবং না জিনিগটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না । তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহের কল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন । বাতাস বধন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হহ করিয়া দুই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া যাইবে, এ কথা বলিতে সময় লাগে না ; কিন্তু, কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না— বাহ্যিক বিশেষ কোনো-একটা বস্তু নাই তাহার অভ্যন্তর বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী । সে কিসের জন্ত প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করিবে । তাহার আশা-তাপমানবদ্বারা দুরাশার উচ্চতম রেখা অস্ত্র দেশের নৈরাশ্রেরেখার কাছাকাছি ।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা । আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই । আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই । আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে । প্রকৃতির গৃহীণনার শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা যেখানে নাই শক্তি সেখানে হইতে বিদায় গ্রহণ করে । বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে, চন্দ্রম্যান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল শুহাবাগী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায় । আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না, তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব । এইজন্য বিপদের মুখে পলায়নের যখন উপায় নাই, পলায়নের শক্তিও তখন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে ।

১ প্রিয়নাথ সেন । 'প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি' গ্রন্থের "কলিত জ্যোতিষ" প্রবন্ধে উল্লিখিত ।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পারি এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস বাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের সোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটাই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই—কিন্তু, সমাজে যতগুলি লোক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তিসম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পৌতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সম্ভাব্য হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই ঐশ্বর্য।

এই পশ্চাত্যদেশে লক্ষ্যবেধের আস্থান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্য সকলেই আপনার ধনুক বাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যজ্ঞসেনীকে পাইবে, এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে স্থলিত আছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা করা আমাদের পক্ষে আবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি ‘আমরা কী শিখিব—কেমন করিয়া শিখিব—শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে’—তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদেরকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না—ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁওয়ার কতকগুলো কৃত্রিম নিরর্থক নিয়মপালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঙ্করণের ক্ষেত্র অব্যবহৃত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্য।

জীবনের ক্ষেত্রে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবতঃ মনেই আসে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অস্ত্রের অলঙ্করণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দয়াজ্ঞা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাজিদিন বলে, ‘তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই।’ পাখির ছানা তো বি. এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না ; উড়িতে পার বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে ; সে নিশ্চয় জানে, তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব, এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই, এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই, অস্তরে অস্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্বতও করিতে পারে না ; অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গন্তিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্বত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, ‘আমি অবিকল কলকাতার সমতুল্য কীর্তি করিয়াছি।’

তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইন্সুল-মাস্টারি পর্বত উড়িয়া তাহার পর পেলনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্তব্যটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা— এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আদর্শগকে বোঝায় না, আমাদের ইচ্ছাশক্তিও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু, যদি কেহ মনে করেন তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন্ দিকে চলিতেছি, তাহা স্থাপন করিয়া জানা চাই। সে জানাটা বড়ই অপ্রিয় হউক তবু সেটা সর্বাগ্রে আবশ্যক। আমরা এ পর্বত বারবার নিজের দুর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইয়া আমরা পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, যাহাকে যাহুয করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্বসংসারে সকল সমাজের সেরা। এতবড়ো

একটা অদ্ভুত অত্যাচারী যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতাই প্রত্যাহ আপনাকে অগ্রাধিকার করিয়া দিয়াছে, তাহাকে আড়ম্বর-সহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়ের-জোরি কৈফিয়ত—যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অস্ত্রের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই। বিষফোড়ার চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু সূচিকিৎসক ফোড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যাহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষফোড়া বিধাতার কাছ হইতে মৃত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ঝাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উদ্ভোগ করিতেছে। কিন্তু যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদূর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, ফোড়াটা তাহার বাহিরের ছোড়া-দেওয়া আকস্মিক জ্বিনিস নহে; ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে, ইহার বুদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিস্রুত করিয়া ফেলিয়াছে, সেইজন্যই সে সংসারের কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্র ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্রকে স্বার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণতঃ ইচ্ছুল হইতে হয় না, এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি মরণের দোকানে তৈরি হয় না, খাওয়াই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্ভবশীল সেইখানেই তাহার বিজ্ঞা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে যেনে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিজ্ঞাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উন্নয়ন হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়। কারণ, জীবনের চালনাকেন্দ্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই; পরাধীন আত্মিক কাছে তো শক্তির আর খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির কেন্দ্র সকল আত্মিক পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপোষে আপনার কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিষ্ট কেন্দ্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অল্পকূল অবস্থা মানুষকে অব্যবহৃত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা বার্থতা। ভাগ্য আমাদেরকে বাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়—এক দিকে বাহার ভাগে বেশি পড়ে অল্প দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবস্থার শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা বড়ই অল্পকূল হউক-না কেন মানুষকে শীর্ণ হইতেই হইবে। আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে বার্থতঃ কী তাহা আমরা জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে পরখ করিয়া দেখি নাই, সেই পরখ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বত্রই দড়িদড়া দিয়া বাধিয়াছি; মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই ধব করিয়া ভালো-মাহুষের জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনভরো বাহাদের ব্যবস্থা, তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরম ধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে, ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্ততার জাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর-কিছু নাই। মানুষের আকাজক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ,

ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে আগাইয়া তুলিতে পারিলেই, তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্যে হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না ; এমন-কি, সে অবস্থার বাহিরের দাবিত্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঠাল-গাছকে ক্ষতবেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে চারা আশেপাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজন্য কোনোমতে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জন্য সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু, সেই চারাটির মজার মধ্যে এই দুনিবার বেগটি সজীব থাকি চাই যে, ‘আমাকে উঠিতেই হইবে, বাড়িতেই হইবে। আলোকে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব, মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্য দিকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা ছাড়িব না।’ ‘চেষ্টা করাই অপরাধ—যেমন আছি তেমনই থাকিব’ কোনো প্রাণবান জিনিস এমন কথা বধন বলে তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন অনন্ত আকাশও তেমন।

মাহুষের সকলের চেয়ে বাহ্য পদম আশার সামগ্রী তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা একমুহূর্ত তুলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি, এইজন্য সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি ; কিন্তু, উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি, সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক, জুয়ার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে ; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে বাহ্য আমাদিগকে কোণের বাহির করে, বাহ্য আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, বাহ্য কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বন্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ বধন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি বধন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব ; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লজ্জা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাসকে স্থনির্দিষ্ট করিয়া দেখা যায় না ; এইজন্য বধন আলোক আসন্ন তখনো অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু, আমি তো স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিন্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিমুখ আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহার

বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদেরকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোভাবেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাচিতেই হইবে; সেই আমাদের দুর্ভাগ্য প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিদ্র পাইতেছে সেইখান দিয়াই এখনি আমাদেরকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাঙ্গের উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ তুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথর হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বজনপ্রতিষ্ঠিত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথবাজার আহ্বান বারবার নানা দিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর-কিছু নাই, ইহাই মুককে কথা বলায়, পঙ্ককে পর্বত লঙ্ঘন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পয়স লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকুপণ ভাবে আমরা দান করিতে পারিব, এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকারে দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমায়ি জলিবে—এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অনুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে।

চ্যান্সফোর্ড, মস্টবিশিয়র

১৯ অগস্ট, ১৯১২

আমেরিকার চিঠি

আজ রবিবার। গির্জার ঘণ্টা বাজিতেছে। সকালে চোখ মেলিয়াই দেখিলাম, বরফে সমস্ত সাদা হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলির কালো রঙের ঢালু ছাদ এই বিশ্বব্যাপী সাদার আবির্ভাবকে বুক পাতিয়া দিয়া বলিতেছে, ‘আধো আঁচরে বোসো!’ যাহ্নবের চলাচলের রাস্তায় ধলাকাদার রাজস্ব একেবারে ঘুচাইয়া দিয়া শুভ্রতার নিশ্চল ধারা যেন শতধা হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। গাছে একটিও পাতা নাই; শুক্রম্ শুক্রমপাপবিক্রম্ ডালগুলির উপরের চূড়ায় তাঁহার আশীর্বাদ বর্ণন করিয়াছেন। রাস্তার দুই ধারের ঘাস যৌবনের শেষ চিহ্নের মতো এখনো সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় নাই, কিন্তু তাহার ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করিয়া হার মানিতেছে। পাখিয়া ডাক বন্ধ করিয়াছে, আকাশে কোথাও কোনো শব্দ নাই। বরফ উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহার পদসঙ্কার কিছুমাত্র শোনা যায় না— বর্ষা আসে বৃষ্টির সঙ্গে, ডালপালার মর্মরে, দিগ্দিগন্ত মুখরিত করিয়া দিয়া রাজবহ্নিতধ্বনি:— কিন্তু আমরা সকলেই যখন ঘুমাইতেছিলাম আকাশের তোরণদ্বার তখন নীরবে খুলিয়াছে, সংবাদ লইয়া কোনো দূত আসে নাই, সে কাহারও ঘুম ভাঙাইয়া দিল না। স্বর্গলোকের নিভৃত আশ্রয় হইতে নিঃশব্দতা মর্তে নামিয়া আসিতেছেন; তাঁহার ঘর্ঘরনির্নাদিত রথ নাই; মাতলি তাঁহার মন্ত ঘোড়াকে বিছাভের কষাঘাতে হাঁকাইয়া আনিতেছে না; ইনি নামিতেছেন ইহার সাদা পাখা মেলিয়া দিয়া, অতি কোমল তাহার সকার, অতি অবাধ তাহার গতি; কোথাও তাহার সংঘর্ষ নাই, কিছুকেই সে কিছুমাত্র আঘাত করে না। সূর্য আবৃত, আলোকের প্রখরতা নাই; কিন্তু, সমস্ত পৃথিবী হইতে একটি অগ্রগন্ড দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এই জ্যোতি যেন শান্তি এবং নম্রতার স্নগমবৃত্ত, ইহার অবগুণ্ঠনই ইহার প্রকাশ।

স্তব্ধ শীতের প্রভাতে এই অপকল্প শুভ্রতার নির্মল আবির্ভাবকে আমি নত হইয়া নমস্কার করি— ইহাকে আমার অস্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লই। বলি, ‘তুমি এমনি ধীরে ধীরে ছাইয়া কেলো; আমার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত কর্ম আবৃত করিয়া দাও। গভীর রাজির অসীম অন্ধকার পার হইয়া তোমার নির্মলতা আমার জীবনে নিঃশেষে অবতীর্ণ হউক, আমার নবপ্রভাতকে অকলঙ্ক শুভ্রতার মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলুক— বিখানি ছুরিতানি পরাস্তব— কোথাও কোনো কালিমা কিছুই রাখিও না, তোমার স্বর্গের আলোক যেমন নিরবচ্ছিন্ন শুভ্র আমার জীবনের ধরাডলকে তেমনি একটি অধঃ শুভ্রতার একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত্ত করিয়া দাও।’

অঙ্ককার প্রভাতের এই অস্তলম্পর্শ শুভ্রতার মধ্যে আমি আমার অন্তরাত্মাকে অবগাহন করাইতেছি। বড়ো শীত, বড়ো কঠিন এই শ্রান। নিজেকে যে একেবারে শিশুর মতো নম্ন করিয়া দিতে হইবে, এবং ডুবিতে ডুবিতে একেবারে কিছুই যে ব্যক্তি থাকিবে না— উর্ধ্বে শুভ্র, অধোতে শুভ্র, সম্মুখে শুভ্র, পশ্চাতে শুভ্র, আরম্ভে শুভ্র, অন্তে শুভ্র— শিব এবং কেবলম্— সমস্ত দেহমনকে শুভ্রের মধ্যে নিঃশেষে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া নমস্কার— নমঃ শিবায চ শিবতরায় চ।

বার্ধক্যের কাস্তি যে কী মহৎ, কী গভীর স্বন্দর, আমি তাহাই দেখিতেছি। যত-কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশেষে ঢাকা পড়িয়া গেল, অনবচ্ছিন্ন একের শুভ্রতা সমস্তকেই আপনার আড়ালে টানিয়া লইল। সমস্ত গান ঢাকা পড়িল, প্রাণ ঢাকা পড়িল, বর্ণচ্ছটার লীলা সাদায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু, এ তো মরণের ছায়া নয়। আমরা যাহাকে মরণ বলিয়া জানি সে যে কালো; শূন্যতা তো আলোকের মতো সাদা নয়, সে যে অমাবস্তার মতো অঙ্ককারময়। সূর্যের শুভ্র রশ্মি তাহার লাল নীল সমস্ত ছটাকে একেবারে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু, তাহাকে তো বিনাশ করে নাই, তাহাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিয়াছে। আজ নিস্তব্ধতার অস্তনিগূঢ় সংগীত আমার চিত্তকে অস্তরে রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। আজ গাছপালা তাহার সমস্ত আভরণ খসাইয়া ফেলিয়াছে, একটি পাতাও বাকি রাখে নাই; সে তাহার প্রাণের সমস্ত প্রাচুর্যকে অস্তরের অদৃশ্য গভীরতার মধ্যে সম্পূর্ণ সমাহরণ করিয়া লইয়াছে। বনস্ত্রী যেন তাহার সমস্ত বাণী নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিজের মনে কেবল ওঝারমন্ত্ৰটি নীরবে জপ করিতেছে। আমার মনে হইতেছে, যেন তাপসিনী গৌরী তাঁহার বসন্তপুষ্পাভরণ ত্যাগ করিয়া শুভ্রবেশে শিবের শুভ্রমূর্তি ধ্যান করিতেছেন। যে কামনা আগুন লাগায়, যে কামনা বিচ্ছেদ ঘটায়, তাহাকে তিনি ক্ষম করিয়া ফেলিতেছেন। সেই অগ্নিদগ্ধ কামনার সমস্ত কালিমা একটু একটু করিয়া ঐ তো বিলুপ্ত হইয়া বাইতেছে; যত দূর দেখা যায় একেবারে সাদায় সাদা হইয়া গেল, শিবের সহিত মিলনে কোথাও আর বাধা রহিল না। এবার যে শুভপরিণয় আসন্ন, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পূণ্য-আলোকে যাহার বার্তা লিখিত আছে এই তপস্তার গভীরতার মধ্যে তাহার নিগূঢ় আয়োজন চলিতেছে; উৎসবের সংগীত সেখানে ঘনীভূত হইতেছে, মালাবদলের ফুলের সাজি বিশ্বচক্ৰ অগোচরে সেখানে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে। এই তপস্তাকে বরণ করো, হে আমার চিত্ত, আপনাকে নত করিয়া নিস্তব্ধ করিয়া দাও— শুভ্র শাস্তি তোমাকে স্তরে স্তরে আবৃত করিয়া স্থিরপ্রতিষ্ঠ গূঢ়তার মধ্যে তোমার সমস্ত চেষ্টাকে আহরণ করিয়া লউক, নির্মলতার দেবদূত আসিয়া একবার এ জীবনের সমস্ত আবর্জনা এক প্রান্তে হইতে

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিক ; তাহার পরে এই ভগ্নস্তর শুদ্ধ আবরণটি
একদিন উঠিয়া বাইবে, একেবারে দ্বিগুণিত আনন্দকলগীতে পূর্ণ করিয়া দেখা দিবে
নূতন জাগরণ, নূতন প্রাণ, নূতন মিলনের মঙ্গলোৎসব ।

৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

—

ছেলেবেলা

ভূমিকা

গৌসাইজির কাছ থেকে অনুরোধ এল ছেলেদের জন্যে কিছু লিখি। ভাবলুম ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা লেখা যাক। চেষ্টা করলুম সেই অতীতের প্রেত-লোকে প্রবেশ করতে। এখনকার সঙ্গে তার অন্তরবাহিরের মাপ মেলে না। তখনকার প্রদীপে যত ছিল আলো তার চেয়ে ধোঁওয়া ছিল বেশি। বুদ্ধির এলাকায় তখন বৈজ্ঞানিক সার্ভে আরম্ভ হয় নি, সম্ভব-অসম্ভবের সীমাসরহদের চিহ্ন ছিল পরস্পর জড়ানো। সেই সময়টুকুর বিবরণ যে ভাষায় গোঁথেছি সে স্বভাবতই হয়েছে সহজ, যথাসম্ভব ছেলেদেরই ভাবনার উপযুক্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমানুষি কল্পনাজাল মন থেকে কুয়াশার মতো যখন কেটে যেতে লাগল তখনকার কালের বর্ণনার ভাষা বদল করি নি, কিন্তু ভাবটা আপনিই শৈশবকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয় নি— কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর-বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে। সেইখানে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালে বোঝা যাবে কেমন ক’রে বালকের মনঃপ্রকৃতি বিচিত্র পারিপার্শ্বিকের আকস্মিক এবং অপরিহার্য সমবায়ের ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিবরণটাকেই ছেলেবেলা আখ্যা দেওয়ার বিশেষ সার্থকতা এই যে, ছেলেমানুষের বুদ্ধি তার প্রাণশক্তির বুদ্ধি। জীবনের আদিপর্বে প্রধানত সেইটেরই গতি অনুসরণ-যোগ্য। যে পোষণপদার্থ তার প্রাণের সঙ্গে আপনি মেলে বালক তাই চারি দিক থেকে সহজে আত্মসাৎ করে চলে এসেছে। প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী-দ্বারা তাকে মানুষ করবার চেষ্টাকে সে মেনে নিয়েছে অতি সামান্য পরিমাণেই।

এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা, সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হল কাহিনী, এ হল কাকলি; সেটা দেখা দিচ্ছে ঝড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে। ফলের সঙ্গে চার দিকের ডালপালাকে মিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছুকাল হল একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পড়ের ফিল্মে। বইটার নাম ‘ছড়ার ছবি’। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের। তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেলালের। এ বইটাতে বালভাষিত গড়ে।

বালক

বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা।
ছিল পাখির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পাররাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিঙ-পরে ভাকত এসে কাক।
ফেরিওয়াল হেঁকে যেত গলির ও পার থেকে
তপসিমাছের বুড়িখানা গামছা দিয়ে ঢেকে।
বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাড়া,
সঙ্ঘাতারার সুরে ঘেন সুর হত তাঁর সাধা।
জুটেছি বউদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে-ঘের-দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি ক'রে চাবির গোছা লুকিয়ে কুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।
কিশোরী চাটুজো হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে,
বাঁ হাতে তার খেলো হাঁকো, চাবির কাঁধে ঝোলে।
ক্রতলয়ে আউড়ে যেত সবকুশের ছড়া,
থাকত আমার খাতা লেখা, প'ড়ে থাকত পড়া;
মনে মনে ইচ্ছে হত যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে গুঠার দ্বায়ে,
গান শুনিবে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।
জ্বলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে
হঠাৎ দেখি, যেম নেমেছে ছাদের কাছে ঘেঁষে।
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে,
ঐরাবতের শুঁড় দেখা দেয় কল-ঢালা সব নলে।

অঙ্ককারে শোনা যেত রিম্মিমিনি ধারা,
রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা সে পথহারা ।
ম্যাপে যে-সব পাছাড় জানি, জানি যে-সব গাঙ
কুয়েন্লুন আর মিসিসিপি, ইয়াংসিকিয়াঙ—
জানার সঙ্গে আধেক-জানা, দূরের থেকে শোনা,
নানা রঙের নানা স্ততোয় সব দিবে জাল-বোনা,
নানারকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা
সব দিবে এক ছালকা জগৎ মন দিবে যোর ঘেরা—
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি
বানের জলে স্কাওলা যেমন, মেঘের তলে পাখি ।

শাস্তিনিকেতন

আষাঢ় ১৩৪৪

ছেলেবেলা

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকলে কলকাতায়। শহরে শাকরাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। তখন কালের এত বেশি হাঁসফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুয়া আপিসে যেতেন কবে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবতে চিবতে, কেউ বা পালকি চ'ড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। ধারা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-জাঁকা, চামড়ার আধঘোমটাওয়ালা, কোচবাক্সে কোচমান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা ছিল দরজাবন্ধ পালকির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদবৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেমসাহেবি; তার মানে, লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোনো মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পরপুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাঁদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরবার পালকিতেও; বড়োমানুষের ক্বিবউদের পালকির উপরে আরও একটা ঢাকা চাপা থাকত মোটা ঘেঁটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগলানো, দাড়ি চোমরানো, ব্যাঞ্জে টাকা আর কুটুমবাড়িতে মেয়েদের পৌছিয়ে দেওয়া, আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পালকি-স্বচ্ছ গজায় ডুবিয়ে আনা। দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনকা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বধরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষয় ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার সোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুণ্ডর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিঁদ্ধি খুঁটত, কখনো বা কাঁচা শাক-স্বচ্ছ মূলো খেত আরামে আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ'; সে যতই হাঁ-হাঁ করে হু হাত তুলত আমাদের জেন ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার অঙ্কে ঐ ছিল তার কন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি ; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার ডেজ বেধে আয়রা অযাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাল এসে জালিয়ে বেত রেড়ির তেলের আলো। আবারে পড়বার ঘরে জলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাস্টারমশায়' মিটমিটে আলোর পড়াতেন প্যারী সরকারের কার্ণটবুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বারবার শুনতে হত, মাস্টারমশায়ের অন্ত ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য বন, ঘুম পেলে চোখে নশ্তি ঘবে। আর আমি? সে কথা ব'লে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মূর্খু হয়ে থাকবার মতো বিল্ডি ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাজি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলু ঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহিরমহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়্‌খড়ির আক্র-দেওয়া, উপর থেকে কুলত মিটমিটে আলোর লঠন। চলতুম আর যন বলত কী জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্পে-গল্পবে, ছিল মাহুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুরির নাকি শর, দড়ায় করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ ঘরে-ভূতটা সবচেয়ে ছিল বদমেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন-পাতা-ওয়াল বাদামগাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পা'টা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি— তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন তখন চাকররা মনে করত লোকটার ধর্মজান একটুও নেই, দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিস্তে যাবে বেরিয়ে। সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলে ছিল যে, টেবিলের নীচে পা রাখলে পা হুড়্‌হুড়্‌ করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁধে ক'রে কলসী ড'রে বাঁধ-কাঙনের গদায় জল তুলে আনত। একতলার অঙ্ককার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালার সারা বছরের খাবার জল। নীচের তলার সেই-সব মাথাসেতে এঁখো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে বারো বাসা করে ছিল কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উলটো দিকে। সেই ভূতুড়ে ছায়ায় সামনে দিয়ে যখন বাড়িভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগাত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালি দিয়ে জোয়ারের সময় গভীর জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালির জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। এখন কপাট টেনে দেওয়া হস্ত-করকর কলকল করে বরনার মতো জল কেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উলটে দিকে মীঠার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিষে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি গাড়ি রাবিল। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ-ছায়া-পড়া আয়নাটা ঘেন গেল সরে। সেই বাদামগাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পাঁকাক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্তির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

২

পালকিখানা ঠাকুরমাদের আমলের। খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাঙা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের। হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা স্নাকড়ি, গায়ে লালরঙের হাতকাটা মেরজাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেয়ের মতো সাবেক ধনদৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পালকির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে কয়ে, দাগ ধরেছে যেখানে সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ ঘেন একালের নামকাটা আসবাব, পড়ে আছে খাতাকিধানীর বারান্দার এক কোণে। আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। এ সংসারে কোনো দরকারি কাজে আমার হাত ছিল না; আর ঐ পুরানো পালকিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এইজন্তেই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল। ও ঘেন সমুদ্রের গাঝখানে বোপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্সন্-ক্লুসো, বড় দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চার দিকের নজরবন্দি এড়িয়ে বসে আছি।

তখন আমাদের বাড়িভরা ছিল লোক, আপন পর কত তার ঠিকানা নেই; নানা মহলের চাকর দাসীর নানা দিকে হৈ হৈ জাক।

সামনের উঠোন দিয়ে প্যারীদাসী খায়া কাঁখে বাজার করে নিয়ে আসছে তরিতরকারি, দুখন বেহারা বাক কাঁখে গভীর জল আনছে, বাড়ির ভিতরে চলেছে তাঁতিনি নতুন-কাশান-পেড়ে খাড়ির সওয়া করতে, বাইনে-করা যে দিহু স্নাকরা গলির পাশের

ঘরে বসে হাপর ফোস ফোস ক'রে বাড়ির ফরমাশ খাটত সে আছে খাতাখানায় কানে-পালথের-কলম-মৌজা কৈলাস মুখের কাছে পাণ্ডার দাবি জানাতে; উঠানে বসে টং টং আওয়াজে পুরোনো লেপের তুলো ধুনছে ধুছরি। বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাচ কষছে। চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়, ডন কেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন। ভিখিরির দল বসে আছে বরাহ ভিকার আশা ক'রে।

বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘটা বেজে ওঠে; পালকির ভিতরকার দিনটা ঘটার হিসাব মানে না। সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভবের ডকা বাজত, রাজা যেতেন স্থানে, চন্দনের জলে। ছুটির দিন দুপুরবেলা যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়াদাওয়া সেবে ঘুম দিচ্ছে। একলা বসে আছি। চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পালকি, হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে যাবুয। চলার পথটা কাটা হয়েছে আমারই খেয়ালে। সেই পথে চলছে পালকি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে-সব দেশের বইপড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনো বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন ঘনের ভিতর দিয়ে। বাঘের চোখ জল্জল্ করছে, গা করছে ছম্ছম্। সঙ্গে আছে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল ছম্, ব্যাস্ সব চূপ। তার পরে এক সময়ে পালকির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি, ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙা যায় না দেখা। দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ছপ্ ছপ্ছপ্, চেউ উঠতে থাকে হুলে হুলে ফুলে ফুলে। মাল্লারা বলে ওঠে, সামাল সামাল, ঝড় উঠল। হালের কাছে আবহুল ঝাঝি, ছুঁচলো তার দাড়ি, গৌফ তার কামানো, মাথা তার নেড়া। তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশমাছ আর কচ্ছপের ডিম।

সে আমার কাছে গল্প করেছিল— একদিন চস্তির মাসের শেষে ভিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী। ভীষণ তুফান, নৌকো ভোবে ভোবে। আবহুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁথরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ভিঙি। গল্পটা এত শিগ্গির শেষ হল, আমার পছন্দ হল না। নৌকোটা ডুবল না, অমনিই বেঁচে গেল, এ তো গপ্পাই নয়। বারবার বলতে লাগলুম 'তার পর' ?

সে বললে, 'তার পর সে এক কাণ্ড। দেখি, এক নেকড়ে বাঘ। ইয়া তার গৌকজোড়া। ঝড়ের সময়ে সে উঠেছিল ও পারে গজের ঘাটের পাকড় গাছে। দমকা হাওয়া যেমনি লাগল গাছ পড়ল ভেঙে পড়ায়। বাঘ তারা ভেসে যায় জলের তোড়ে।

খাবি খেতে খেতে উঠল এসে চরে। তাকে দেখেই আমার রশিতে লাগালুম ফাঁস। জানোয়ারটা এতো বড়ো চোখ পাঁকিয়ে দাঁড়ালো আমার সামনে। সীতার কেটে তার জমে উঠেছে ঘিমে। আমাকে দেখে তার লাল-টকটকে জিভ দিয়ে নাল ঝরতে লাগল। বাইরে ভিতরে অনেক ঝাঙ্কনের সঙ্গে তার চেনাশোনা হয়ে গেছে, কিন্তু আবহুলকে সে চেনে না। আমি ডাক দিলুম ‘আও বাচ্ছা’। সে সামনের দু পা ভুলে উঠেই দিলুম তার গলায় ফাঁস আটকিয়ে, ছাড়াবার জন্যে বতাই ছটফট করে বতাই ফাঁস এঁটে গিয়ে তার জিভ বেরিয়ে পড়ে।

এই পর্যন্ত শুনেই আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, ‘আবহুল, সে মরে গেল নাকি।’

আবহুল বললে, ‘মরবে তার বাপের সাধি কী। নদীতে বান এসেছে, বাহাদুরগঞ্জে ফিরতে হবে তো? ডিঙির সঙ্গে জুড়ে বাঘের বাচ্ছাকে দিয়ে গুল টানিয়ে নিলেম অন্তত বিশ ক্রোশ রাস্তা। গৌ গৌ করতে থাকে, পেটে দিই দাঁড়ের খোঁচা, দশ-পনেরো ঘণ্টার রাস্তা দেড় ঘণ্টায় পৌঁছিয়ে দিলে। তার পরেকার কথা আর জিগ্গেস কোরো না বাবা, জবাব মিলবে না।’

আমি বললুম, ‘আচ্ছা বেশ, বাঘ তো হল, এবার কুমির?’

আবহুল বললে, ‘জলের উপর তার নাকের ডগা দেখেছি অনেকবার। নদীর ঢালু ডাঙায় লম্বা হয়ে শুয়ে সে যখন রোদ পোহায়, মনে হয় তারি বিচ্ছিরি হাসি হাসছে। বন্ধু থাকলে মোকাবিলা করা যেত। লাইসেন্স ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু যজ্ঞ হল। একদিন কাঁচি বেদেনি ডাঙায় বসে দাঁ দিয়ে বাধারি চাঁচছে, তার ছাগলছানা পাশে বাঁধা। কখন নদীর থেকে উঠে কুমিরটা পাঠার ঠ্যাঙ ধরে জলে টেনে নিয়ে চলল। বেদেনি একেবারে লাফ দিয়ে বসল তার পিঠের উপর। দাঁ দিয়ে ঐ দানো-গিরগিটির গলায় পৌঁচের উপর পৌঁচ লাগাল। ছাগলছানা ছেড়ে জন্তটা ডুবে পড়ল জলে।’

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, ‘তার পরে?’

আবহুল বললে, ‘তার পরেকার খবর তলিয়ে গেছে জলের তলায়, ভুলে আনতে দেয়ি হবে। আসছে-বার যখন দেখা হবে চর পাঠিয়ে খোঁজ নিয়ে আসব।’

কিন্তু আর তো সে আসে নি, হয়তো খোঁজ নিতে গেছে।

এই তো ছিল পালকির ভিতর আমার সন্ধ্যা; পালকির বাইরে এক-একদিন ছিল আমার বাস্টারি, রেলিঙগুলো আমার ছাদ। ডরে থাকত চুপ। এক-একটা ছিল তারি দুই, পড়াশুনোর কিছুই মন নেই; ডর দেখাই যে বড়ো হলে কুলিগিরি করতে

হবে। আর খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, ছুঁইনি খামতে চার না, কেননা খামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আরও একটা খেলা ছিল, সে আমার কাঠের সিঁড়িকে নিয়ে। পুজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঁড়িকে বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাঠি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। মস্তুর বানাতে হয়েছিল, নইলে পুজো হয় না।—

সিঁড়িমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলুকুট ঢুলুকুট ঢামুকুড়কুড়,
আখরোট বাখরোট খট খট খটাস
পট পট পটাস।

এর মধ্যে প্রায় সব কথাই ধার-করা, কেবল আখরোট কথাটা আমার নিজের। আখরোট খেতে ভালোবাসতুম। খটাস শব্দ থেকে বোঝা যাবে আমার খাঁড়াটা ছিল কাঠের। আর পটাস শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে সে খাঁড়া মজবুত ছিল না।^১

৩

কাল রাত্তির থেকে মেঘের কামাই নেই। কেবলই চলছে বৃষ্টি। গাছগুলো বোকার মতো জ্বুজ্বু হয়ে রয়েছে। পাখির ডাক বন্ধ। আজ মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলাকার সন্ধ্যাবেলা।

তখন আমাদের ঐ সময়টা কাটত চাকরদের মহলে। তখনও ইংরেজি শব্দের বানান আর মানে-মুখস্থর বুক-খড়াস সন্ধ্যাবেলার ঘাড়ে চেপে বসে নি। সেজদাদা^২ বলতেন, আগে চাই বাংলা ভাষার গাঁথুনি, তার পরে ইংরেজি শেখার পত্তন। তাই যখন আমাদের বয়সী ইস্কুলের সব পোড়োরা গড়গড় করে আউড়ে চলেছে I am up আমি হই উপরে, He is down তিনি হন নীচে, তখনও বি-এ-ডি ব্যাড এম-এ-ডি ম্যাড পর্যন্ত আমার বিস্তে পৌছয় নি।

নবাবি জবানিতে চাকর-নোকরদের মহলকে তখন বলা হত তোশাখানা। যদিও সেকালে আমরা দশা থেকে আমাদের বাড়ি নেবে পড়েছিল অনেক নীচে, তবু তোশাখানা দফতরখানা বৈঠকখানা নামগুলো ছিল ভিত্তি আঁকড়ে।

১ ক্রীড়া 'কাঠের সিঁড়ি'— ছড়ায় হবি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, এককিলে খণ্ড

২ মেয়েজাদাও ঠাকুর

সেই জোশাখানার দক্ষিণ ভাগে বড়ো একটা ঘরে কাঁচের সেজে রেড়ির তেলে আলো জলছে মিট মিট করে, গণেশমার্কী ছবি আর কালীমায়ের পট রয়েছে দেয়ালে, তারই আশেপাশে টিকটিকি রয়েছে পোকা-শিকারে। ঘরে কোনো আসবাব নেই, মেজের উপরে একখানা ময়লা মাদুর পাতা।

জানিয়ে রাখি আমাদের চাল ছিল গরিবের মতো। গাড়িঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরে কোণের দিকে তেঁতুল গাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকিগাড়ি আর একটা বড়ো ঘোড়া। পরনের কাপড় ছিল নেহাত সাদাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে। যখন ব্রজেশ্বরের ফর্দ এড়িয়ে জলপানে বরাদ্দ হল পাঁউরুটি আর কলাপাতা-মোড়া মাখন, মনে হল আকাশ যেন হাতে নাগাল পাওয়া গেল। সাবেক কালের বড়োমহিষির ভয়দশা সহজেই মনে নেবার তালিম চলছিল।

আমাদের এই মাদুর-পাতা আসরে যে চাকরটি ছিল সর্দার তার নাম ব্রজেশ্বর। চুলে গোঁফে লোকটা কাঁচাপাকা, মুখের উপর টানপড়া শুকনো চামড়া, গম্ভীর মেজাজ, কড়া গলা, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা। তার পূর্ব মনিষ ছিলেন লক্ষ্মীমন্ড, নামডাকওয়াল। সেখান থেকে তাকে নাবতে হয়েছে আমাদের মতো হেলায়-মাদুর ছেলেদের খবরদারির কাজে। শুনেছি গ্রামের পাঠশালায় সে গুরুগিরি করেছে। এই গুরুমশায়ি ভাষা আর চাল ছিল তার শেষ পর্যন্ত। বাবুরা 'বসে আছেন' না বলে সে বলত 'অপেক্ষা করে আছেন'। শুনে মনিষরা হাসাহাসি করতেন। যেমন ছিল তার গুমোর তেমনি ছিল তার শুচিবাই। স্নানের সময় সে পুকুরে নেমে উপরকার তেলভাঙ্গা জল দুই হাত দিয়ে পাঁচ-সাতবার ঠেলে দিয়ে একেবারে রূপ করে দিত ডুব। স্নানের পর পুকুর থেকে উঠে বাগানের রাস্তা দিয়ে ব্রজেশ্বর এমন ভঙ্গীতে হাত ঝাঁকিয়ে চলত যেন কোনোমতে বিধাতার এই নোংরা পৃথিবীটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে পারলেই তার জাত বাঁচে। চাল চলনে কোন্টা ঠিক, কোন্টা ঠিক নয়, এ নিয়ে খুব ঝোঁক দিয়ে সে কথা কইত। এ দিকে তার ঘাড়টা ছিল কিছু ঝাঁক, তাতে তার কথার মান বাড়ত। কিন্তু ওরই মধ্যে একটা খুঁত ছিল গুরুগিরিতে। ভিতরে ভিতরে তার আহারের লোভটা ছিল চাপা। আমাদের পাতে আগে থাকতে ঠিকমত ভাগে খাবার সাজিয়ে রাখা তার নিয়ম ছিল না। আমরা খেতে বসলে একটি একটি করে লুচি আলগোছে ছলিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করত, 'আর দেব কি।' কোন্ উত্তর তার মনের মতো সেটা বোঝা যেত তার গলায় স্বরে। আমি প্রায়ই বলতুম, 'চাই নে।' তার পরে আর সে পীড়াপীড়ি করত না। ছুধের বাটিটার 'পরেও তার অসামান্য রকমের টান

ছিল, আমার মোটে ছিল না। শেলফওয়ালা একটা খাটো আলমারি ছিল তার ঘরে। তার মধ্যে একটা বড়ো পিড়লের বাটিতে থাকত তুখ, আর কাঠের বারকোশে লুচি তরকারি। বিড়ালের লোভ জ্বালের বাইরে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়াত।

এমনি করে অল্প খাওয়া আমার ছেলেবেলা থেকেই দিবা সন্ধ্যা গিয়েছিল। সেই কম খাওয়াতে আমাকে কাহিল করেছিল এমন কথা বলবার জো নেই। যে ছেলেরা খেতে কষ্ট করত না তাদের চেয়ে আমার গায়ের জোর বেশি বই কম ছিল না। শরীর এত বিস্ত্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোক যখন হয়মান করে দিত তখনও শরীরে কোনোরকম জ্বলুমের জ্বায়েও ব্যামো ঘটতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজ, গলার মধ্যে একটু খুশখুশনি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর পেট-কাষড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা ভাগির পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে, কেবল দরকারমত মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। শুনে মা মনে মনে হাসতেন, একটুও ভাবনা করতেন বলে মনে হয় নি। তবু চাকরকে ডেকে বলে দিতেন, ‘আচ্ছা বা, মাস্টারকে জানিয়ে দে, আজ আর পড়াতে হবে না।’ আমাদের সেকলে মা মনে করতেন, ছেলে মাঝে মাঝে পড়া কামাই করলে এতই কি লোকসান। এখনকার মায়ের হাতে পড়লে মাস্টারের কাছে ভো ফিরে যেতেই হত, তার উপরে খেতে হত কানমলা। হয়তো বা মূচকি হেসে গিলিয়ে দিতেন ক্যান্টর অয়েল। চিরকালের জন্যে আরাম হত ব্যামোটা। দৈবাৎ কখনো আমার জ্বর হয়েছে ; তাকে কেউ জ্বর বলত না, বলত গা-গরম। আসতেন নীলমাধব ডাক্তার। খার্মোমিটার তখন চক্ষেও দেখি নি ; ডাক্তার একটু গায়ে হাত দিয়েই প্রথম দিনের ব্যবস্থা করতেন ক্যান্টর অয়েল আর উপোস। জল খেতে পেতুম অল্প একটু, সেও গরম জল। তার সঙ্গে এলাচদানা চলতে পারত। তিন দিনের দিনই মৌরলা মাতের কোল আর গলা ভাত উপোসের পরে ছিল অব্যত।

জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-খরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ ডেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে কোড়াকটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হায বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একান্তই রকমের ভালো। মায়েরা যদি ছেলেদের শরীর এতটা নীকসী রাখতে চান যাতে মাস্টারের হাত এড়াতে না পারে তা হলে ব্রজেশ্বরের মতো চাকর খুঁজে বের করবেন। খাবার-খরচার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাঁচাবে ডাক্তার-খরচা ; বিশেষ করে এই কলের ভাঁটার মরদা আর এই ডেজাল-

দেওয়া দি-ভেলের দিনে। একটা কথা মনে রাখা দরকার, তখনও বাজারে চকোলেট দেখা দেয় নি। ছিল এক পরসাদা দামের গোলাপি-রেউড়ি। গোলাপি গন্ধের আমেজ-দেওয়া এই ভিলে-ঢাকা চিনির ডালা আজও ছেলেদের পকেট চট্‌চটে ক'রে তোলে কি না জানি নে— নিশ্চয়ই এখনকার মানী লোকের ঘর থেকে লজ্জায় দৌড় ঘেঁরেছে। সেই ভাজা মগলার ঠোঁড়া গেল কোথায়। আর সেই সস্তা দামের ভিলে গজা? সে কি এখনও টিকে আছে। না থাকে তো তাকে ফিরিয়ে আনার দরকার নেই।

ব্রহ্মবরের কাছে সন্ধ্যাবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কুস্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্যো। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল স্মরণসম্ভব তার মুখস্থ। সে হঠাৎ আসন দখল করে কুস্তিবাসকে ছাপিয়ে দিয়ে হু হু করে আউড়িয়ে যেত তার পাঁচালির পালা। ‘গুরে রে লক্ষণ, এ কী অলক্ষণ, বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ।’ তার মুখে হাসি, মাথায় টাক ঝক্ ঝক্ করছে, গলা দিয়ে ছড়া-কাটা লাইনের স্বর বাজিয়ে চলছে, পদে পদে শব্দের মিলগুলো বেজে ওঠে যেন জলের নিচেকার বুড়ির আওয়াজ। সেই সঙ্গে চলত তার হাত পা নেড়ে ভাব-বাংলানো। কিশোরী চাটুজ্যোর সবচেয়ে বড়ো আপসোস ছিল এই যে, দাদাভাই অর্থাৎ কিনা আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভরতি হতে পারলুম না। পারলে দেশে যা-হয় একটা নাম থাকত।

রাত হয়ে আসত, মাতুর-পাতা বৈঠক যেত ভেঙে। ভূতের ভয় শিরদাঁড়ার উপর চাপিয়ে চলে যেতুম বাড়ির ভিতরে মায়ের ঘরে। মা তখন তাঁর খুড়িকে নিয়ে তাস খেলছেন। পংখের-কাজ-করা ঘর হাতির দাঁতের মতো চক্‌চকে, মস্ত তরুপোশের উপর জাম্বিয় পাতা। এমন উৎপাত বাধিয়ে দিতুম যে তিনি হাতের খেলা কলে দিয়ে বলতেন, ‘জালাতন করলে, বাও খুড়ি, ওদের গল্প শোনাও গে।’ আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটির জলে পা ধুয়ে দ্বিধম্বাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুক হুত দৈতাপুরী থেকে রাজকুমার-ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা। মাঝখানে আমারই ঘুম ভাঙার কে। রাতের প্রথম পহরে শেয়াল উঠত ডেকে। তখনও শেয়াল-ডাকা রাত কলকাতার কোনো কোনো পুরোনো বাড়ির ভিতের নীচে কুকরে উঠত।

৪

আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন সন্ধ্যাবেলায় কলকাতা শহর এখনকার মতো এত বেশি সজাগ ছিল না। এখনকার কালে সূর্যের আলোর দিনটা যেমনি ফুরিয়েছে অমনি শুরু হয়েছে বিজলি আলোর দিন। সে সময়টাতে শহরে কাজ কম কিন্তু

বিশ্রাম নেই। উলুনে ঘেন জলা কাঠ নিভেছে তবু কয়লায় রয়েছে আগুন। তেলকল চলে না, স্টিমারের বাঁশি থেমে থাকে, কারখানাঘর থেকে মজুরের দল বেরিয়ে গেছে, পাটের-গাঁট-টানা গাড়ির মোষগুলো গেছে টিনের চালের নীচে শহরে গোষ্ঠে। সমস্ত দিন যে শহরের মাথা ছিল নানা চিন্তায় ভেঙে আগুন, এখনও তার নাড়িগুলো ঘেন দব দব করছে। রাস্তার দু ধারে দোকানগুলোতে কেনাবেচা ভেমনি আছে, কেবল সামান্য কিছু ছাই-চাপা। রকম-বেরকমের গোড়ানি দিতে দিতে হাওয়াগাড়ি ছুটেছে দশ দিকে; তাদের দৌড়ের পিছনে গরজের ঠেলা কম।

আমাদের সেকালে দিন ফুরলে কাজকর্মের বাড়তি ভাগ যেন কালো কয়ল মুড়ি দিয়ে চূপচাপ গুয়ে পড়ত শহরের বাতি-নেবানো নীচের তলায়। ঘরে-বাইরে সজ্জায় আকাশ থম্ থম্ করত। ইডেন গার্ডেনে গজার ধারে শৌখিনদের হাওয়া খাইয়ে নিয়ে ফেরবার গাড়িতে সইসদের হৈ হৈ শব্দ রাস্তা থেকে শোনা যেত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে রাস্তায় ফেরিওয়ালা হৈকে যেত 'বরীফ'। ইাড়িতে বরফ-দেওয়া নোনতা জলে ছোটো ছোটো টিনের চোঙে থাকত যাকে বলা হোত কুলফির বরফ, এখন যাকে বলে আইস কিংবা আইসক্রীম। রাস্তার দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই ডাকে মন কী রকম করত তা মনই জানে। আর-একটা ইাক ছিল 'বেলফুল'। বসন্তকালের সেই মালীদের ফুলের বুড়ির খবর আজ নেই, কেন জানি নে। তখন বাড়িতে মেয়েদের খোঁপা থেকে বেলফুলের গোড়ে মালার গন্ধ ছড়িয়ে যেত বাতাসে। গা ধুতে বাবার আগে ঘরের সামনে বসে সমুখে হাত-আঁমনা রেখে মেয়েরা চুল বাঁধত। বিছুনি-করা চুলের দড়ি দিয়ে খোঁপা তৈরি হত নানা কারিগরিতে। তাদের পরনে ছিল করাসডাঙার কালাপেড়ে শাড়ি, পাক দিয়ে কুঁচকিয়ে তোলা। নাপত্তিনি আসত, কামা দিয়ে পা ঘসে আলতা পরাত। মেয়েমহলে তারাই লাগত খবর-চালাচালির কাজে। ট্রানের পায়দানের উপর ভিড় করে কলেক্স আর আপিস ফেরার দল ফুটবল খেলার ময়দানে ছুটত না। ফেরবার সময় তাদের ভিড় জমত না সিনেমা-হলের সামনে। নাটক-অভিনয়ের একটা কুঁতি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু কী আর বলব, আমরা সে সময়ে ছিলুম ছেলেমানুষ।

তখন বড়োদের আয়োজে ছেলেরা দূর থেকেও ভাগ বসাতে পেত না। যদি সাহস করে কাছাকাছি যেতুম তা হলে শুনতে হত 'বাও খেলা করো পে', অথচ ছেলেরা খেলায় যদি উচিতরত গোল করত তা হলে শুনতে হত 'চূপ করো'। বড়োদের আয়োজি-আহ্বান সবসময় খুব যে চূপচাপে সারা হত তা নয়। তাই দূর থেকে কখনো কখনো স্বরনার ফেনার মতো তার কিছু কিছু পড়ত ছিটকিরে আমাদের

দিকে। এ বাড়ির বারান্দায় বুক পড়ে থাকতুম, দেখতুম ও বাড়ির নাচঘর আলোয় আলোয়। দেউড়ির সামনে বড়ো বড়ো জুড়িগাড়ি এসে জুটেছে। সদর দরজার কাছ থেকে দাদাদের কেউ কেউ অতিথিদের উপরে আগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। গোলাপপাখি থেকে গায়ে গোলাপজল ছিটিয়ে দিচ্ছেন, হাতে দিচ্ছেন ছোটো একটি করে তোড়া। নাটকের থেকে কুলীন মেয়ের ফুঁপিয়ে কারা কখনো কখনো কানে আসে, তার মর্ম বুঝতে পারি নে। বোঝবার ইচ্ছেটা হয় প্রবল। খবর পেতুম যিনি কাঁদতেন তিনি কুলীন বটে, কিন্তু তিনি আমার ভয়ীপতি।^১ তখনকার পরিবারে যেমন মেয়ে আর পুরুষ ছিল দুই সীমানায় দুই দিকে, তেমনি ছিল ছোটোরা আর বড়োরা। বৈঠকখানায় ঝাড়-লঠনের আলোয় চলছে নাচগান, গুড়গুড়ি টানছেন বড়োর দল, মেয়েরা লুকনো থাকতেন স্বরোধার ও পারে, চাপা আলোয় পানের বাটা নিয়ে, সেখানে বাইরের মেয়েরা এসে জমতেন, কিস্কিস করে চলত গেরস্তালির খবর। ছেলেরা তখন বিছানায়। পিয়ারী কিংবা শংকরী গল্প শোনাচ্ছে, কানে আসছে—

‘জোচ্ছনার ঘেন ফুল ফুটেছে—’

৫

আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনীঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। মিহিগলা-গুয়ালা ছেলেদের বাছাই করে নিয়ে দল বীথার ধুম ছিল। আমার মেজকাকা^২ ছিলেন এই-রকম একটি শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল তারি নেশা। এ পাড়ায় ও পাড়ায় এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। দলকর্তা অধিকারীরা সবাই যে জাতে বড়ো কিংবা লেখাপড়ায় এমন-কিছু তা নয়। তারা নাম করেছে আপন কুমতায়। আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে যাবে যাবে। কিন্তু রাস্তা নেই, ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগাড়সম্বর। বারান্দা জুড়ে বসে গেছে দলবল, চারি দিকে উঠছে তাবাকের ধোঁয়া। ছেলেগুলো লম্বা-চুল-গুয়ালা, চোখে-কালি-পড়া, অল্প বয়সে তাদের মুখ গিয়েছে পেকে। পান খেয়ে খেয়ে ঠোট

১ যহুনাথ মুখোপাধ্যায়, পরবর্ত্তী, মেঘের বাঘী

২ দিলীপনাথ ঠাকুর, “যাবুবিলাস” নাটকের লেখক

গিয়েছে কালো হয়ে। সাজগোজের আসবাব আছে রঙকরা টিনের বাজায়। দেউড়ির দরজা খোলা, উঠানে পিল পিল করে ঢুকে পড়ছে লোকের ভিড়। চার দিকে টগবগ করে আওয়াজ উঠছে, ছাপিয়ে পড়ছে গলি পেরিয়ে চিংপুরের রাস্তায়। রাজি হবে ন'টা, পান্থরার পিঠের উপর বাজপাখির মতো হঠাৎ এসে পড়ে শ্রাম, কড়া-পড়া শব্দ হাতের মুঠি দিয়ে আমার কনুই ধরে বলে, 'মা ডাকছে, চলো শোবে চলো।' লোকের সামনে এই টানাহেঁচড়ায় মাথা হেঁট হয়ে যেত, হার মেনে চলে যেতুম শোবার ঘরে। বাইরে চলছে হাঁকডাক, বাইরে জগছে ঝাড়লঠন, আমার ঘরে সাড়াশব্দ নেই, পিলহুজের উপর টিম টিম করছে পিতলের প্রদীপ। ঘুমের ঘোরে মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে নাচের তাল সমে এসে ঠেকতেই ঝমঝম করতাল।

সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরল, ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল নলদমরুস্তীর পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটো পর্যন্ত বিছানায় ছিলাম ঘুমিয়ে। বারবার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তর আনি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, কেননা তাঁরা বড়ো আমরা ছোটো।

সে রাতে নারাজ মেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন, আর-একটা কারণ ন'টার পরে নিম্নে কয়েক জাগিয়ে রাখতে বেশ-একটু ঠেলাঠেলির দরকার হত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হল বাইরে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একডালার দোতলার রঙিন ঝাড়লঠন থেকে ঝিলিঝিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত। এক দিকে বসে আছেন বাড়ির কর্তারা আর যাদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটারে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-কোলানো নামজাদার দল, আর এই যাত্রার আসরে বড়ো ছোটোয় ঘেঁষাঘেঁষি। তাঁদের বেশির ভাগ মানুষই, শুধু-লোকেরা যাদের বলে বাজ্ঞে লোক। তেমনি আবার পালাগানটা লেখানো হয়েছে এমন-সব লিখিয়ে দিয়ে যারা হাত পাকিয়েছে খাগড়া কলমে, যারা ইংরেজি কপিবুকের মক্শো করে নি। এর সুর, এর নাচ, এর সব গল্প বাংলাদেশের হাট ঘাট মাঠের পরমা-করা; এর ভাষা পণ্ডিতমশায় মেন নি পালিশ করে।

সত্যি যখন দাদাদের কাছে এসে বসলুম, ক্রমায়ে কিছু কিছু টাকা বেঁধে আমাদের হাতে দিয়ে দিলেন। বাহবা দেবার ঠিক জায়গাটাতে ঐ টাকা ছুঁড়ে দেওয়া ছিল রীতি। এতে বাজ্ঞাওয়ালার ছিল উপরি পাওনা, আর গৃহস্থের ছিল খোশনাম।

রাত্তি ফুরোত, যাত্রা ফুরোতে চাইত না। মাঝখানে নেতিয়ে-পড়া দেহটাকে আড়কোলা করে কে যে কোথায় নিয়ে গেল জানতেও পারি নি। জানতে পারলে সে কি কম লজ্জা। যে মানুষ বড়োদের সমান সারে বসে বকশিণ দিচ্ছে ছুঁড়ে, উঠোনস্থল লোকের সামনে তাকে কিনা এমন অপমান। ঘুম বধন ভাঙল দেখি মায়ের তক্তপোশে শুয়ে আছি। বেলা হয়েছে বিস্তর, কাঁ কাঁ করছে রোদ্দুর। নুর্ধ উঠে গেছে অথচ আমি উঠি নি, এ ঘটে নি আর কোনোদিন।

শহরে আজকাল আশোদ চল নদীর স্রোতের মতো। মাঝে-মাঝে তার ফাঁক নেই। রোজই যেখানে-সেখানে বধন-তখন সিনেমা, যে খুশি ঢুকে পড়ছে সামান্য ধরচে। সেকালে যাত্রাগান ছিল যেন শুকনো গাঙে কোণ-তুকোশ অন্তর বালি খুঁড়ে জল তোলা। ঘণ্টা কয়েক তার মেঘাদ, পথের লোক হঠাৎ এসে পড়ে, আঁজলা ভরে তেঁটা নেয় মিটিয়ে।

আগেকার কালটা ছিল যেন রাজপুত্র। মাঝে মাঝে পালপার্বণে বধন মজি হত আপন এলেকার করত দান-খয়রাত। এখনকার কাল সদাগরের পুত্র, হরেক বকমের বক্বকে মাল সাজিয়ে বসেছে সদর রাস্তার চৌমাথায়। বড়ো রাস্তা থেকে বন্ধের আসে, ছোটো রাস্তা থেকেও।

৬

চাকরদের বড়োকর্তা ব্রজেশ্বর। ছোটোকর্তা যে ছিল তার নাম শ্রাম—বাড়ি যশোরে, খাঁটি পাড়ার্গেয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ি নয়। সে বলত, ভেনারা, ওনারা, বাতি হবে, বাতি হবে, যুগির ডাল, কুলির আদল। 'দোমনি' ছিল তার আদরের ডাক। তার রঙ ছিল শ্রামবর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেল-চুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারী শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা। ছেলেদের 'পরে তার ছিল দরদ। তার কাছে আমরা ডাকাতেই গল্প শুনতে পেতুম। তখন ভূতের ভয় যেমন মানুষের মন জুড়ে ছিল তেমনি ডাকাতেই গল্প ছিল ঘরে ঘরে। ডাকাতি এখনো কম হয় না—খুনও হয়, অখমও হয়, লুটও হয়, পুলিশও ঠিক লোককে ধরে না। কিন্তু এ হল ধবর, এতে গল্পের মজা নেই। তখনকার ডাকাতি গল্পে উঠেছিল দানা বেঁধে, অনেকদিন পর্যন্ত মুখে মুখে চারিয়ে গেছে। আমরা বধন জন্মেছি তখনো এমন-সব লোক দেখা যেত যারা সমর্থ বয়সে ছিল ডাকাতেই মলে। বস্ত বস্ত সব লাঠিয়াল, সঙ্গে সঙ্গে চলে লাঠিখেলার সাজেদ। তাদের নাম শুনলেই লোকে সেলায় করত। প্রায়ই ডাকাতি

তখন গৌরারের মতো নিছক খুনখারাবির ব্যাপার ছিল না। তাতে যেমন ছিল বুকের পাটা তেমনি দরাজ মন। এ দিকে ভদ্রলোকের ঘরেও লাঠি দিবে লাঠি ঠেকাবার আখড়া বসে গিয়েছিল। যারা নাম করেছিল ডাকাতরাও তাদের মানত ওস্তাদ বলে, এড়িয়ে চলত তাদের সীমানা। অনেক জমিদারের ডাকাতি ছিল ব্যাবসা। গল্প শুনেছি, সেই জাতের একজন দল বসিয়ে রেখেছিল নদীর মোহানায়। সেদিন অমাবস্তা, পুজোর রাত্রির, কালী কঙ্কালীর নামে মুণ্ড কেটে মন্দিরে বধন নিয়ে এসে জমিদার কপাল চাপড়ে বললে, 'এ যে আমারই জামাই !'

আরও শোনা যেত রঘুডাকাত বিত্তডাকাতের কথা। তারা আগে থাকতে ধবর দিয়ে ডাকাতি করত, ইতরপনা করত না। দূর থেকে তাদের হাঁক শুনে পাড়ার রক্ত যেত হিম হয়ে। মেয়েদের গায়ে হাত দিতে তাদের ধর্ম ছিল মানা। একবার একজন মেয়ে খাঁড়া হাতে কালী সেজে উল্টে ডাকাতের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করেছিল।

আমাদের বাড়িতে একদিন ডাকাতের খেলা দেখানো হয়েছিল। মস্ত মস্ত কালো কালো জোয়ান সব, লম্বা লম্বা চুল। ঢেঁকিতে চাদর বেঁধে সেটা দাঁতে কামড়ে ধরে দিলে ঢেঁকিটা টপকিয়ে পিঠের দিকে। কাঁকড়া চুলে মাহুঘ ছলিয়ে লাগল ঘোরাতে। লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠল দোতলায়। একজনের দুই হাতের ফাঁক দিয়ে পাখির মতো স্ট করে বেরিয়ে গেল। দশ-বিশ কোণ ঘুরে ডাকাতি সেরে সেই রাত্রেই ভালোমাহুঘের মতো ঘরে ফিরে এসে শুয়ে থাকা কেমন করে হতে পারে, তাও দেখালে। খুব বড়ো একঝোড়া লাঠির মাঝখানে আড়-করা একটা করে পা রাখবার কাঠের টুকরো বাদ্য। এই লাঠিকে বলে রঙপা। দুই হাতে দুই লাঠির আগা ধরে সেই পাদানের উপর পা রেখে চললে এক পা ফেলা দশ পা ফেলার সামিল হত, ঘোড়ার চেয়ে দৌড় হত বেশি। ডাকাতি করবার মতলব যদিও মাথায় ছিল না তবু এক সময়ে এই রঙপায় চলার অভ্যাস তখনকার শাস্তিনিকেতনে ছেলেদের মধ্যে চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। ডাকাতি খেলার এই ছবি জামের মুখের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে কতবার সঙ্গে কাটিয়েছি দু হাতে পাঞ্জর চেপে ধরে।

ছুটির রবিবার। আগের সন্ধ্যাবেলার ঝিঝি ডাকছিল বাইরের দক্ষিণের বাগানের ঝোপে, গল্পটা ছিল রঘু ডাকাতের। ছায়া-কাঁপা ঘরে বিটুবিটে আলোতে বুক করছিল ধুক ধুক। পরদিন ছুটির ফাঁকে পালকিতে চড়ে বসলুম। সেটা চলতে শুরু করল বিনা চলার, উড়ো ঠিকানায়, গল্পের জালে জড়ানো মনটাকে ভয়ের স্বাদ দেবার জন্যে। নিম্ন অঙ্ককারের নাড়িতে যেন তালে তালে বেজে উঠছে বেহারাজুলোর হাই হাই হাই হাই, গা করছে ছম ছম। ধূ ধূ করে মাঠ, বাজার কাঁপে

রোদুরে। নূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল। চিক চিক করে বাজি।
ভাঙার উপর থেকে ঝুঁকে পড়েছে কাটল-ধরা ঘাটের দিকে ডালপালা-ছড়ানো পাকুড়
গাছ।

গল্পের আভাস জমা হয়ে আছে না-জানা মাঠের গাছতলায়, ঘন বেতের ঝোপে।
যত এগোচ্ছি ছুর ছুর করছে বুক। বাঁশের লাঠির আগা দুই-একটা দেখা যায়
ঝোপের উপর দিকে। কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখানে। জল খাবে,
ভিজে গামছা জড়াবে মাথায়। তার পরে ?—

‘রে রে রে রে রে রে!’

৭

সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনোর জাঁতাকল চলছেই। ঘরঘর শব্দে এই কলে
দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া
শাসনকর্তা। তবু তার তাকে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে।
তিনি আমাদের মনে বড়টা বেশি মাল বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই
ভিড়ি উলটিয়ে তুলিয়ে গেছে, এ কথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার
বিগেটা লোকসানি মাল। সেজদাদা তাঁর বড়ো মেয়েকে শিখিয়ে তুলতে লেগেছিলেন।
বধাসময়ে তাকে দিয়েছিলেন লোরেটোতে ভরতি করে। তার পূর্বেই তার ভাষায়
প্রথম মঞ্চল হয়ে গেছে বাংলায়।

প্রতিভাকে বিলিতি সংগীতে পাকা করে তুললেন। তাতে করে তাকে বিশি
গানের পথ তুলিয়ে দেওয়া হয় নি সে আমরা জানি। তখনকার দিনে ভদ্র পরিবারে
হিন্দুস্থানি গানে তার সমান কেউ ছিল না।

বিলিতি সংগীতের গুণ হচ্ছে তাতে স্বর সাধানো হয় খুব খাঁটি করে, কান
দোরস্ত হয়ে যায়, আর পিয়ানোর শাসনে তালেও ঢিলেমি থাকে না।

এ দিকে বিষ্ণুর কাছে বিশি গান শুক হয়েছে শিশুকাল থেকে। গানের এই
পাঠশালায় আমাকেও ভরতি হতে হল। বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার
কালের কোনো নায়ী বা বেনায়ী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে স্বপ্না করবেন। সেগুলো
পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের ডলায়। দুই-একটা নমুনা দিই—

এক যে ছিল বেদের মেয়ে

এল পাড়াতে

মাথের উলকি পরাতে।

আবার উলকি পরা ঘেমন-ভেমন

লাগিয়ে দিল ভেলকি

ঠাকুরঝি,

উলকির জালাতে কত কৈদেছি

ঠাকুরঝি।

আরও কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে। যেমন—

চন্দ্র সূর্য হার যেনেছে, জোনাক জালে বাতি।

যোগল পাঠান হৃদ হল,

ফার্সি পড়ে তাঁতি।

...

গণেশের মা, কলাঘটকে জালা দিয়ে না,

তার একটি মোচা ফললে পরে

কত হবে ছানাপোনা।

অতি পুরোনো কালের ভুলে-যাওয়া ধবরের আয়েজ আসে এমন লাইনও পাওয়া যায়। যেমন—

এক যে ছিল কুকুর-চাটা

শেয়ালকাটার বন

কেটে করলে সিংহাসন।

এখনকার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে হারমোনিয়মে সুর লাগিয়ে সা রে গা মা সাধানো, তার পরে হালকা গোছের হিম্মি গান ধরিয়ে দেওয়া। তখন আমাদের পড়াশুনোর যিনি তদারক করতেন তিনি বুঝেছিলেন, ছেলেবাহুবি ছেলেদের মনের আপন জিনিস, আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিম্মি বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে আয়না করে নেয়। তা ছাড়া, এ ছন্দের মিলি তাল বাঁধা-তবলার বোলের তোরাফা রাখে না। আপনা-আপনি নাড়িতে নাচতে থাকে। শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য যেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান যেখানোর শুরু সেই ছড়ায়— এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।

তখন হারমোনিয়ম আসে নি এ দেশের গানের আভাষ যারতে। কীথের উপর তবুয়া ভুলে গান অভ্যাস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলাবি করি নি।

আমার ঘোষ হচ্ছে, পঞ্চবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশি দিন চালাতে পারে নি। ইচ্ছেমত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে বা পেয়েছি বুলি উরতি করেছি তাই দিয়েই।

মন দিয়ে শেখা যদি আমার হাতে থাকত তা হলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে ডাচ্ছিল্য করতে পারত না। কেননা স্ববোধ ছিল বিস্তর। যে কয়দিন আমাদের শিক্ষা দেবার কর্তা ছিলেন সেজন্যই ততদিন বিকুর কাছে আনমনাভাবে ব্রহ্মসংগীত আউড়েছি। কখনো কখনো যখন মন আপনা হতে লেগেছে তখন গান আদায় করেছি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেজন্যই বেহাগে আওড়াচ্ছেন 'অতি-গজ-গামিনী রে', আমি লুকিয়ে মনের মধ্যে তার ছাপ ভুলে নিচ্ছি। সঙ্গে-বেলায় যাকে সেই গান শুনিতে অবাক করা খুব সহজ কাজ ছিল। আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকৃষ্ণবাবু দিনরাত গানের মধ্যে ভলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল যেখে শ্রবণ করতেন, হাতে থাকত শুড়শুড়ি, অশুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে, শুন শুন গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চার দিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না, গান তিনি দিতেন; কখন ভুলে নিতুম জানতে পারতুম না। স্কুতি যখন রাখতে পারতেন না দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জল জল করত, গান ধরতেন— যম ছোড়ো! ব্রজকী বাসরী। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।

তখনকার আতিথ্য ছিল খোলা দরজায়। চেনাশোনার খোজখবর নেবার বিশেষ দরকার ছিল না। যারা যখন এসে পড়ত তাদের পোবার জায়গাও মিলত, অয়ের খালাও আসত যথানিয়মে। সেই রকমের অচেনা অতিথি একদিন লেপ-মোড়া তরুর কাঁখে করে তাঁর পুঁটুলি খুলে বসবার ঘরের এক পাশে পা ছড়িয়ে দিলেন। কানাই হাঁকোবরদার যথারীতি তাঁর হাতে দিলে হাঁকো ভুলে।

সেকালে ছিল অতিথির জন্তে এই যেমন তামাক তৈরী পান। তখনকার দিনে বাড়ি-ভিতরে যেয়েদের সকাল বেলাকার কাজ ছিল ঐ— পান সাজতে হত রাশি রাশি, বাইরের ঘরে যারা আসত তাদের উদ্দেশে। চটপট পানে চুন লাগিয়ে, কাঠি দিয়ে খয়ের লেপে, ঠিকমত বসলা ভরে, লজ দিয়ে মুড়ে সেগুলো বোঝাই হতে থাকত পিতলের গায়লায়; উপরে পড়ত খয়েরের ছোপলাগা ভিজে স্নাকডার ঢাকা। ও দিকে বাইরে সিঁড়ির নীচের ঘরটাতে চলত তামাক সাজার ধুম। মাটির গায়লায় ছাই-ঢাকা জল, আলবোলায় নলগুলো ঝুলছে নাগলোকের সাপের মতো, তাদের নাড়ির মধ্যে গোলাপ-জলের গন্ধ। বাড়িতে যারা আসতেন সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার মুখে তাঁরা গৃহস্থের প্রথম 'আমুন যশার' ডাক পেতেন এই অশুরি তামাকের গন্ধে। তখন এই একটা রীতি নিয়ম ছিল মানুষকে মেনে নেওয়ার।

সেই ভরপুর পানের গামলা অনেক দিন হল সরে পড়েছে, আর সেই হাঁকোবরদার জাতটা সাজ খুলে ফেলে ময়রার দোকানে তিন দিনের বাসি সমেশ চটকে চটকে মাথতে লেগেছে।

সেই অজানা গাইয়ে আপন ইচ্ছেমত রয়ে গেলেন কিছুদিন। কেউ প্রশ্নও করলে না। ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের পেখা ঘানের খাতে নেই, তাদের পথ অনিয়মের পেখায়। সকাল বেলার সুরে চলত 'বঙালী হমারি রে'।

তার পরে যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড়ো গুস্তান এসে বসলেন বহু ভট্ট। একটা মন্ত কুল করলেন, জেন ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই; সেইজন্তে গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে— ভালো লাগল কাফি সুরে 'কম কুম বরধে আজু বাদরওয়া', রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দল বেঁধে। মুশকিল হল, এই সময়ে আর-এক অতিথি হাজির হল কিছু না বলে করে। বাঘ-মারা বলে তাঁর খ্যাতি। বাঙালি বাঘ মারে এ কথাটা সেদিন শোনাত খুব অদ্ভুত, কাজেই বেশির ভাগ সময় আটকা পড়ে গেলুম তাঁরই ঘরে। যে বাঘের কবলে পড়েছিলেন বলে আমাদের বুকে চমক লাগিয়েছিলেন সে বাঘের মুখ থেকে তিনি কামড় পান নি, কামড়ের গল্পটা আশ্বাস করে নিচ্ছেছিলেন মিউজিয়মে মরা বাঘের হাঁ থেকে— তখন সে কথা ভাবি নি, এখন সেটা পষ্ট বুঝতে পারছি। তবু তখনকার মতো ঐ বীরপুরুষের জন্ত ঘন ঘন পান-তামাকের জোগাড় করতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। দূর থেকে কানে পৌঁছত কানাড়ার আলাপ।

এই তো গেল গান। সেজদাদার হাতে আমার অস্ত্র বিস্তার যে পোড়াপত্তন হয়েছিল সেও খুব ফলাও স্বকষের। বিশেষ কিছু ফল হয় নি, সে স্বভাবদোষে। আমার মতো মানুষকে মনে রেখেই রায়প্রসাদ গেন বলেছিলেন, 'মন, তুমি কৃষিকাজ বোঝো না।' কোনোদিন আবারে কাজ করা হয় নি।

চাষের আঁচড় কাটা হয়েছিল কোন্ কোন্ খেতে তার খবরটা দেওয়া থাক।

অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি, কুস্তির সাজ করি, শীতের দিনে শিরশির করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল, কানা পালোয়ান, সে আমাদের কুস্তি লড়াত। দালানঘরের উত্তর দিকে একটা কাঁকা জমি, তাকে বলা হয় গোলাবাড়ি। নাম শুনে বোঝা যায়, শহর একদিন পাড়ারীটাকে আগা-

গোড়া চাপা দিয়ে বসে নি, কিছু কিছু কাঁক ছিল। শহরে সভ্যতার শুরুতে আমাদের গোলাবাড়ি গোলা ভরে বছরের ধান জমা করে রাখত, খাল অমির রায়তরা দিত তাদের ধানের ভাণ্ড। এই পাঁচিল ঘেঁষে ছিল কুস্তির চালাঘর। এক হাত আন্দাজ খুঁড়ে মাটি আলগা করে তাতে এক মোন সরষের তেল ঢেলে জমি তৈরি হয়েছিল। সেখানে পালোয়ানের সঙ্গে আমার প্যাচ করা ছিল ছেলেখেলা মাত্র। খুব খানিকটা মাটি মাখামাখি করে শেষকালে গায়ে একটা জামা চড়িয়ে চলে আসতুম। সকালবেলায় রোজ এত ক'রে মাটি ঘেঁটে আসা ভালো লাগত না মায়ের, তাঁর ভয় হত ছেলের গায়ে রঙ মেটে হয়ে যায় পাছে। তার ফল হয়েছিল ছুটির দিনে তিনি লেগে যেতেন শোধন করতে। এখনকার কালের শোধন গিয়ারা রঙ সাক করবার সরঞ্জাম কোটোতে করে কিনে আনেন বিলিডি দোকান থেকে, তখন তাঁরা মলম বানাতেন নিজের হাতে। তাতে ছিল বাগাম-বাটা, সর, কমলালেবুর খোসা, আরও কত কী— যদি জানতুম আর মনে থাকত তবে বেগম-বিলাস নাম দিয়ে ব্যবসা করলে সন্দেহের দোকানের চেয়ে কম আয় হত না। রবিবার দিন সকালে বারান্দায় বসিয়ে দলন-মলন চলতে থাকত, অস্থির হয়ে উঠত মন ছুটির জন্যে। এ দিকে ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে একটা গুজব চলে আসছে যে, জন্মমাত্র আমাদের বাড়িতে শিশুদের ডুবিয়ে দেওয়া হয় মদের মধ্যে, তাতেই রঙটাতে সাহেবি জেলা লাগে।

কুস্তির আখড়া থেকে ফিরে এসে দেখি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্র বসে আছেন মাহুঘের হাড় চেনাবার বিশ্লেষণে পেশাবার জন্যে। দেয়ালে ঝুলছে আস্ত একটা কঙ্কাল। রাত্রে আমাদের শোবার ঘরের দেয়ালে এটা ঝুলত, হাওয়ার নাড়া খেলে হাড়গুলো উঠত খট খট করে। তাদের নাড়াচাড়া করে করে হাড়গুলোর শব্দ শব্দ নাম সব জানা হয়েছিল, তাতেই ভয় গিয়েছিল ভেঙে।

দেউড়িতে বাজল সাতটা। নীলকমল^১ মাস্টারের ঘড়ি-খরা সময় ছিল নির্রেট। এক মিনিটের তফাত হবার জো ছিল না। খটখটে রোগা শরীর, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর ছাত্রেরই মতো, এক দিনের অন্তেও মাখামাখি হযোগ ঘটল না। বই নিয়ে স্ট্রেট নিয়ে যেতুম টেবিলের সামনে। কালো বোর্ডের উপর খড়ি দিয়ে অঙ্কের দাগ পড়তে থাকত— সবই বাংলায়, পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত। সাহিত্যে 'সীতার বনবাস' থেকে একদম চড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল 'মেঘনাদবধ' কাব্যে। সঙ্গে ছিল প্রাকৃতবিজ্ঞান। মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত^২, বিজ্ঞানের ভাষা ভাষা খবর পাওয়া যেত জানা জিনিস

১ নীলকমল ঘোষাল —দীপকস্মৃতি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, সংস্করণ ৭৩, পৃ ২৮৩

২ সীতানাথ ঘোষ ?

পর্য্যবসায় করে। মাঝে একবার আলেন হেরষ ডব্বরষ। লাগলুম কিছু না বুঝে মুগ্ধবোধ
মুগ্ধ করে ফেলতে। এমনি করে সারা সকাল জুড়ে নানারকম পড়ার বতই চাপ পড়ে
মন ভুতই ভিতরে ভিতরে চুরি ক'রে কিছু কিছু বোকা সরাতে থাকে, জালের মধ্যে
ফাঁক ক'রে তার ভিতর দিয়ে মুগ্ধ বিস্তে কসকিষে যেতে চায়, আর নীলকমল মাস্টার
তার ছাত্রের বুদ্ধি নিয়ে যে মত জাতি করতে থাকেন তা বাইরের পাচজনকে ডেকে
ডেকে শোনাবার মতো হয় না।

বারান্দায় আর-এক ধারে বুড়ো দরজি, চোখে আতশ কাঁচের চশমা, ঝুঁকে প'ড়ে
কাপড় সেলাই করছে, মাঝে মাঝে সময় হলে নমাজ পড়ে নিচ্ছে— চেয়ে দেখি আর
ভাবি কী স্থখই আছে নেয়ামত। অল্প কষতে মাথা বধন ঘুলিয়ে যায় চোখের উপর
স্রেট আড়াল ক'রে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি, দেউড়ির সামনে চন্দ্রভান, লম্বা দাড়ি
কাঠের কাঁকই দিয়ে আঁচড়িয়ে তুলছে দুই কানের উপর দুই ভাগে। পাশে বসে আছে
কাঁকন-পরী ছিপছিপে ছোকরা দরোয়ান, কুটছে তামাক। ঐখানে ঘোড়াটা সকালেই
খেয়ে গেছে বালতিতে বরাদ্দ দানা, কাঁকগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-
পড়া ছোলা, জনি কুকুরটার কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে— ঘেউ ঘেউ করে দেয় ভাড়া।

বারান্দায় এক কোণে কাঁট দিয়ে জমা করা ধুলোর মধ্যে পুঁতেছিলুম আত্মার
বিচি^১। কবে তার থেকে কচি পাতা বেরবে দেখবার জন্তে মন ছটফট করছে।
নীলকমল মাস্টার উঠে গেলেই ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসা চাই, আর দেওয়া চাই
জল। শেষ পর্যন্ত আমার আশা মেটে নি। যে কাঁটা একদিন ধুলো জমিয়েছিল সেই
কাঁটাই দিয়েছিল ধুলো উড়িয়ে।

সূর্য উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আড়িনাষ হলে পড়ে ছায়া। ন'টা বাজে। বেঁটে
কালো গোবিন্দ কাঁধে হলদে রঙের ময়লা গামছা ঝুলিয়ে আমাকে নিয়ে যায় স্নান
করাতে। সাড়ে ন'টা বাজতেই রোজকার বরাদ্দ ভাল ভাত বাছের ঝোলের বাঁধা
ভোজ। কচি হয় না খেতে।

ঘন্টা বাজে দশটার। বুড়ো রাস্তা থেকে মন-উদাস-করা ডাক শোনা যায় কাঁচা-
আম-ওয়ালার। বাসনওয়ালার ঠাং ঠাং আওয়াজ দিয়ে চলছে ঘুরের থেকে ঘুরে। গলির
ধারের বাড়ির ছাতে বড়োবউ ভিজে চুল শুকোচ্ছে রোদুরে, তার দুই মেয়ে কড়ি নিয়ে
খেলেই চলেছে, কোনো তাড়া নেই। মেয়েদের শুধন ইঁদুল বাওয়ার তাগিদ ছিল না।
মনে হত ঘেরে-জম্বটা নিছক স্থবের। বুড়ো ঘোড়া পালকিপাড়িতে ক'রে টেনে নিয়ে
চলল আমার দশটা-চারটার আন্দামানে। সাড়ে চারটের পর কিনে আসি ইঁদুল থেকে।

১. অর্থাৎ 'আত্মার বিচি' —হৃদয় হৃদি, রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ বর্ষ

জিম্নাস্টিকের মাস্টার এসেছেন। কাঠের ডাঙার উপর ঘণ্টাখানেক ধরে শরীরটাকে উলটপালট করি। তিনি যেতে না যেতে এসে পড়েন ছবি-আকার মাস্টার।

ক্রমে দিনের মরচে পড়া আলো বিলিয়ে আসে। শহরের পাঁচমিশালি ঝাপসা শব্দে স্বপ্নের স্বর লাগায় ইটকাঠের দৈত্যটার দেহে।

পড়বার ঘুরে জলে গুঠে তেলের বাতি। অঘোর মাস্টার এসে উপস্থিত। শুরু হয়েছে ইংরেজি পড়া। কালো কালো মলাটের রীতির ঘেন গুত পেতে রয়েছে টেবিলের উপর। মলাটটা ঢল্‌ঢলে, পাতাগুলো কিছু ছিঁড়েছে, কিছু দাগি, অজায়গায় হাত পাকিয়েছি নিজের নাম ইংরেজিতে লিখে—তার সবটাই ক্যাপিটল অক্ষর। পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি। যত পড়ি তার চেয়ে না পড়ি অনেক বেশি।...

বিছানায় ঢুকে একদফা পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পার না—রাজপুত্র চলছে তেপান্তর মাঠে।

৮

তখনকার কালের সঙ্গে এখনকার কালের তফাত ঘটেছে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই আজকাল বাড়ির ছাদে না আছে মাহুঘের আনাগোনা, না আছে ভূতপ্রভেদের। পূর্বেই জানিয়েছি, অত্যন্ত বেশি লেখাপড়ার আবহাওয়ায় টিকতে না পেরে ব্রহ্মদৈত্য দিয়েছে দৌড়। ছাদের কার্নিসে তার আরামে পা রাখবার গুহব উঠে গিয়ে সেখানে এঠো আয়ের আঁঠি নিয়ে কাকেদের চলেছে ছেঁড়াছেঁড়ি। এ দিকে মাহুঘের বসতি আটক পড়েছে নীচের তলায় চারকোনা দেয়ালের প্যাকবাক্সে।

মনে পড়ে বাড়ি-ভিতরের পাঁচিল-ঘেরা ছাদ। যা বসেছেন সন্ধ্যাবেলায় মাহুর পেতে, তাঁর সজিনীয়া চার দিকে ঘিরে বসে গল্প করছে। সেই গল্পে খাঁটি ধবরের দরকার ছিল না। দরকার কেবল সময়-কাটানো। তখনকার দিনের সময় ভরতি করবার অস্ত্রে নানা দায়ের নানা মালমসলার বরাদ্দ ছিল না। দিন ছিল না ঠাসবুজনি করা, ছিল বড়ো-বড়ো-কাক-গুরাল। জালের মতো। পুরুষদের মজলিসেই হোক, আর মেয়েদের আসরেই হোক, গল্পগুহব হাসিতামাশা ছিল খুবই হালকা দায়ের। দায়ের সজিনীদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন ব্রজ আচার্যের বোন, যাকে আচার্যিনী বলে ডাকা হত। তিনি ছিলেন এ বৈঠকে দৈনিক ধবর সরবরাহ

করবার কাজে। প্রায় আনতেন রাজ্যের বিদকূটে খবর কুড়িয়ে কিংবা বানিয়ে। তাই নিয়ে গ্রন্থাঙ্কি-স্বস্ত্যায়নের হিসেব হত খুব ফলাও ধরচার। এই সভায় আমি মাঝে মাঝে টাটকা পুঁথি-পড়া বিস্তার আমদানি করেছি, শুনিয়েছি শূঁষ পৃথিবী থেকে ন কোটি মাইল দূরে। ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে স্বয়ং বাঙ্গালীক-রামায়ণের টুকরো আউড়ে দিয়েছি অমৃত্যুর-বিসর্গ-মুহুর্ত; যা জানতেন না তাঁর ছেলের উচ্চারণ কত খাঁটি, তবু তার বিস্তার পান্না শূঁষের ন কোটি মাইল রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে তাঁকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এ-সব শ্লোক স্বয়ং নারদমুনি ছাড়া আর কারও মুখে শোনা যেতে পারে, এ কথা কে জানত বলে।

বাড়ি-ভিতরের এই ছাদটা ছিল আগাগোড়া মেয়েদের দখলে। তাঁড়ারের সঙ্গে ছিল তার বোকাপড়া। ওখানে রোদ পড়ত পুরোপুরি, জারক নেবুকে দিত জারিয়ে। ঐখানে মেয়েরা বসত পিতলের গায়লা-ভরা কলাইবাটা নিয়ে। টিপে টিপে টপ্‌টপ্ করে বড়ি দিত চুল শুকোতে শুকোতে; দাসীরা বাসি কাপড় কেচে মেলে দিয়ে যেত রোদ্দুরে। তখন অনেকটা হালকা ছিল ধোবার কাজ। কাঁচা আম ফালি করে কেটে কেটে আমসি শুকনো হত, ছোটো বড়ো নানা সাইজের নানা-কাজ-করা কালো পাথরের ছাঁচে আমের রস থাকে থাকে জমিয়ে তোলা হত, রোদ-খাওয়া সরষের তেলে মজে উঠত ইচড়ের আচার। কেঁদাখয়ের তৈরি হত সাবধানে, তার কথাটা আমার বেশি করে মনে রাখবার মানে আছে। যখন ইকুলের পণ্ডিতমশায় আমাকে জানিয়ে দিলেন আমাদের বাড়ির কেঁদাখয়েরের নাম তাঁর শোনা আছে, অর্থ বুঝতে শক্ত ঠেকল না। যা তাঁর শোনা আছে সেটা তাঁর জানা চাই। তাই বাড়ির সুনাম বজায় রাখবার জন্ত মাঝে মাঝে লুকিয়ে ছাদে উঠে দুটো-একটা কেঁদাখয়ের—কী বলব—চুরি করতুম বলার চেয়ে বলা ভালো অপহরণ করতুম। কেননা রাজা-মহারাজারাগে দরকার হলে, এমন-কি না হলেও, অপহরণ করে থাকেন আর বারা চুরি করে তাদের জেলে পাঠান, শুলে চড়ান। শীতের কাঁচা রৌদ্রে ছাদে বসে গল্প করতে করতে কাক তাড়াবার আর সময় কাটাবার একটা দায় ছিল মেয়েদের। বাড়িতে আমি ছিলাম একমাত্র দেওয়, বউদিদি'র আমসন্ত-পাহারা, তা ছাড়া আরও পাঁচরকম খুচরো কাজের সাধি। পড়ে শোনাতুম 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'²। কখনো কখনো আমার উপরে তার পড়ত

১ কান্দবরী দেবী, জ্যোতির্বিজ্ঞানায় গাঙ্গুলের পরী

২ "যেইটি কল্যাণের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী গইরা বিরচিত।"—প্রতাপচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত
প্রথম প্রকাশ : প্রথমবর্ষ ১৭২১ শক [১৮৬৩], দ্বিতীয়বর্ষ ১৮০০ শক [১৮৬৩]

জাঁতি দিয়ে সুপুঁরি কাটবার। খুব সৰু করে সুপুঁরি কাটতে পারতুম। আমার অন্য কোনো গুণ যে ছিল, সে কথা কিছুতেই বউঠাকরুন মানতেন না, এমন-কি চেহারারও খুঁত ধরে বিধাতার উপর রাগ ধরিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার সুপুঁরি-কাটা হাতের গুণ বাড়িয়ে বলতে মুখে বাধত না। তাতে সুপুঁরি কাটার কাজটা চলত খুব দৌড়বেগে। উসকিয়ে দেবার লোক না থাকতে সৰু করে সুপুঁরি কাটার হাত অনেক দিন থেকে অন্য সৰু কাজে লাগিয়েছি।

ছাদে-মেলে-দেওয়া এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়ারগায়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন বাড়িতে ছিল ঢেঁকিশাল, যখন হত নাক কোটা, যখন দাসীরা সন্ধ্যাবেলায় বসে উরুতের উপর গলতে পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকোড়ির নেমন্তরে। রূপকথা আজকাল ছেলেরা মেয়েদের মুখ থেকে শুনেতে পায় না, নিজে নিজে পড়ে ছাপানো বই থেকে। আচার চাটনি এখন কিনে আনতে হয় নতুনবাজার থেকে—বোতলে ভরা, গালা দিয়ে ছিপিতে বন্ধ।

পাড়ারগায়ের আরও-একটা ছাপ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে। ঐখানে গুরুমশায়ের পাঠশালা বসত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়াপ্রতিবেশীর ছেলেদেরও ঐখানেই বিজ্ঞের প্রথম আঁচড় পড়ত তালপাতায়। আমিও নিশ্চয় ঐখানেই স্বরে-অ স্বরে-আ'র উপর দাগা বুলোতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সৌরলোকের সবচেয়ে দূরের গ্রহের মতো সেই শিশুকে মনে-আনা-ওরালা কোনো দূরবীন দিয়েও তাকে দেখবার জো নেই।

তার পরে বই পড়ার কথা প্রথম বা মনে পড়ে সে যজ্ঞমার্ক মুনির পাঠশালার বিষয় ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুয় পেট চিরছে নৃসিংহ-অবতার—বোধ করি সীসের ফলকে খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে। আর মনে পড়ছে কিছু কিছু চাণক্যের শ্লোক।^১

আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বড়ো বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন ঐ ছাদে নানা ভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল ভেড়ালার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কতদিন দেখেছি, তখনো সূর্য ওঠে নি, তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড়-করা। যাবে যাবে তিনি অনেক দিনের জন্য চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তখন ঐ ছাদে যাওয়া ছিল আমার সাত-সমুদ্র-পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নীচেভলার বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের

^১ ভুলনীর 'শিশুবোধক'। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বাক্ষরিত কড়'ক সংস্কৃতি ও কলিকাতা, আহিরিটোলা, ইত্যাদি প্রকাশিত।

কাক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক-চলাচল ; কিন্তু ঐ ছাদের উপর যাওয়া লোকবসতির পিল্পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া । ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায় যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে । নানা বাড়ির নানা গড়নের উচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের কাকড়া মাথা । আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই ছপুর বেলায় । বরাবর এই ছপুর বেলাটা নিয়েছে আমার মন ভুলিয়ে । ও যেন দিনের বেলাকার রাস্তার, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগি হয়ে যাবার সময় । খড়খড়ির ভিতর দিয়ে হাত গলিয়ে ঘরের ছিটকিনি দিতুম খুলে । দরজার ঠিক সামনেই ছিল একটা সোফা ; সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে বসতুম । আমাকে পাকড়া করবার চৌকিদার যারা, পেট ভরে খেয়ে তাদের ঝিমুনি এসেছে, গা মোড়া দিতে দিতে শুয়ে পড়েছে মাদুর জুড়ে । রাঙা হয়ে আসত রোদ্দুর, চিল ডেকে যেত আকাশে । সামনের গলি দিয়ে হেঁকে যেত চুড়িওয়াল । সেদিনকার ছপুরবেলাকার সেই চুপচাপ বেলা আজ আর নেই, আর নেই সেই চুপচাপ বেলার ফেরিওয়াল ।

হঠাৎ তাদের হাঁক পৌছত যেখানে বালিশের উপর খোলা চুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বৌ, দাসী ডেকে নিয়ে আসত ভিতরে, বুড়ো চুড়িওয়াল কচি হাত টিপে টিপে পরিয়ে দিত পছন্দমত বেলোয়ারি চুড়ি । সেদিনকার সেই বৌ আজকের দিনে এখনো বৌএর পদ পায় নি, সেকেণ্ড ক্লাসে সে পড়া যুগ্ম করছে । আর সেই চুড়িওয়াল হয়তো আজ সেই গলিতেই বেড়াচ্ছে রিক্শা ঠেলে । ছাদটা ছিল আমার কেতাব-পড়া মঞ্চভূমি, ধু ধু করছে চার দিক । গরম বাতাস হ হ করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, আকাশের নীল রঙ এসেছে কিকে হয়ে ।

এই ছাদের মঞ্চভূমিতে তখন একটা ওয়েগিস দেবা দিয়েছিল । আজকাল উপরের তলায় কলের জলের নাগাল নেই । তখন তেতালার ঘরেও তার দৌড় ছিল । লুকিয়ে-চোকা নাবার ঘর, তাকে যেন বাংলা দেশের শিত্তি লিভিংস্টন এইমাত্র খুঁজে বের করলে । কল দিতুম খুলে, ধারাজল পড়ত সকল পায়ে । বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মাদুর হয়ে বসতুম ।

ছুটির দিনটা দেখতে দেখতে শেষের দিকে এসে পৌছল । নীচের দেউড়ির ঘন্টার বাজল চারটে । রবিবারের বিকেল বেলার আকাশটা বিস্তীর্ণ কবের মুখ বিগড়ে আছে । আসছে-সোমবারের হাঁ-করা মুখের গ্রহণ-সাগানো ছায়া তাকে গিলতে শুরু করেছে । নীচে এককণে পাহারা-এড়ানো ছেলের খোঁজ পড়ে গেছে ।

এখন জলখাবারের সময়। এইটে ছিল ব্রজেশ্বরের একটা লালচিহ্ন-দেওয়া দিনের ভাগ। জলখাবারের বাজার করা ছিল তারই জিন্দায়। তখনকার দিনে দোকানিরা ঘিরের দামে শতকরা ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হারে মুনকা রাখত না, গন্ধে স্বাদে জলখাবার তখনো বিধিয়ে ওঠে নি। যদি ছুটে যেত কচুরি সিঙাড়া, এমন-কি আলুর দম, সেটা মুখে পুরতে সময় লাগত না। কিন্তু যথাসময়ে ব্রজেশ্বর যখন তার বাঁকা ঘাড় আরও ঝাঁকিয়ে বলত ‘দেখো বাবু আজ কী এনেছি’, প্রায় দেখা যেত কাগজের চৌপায় চীনেবাদাম-ভাজা! সেটাতে আমাদের যে কচি ছিল না তা নয়, কিন্তু ওর দরের মধ্যোই ছিল ওর আদর। কোনোদিন টুঁ শব্দ করি নি। এমন-কি, বেদিন তালপাতার চৌড়া থেকে বেরত তিলেগজা সেদিনও না।

দিনের আলো আসছে ঘোলা হয়ে। মন খারাপ নিয়ে একবার ছাদটা ঘুরে আসা গেল, নীচের দিকে দেখলুম তাকিয়ে—পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো উঠে গিয়েছে। লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে ঘাটে, বটগাছের ছায়া পড়েছে অর্ধেক পুকুর জুড়ে, রাস্তা থেকে জুড়িগাড়ির সইসের হাঁক শোনা যাচ্ছে।

২

দিনগুলো এমনি চলে যায় একটানা। দিনের মাঝধানটা ইস্কুল নেয় খাবলিয়ে, সকালে বিকেলে ছিটকিয়ে পড়ে তারই বাড়তির ভাগ। ঘরে চুকতেই ক্লাসের বেঞ্চি-টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কল্লইয়ের গুঁতো মারে। রোজই তাদের একই আড়ষ্ট চেহারা।

সন্ধ্যাবেলায় কিরে যেতুম বাড়িতে। ইস্কুলঘরে তেলের বাতিটা তুলে ধরেছে পরদিনের পড়াইতির-পথের সিগন্যাল। এক-একদিন বাড়ির আঙিনায় আসে ভালুক-নাচ-ওয়ারা। আসে সাপুড়ে সাপ খেলাতে। এক-একদিন আসে ভোজবাজিওয়ারা, একটু দেয় নতুনের আশেজ।

আমাদের চিংপুর রোডে আজ আর ওদের ডুগুগি বাজে না। সিনেমাকে দূর থেকে সেলায় ক’রে তারা বেশ ছেড়ে পালিয়েছে। শুকনো পাতার সঙ্গে এক জাতের কড়িঙ যেমন বেমালুম বড় ঝিলিয়ে থাকে আবার প্রাণটা তেমনি শুকনো দিনের সঙ্গে ক্যাকাপে হয়ে ঝিলিয়ে থাকত।

তখন খেলা ছিল সাধারণ কয়েক রকমের। ছিল মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল—ক্রিকেটের অন্ত্যস্ত দূর সুটব। আর ছিল লাঠিয়-ঘোরানো, ঘুড়ি-ওড়ানো। শহরে

ছেলেদের খেলা সবই ছিল এমনি কমজোরি। মাঠজোড়া ফুটবল-খেলার লক্ষ্যস্পর্শ তখনো ছিল সমুদ্রপারে। এমনি করে একই বাপের দিনগুলো শুকনো খুটির বেড়া পুঁতে চলেছিল আমাকে পাকে পাকে ঘিরে।

এমন সময় একদিন বাজল সানাই বাগোয়াঁ^১ হয়ে। বাড়িতে এল নতুন বোঁ^২, কচি শামলা হাতে স্রু সোনার চুড়ি। পলক ফেলতেই ফাঁক হয়ে গেল বেড়া, দেখা দিল চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের নতুন মাহুঘ। দূরে দূরে ঘুরে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে। ও এসে বসেছে আদরের আসনে, আমি যে হেলাকেলার ছেলেমাহুঘ।

ছুই মহলে বাড়ি তখন ভাগ করা। পুরুষরা থাকে বাইরে, মেয়েরা ভিতর-কোঠায়। নবাবি কারুকা তখনো চলে আসছে। মনে আছে দিদি^৩ বেড়াচ্ছিলেন ছাদের উপর নতুন বোঁকে পাশে নিয়ে, মনের কথা-বলাবলি চলছিল। আমি কাছে যাবার চেষ্টা করতেই এক ধমক। এ পাড়া যে ছেলেদের দাগকাটা গতির বাইরের। আবার শুকনো মুখ করে কিরতে হবে সেই ছাংলাপড়া পুরোনো দিনের আড়ালে।

হঠাৎ দূর পাহাড় থেকে বর্ষার জল নেমে সাবেক দাঁধের তলা কইয়ে দেয়, এবার তাই ঘটল। বাড়িতে নতুন আইন চালালেন কতী। বোঁঠাকরনের জায়গা হল বাড়ি-ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিষেতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমস্করের দিনে প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমাহুঘ। বোঁঠাকরন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয়াতে ভালোবাসতেন, এই খাওয়াবার শব্দ মেটাতে আমাকে হাতির পেতেন। ইঞ্চল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানত। ভাত যেদিন যেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চট্টিছোতোজোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের থেকে একটা-কোনো দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ষগড়ার পস্তন করতুম। বলতে হত, 'তুমি গেলে তোমার ঘর সামলাবে কে। আমি কি চৌকিদার।' তিনি রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'তোমাকে আর ঘর সামলাতে হবে না, নিজের হাত সামলিয়ে।'।

এ কালের মেয়েদের হাসি পাবে, তাঁরা বলবেন, নিজের ছাড়া সংসারে কি পরের দেওয় ছিল না কোনোখানে। কথাটা যানি। এখনকার কালের বহুল সকল দিকেই

১ কাদম্বরী দেবী, জ্যোতিষ্মতীনাথের পত্নী

২ 'ছোড়দিদি' বর্ধুয়ারী দেবী

তখনকার থেকে হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। তখন বড়ো-ছোটো সবাই ছিল ছেলেমাছুষ।

এইবার আমার নির্জন বেহুয়িনি ছাদে শুক হল আর-এক পালা—এল বাহুঘের সঙ্গ, বাহুঘের রেহ। সেই পালা জমিয়ে দিলেন আমার জ্যোতিদাদা^১।

১০

ছাদের রাজ্যে নতুন হাওয়া বইল, নামল নতুন কতু।

তখন পিতৃদেব জোড়াসাঁকোর বাস ছেড়েছিলেন। জ্যোতিদাদা এসে বসলেন বাইরের ভেতলার ঘরে। আমি একটু জ্বরগা নিলুম তারই একটি কোণে।

অম্বর-মহলের পর্দা বইল না। আজ এ কথা নতুন ঠেকবে না, কিন্তু তখন এত নতুন ছিল যে মেপে দেখলে তার খই পাওয়া যায় না। তারও অনেক কাল আগে, আমি তখন শিশু, মেজদাদা^২ সিভিলিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছেন। বোম্বাইয়ে প্রথম তাঁর কাজে যোগ দিতে যাবার সময় বাইরের লোকদের অবাক করে দিয়ে তাদের চোখের সামনে দিয়ে বোঁঠাককনকে^৩ সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বাড়ির বোঁকে পরিবারের মধ্যে না রেখে দূর বিদেশে নিয়ে যাওয়া এই ভো ছিল যথেষ্ট, তার উপরে যাবার পথে ঢাকাঢাকি নেই—এ যে হল বিষম বেদস্তর। আপন লোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

বাইরে বেরবার মতো কাপড় তখনও যেয়েদের মধ্যে চলতি হয় নি। এখন শাড়ি জামা নিয়ে যে সাজের চলন হয়েছে তারই প্রথম শুরু করেছিলেন বোঁঠাককন^৩।

বেশী ছলিয়ে তখনও ক্রক ধরে নি ছোটো যেয়েরা। অন্তত আমাদের বাড়িতে। ছোটোদের মধ্যে চলন ছিল পেশোয়ারের। বেখুন ইকুল যখন প্রথম খোলা হল আমার বড়দিদির^৪ ছিল অল্প বয়স। সেখানে যেয়েদের পড়াশোনার পথ সহজ করবার প্রথম দলের ছিলেন তিনি। ধবধবে তাঁর রঙ। এ দেশে তার তুলনা পাওয়া যেত না। শুনেছি পালকিতে করে ফুলে যাবার সময় পেশোয়ার-পর্য্যটকে চুরি-করা ইংরেজ বেয়ে মনে করে পুলিশে একবার ধরেছিল।

আগেই বলেছি সেকালে বড়ো ছোটোর মধ্যে চলাচলের সাঁকোটা ছিল না। কিন্তু

১ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ 'মেজো বোঁঠাককন' জ্ঞানানন্দিনী দেবী

৪ সোণালিনী দেবী

এই-সকল পুরোনো কায়দার ভিড়ের মধ্যে জ্যোতিদাদা এসেছিলেন নির্জলা নতুন মন নিয়ে। আমি ছিলাম তাঁর চেয়ে বারো বছরের ছোটো। বয়সের এত দূর থেকে আমি যে তাঁর চোখে পড়তুম এই আশ্চর্য। আরও আশ্চর্য এই যে, তাঁর সঙ্গে আলাপে জ্যাঠামি বলে কখনও আমার মুখ চাপা দেন নি। তাই কোনো কথা ভাবতে আমার সাহসে অকুলোন হয় নি। আজ ছেলেদের মধ্যেই আমার বাস। পাঁচরকম কথা পাড়ি, দেখি তাদের মুখ বোজা। জিজ্ঞেসা করতে এদের বাধে। বুঝতে পারি, এরা সব সেই বুড়োদের কালের ছেলে যে কালে বুড়োরা কইত কথা আর ছোটোরা থাকত বোবা। জিজ্ঞাসা করবার সাহস নতুন কালের ছেলেদের; আর বুড়োকালের ছেলেরা সব-কিছু মেনে নেয় ঘাড় শুঁজে।

ছাদের ঘরে এল পিয়ানো। আর এল একালের বানিশকরা বৌবাজারের আসবাব। বুকের ছাতি উঠল ফুলে। গরীবের চোখে মেধা দিল হাল-আমলের সস্তা আমিরি।

এইবার ছুটল আমার গানের কোয়ারা। জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গিতে ঝমঝম স্বর তৈরি করে যেতেন, আমাকে রাখতেন পাশে। তখনি তখনি সেই ছুটে-চলা স্বরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।

দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা কপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে কমালে, পিরিচে একমাস বরফ-দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান।

বোঁঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা, বেহালাতে লাগাতেন ছড়ি, আমি ধরতুম চড়া স্বরের গান। গলায় ষেটুকু স্বর দিয়েছিলেন বিধাতা তখনও তা ফিরিয়ে নেন নি। স্বর্ষ-তোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত আমার গান। হ হ করে দক্ষিণে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভ'রে।

ছাদটাকে বোঁঠাকরুন একেবারে বাগান বানিয়ে তুলেছিলেন। পিছনের উপরে সারি সারি লম্বা পাত গাছ, আশেপাশে চামেলি গন্ধরাজ রজনীগন্ধা কয়দী হোলনচাঁপা। ছাদ-জখমের কথা মনেই আনেন নি, সবাই ছিলেন খেরালি।

প্রায় আসতেন অক্ষয় চৌধুরী। তাঁর গলায় স্বর ছিল না সে কথা তিনিও জানতেন, অন্তরে আরও বেশি জানত। কিন্তু তাঁর গাবার জেদ কিছুতে থামত না। বিশেষ করে বেহাগ রাগিনীতে ছিল তাঁর শখ। চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। হাতের কাছে আওয়াজওয়ালা কিছু পেলেই দাঁত দিয়ে ঠোট কাষড়ে ধরে পটাপট শব্দে তাকেই বীরা-তবলার বদলি করে নিতেন।

ঘলাট-বাধানো বই থাকলে ভালোই চলত। ভাবে ভোর সাহুস, তাঁর ছুটির দিনের সঙ্গে কাজের দিনের তফাত বোঝা যেত না।

সন্ধ্যাবেলার সভা যেত ভেঙে। আমি চিরকাল ছিলাম রাত-জাগিয়ে ছেলে। সকলে শুতে যেত, আমি ঘুরে ঘুরে বেড়াতুম, ব্রহ্মদত্তির চেলা। সমস্ত পাড়া চুপচাপ। টাদনি রাতে ছাদের উপর সারি সারি গাছের ছায়া যেন স্বপ্নের আলপনা। ছাদের বাইরে সিঁহ গাছের মাথাটা বাতালে ছলে উঠছে, বিলম্বিত করছে পাতাগুলো। জানি নে কেন সবচেয়ে চোখে পড়ত সাবনের গলির ঘুমন্ত বাড়ির ছাদে একটা ঢালু-পিঠ-ওয়ালো বেঁটে চিলেকোঠা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের দিকে যেন আঙুল বাড়িয়ে রয়েছে।

রাত একটা হয়, দুটো হয়। সাবনের বড়ো রাস্তায় রব শুঠে, 'বলো হরি হরিবোল।'

১১

খাঁচার পাখি পোষার শখ তখন ঘরে ঘরে ছিল। সবচেয়ে খারাপ লাগত পাড়ার কোনো বাড়ি থেকে পিঁজরেতে-বাঁধা কোকিলের ডাক। বৌঠাকরুন জোগাড় করেছিলেন চীনদেশের এক ডায়া পাখি। কাপড়ের ঢাকার ভিতর থেকে তার শিশ উঠত কোয়ারার যতো। আরও ছিল নানা জাতের পাখি, তাদের খাঁচাগুলো ঝুলত পশ্চিমের বারান্দায়। যোজ সকালে একজন পোকাওয়ালো পাখিদের খোরাক জোগাত। তার ঝুলি থেকে বেরত ফড়িঙ, ছাতুখোর পাখিদের অন্তে ছাতু।

জ্যোতিদাদা আমার সকল তর্কের জবাব দিতেন। কিন্তু যেহেতু কাছে এতটা আশা করা যায় না। একবার বৌঠাকরুনের মজি হয়েছিল খাঁচার কাঠবিড়ালি পোষা। আমি বলেছিলাম কাজটা অসম্ভব হচ্ছে, তিনি বলেছিলেন গুরুশ্রমায়গিরি করতে হবে না। এঁকে ঠিক জবাব বলা চলে না। কাজেই কথা-কাটাকাটির বদলে লুকিয়ে দুটি প্রাণীকে ছেড়ে দিতে হল। তার পরেও কিছু কথা শুনেছিলাম, কোনো জবাব করি নি।

আমাদের মধ্যে একটা বাঁধা ঝগড়া ছিল কোনোদিন যার শেষ হল না, সে কথা বলছি।

উদ্দেশ ছিল ঢালুক লোক। বিলিতি দরজির দোকান থেকে বস্ত-সব ছাঁটাকাটা নানা রঙের রেশমের কালি জলের দ্বারা কিনে আনত, তার সঙ্গে নেটের টুকরো আর খেলো লেন বিলিয়ে যেহেতু জামা যানানো হত। কাগজের প্যাকেট খুলে সাবধানে বেলে ধরত যেহেতু চোখে, বলত 'এই হচ্ছে আজকের দিনের ক্যানন'। ঐ মস্তটার টান যেহেতু সাবলোতে পারত না। আমাকে কী কুৎসিত বলতে পারি নে। বারবার

অস্থির হয়ে আপত্তি জানিয়েছি, জবাবে শুনেছি আঠামি করতে হবে না। আমি বৌঠাকরুনকে জানিয়েছি, এর চেয়ে অনেক ভালো, অনেক ভাল, সেকেন্দ্রে সাদা কালাপেড়ে শাড়ি কিংবা ঢাকাই। আমি ভাবি আজকালকার জর্জেট-জড়ানো বৌদিদিদের রঙ-করা পুতুল-গড়া রূপ দেখে দেওয়ানের মুখে কি কোনো কথা সরছে না। উমেশের সেলাই-করা ঢাকনি -পরা বৌঠাকরুন যে ছিলেন ভালো। চেহারার উপর এত বেশি জালিয়াতি তখন ছিল না।

তর্কে বৌঠাকরুনের কাছে বরাবর হেরেছি, কেননা তিনি তর্কের জবাব দিতেন না। আর হেরেছি দাবাখেলায়, সে খেলায় তাঁর হাত ছিল পাকা।

জ্যোতিদাদার কথা যখন উঠে পড়েছে তখন তাঁকে ভালো করে চিনিয়ে দিতে আরও কিছু বলার দরকার হবে। শুরু করতে হবে আরও-একটু আগেকার দিনে।

জমিদারির কাজ দেখতে প্রায় তাঁকে যেতে হত শিলাইদহে। একবার যখন সেই দরকারে বেরিয়েছিলেন আমাকেও নিয়েছিলেন সঙ্গে। তখনকার পক্ষে এটা ছিল বেসরকারি, অর্থাৎ যাকে লোকে বলতে পারত 'বাড়াবাড়ি হচ্ছে'। তিনি নিশ্চয় ভেবে-ছিলেন, ঘর থেকে এই বাইরে চলাচল এ একটা চলতি ক্লাসের মতো। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, আমার ছিল আকাশে-বাতাসে-চ'রে-বেড়ানো মন— সেখান থেকে আমি খোরাক পাই আপনা হতেই। তার কিছুকাল পরে জীবনটা যখন আরও উপরের ক্লাসে উঠেছিল আমি যাক্ষুষ হচ্ছিলুম এই শিলাইদহে।

পুরোনো নীলকুঠি' তখনো খাড়া ছিল। পরা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার আয়না। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যাবসায় সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠিঘাল সাহেবের দাবরার একেবারে খস খস করেছে। কোথায় নীলকুঠির ঘরের দূত সেই দেওয়ান, কোথায় লাঠি-কাখে কোমর-বাধা পেয়াদার দল, কোথায় লম্বা-টেবিল-পাতা খানার ঘর যেখানে ঘোড়ার চ'ড়ে সদর থেকে সাহেবরা এসে রাতকে দিন করে দিত— ভোজের সঙ্গে চলন্ত জুড়ি-বুড়োর ঘূর্ণিপাক, রক্তে ফুটতে থাকত ক্রাম্পনের নেশা, হস্ততাপা রায়তদের দোহাই-পাকা কারা উপর-ওয়ালাদের কানে পৌঁছত না, সদর জেলখানা পর্যন্ত তাদের শাসনের পথ লম্বা হয়ে চলত। সেদিনকার আর বা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউগাছগুলি দোলাহুলি করে বাতাসে, আর

সেদিনকার স্বায়ত্তদের নাতি-নাতনিরা কখনো কখনো ছপুররাজে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠিবাড়ির পোড়ো বাগানে।

একলা থাকার ঘর নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর, যত বড়ো ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করেছে পল্লী। সেগুলো যেন ক'রে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল— ঝরেও গেছে।

তখনকার দিনে অল্প বয়সের ছেলে, বিশেষত মেয়ে, যদি অক্ষর গুণে দু' ছত্র পদ্ম লিখত তা হলে দেশের সমাজদাররা ভাবত, এমন যেন আর হয় না, কখনো হবে না।

সে-সব মেয়ে-কবিদের নাম দেখেছি, কাগজে তাদের লেখাও বেরিয়েছে। তার পরে সেই অতি সাবধানে চোক্ষো অক্ষর বাঁচিয়ে লেখা ভালো ভালো কথা আর কাঁচা কাঁচা মিল বেই গেল মিলিয়ে, অবনি তাদের সেই নাম-মোছা পটে আজকালকার মেয়েদের সারি সারি নাম উঠছে ফুটে।

ছেলেদের সাহস মেয়েদের চেয়ে অনেক কম, লজ্জা অনেক বেশি। সেদিন ছোটো বয়সের ছেলে-কবি কবিতা লিখেছে যেন পড়ে না, এক আমি ছাড়া। আমার চেয়ে বড়ো বয়সের এক ভাগনে' একদিন বাৎলিয়ে দিলেন চোক্ষো অক্ষরের ছাঁচে কথা ঢাললে সেটা অম্বে ওঠে পল্লী। স্বয়ং দেখলুম এই জাতুবিদের ব্যাপার। আর হাতে হাতে সেই চোক্ষো অক্ষরের ছাঁচে পদ্মও ফুটল; এমন-কি তার উপরে ভয়রও বসবার জায়গা পেল। কবিদের সঙ্গে আমার তফাত গেল ঘুচে, সেই অবধি এই তফাত ঘুচিয়েই চলেছি।

যেন আছে, ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাসে যখন পড়ি সুপারিন্টেন্ডেন্ট গোবিন্দবাবু ওজব গুনলেন যে, আমি কবিতা লিখি। আমাকে কয়খান করলেন লিখতে, ভাবলেন নরীল-ফুলের নাম উঠবে জলজলিয়ে। লিখতে হল, শোনাতেও হল ক্লাসের ছেলেদের, গুনতে হল যে এ লেখাটা নিশ্চয় চুরি। নিশ্চয়ই জানতে পারে নি, তার পরে যখন সেখানে হয়েছি তখন ভাব-চুরিতে হাত পাকিয়েছি। কিন্তু এ চোরাই ঝালগুলো দায়ি জিনিস।

যেন পড়ে পরায়ে জিপদীতে মিলিয়ে একবার একটা কবিতা বানিয়েছিলুম, তাতে এই দুঃখ জানিয়েছিলুম যে, সীতার দ্বিগুণ পদ্ম ভুলতে গিয়ে নিজের হাতের চেউয়ে পদ্মটা

সরে সরে যায়, তাকে ধরা যায় না। অক্ষয়বাবু তাঁর আত্মীয়দের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে এই কবিতা শুনিতে বেড়ালেন; আত্মীয়রা বললেন, ছেলেটির লেখবার হাত আছে।

বৌঠাকরুনের ব্যবহার ছিল উলটো। কোনোকালে আমি যে লিখিবে হব, এ তিনি কিছুতে মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন, কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না। আমি মন-মরা হয়ে ভাবতুম, তাঁর চেয়ে অনেক নীচের ধাপের মার্ক। যদি মিলত তা হলে বেয়েদের সাজ নিয়ে তাঁর খুদে দেওর-কবির অপছন্দ অমন করে উড়িয়ে দিতে তাঁর বাধত।

জ্যোতিষাড়া ঘোড়ার চড়তে ভালোবাসতেন। বৌঠাকরুনেরও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টুঘোড়া। সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথভল্লার মাঠে ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে।^১ সেই এবড়ো-খেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জোর ছিল বলেই আমি পড়ি নি। কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ার চড়িয়েছিলেন। সে টাট্টু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে যেখানে সে দানা খেত। পরদিন থেকে তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

বন্দুক-ছোঁড়া জ্যোতিষাড়া কল্ল কয়েছিলেন, সে কথা পূর্বেই জানিয়েছি। বাঘ-শিকারের ইচ্ছা ছিল তাঁর মনে। বিশ্বনাথ শিকারী একদিন বদর দিল, শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ এসেছে। তখনি বন্দুক বাগিয়ে তিনি তৈরি হলেন। আশ্চর্যের কথা এই, আমাকেও নিলেন সঙ্গে। একটা মুনকিল কিছু ঘটতে পারে, এ যেন তাঁর ভাবনার মধ্যেই ছিল না।

ওস্তাদ শিকারী ছিল বটে বিশ্বনাথ। সে জানত, বাচানের উপর থেকে শিকার করাটা মরদের কাজ নয়। বাঘকে সামনে ডাক দিয়ে লাগাত জুলি। একবারও কসকায় নি তার ডাক।^২

ঘন জঙ্গল। সেরকম জঙ্গলের ছায়াতে আলোতে বাঘ চোখেই পড়তে চায় না। একটা মোটা বাশগাছের গায়ে ককি কেটে কেটে বইয়ের মতো বানানো হয়েছে। জ্যোতিষাড়া উঠলেন বন্দুক হাতে। আমার পায়ে জুতোও নেই, বাঘটা

১. প্রবন্ধ ১২-সংখ্যক কবিতা —অন্যদিনে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড

ভাড়া করলে তাকে যে জুতোপেটা করব তারও উপায় ছিল না। বিশ্বনাথ ইশারা করলে। জ্যোতিদাদা অনেকক্ষণ দেখতেই পান না। তাকিয়ে তাকিয়ে শেষকালে ঝোপের মধ্যে বাঘের গায়ের একটা দাগ তাঁর চশমাপরা চোখে পড়ল। মারলেন জুলি। দৈবাৎ লাগল সেটা তার শিরদাঁড়ার। সে আর উঠতে পারল না। কাঠকুটো বা সামনে পার কাষড়ে ধ'রে লেজ আছড়ে ভীষণ গর্জাতে লাগল। ভেবে দেখলে মনে সন্দেহ লাগে। অতক্ষণ ধরে বাঘটা বরবার জন্তে সবুজ করে ছিল, সেটা ওদের বেজাজে নেই বলেই জানি। তাকে আগের রাতে তার খাবার সঙ্গে ফিকির করে আফিম লাগার নি জো! এত ঘুম কেন।

আরও একবার বাঘ এসেছিল শিলাইদহের জঙ্গলে। আমরা দুই ভাই যাত্রা করলুম তার খোঁজে, হাতির পিঠে চ'ড়ে। আঘের খেত থেকে পট পট করে আঁধ উপড়িয়ে চিবতে চিবতে পিঠে কৃত্রিম লাগিয়ে চলল হাতি ভারি চালে। সামনে এসে পড়ল বন। হাঁটু দিয়ে চেপে, শুঁড় দিয়ে টেনে গাছগুলোকে পেড়ে কেলতে লাগল মাটিতে। তার আগেই বিশ্বনাথের ভাই চামরর কাছে গল্প শুনেছিলুম, সর্বশেষ ব্যাপার হয় বাঘ বধন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে চ'ড়ে খাঁচা বসিয়ে ধরে। তখন হাতি নী নী শব্দে ছুটতে থাকে বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে, পিঠে যারা থাকে শুঁড়ের ধাক্কা তাদের হাত পা মাথার হিসেব পাওয়া যায় না। সেদিন হাতির উপর চ'ড়ে ব'সে শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে ছিল ঐ ছাড়গোড়-ভাড়ার ছবিটা। ভয় করাটা চেপে রাখলুম লজ্জায়। বেপরোয়া ভাব ঘেঁষিয়ে চাইতে লাগলুম এ দিকে, ও দিকে। যেন বাঘটাকে একবার দেখতে পেলুম হয়। চুকে পড়ল হাতি বন জঙ্গলের মধ্যে। এক আয়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। মাহত তাকে চেতিয়ে তোলবার চেষ্টাও করল না। দুই শিকারী প্রাণীর মধ্যে বাঘের 'পরেই তার বিশ্বাস ছিল বেশি। জ্যোতিদাদা বাঘটাকে ঘায়েল করে মরিয়া করে তুলবেন, নিশ্চয় এটাই ছিল তার সবচেয়ে ভাবনার কথা। হঠাৎ বাঘটা ঝোপের ভিতর থেকে দিল এক লাফ। তখন যেখান ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা বহুওয়াল। ঝড়েয় কাপটা। আঘাদের বিড়াল কুকুর পেরাল-দেখা নজর—এ যে ঘাড়-গর্দানে একটা একরাশ মূরখ, অথচ তার তার নেই যেন। খোলা মাঠের ভিতর দিয়ে হুপুরবেলার রৌদ্রে চলল সে যৌড়ে। কী স্বন্দর সহজ চলনের বেগ। মাঠে কসল ছিল না। ছুটন্ত বাঘকে ভয়পূর করে দেখবার আয়গা এই বটে—সেই রৌদ্রঢালা হলদে রঙের প্রকাণ্ড মাঠ।

আর-একটা কথা বাকি আছে, শুনেতে যজ্ঞ লাগতে পারে। শিলাইদহে মালী

ফুল ভুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে দিত। আমার মাথায় খেয়াল গেল ফুলের রঙিন রস দিয়ে কবিতা লিখতে।^১ টিপে টিপে যে রসটুকু পাওয়া যায় সে কলমের মুখে উঠতে চায় না। ভাবতে লাগলুম, একটা কল তৈরি করা চাই। ছেঁদাওয়ালা একটা কাঠের বাটি, আর তার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চালাবার মতো একটা হাযান-দিস্তের নোড়া হলেই চলবে। সেটা ঘোরানো যাবে দড়িতে-বাঁধা একটা চাকার। জ্যোতিদাদাকে দরবার জানালুম। হয়তো মনে মনে তিনি হাসলেন, বাইরে সেটা ধরা পড়ল না। হকুম করলেন, ছুতোর এল কাঠকোঠ নিয়ে। কল তৈরি হল। ফুলে-ডরা কাঠের বাটিতে দড়িতে-বাঁধা নোড়া যতই ঘোরাতে থাকি ফুল পিষে কাদা হয়ে যায়, রস বেরয় না। জ্যোতিদাদা দেখলেন, ফুলের রস আর কলের চাপে ছন্দ মিলল না। তবু আমার মুখের উপর হেসে উঠলেন না।

জীবনে এই একবার এঞ্জিনিয়ারি করতে নেবেছিলুম। যে যা নয় নিজেকে তাই যখন কেউ ভাবে তার মাথা হেঁট করে দেবার এক দেবতা তৈরি থাকেন, শাস্ত্রে এমন কথা আছে। সেই দেবতা সেদিন আমার এঞ্জিনিয়ারির দিকে কটাক্ষ করেছিলেন, তার পর থেকে যত্নে হাত লাগানো আমার বন্ধ, এমন-কি সেতারে এসবাজেও তার চড়াই নি।

জীবনস্মৃতিতে লিখেছি, ফ্রাটলা কোম্পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী জাহাজ চালাতে গিয়ে কী করে জ্যোতিদাদা নিজেকে ফতুর করে দিলেন। বোঠাকরনের মৃত্যু হয়েছে তার আগেই।^২ জ্যোতিদাদা তাঁর তেতলার বাসা ভেঙে চলে গেলেন। শেষকালে বাড়ি বানালেন রাঁচির এক পাহাড়ের উপর।^৩

১২

এইবার তেতলা ঘরের আর এক পালা আরম্ভ হল আমার সংসার নিয়ে।...

একদিন গোলাবাড়ি, পালকি, আর তেতলার ছাদের খালি ঘরে আমার ছিল যেন বেদের বাসা—কখনো এখানে, কখনো ওখানে। বোঠাকরন এলেন ছাদের ঘরে বাগান দিল দেখা। উপরের ঘরে এল পিয়ানো, নতুন নতুন সুরের ফোয়ারা ছুটল।

১ ঋতু ১২-সংখ্যক কবিতা —স্মরণিবে। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ বর্ষ

২ ৮ বৈশাখ, ১২৯১

৩ 'শান্তিখাম', রাঁচির মোরাবানী পাহাড়ে

পূর্বদিকের চিলেকোঠার ছায়ায় জ্যোতিদাদার কক্ষি খাওয়ার সরঞ্জাম হত সকালে। সেই সময়ে পড়ে শোনাতেন তাঁর কোনো-একটা নতুন নাটকের প্রথম খণ্ড। তার মধ্যে কখনো কখনো কিছু জুড়ে দেবার জন্যে আমাকেও ডাক পড়ত আমার অভ্যস্ত কাঁচা হাতের লাইনের জন্যে। ক্রমে রোদ এগিয়ে আসত— কাক-গুলো ডাকাডাকি করত উপরের ছাদে বসে কটির টুকরোর 'পরে লক্ষ করে। দশটা বাজলে ছায়া যেত ক্ষয়, ছাতটা উঠত তেতে।

দুপুরবেলায় জ্যোতিদাদা যেতেন নীচের তলায় কাছারিতে। বোঁঠাকরুন কলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে বস্ত্র করে রূপোর রেকাবিতে সাজিয়ে দিতেন। নিজের হাতের মিঠার কিছু কিছু থাকত তার সঙ্গে, আর তার উপরে ছড়ানো হত গোলাপের পাপড়ি। গেলাসে থাকত ডাবের জল কিংবা কলের রস কিংবা কচি তালশাঁস বরফে ঠাণ্ডা করা। সমস্তটার উপর একটা ফুলকাটা রেশমের কুমাল ঢেকে মোরাদাবাদি খুঁকতে করে জলখাবার বেলা একটা-দুটোর সময় রওনা করে দিতেন কাছারিতে।

তখন বঙ্গদর্শনের^১ ঘুম লেগেছে; স্বর্ঘমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মতো আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল কী হবে, দেশহুঙ্ক সবার এই ভাবনা।

বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারও ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না; কেননা আমার একটা গুণ ছিল, আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বোঁঠাকরুন ভালোবাসতেন। তখন বিজলিপাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বোঁঠাকরুনের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।

১৩

মাঝে মাঝে জ্যোতিদাদা যেতেন হাওয়া বদল করতে গঙ্গার ধারের বাগানে। বিলিতি সঞ্জাগরির ছোঁওয়া লেগে গঙ্গার ধার তখনো জ্বালা খোঁওয়ায় নি। মুখে বায় নি তার ছুই ধারে পাখির বাসা, আকাশের আলোর লোহার কলের শুঁড়গুলো হুঁসে দেয় নি কালো নিখাস।

গঙ্গার ধারের প্রথম যে বাসা আমার মনে পড়ে, ছোটো সে দোতলা বাড়ি। নতুন বর্ষা নেমেছে। মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের উপর ঢেউ খেলিয়ে, মেঘের ছায়া কালো হয়ে ঘনিরে রয়েছে ও পারে বনের মাথায়। অনেকবার এইরকম দিনে নিজের গান

১ প্রকাশ ১২৭৩ খ্রিঃ [ইং ১৮৭২ খ্রিঃ]

ভৈরি করেছি, সেদিন তা হল না। বিজ্ঞাপতির পদটি জেগে উঠল আমার মনে, ‘এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।’ নিজের স্বর দিয়ে ঢালাই করে রাগিণীর ছাপ মেয়ে তাকে নিজের করে নিলুম। গজার ধারে সেই স্বর দিয়ে মিনে-করা এই বাদল-দিন আজও রয়ে গেছে আমার বর্ষাগানের সিঁকুকাটাতে। মনে পড়ে, থেকে থেকে বাতাসের ঝাপটা লাগছে গাছগুলোর মাথার উপর, ঝুটোপুটি বেধে গেছে ডালে-পালায়, ডিঙিনোকাগুলো সাদা পাল তুলে হাওয়ার মুখে ঝুঁকে পড়ে ছুটেছে, ঢেউগুলো ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ঝপ ঝপ শব্দে পড়ছে ঘাটের উপর। বোঁঠাকরুন ফিরে এলেন; গান শোনালুম তাঁকে; ভালো লাগল বলেন নি, চুপ করে শুনলেন। তখন আমার বয়স হবে বোলা কি সতেরো। বা-তা তর্ক নিয়ে কথা-কাটাকাটি তখনো চলে, কিন্তু ঝাঁজ কমে গিয়েছে।

তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হল মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাঁচের জানলা দেওয়া উচুনিচু ঘর, মাঝল পাথরে বাঁধা মেঝে, ধাপে ধাপে গজার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। ঐখানে রাত জাগবার ঘোর লাগত আমার মনে, সেই সাবরমতী নদীর ধারের পায়চারি^১র সঙ্গে এখানকার পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাঙির কারখানা।

ঐ মোরান-বাগানের কথায় মনে পড়ে এক-একদিন রান্নার আয়োজন বকুলগাছ-তলায়। সে রান্নায় মসলা বেশি ছিল না, ছিল হাতের গুণ। মনে পড়ে পইন্ডের সময় বোঁঠাকরুন আমাদের দুই ভাইয়ের হবিষ্কার রेंধে দিতেন, তাতে পড়ত গাওয়া ঘি। ঐ তিন দিন তার স্বাদে, তার গন্ধে, মুগ্ধ করে রেখেছিল লোভীদের।

আমার একটা বড়ো মুশকিল ছিল, শরীরটাকে সহজে রোগে ধরত না। বাড়ির আর-আর যে-সব ছেলে রোগে পড়তে জানত তারা পেত তাঁর হাতের সেবা। তারা শুধু যে তাঁর সেবা পেত তা নয়, তাঁর সময় জুড়ে বসত। আমার ভাগ যেত কমে।

সেদিনকার সেই ভেতালার দিন বিলিয়ে গেল তাঁকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে আমার এল ভেতালার বসতি, আগেকার সঙ্গে এর ঠিক জোড়-লাগানো চলে না।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি যৌবনের সদর দরজায়। আবার ফিরতে হল সেই ছেলেবেলার সীমানার দিকে।

এবার বোলা বছর বয়সের হিসাব দিতে হচ্ছে। তার আরম্ভের মুখেই দেখা

১. জীবনযাত্রার ‘আয়োজন’ পরিচ্ছেদে উল্লিখিত — স্ববীজ-রচনাখলী, মণ্ডল ৭৩

দিয়েছে ভারতী^১। আশকাল দেশে চার দিকেই ফুটে ফুটে উঠছে কাগজ বের করবার টগবগানি। বুঝতে পারি সে দেশের জোর, যখন কিরে তাকাই সেদিনকার খেপামির দিকে। আবার মতো ছেলে যার না ছিল বিদ্যে, না ছিল সাধি, সেও সেই বৈঠকে জায়গা জুড়ে বসল, অথচ সেটা কারও নজরে পড়ল না— এর থেকে জানা যায়, চার দিকে ছেলেমানুষি হাওয়ার যেন ঘুর লেগেছিল। দেশে একমাত্র পাকা হাতের কাগজ তখন দেখা দিয়েছিল বঙ্গদর্শন। আমাদের এ ছিল কাঁচাপাকা; বড়দাদা^২ যা লিখছেন তা লেখাও যেমন শক্ত বোঝাও তেমনি, আর তারই মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প^৩— সেটা যে কী বহুনির বিহুনি নিয়ে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুকে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন ক'রে খোলে নি।

এইখানে বড়দাদার কথাটা বলে নেবার সময় এল। জ্যোতিদাদার আসর ছিল তেভালার ঘরে, আর বড়দাদার ছিল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়। এক সময়ে তিনি ডুবেছিলেন আপন-মনে ভারি ভারি তত্ত্বকথা নিয়ে, সে ছিল আমাদের নাগালের বাইরে। যা লিখতেন, যা ভাবতেন, তা শোনার লোক ছিল কম। যদি কেউ রাগি হয়ে ধরা দিত তাকে উনি ছাড়তে চাইতেন না, কিংবা সে ঠেকে ছাড়ত না— ওঁর উপর যা দাবি করত সে কেবল তত্ত্বকথা শোনা নিয়ে নয়। একটি সঙ্গী বড়দাদার জুটেছিলেন, তাঁর নাম জানি নে, তাঁকে সবাই ডাকত ফিলজফার ব'লে। অন্য দাদারা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন কেবল তাঁর মটনচপের 'পরে লোভ নিয়ে নয়, দিনের পর দিন তাঁর নানা রকমের জরুরি দরকার নিয়ে। দর্শনশাস্ত্র ছাড়া বড়দাদার শখ ছিল গণিতের সমস্তা বানানো। অকচিৎওয়াল পাভাগুলো দক্ষিণে হাওয়ার উড়ে বেড়াত বারান্দায়। বড়দাদা গান গাইতে পারতেন না, বিলিতি বাঁপি বাজাতেন, কিন্তু সে গানের অন্ত নয়— অক দিয়ে এক-এক রাগিণীতে গানের স্বর যেপে নেবার জন্তে। তার পরে এক সময়ে ধরলেন 'অপ্ৰপ্রয়াণ' লিখতে। তার গোড়ায় শুরু হল ছন্দ বানানো। সংস্কৃত ভাষার ধনিকে বাংলা ভাষার ধনির বাটখারায় ওজন করে করে সাজিয়ে তুলতেন— তার অনেকগুলো রেখেছেন, অনেকগুলি রাখেন নি, ছেঁড়া পাতায় ছড়াছড়ি গেছে। তার পরে কাব্য লিখতে লাগলেন; যত লিখে রাখতেন তার জেরে কেলে দিতেন অনেক বেশি। যা লিখতেন তা সহজে পছন্দ হত না। তাঁর সেই-সব ফেলাছড়া লাইনগুলো কুড়িয়ে রাখবার মতো বুদ্ধি আমাদের ছিল না। যেমন যেমন

১ প্রকাশ ১২৮৪ খ্রিঃ [ইং ১৮৭৭]

২ বিজ্ঞানপ্রয়াণ ঠাকুর

৩ রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'ভিখারিণী' —ভারতী, ১২৮৪ খ্রিঃ-ভাদ্র

লিখতেন শুনিযে যেতেন, শোনবার লোক জমত তাঁর চার দিকে। আমরা বাড়িমুখ সবাই যেতে গিয়েছিলুম এই কাব্যের রসে। পড়ার মাঝে মাঝে উচ্চহাসি উঠত উথলিয়ে। তাঁর হাসি ছিল আকাশ-ভরা; সেই হাসির ঝোঁকের মাথায় কেউ যদি হাতের কাছে থাকত তাকে চাপড়িয়ে অস্থির করে তুলতেন।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির প্রাণের একটি ঝরনাতলা ছিল এই দক্ষিণের বারান্দা, শুকিয়ে গেল এর শ্রোত, বড়দাদা চলে গেলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমে। আমার কেবল মাঝে মাঝে মনে পড়ে, ঐ বারান্দার সামনের বাগানে মন-কেমন-করা শরতের রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে, আমি নতুন গান তৈরি করে গাচ্ছি ‘আজি শরততপনে প্রভাতস্বপনে কী জানি পরান কী যে চায়’। আর মনে আসে একটি তপ্ত দিনের কী কী দুই গ্রহরের গান ‘হেলাফেলা সারাবেলা এ কী খেলা আপন-মনে’।

বড়দাদার আর-একটি অভ্যাস ছিল চোখে পড়বার মতো, সে তাঁর সীতার কাটা। পুকুরে নেমে কিছু না হবে তো পঞ্চাশ বার এপার-ওপার করতেন। পেনেটির বাগানে যখন ছিলেন তখন গঙ্গা পেরিয়ে চলে যেতেন অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁর দেখাদেখি সীতার আমরাও শিখেছি ছেলেবেলা থেকে। দেখা শুরু করেছিলুম নিজেকে নিজেই। পায়জামা ভিজিয়ে নিষে টেনে টেনে ভরে তুলতুম বাতাসে। জলে নামলেই সেটা কোমরের চার দিকে হাওয়ার কোমরবন্দর মতো ফুলে উঠত। তার পরে আর ডোববার জো থাকত না। বড়োবয়সে যখন শিলাইদহের চরে থাকতুম তখন একবার সীতার দিয়ে পদ্মা পেরিয়েছিলুম। কথাটা শুনেও যতটা তাক-লাগানো আসলে ততটা নয়। মাঝে মাঝে চরা-পড়া সেই পদ্মার টান ছিল না তাকে সম্বাহ করবার মতো; তবু ডাঙার লোকের কাছে ভয়-লাগানো গল্পটা শোনাবার মতো বটে, শুনিযেওছি অনেকবার। ছেলেবেলায় যখন গিয়েছি ড্যাংলহোসি পাহাড়ে, পিতৃদেব আমাকে একা-একা ঘুরে বেড়াতে কখনো মানা করেন নি। পারে-চলা রাস্তার আমি ফলাওমালা লাঠি হাতে এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে উঠে যেতুম। তার সকলের চেয়ে যজ্ঞ ছিল মনে মনে ভয় বানিয়ে তোলা। একদিন ওংরাই পথে যেতে যেতে পা পড়েছিল গাছের ঝুলায় রাশ-করা শুকনো পাতার উপর। পা একটু হড়কে যেতেই লাঠি দিয়ে ঠেকিয়ে দিলুম। কিন্তু না ঠেকাতেও তো পারতুম। ঢালু পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে অনেকদূর নীচে ঝরনার মধ্যে পড়তে কতক্ষণ লাগত। কী যে হতে পারত সেটা এতখানি করে মা’র কাছে বলেছি। তা ছাড়া ঘন পাইনের বনে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ডালুকের সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারত, এও একটা শোনাবার মতো জিনিস ছিল বটে। ঘটবার মতো কিছুই ঘটে নি, কাজেই অঘটন সব জমিয়েছিলুম মনে।

আমার সঁতার দিয়ে পদ্মা পার হওয়ার গল্পও এ-সব গল্পের থেকে খুব বেশি তফাত নয়।

সাতেরো বছরে পড়লুম যখন, ভারতীয় সম্পাদকি বৈঠক থেকে আমাকে সরে যেতে হল।

এই সময়ে আমার বিলেত যাওয়া ঠিক হয়েছে। আর সেই সঙ্গে পরামর্শ হল, আহাজে চড়বার আগে মেজদাদার সঙ্গে গিয়ে আমাকে বিলিতি চালচলনের গোড়া-পত্তন করে নিতে হবে। তিনি শুধু অজিরতি করছেন আমেদাবাদে; মেজ-বৌঠাকরুন আর তাঁর ছেলেমেয়ে আছেন ইংলণ্ডে, কর্তা নিয়ে মেজদাদা তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন এই অপেক্ষায়।

শিকড়হুড় আমাকে উপড়ে নিয়ে আসা হল এক খেত থেকে আর-এক খেতে। নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে বোকাপড়া শুরু হল। গোড়াতে সব-তাতেই খটকা দিতে লাগল লজ্জা। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে নিজের মানরক্ষা করব কী করে এই ছিল ভাবনা। যে অচেনা সংসারের সঙ্গে মাথামাথিও সহজ ছিল না, আর পথ ছিল না যাকে এড়িয়ে যাওয়ার, আমার মতো ছেলের মন সেখানে কেবলই হুঁচট খেয়ে মরত।

আমেদাবাদে একটা পুরনো ইতিহাসের ছবির মধ্যে আমার মন উড়ে বেড়াতে লাগল। জজের বাসা ছিল শাহিবান্গে, বাগশাহি আমলের রাজবাড়িতে। দিনের বেলায় মেজদাদা চলে যেতেন কাজে; বড়ো বড়ো কাঁকা ঘর হাঁ হাঁ করছে, সমস্ত দিন ভূতে-পাওয়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। সামনে প্রকাণ্ড চাতাল, সেখান থেকে দেখা যেত সাবরমতী নদী হাটুজল লুটিয়ে নিয়ে একেবেঁকে চলেছে বালির মধ্যে। চাতালটার কোথাও কোথাও চৌবাচ্চার পাথরের গাঁথনিতে যেন খবর জমা হয়ে আছে বেগমদের স্থানের আমিরিআনার।

কলকাতার আমরা বাবু, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখি নি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকের বেঁটে সময়টাতেই বাধা। আমেদাবাদে এসে এই প্রথম দেখলুম চলচ্চিত্র ইতিহাস খেয়ে গিয়েছে, দেখা যাচ্ছে তার পিছন-কেরা বড়ো ঘরোয়ানা। তার সাবক দিনগুলো যেন বকের ঘনের মতো মাটির নীচে পোতা। আমার মনের মধ্যে প্রথম আভাস দিয়েছিল ‘কুখিত পাষণ’^১এর গল্পের।

সে আজ কত শত বৎসরের কথা। নহবৎখানায় বাজছে রোশনচৌকি দিনরাত্রে আট প্রহরের রাগিণীতে, রাতার তালে তালে ঘোড়ার ঘুরের শব্দ উঠছে, ঘোড়সওয়ার তুর্কি কোজের চলছে কুচকাওয়াজ, তাদের মর্শার কলার রোল উঠছে বকুঝকিয়ে।

বাদশাহি দরবারের চার দিকে চলেছে সর্বনেশে কানাকানি ফুস্ফাস। অন্দরমহলে খোলা ভলোয়ার হাতে হাবসি খোজারা পাহারা দিচ্ছে। বেগমদের হামায়ে ছুটছে গোলাবজলের ফোয়ারা, উঠছে বাজুবন্ধ-কাকনের বন্ধানি। আজ স্থির দাঁড়িয়ে শাহিবাগ, ভুলে-যাওয়া গল্পের মতো ; তার চার দিকে কোথাও নেই সেই রঙ, নেই সেই-সব ধনি— শুকনো দিন, রস-ফুরিয়ে-যাওয়া রাত্রি।

পুরনো ইতিহাস ছিল তার হাড়গুলো বের করে ; তার মাথায় খুলিটা আছে, মুকুট নেই। তার উপরে খোলস মুখোস পরিয়ে একটা পুরোপুরি মূর্তি মনের জাহ্নবরে সাজিয়ে তুলতে পেরেছি তা বললে বেশি বলা হবে। চালচলির খাড়া করে একটা খসড়া মনের সামনে দাঁড় করিয়েছিলুম, সেটা আমার খেলারই খেলনা। কিছু মনে থাকে, অনেকখানি ভুলে যাই ব'লে এইরকম জোড়াতাড়া দেওয়া সহজ হয়। আশি বছর পরে এসে নিজেরই যে-একখানা রূপ সামনে আজ দেখা দিয়েছে আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলে না, অনেকখানি সে মনগড়া।

এখানে কিছুদিন থাকার পর বেঙ্গদাদা মনে করলেন, বিদেশকে যারা দেশের রস দিতে পারে সেইরকম মেয়েদের সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে দিতে পারলে হয়তো ঘরছাড়া মন আরাম পাবে। ইংরেজি ভাষা লেখবারও সেই হবে সহজ উপায়। তাই কিছুদিনের জন্যে বোম্বাইয়ের কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির কোনো-একটি এখনকার কালের পড়াশুনোওয়ালা মেয়ে^১ বন্ধুত্ব করে মেয়ে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিচ্ছেদ সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিজ্ঞা ফলাবার মতো পুঁথি ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে। আদর আদায় করবার ঐ ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো মূলধন। যার কাছে নিজের এই কবিস্থানার জানান দিয়েছিলেন তিনি সেটাকে যেপেছখে নেন নি, যেনে নিয়েছিলেন। কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে— সেটা ভালো লাগল তাঁর কানে। ইচ্ছে করেছিলেন সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটাকে কাব্যের গাঁথুনিতে ; শুনলেন সেটা ভোরবেলাকার ভৈরবী সুরে ; বললেন, ‘কবি, তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মরণদিনের থেকেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠতে পারি।’ এর থেকে বোঝা যাবে, মেয়েরা যাকে আদর জানাতে চায় তার কথা একটু বধু মিশিয়ে বাড়িয়েই বলে, সেটা খুশি ছড়িয়ে দেবার জন্মেই।

১ অল্পপূর্ণা গুরুদেবর বা আনা গুরুদেব, ডাক্তার আব্বাস আলী পাশুরা'এর কন্যা

মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহ্যিক অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন, একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন, ‘একটা কথা আমার রাখতেই হবে, তুমি কোনো দিন দাড়ি রেখো না, তোমার মুখের সৌন্দর্য যেমত কিছুতেই চাকা না পড়ে।’ তাঁর এই কথা আজ পর্যন্ত রাখা হয় নি, সে কথা সকলেরই জানা আছে। আমার মুখে অবাধ্যতা প্রকাশ পাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

আমাদের ঐ বটগাছটাতে কোনো কোনো বছরে হঠাৎ বিদেশী পাখি এসে বাসা বাঁধে। তাদের ডানার নাচ চিনে নিতে নিতেই দেখি তারা চলে গেছে। তারা অজানা স্থল নিয়ে আসে দূরের বন থেকে। তেমনি জীবনযাত্রার মাঝে মাঝে অগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মাতৃস্বের দূতী, হৃদয়ের দখলের সৌন্দর্য বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না। চলে যেতে যেতে বেঁচে-থাকার চাদরটার উপরে ফুলকাটা কাঁধের পাড় বসিয়ে দেয়, বরাবরের মতো দিনরাত্রির দায় দিয়ে যায় বাড়িয়ে।

১৪

যে মৃত্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল— সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই। তার মালমসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে। অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কাজ খেয়ে যায়। এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানাঘরে যাদের বিশেষ রকম গড়ন-পিটন ঘটে তারা বাজারে বিশেষ মার্কায় দায় পায়।

আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানাঘরের প্রায় সবস্তুটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম। মাস্টার পণ্ডিত যাদের বিশেষ করে রাখা হয়েছিল তাঁরা আমাকে ডব্বিয়ে দেবার কাজে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মশায় ছিলেন আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাসীশ মশায়ের পুত্র, বি. এ. পাস-করা। তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, লেখাপড়া-লেখার বাঁধা রাস্তায় এ ছেলেকে চালানো যাবে না। মুশকিল এই যে, পাস-করা ডব্বালোকের ছাঁচে ছেলেদের চালানো করতেই হবে, এ কথাটা তখনকার দিনের মুকসিররা তেমন জোরের সঙ্গে ভাবেন নি। সেকালে কলেজি বিভাগ একই বেঁকাআলে ধনী অধনী সকলকেই টেনে আনবার তাগিদ ছিল না। আমাদের বংশে তখন ধন ছিল না ক্রিয়াকর্মী নাহি ছিল, তাই

রীতিটা টিকে গিয়েছিল। লেখাপড়ার গরজটা ছিল ঢিলে। ছাত্রবৃত্তির নীচের ক্লাস থেকে এক সময়ে আমাদের চালান করা হয়েছিল ডিক্ৰুজ সাহেবের বেঙ্গল একাডেমিতে। আর-কিছু না হোক, ভদ্রতা রক্ষার মতো ইংরেজি বচন সড়গড় হবে, অভিভাবকদের এই ছিল আশা। ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলাম বোবা আর কালা, সকলরকম এক্সেসাইজের খাতাই থাকত বিধবার খান কাপড়ের মতো আগাগোড়াই সাদা। আমার পড়া না করবার অদ্ভুত জেদ দেখে ক্লাসের মাস্টার ডিক্ৰুজ সাহেবের কাছে নালিশ করেছিলেন। ডিক্ৰুজ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পড়াশোনা করবার জন্তে আমরা জন্মাই নি, মাসে মাসে মাইনে চুকিয়ে দেবার জন্তেই পৃথিবীতে আমাদের আসা। জ্ঞানবাবু কতকটা সেইরকমই ঠিক করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি একটা পথ কেটেছিলেন। আমাকে আগাগোড়া মুখস্থ করিয়ে দিলেন কুমারসম্ভব। ঘরে বসে রেখে আমাকে দিয়ে ম্যাকবেথ তর্জমা করিয়ে নিলেন। এ দিকে রামসর্বস্ব পণ্ডিতমশায় পড়িয়ে দিলেন শকুন্তলা। ক্লাসের পড়ার বাইরে আমাকে দিয়েছিলেন ছেড়ে, কিছু ফল পেয়েছিলেন। আমার ছেলেবয়সের মন গড়বার এই ছিল মালমসলা, আর ছিল বাংলা বই যা তা, তার বাছবিচার ছিল না।

উঠলুম বিলেতে গিয়ে, জীবনগঠনে আরম্ভ হল বিদিশি কারিগরি—কেমিস্ট্রিতে যাকে বলে যৌগিক বস্তুর সৃষ্টি। এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিজ্ঞা শিখে নিতে; কিছু কিছু চেষ্টা হতে লাগল, কিন্তু হয়ে উঠল না। মেজবোঠান ছিলেন, ছিল তাঁর ছেলেবেষে, জড়িয়ে রইলুম আপন ঘরের জালে। ইন্সলমহলের আশেপাশে ঘুরেছি; বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মাসখের কাছাকাছি থাকার পাওনা। নানা দিক থেকে বিলেতের আবহাওয়ার কাজ চলতে লাগল মনের উপর।

পালিত সাহেব^১ আমাকে ছাড়িয়ে নিলেন ঘরের বাধন থেকে। একটি ভাস্কারের বাড়িতে বাসা নিলুম। তাঁরা আমাকে তুলিয়ে দিলেন যে, বিদেশে এসেছি। মিসেস স্কট আমাকে যে স্নেহ করতেন সে একেবারে খাটি। আমার জন্তে সকল সময়েই মায়ের মতো ভাবনা ছিল তাঁর মনে। আমি তখন লগুন যুনিভার্সিটিতে ভরতি হয়েছি, ইংরেজি সাহিত্য পড়াচ্ছেন হেনরি বরলি। সে তো পড়ার বই থেকে চালান দেওয়া শুকনো মাল নয়। সাহিত্য তাঁর মনে, তাঁর গলার স্বরে প্রাণ পেয়ে উঠত—আমাদের সেই বয়সে পৌছত যেখানে প্রাণ চায় আপন

ধোয়াক, মাঝখানে রাসের কিছুই লোকমান হত না। বাড়িতে এসে ক্যারেগুন প্রেসের বইগুলি থেকে পড়বার বিষয় উলটে-পালটে বুঝে নিতুম। অর্থাৎ নিজের মাস্টারি করার কাজটা নিজেই নিয়েছিলুম। নাহক থেকে থেকে মিসেস স্কট মনে করতেন, আমার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। তিনি জানতেন না, ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যাঘাৎ হবার গোট বন্ধ। প্রতিদিন ভোরবেলায় বরফ-গলা জলে স্নান করেছি। শুখনকার ডাক্তারি মতে এরকম অনিয়মে বেঁচে থাকার যেন শাস্ত্র ভিড়িয়ে চলা।

আমি যুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিন মাস মাত্র। কিন্তু আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই যাহ্নুষের ছোঁওয়া লেগে। আমাদের কারিগর স্বযোগ পেলেই তাঁর রচনায় মিলিয়ে দেন নূতন নূতন মালমসলা। তিন মাসে ইংরেজের হৃদয়ের কাছাকাছি থেকে সেই মিশ্রণটি ঘটেছিল। আমার উপরে ভার পড়েছিল রোজ সন্ধ্যাবেলায় রাত এগারোটা পর্যন্ত পাল্লা ক'রে কাব্যনাটক ইতিহাস পড়ে শোনানো। ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে যাহ্নুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলেম, ব্যারিস্টার হই নি। জীবনের গোড়াকার কাঠামোটাকে নাড়া দেবার মতো খাঁকা পাই নি, নিজের মূখ্য নিয়েছি পূর্ব-পশ্চিমের হাত মেলানো—আমার নামটার মানে পেয়েছি প্রাণের মধ্যে।

সভ্যতার সংকট

সভ্যতার সংকট

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতন দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃষ্ট অপর প্রান্ত থেকে নিঃসৃত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অস্বস্তি করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি স্থিতিশীল হয়ে গেছে ; সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর ক্ষুণ্ণতার কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেক পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্ঘাটিত হল একটি বহু সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিজ্ঞানভীর পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিজ্ঞান জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল যান্ত্রিকতম বৈদ্যুতিক পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলেয় ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে ; নিরন্তর আলোচনা চলত সেক্সপিয়রের নাটক নিয়ে, বায়্রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্সে সর্বমানবের বিজয়ধোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সে বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা, একসময় অত্যাচারপ্রণীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে। দ্বারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলণ্ডে। মানবমৈত্রীর বিস্তৃত পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে, তাই আন্তরিক প্রজ্ঞা নিয়ে ইংরেজকে ক্রমের উচ্চাগনে বসিয়েছিলেন। তখনো সাম্রাজ্যবাদবস্তুর তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয় নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, সেইসময় জন্ম ড্রাইটের যুগ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেন তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতার ক্রমের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রজ্ঞা বিস্তার করেছিল সে আমার আজ

পৰ্বন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীমষ্ট দিনেও আমার পূৰ্বস্মৃতিকে রক্ষা করেছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের জ্ঞান বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে প্রজ্ঞার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কৃপা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা রূপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টলাভ করেছিল আজ পৰ্বন্ত তার বিজয়শয্যা আমার মনে মজ্জিত হয়েছে।

‘সিভিলিজেশন’, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার স্বার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলবৃত্তের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারস্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ, এই আচারের ভিত্তি প্রধান উপরেই প্রতিষ্ঠিত—তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাকুক। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিন্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিজ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলাম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে কী লোকব্যবহারে, স্তায়বুদ্ধির অমুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যাহরণ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই পেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন হৃদয়ে। প্রত্যাহ দেখতে পেলুম—সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, যিনি প্রবর্তনার ভারী আঁকে কী অনায়াসে লম্বন করতে পারে।

নিম্নে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেটন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে বা-কিছু অত্যাৱশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক-শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটে নি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহিমাধানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলাম তখন কোনোদিন সভ্যনাথদারী মানব-আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারি নি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিণীত অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব স্বীকা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম আপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কিরকম সম্পদ্বান হয়ে উঠল। সেই আপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্য শাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার স্বভাৱ নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকুপণ অধ্যবসায়—সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্ত ও আত্মাবমাননা অপসাদ্রিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করে নি, বিত্তহীন মানবসম্পদের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার ক্ষুদ্র এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে দীর্ঘা এবং আনন্দ অজুতব করেছি। স্বভাৱ শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল—দেখেছিলাম, সেধানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না; তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার স্বার্থ সভ্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপরে প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে—এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নিরীক করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সংঘর্ষ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির। আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিশালী করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সবই কিছু পড়েছি। এইরকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাদের মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেধানকার

শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদাক্ষণ নিশ্চেষ্টা বয়েস শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই যুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের যুরোপীয় দণ্ডোঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুস্ত্রিয়ানদের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে যুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বাঙ্গতঃ করণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণ কামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্তানের মধ্যে শিকা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যদিচ এখনো ঘটে নি কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, তার একমাত্র কারণ—সভ্যভাগবিত কোনো যুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারে নি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদল পাথর বুকে নিয়ে তলিষে পড়ে রইল নিকপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এতবড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহির্কেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসং করলে। এই অভীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত ; ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল। পরে এক সময়ে স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলার ইংলণ্ড ক্রিয়কম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, একদল ইংরেজ সেই বিপদগ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত আগ্রহ হয় নি, তবু যুরোপীয় জাতির প্রজাতন্ত্রদ্বারা রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানবহিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। যুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই নোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনার ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিকা এবং আরোগ্যের পোকাবহ অভাব স্বাভাবিক নয় ; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাই নি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে।

আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্য আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যাহই ক্রমশ উৎকর্ষ হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারত-শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের কোনো-এক গোপন কেষ্টে প্রেরণের দ্বারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এতবড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে আপানের চেয়ে নূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজশাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিযুক্ত ভারত, আর আপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষদ্বারার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলা, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and Order, বিধি এবং ব্যবস্থা, বা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, বা দায়োয়ানি যাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি প্রকাটা রাধা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারে নি। অর্থাৎ, যাহুবে যাহুবে যে সম্বন্ধ সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে তার রূপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে যাকে যাকে মহাদেশ ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাই নি। এরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্বলে এণ্ড্রুজের নাম করতে পারি; তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃষ্টানকে, যথার্থ মানবকে বহুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ যত্নের পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ঘর হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণবয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল প্রজ্ঞা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলাম, আমার শেষবয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক-মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত বাহ্যিক্য আমার মনে ক্রম হয়ে থাকবে। আমি এদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এদের পরিচয় আমার জীবনে একটি প্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এরা সকলপ্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে

আমার নৈরাশ্র কোথাও প্রতিবাদ পেল না।

এমনসময় দেখা গেল, সমস্ত যুরোপে বর্ষরতা কিরকম নথদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্ভূত। এই মানবপীড়নের মহামারী পশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হৃদভাগ্য নিঃসহায় নীরব অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি।

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনদ্বারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম যুরোপের অস্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদ্যার দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিজ্ঞাপকতার অন্নদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি— পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিংকর উচ্ছিন্ন সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ত্ত ভগ্নস্তুপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মানুষের অস্ত্রহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও কমতা মদমত্ততা আত্মভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মৈধেতে ভাবং ভূতো ভ্রূণাণি পশ্যতি।

ভূতঃ সপত্নান্ অয়তি সমূলন্ত বিনশ্যতি।

ঐ মহামানব আসে,
 দিকে দিকে ঘোষাক লাগে
 মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে ।
 সুরলোকে বেজে ওঠে শব্দ,
 নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক,
 এল মহাজন্মের লয় ।
 আজি অমরাত্রির দুর্গভোরণ যত
 ধূলিভলে হয়ে গেল ভয় ।
 উদয়শিখরে জাগে যাইভঃ যাইভঃ রব
 নবজীবনের আশাসে ।
 'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যাসয়'
 যন্ত্রি উঠিল মহাকাশে ।

উদয়ন । শান্তিনিকেতন

১ বৈশাখ ১৩৪৮

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও রচনা-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিয়ে মুদ্রিত হইল ।]

‘ছড়া’ ১৩৪৮ সালের ডাঙ্গ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইলেও গ্রন্থটির মুদ্রণ তাহার জীবদ্দশাতেই শুরু হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এক পাঠসভায়, একুশ “নূতন কবিতা” সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর ছাত্রদের বাহা বলিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি ১৩৪৭ বৈশাখের প্রবাসীতে ‘নূতন কবিতা’ নামে মুদ্রিত হয় ; উক্ত সংখ্যার ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই কবিতাগুলির ভাষা ও ছন্দ প্রসঙ্গে ‘ছড়ার ছবি’ গ্রন্থের ভূমিকাটিও (রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ড) স্বরণযোগ্য।

প্রথম কবিতার একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পাঠ ‘শনিবারের চিঠি’তে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়। কবিতাটির উক্ত পূর্বতন পাঠ এখানে সংকলিত হইল—

ছড়া

স্বপনদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে,
লাল বাঁধরের নাচন সেখায় রামছাগলের ঘাড়ে।
মনিব যিঞা বাঁধরটাকে খাওয়ায় শালিধান্ত।
রামছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্ত।
দাড়িটা তার নড়ে কেবল, বাজে রে ডুগুড়ুগি—
কাংলা মারে লেজের ঝাপট, জল ওঠে বুগুগি।

রামছাগলের ঘোটা গলার ভ্যাভ্যা যবেয় ডাকে
সুড়ুসুড়ি দেয় খেকে খেকে চৌকিদারের নাকে।
ইচির পরে বারে বারে বতাই ইঁচি ছাড়ে
বাতাস জুড়ে ঘন ঘন কোদাল ঘেন পাড়ে।
দন্তবাড়ির ঘাটের কাছে যেখনি ইঁচি পড়া
আংকে উঠে কাঁধের খেকে বৌ কেল দেয় বড়া।
কাকেরা হয় হতবুদ্ধি, বকেরা ভাঙে ধ্যান,
এজলাসেতে চমকে ওঠেন হরিমোহন সেন।

হাঁচির ধাক্কা এতখানি, এটা গুজব মিথো—
 এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিন্তে
 অল্প কিছু লাগল ধাঁধা। রাগল অপর পক্ষে ;
 বললে, 'ফিজিক্স পড়ে কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে।
 অল্প দেশে অসম্ভব বা পুণ্য ভারতবর্ষে
 সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর সে।'
 এই নিয়ে দুই দলে মিলে ইট পাটকেল ছোড়া—
 হায় রে কারও ডাঙল কপাল, কেউ বা হল খোড়া।
 গোলমিষি লালমিষি জুড়ে বীরপুরুষের বড়াই—
 সমুদ্রতীরে এ পারেতে এরই বলে লড়াই।
 সিঁছুপারে যত্নদূতের চলছে নাচানাচি,
 বাংলাদেশের তেঁতুলবনে চৌকিদারের হাঁচি।
 সত্য হোক বা আজগুবি হোক— আদমদিঘির পাড়ে
 বানর চড়ে বসে আছে রামছাগলের ঘাড়ে।
 ছেলেরা সব হাততালি দেয়, বাজে রে ডুগুগি—
 গভীর জলে কাংলা খেলায়, জল ওঠে বুগুগি।

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫২৩

কবির হাতে লেখা, 'ছড়া'র পঞ্চম কবিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয়
 কবিতার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। নিয়ে উহা সংকলিত হইল—

চলচ্চিত্র

মাথার থেকে ধানী রঙের গুড়নাখানা সরে যায়,
 চীনের টবে হাসুহানার গন্ধে বাতাস ভরে যায়।
 তিনটে পাঠান মালী আছে নবাবজাদার বাগানে,
 দুয়ারে তার ডালকুস্তো চীৎকারে রাত-জাগানে।
 ধানশ্রীতে সানাই বাজে কুজবাবুর ফটকে,
 দেউড়িতে ভিড় জমে গেছে নাটক দেখার চটকে।
 কোমর-ঘেরা আঁচলখানা, হাতে পানের কোঁটা,
 ঘোষপাড়াতে হুঁহুনিরে চলে নাপিত-খটটা।

গাছে চড়ে রাখাল ছোঁকা জোগায় কাঁচা সুপরি,
 ছবেলা পান কাঁধা আছে, আরো আছে উপরি ।
 সের পঁচিশেক কদম্বা ছিল কলুবুড়ির ধামাতে
 জলের মধ্যে উলটে গেল ঘাটের ধারে নামাতে ।
 মাছ এল তাই কাংলাপাড়া খরসাহাটি বেঁটিয়ে,
 মোটা মোটা চিংড়ি ওঠে পাকের তলা বেঁটিয়ে ।
 চিনির পানা খেয়ে খুশি, ডিগবাজি খায় কাংলা—
 চাঁদা মাছের চ্যাপটা জঠর রইল না আর পাংলা ।
 শেষে দেখি ইলিশ মাছের মিষ্টিতে আর কচি নাই,
 চিডল মাছের মুখটা দেখেই ঐশ্বর্য তারে পুছি নাই ।
 ননদকে ভাজ বললে, তুমি বিখ্যে এ মাছ কোট, তাই,
 রাখতে গিয়ে দেখি এ যে মিঠাই-গজার ছোটো তাই ।

রোদের তাপে হাওয়া কাঁপে, মাঠের বালি ভেঙে যায় ।
 পাকুড়তলার ঘাটে গোকুর দিঘিতে জল খেতে যায় ।
 ডিঙি চলে থিকি থিকি, নদীর ধারা বিহি—
 ছপুর-রোদে আকাশে চিল ডাক দিয়ে যায় চিঁহি ।
 লখা চলে ছাতা মাথায় গৌরী কনের বর—
 ড্যাং ড্যাঙাড্যাং বাজি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর ।

হাঁটুজলে পায় হয়ে যায় মরা নদীর সোঁতা,
 পাড়ির কাছে পাকে ডিঙি আখখানা বর পোঁতা ।
 এনামেলের বাগন-ভরা চলেছে এক ঝাঁক,
 কামার পিটোয় ছম্ছমিয়ে গোকুর গাড়ির চাকা ।
 মাঠের পারে ধকধকিয়ে চল্টি গাড়ির ঘোঁওয়া
 আকাশ বেয়ে ছেঁটে চলে কালো বাঘের ঘোঁওয়া ।
 কাঁসারিটা বাজিয়ে কাঁসা আগায় গলিটাকে,
 কুকুরগুলোর অসহ হয়— আর্জিনাদে ডাকে ।
 ডিঙে চুলের ঝুঁটি বেঁধে বসে আছেন কন্তে,
 মোচার ঘন্ট বানাতে চান কোন্ মাস্তুমের অন্তে ।

গামলা চেটে পরখ করে গাইট। দড়ি-বাধা,
 উঠানের এক কোণে জমা কমলাগুঁড়োর গাদা।
 ভালুক নাচের ডুগুড়ুগি ওই বাজছে ও পাড়াতে,
 কোন্-দিলী ওই বেদের মেয়ে নাচার লাঠি হাতে।
 অশখতলার পাটল গোক আরাবে চোখ বোজে,
 ছাগলছানা ঘুরে বেড়ায় কচি ঘাসের খোজে।
 হঠাৎ কখন বাহুলে মেঘ জুটল দলে দলে,
 পশলা কয়েক বৃষ্টি হতেই মাঠ ভাগালো জলে।
 মাথায় তুলে কচুর পাতা গাঁওতালি সব মেয়ে
 উচ্ছ্বাসের রোল তুলে যায় গাঁয়ের পথে ধেয়ে।
 মাথায় চামর বেঁধে নিয়ে হাট ভেঙে যায় হাটুরে,
 ভিজে কাঠের আঁঠি বেঁধে চলছে ছুটে কাঠুরে।

বিজুলি যায় সাপ খেলিয়ে লকলকি,
 বাণের পাতা চমকে ওঠে স্বক্‌স্বকি।

চড়কভাঙায় ঢাক বাজে ওই ভাভাঃ ভাঃ।

মাঠে মাঠে মক্‌মকিয়ে ডাকে ব্যাঙ।

২৭/৩/১৯৪০

—সকলিতা, ১৩৫০, পৃ ৮১৯

সপ্তম কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক “২১/১১/৩২” তারিখে অঙ্কিত ও “সাহিত্যে
 অবচেতন চিন্তের সৃষ্টি” কবিকৃত এই মন্তব্য-সংবলিত একটি কৌতুকচিত্র-সহ
 ‘অবচেতনার অবদান’ নামে ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ‘শনিবারের চিঠি’তে
 প্রথম মুদ্রিত হয়। কবিতাটির মুখবন্ধ-স্বরূপ নিম্নোদ্ভূত কয়েকটি বাক্য উক্ত মাসিক
 পত্রিকার বাহির হইয়াছিল—

অবচেতন মনের কাব্যরচনা অন্বেষণ করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের
 অসংলগ্নতা কুসাধ্য। ভাবী যুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত
 হলেম। তারই এই নমুনা। কেউ কিছুই বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই
 আশাশূন্যক হবে।

—শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, পৃ ২০৫

‘ছড়া’র অন্ত্যাক্ষর কয়েকটি কবিতার সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের ন্যূনতম নিয়ে প্রদত্ত হইল—

গ্রন্থ সংখ্যা	পত্রিকার পিরোনাম	পত্রিকা	কাল
৩	পরিস্থিতি	প্রবাসী	১৩৪৭ বৈশাখ
৪	মামলা	প্রবাসী	১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
৫	চলচ্চিত্র	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৩৪৭ শ্রাবণ
৬	শ্রী	প্রবাসী	১৩৪৬ চৈত্র
২	স্ববিচারী সংস্করণ	বঙ্গলক্ষ্মী	১৩৪৭ বৈশাখ

শেষ লেখা

‘শেষ লেখা’ রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রচিত সর্বশেষ কবিতাগুলি সংকলিত হইয়াছে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত গ্রন্থের বিজ্ঞপ্তিটি নিয়ে মুদ্রিত হইল—

এই গ্রন্থের নামকরণ পিতৃদেব করিয়া বাইতে পারেন নাই।

‘শেষ লেখা’র কয়েকটি কবিতা তাঁহার অন্তর্নিহিত ; অনেকগুলি শব্দার্থের ব্যবহার যুখে যুখে রচিত, নিকটে বাঁহারা থাকিলেও তাঁহার সেগুলি লিখিয়া লইতেন, পরে তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া যুগ্মের অনুরূপ দিতেন।

‘সমুখে শান্তি-পারাবার’ গানটি ‘ভাকবর’ নাটকের অভিনয়ের জন্য লিখিত হইয়াছিল। এই অভিনয়ের সংকল্প কার্যে পরিণত হয় নাই ; গানটি তাঁহার দেহান্তের পর গীত হয়, পুত্রবীর পিতৃদেব এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ইহা তাঁহার পরলোকযাত্রার পর (২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮) সজ্জার শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও ৩২শে জ্যৈষ্ঠ জ্যৈষ্ঠাসরে শান্তিনিকেতনে গীত হয়।

অন্যভাবে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ‘সমুখে শান্তি-পারাবার’ গানটির বহু পংক্তিতে ‘জ্যোতি প্রবর্তারকার’ স্থলে ‘জ্যোতির প্রবর্তারকা’ পাঠ এবং ‘হৃদয়ের আধার রাতি বারে বারে’ কবিতাটির চতুর্থ পংক্তিতে ‘কটোর বিকৃত ভান’ স্থলে ‘কটোর বিকৃত ভান’ পাঠ হাপা হইয়াছে। প্রথম ত্রয়টি শ্রীমতীকান্ত সরকার সর্বপ্রথম অনুমান করেন ও এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

‘বিবাহের পক্ষ বরষে’ কবিতাটি শ্রীমতী মন্মতা দেবীর বিবাহের পক্ষ বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত।

‘ভব অন্তর্যমের দানের উৎসবে’ কবিতাটি শ্রীমতী মন্মতা দেবীর অন্তর্যম উপলক্ষে রচিত।

‘হৃদয়ের আধার রাতি বারে বারে’ কবিতাটি তিনি যুখে যুখে বলিয়াছিলেন এবং পরে সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

‘ভোবার সৃষ্টির পথ রেখে আকর্ণ করি’ কবিতাটিও এইরূপ যুখে যুখে রচিত, কিন্তু এটি সংশোধন করিবার অবসর ও সুযোগ ভাষার হয় নাই।

—বিজ্ঞপ্তি, শেষ লেখা

‘শেষ লেখা’র যে-সকল কবিতা সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাদের প্রথম প্রকাশের সূচী নিয়ে প্রদত্ত হইল—

ক্রমে সংখ্যা	পত্রিকার বিরোনাম	পত্রিকার নাম	কাল
১		বিশ্বভারতী নিউজ	১৯৪১ অগস্ট
২	অনন্ত আমি	প্রবাসী	১৯৪৭ জ্যৈষ্ঠ ^১
৪	শূন্য চৌকি	বঙ্গলক্ষ্মী	১৯৪৮ বৈশাখ
৬		প্রবাসী	১৯৪৮ জ্যৈষ্ঠ ^২
৭	জীবন	প্রবাসী	১৯৪৮ জ্যৈষ্ঠ
৮	পঞ্চম বার্ষিকী	প্রবাসী	১৯৪৮ জ্যৈষ্ঠ
৯	ধূলি	প্রবাসী	১৯৪৮ আষাঢ়
১০		প্রবাসী	১৯৪৮ জ্যৈষ্ঠ ^৩
১১	কঠিনেরে ভালোবাসিলাম	জয়ন্তী	১৯৪৮ আষাঢ়
১৪	রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ কবিতা	আনন্দবাজার পত্রিকা	১৯৪৮ জ্যৈষ্ঠ ২৪

৪ ও ৫-সংখ্যক কবিতায় উল্লিখিত “চৌকি” বা “আগনধানি” প্রসঙ্গে ত্রিপ্রতিমা ঠাকুরের ‘নির্বাণ’ গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ প্রণিধানযোগ্য বিবেচনায় উদ্ধৃত হইল—

এই অস্থলের সময় যে চৌকিতে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] সব সময় বসতেন তার একটু ইতিহাস এখানে লিখলে বোধ হয় অবান্তর হবে না। তিনি বন্ধন বন্ধি-আমেরিকায় বস্তুতা দিতে যান [ইং ১৯২৫ সাল] সেই সময় সেখানকার প্রসিদ্ধ জেদিকা ম্যাডাম জিটোরিয়া ওকাল্প^৪র তিনি অতিথি হন, ইনি বাবাক্ষণায়ের একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।... আমেরিকায় শরীর ধারণ হতে বাবাক্ষণায় লগনে চলে আসবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।... অনেক হাঙ্গামা করে জাহাজ ভাে ঠিক হল, জিটোরিয়া Cabin de luxe রিজার্ভ করে দিলেন পাছে বাবাক্ষণায়ের সমুদ্রপথে কোনো কষ্ট বা অসুবিধে হয়। তাতেও তিনি সন্তুষ্ট

১ প্রবাসী অনুসারে কবিতাটির বাংলা রচনা তারিখ ২৫ বৈশাখ, ১৯৪৭।

২ ‘সত্যভারত সংকট’ প্রবন্ধের উপসংহার-অঙ্গণ যুক্তি হইয়াছিল।

৩ কবিতাটি প্রবাসী অনুসারে “শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস, আই. সি. এন্স.-কে বাবুড়ায় প্রেরিত।”

৪ ক্রটব্য ‘বাজী’র গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, উৎকর্ষ ৭৩।

৫ কবি ইঁহার বাংলা নামকরণ করিয়াছিলেন, কিম্বা। ‘পূরবী’ কাব্যগ্রন্থটি সেই নামে ইঁহাকেই উৎসর্গীকৃত। রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ ৭৩ ক্রটব্য।

হতে যা পেয়ে তাঁর নিজের চাইঃরমের একখানি আরাব-চেরার জাহাজে তুলে দিলেন।... সেই চৌকি-খানি সেবার নানা ঘের ঘুরে অবশেষে উত্তরাঙ্গণে পৌঁছেছিল। অনেকদিন আর তিনি ওই চৌকি ব্যবহার করেন নি, আশাধের কাছেই পড়ে ছিল। আজ আবার ব্যামোর মধ্যে দেখলুম ঐ চৌকিখানিতে বসে তিনি শ্রম করছেন, সমস্ত দিনই আর ঘুম বা বিশ্রামান্তে ওই আসনের উপর বসে থাকতেন।

—নির্বাণ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৩-৫৪

চৌকিখানি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত আছে।

১৫-সংখ্যক কবিতাটি ১৩৪৮ সালের ৩২ জীবন তারিখে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ‘আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের আত্মবাসন’ উপলক্ষ্যে প্রথম মুদ্রিত হয় ও আত্মের ‘অস্থান পদ্ধতি’র সহিত সর্বসাধারণে বিতরিত হয়। উক্ত মুদ্রিত পত্রীর পাদটীকা অংশ প্রাসঙ্গিকবোধে নিম্নে মুদ্রিত হইল—

বিস্তৃত ৩০শে জুলাই, ১৯৪১ (১৪ই আশ্বিন, ১৩৪৮), বুধবার, আত্মে সাদে নয় ঘটিকার অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পূর্বে শুরুসেব এই কবিতাটি মুখে মুখে রচনা করেন, ইহা পরিমার্জিত কবিতার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। ইহাই তাঁহার শেষ রচনা।

মুক্তির উপায়

‘মুক্তির উপায়’ নাটকটি ‘অলকা’ মাসিক পত্রের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে (১৩৪৫ আশ্বিন) মুদ্রিত হইয়াছিল, গ্রন্থাকারে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

গল্পগুচ্ছের ‘মুক্তির উপায়’ গল্পটি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। এই গল্পটি রবীন্দ্র-রচনাবলীর ষোড়শ খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

লিপিকা

‘লিপিকা’ ১৩২৯ [ইং ১৯২২ অগস্ট] সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৫২ সালের পৌষ মাসে প্রকাশিত সংস্করণে ১৩২৭ বৈশাখের ভারতী হইতে একটি নূতন রচনা সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে লিপিকার শেষে সংযোজনরূপে উহা মুদ্রিত হইল।

লিপিকার সমুদয় রচনা ১৩২৪-২৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল—

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
তোতা-কাহিনী	সবুজপত্র	১৩২৪ মাঘ
স্বর্গ-মর্ত	সবুজপত্র	১৩২৫ কাশ্বিন

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
ঘোড়া ^১	সবুজপত্র	১৩২৬ বৈশাখ
প্রথম শোক ^২	সবুজপত্র	১৩২৬ আষাঢ়
কর্তার ভূত	প্রবাসী	১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ
অম্পট্ট ^৩	সবুজপত্র	১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ
বাণী ^৪	সবুজপত্র	১৩২৬ ভাদ্র
পায়ে চলার পথ	প্রবাসী	১৩২৬ আশ্বিন
প্রের	ভারতী	১৩২৬ আশ্বিন
মেঘলা দিনে ^৫	ভারতী	১৩২৬ আশ্বিন
পুরোনো বাড়ি	মানসী ও মর্মবাণী	১৩২৬ আশ্বিন
আগমনী	আগমনী	১৩২৬ মহাশয়া
মেঘদূত	প্রবাসী	১৩২৬ কার্তিক
বাণি	সবুজপত্র	১৩২৬ কার্তিক
কৃত্রিম শোক	ভারতী	১৩২৬ কার্তিক
সতেরো বছর	ভারতী	১৩২৬ কার্তিক
সন্ধ্যা ও প্রভাত	মানসী ও মর্মবাণী	১৩২৬ কার্তিক
একটি চাউনি	প্রবাসী	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
একটি দিন	প্রবাসী	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
গলি ^৬	সবুজপত্র	১৩২৬ অগ্রহায়ণ
সঙগাত	শান্তিনিকেতন	১৩২৬ পৌষ
মুক্তি	শান্তিনিকেতন	১৩২৬ পৌষ
প্রাণমন ^৭	সবুজপত্র	১৩২৬ ফাল্গুন
গল্প ^৮	প্রবাসী	১৩২৭ বৈশাখ
রথযাত্রা	আকুর	১৩২৭ বৈশাখ
কথিকা	ভারতী	১৩২৭ বৈশাখ
স্বয়ংসানীর সাধ	পাখী	১৩২৭ আশ্বিন
নতুন পুতুল	প্রবাসী	১৩২৮ ভাদ্র
নাথের খেলা	বোসলেন্স ভারত	১৩২৮ ভাদ্র
পট	সবুজপত্র	১৩২৮ ভাদ্র
রাজপুস্তক	ভারতী	১৩২৮ আশ্বিন

রচনার নাম	পত্রিকা	কাল
ভুল স্বর্গ	প্রবাসী	১৩২৮ কার্তিক
মৌরু	ভারতী	১৩২৮ কার্তিক
সিদ্ধি	সবুজপত্র	১৩২৮ মাঘ-ফাল্গুন
বিদ্যক	ভারতী	১৩২৯ বৈশাখ
উপসংহার	ভারতী	১৩২৯ বৈশাখ
পর্যায় পরিচয়	বঙ্গবানী	১৩২৯ বৈশাখ
প্রথম চিঠি	শান্তিনিকেতন	১৩২৯ বৈশাখ
পুনরাবৃত্তি	প্রবাসী	১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ

অঙ্ক-চিহ্নিত রচনাবলির পত্রিকার-মুক্তি নিম্নোক্তঃ ১ মুক্তির ইতিহাস ২ কবিকা ৩ কবিকা ৪ কবিকা ৫ অক্ষয়তা ৬ কবিকা ৭ আবার কথা ৮ গল্প বল।

রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সে রচনার যেমন এ ক্ষেত্রেও তেমনই সাহসিকের ও পুস্তকের পাঠে বহু স্থলে মিল নাই। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, ‘মেঘলা দিনে’ ও ‘প্রাণমন’ লিপিকার পরিবর্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে ‘মুক্তি’ কবিকাটির লিপিকার গ্রহীত পাঠ পূর্ববর্তী পাঠ হইতে সংকুত ও সংক্ষিপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের ভূমিকার লিখিয়াছেন, ‘লিপিকা’র প্রথম তিনি বাংলা গদ্যকবিতা লিখিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু “ছাপবার সময় বাক্যাংশলিকে পঙ্ক্তির মতো খণ্ডিত করা হয় নি—বোধকরি ভীকৃত্যই তার কারণ।” লিপিকার প্রথম ভাগের অধিকাংশ রচনাই উক্ত বস্তুবোয় লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। লিপিকার প্রথম মুদ্রণকালে ঐরূপ রচনার বাক্যের মাঝে মাঝে ছন্দের বিরামস্থলগুলিতে বেশি কঁক দেখানো হইয়াছিল। এহে সংকলনের পূর্বে, লিপিকার একটি রচনার বাক্যাবলীকে আবৃত্তির ছন্দ-অনুযায়ী ভাঙিয়া সাজানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভারতীতে। এই স্থলে উহা যথাযথ উদ্ধৃত করা গেল—

এর

অশান হতে বাপ কিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলটি—গা খোলা, গলায় সোনার ভাবিজ,—একলা গলির উপরকার আন্টার ধারে,

কি ভাবচে তা সে আপনি জানেনা।

সকালের রৌদ্র গায়েনের বাড়ির নীচ গাছটির আগড়ালে দেখা দিচ্ছে;

কাঁচা-আমওয়াল গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে ; খোকা জিজ্ঞাসা করলে “মা কোথায় ?”

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বলে, “স্বর্গে।”

সে রাতে শোকে শান্ত বাপ,

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কণে কণে গুম্বরে উঠছে।

ছায়ে লগ্ননের মিটমিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড় টিকটিকি।

সামনে খোলা ছাদ, কখন খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারাওয়াল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমছে।

উলঙ্গগায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে, “কোথায় স্বর্গের রাস্তা ?”

আকাশে তার কোনো সাড়া নেই ;

কেবল তারায় তারায় বোবা অঙ্ককারের চোখের জল।

—ভারতী, ১৩২৬ আশ্বিন

লিপিকার প্রথমাংশের কয়েকটি রচনার পূর্বতন রূপ পাওয়া যায় ১২০২ বৈশাখের ভারতীতে প্রকাশিত ‘পুষ্পাঞ্জলি’-নামক রবীন্দ্রনাথের একটি পুরাতন রচনায়। উক্ত রচনাটি সম্পূর্ণ বহু রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গ্রন্থপরিচয়ের ‘জীবনস্মৃতি’ অংশে (পৃ ৪৮৫-২৫) আত্মোপাস্ত মুদ্রিত হইয়াছে।

সে

‘সে’ ১৩৪৪ সালের বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং চিত্রিত করিয়াছিলেন। বর্তমান সংস্করণে উক্ত চিত্রের অনেকগুলিই পুনর্মুদ্রিত হইল।

নবপঞ্চায় ‘সন্দেশ’ পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের আশ্বিনে কাষ্ঠিক এবং অগ্রহায়ণে এই গ্রন্থের প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। রংমশাল পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (১৩৪৩ কাষ্ঠিক, পৃ ১-৬) বাহা মুদ্রিত হয় আর তাহাই ‘সে’ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে ; ভূমিকাংশটি (রংমশালের পাঠ) ‘সে’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ইহং রূপান্তরিত ভাবে

গ্রন্থিত আছে। ২২৮-২৯ পৃষ্ঠার 'এক ছিল বোটা কেঁদো বাঘ' কবিতাটি ১৩৪১ বৈশাখের 'মুকুল' পত্রিকায় (নবপঞ্চায়, পৃ ১-২) 'বাঘের শুচিতা' নামে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল।

গল্পসল্প

'গল্পসল্প' ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার নামপত্রখানি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত।

দু-একটিমাত্র বাদে গল্পসল্পের সমস্ত রচনা রবীন্দ্রজীবনের শেষ বৎসরের কসল। ইহার প্রবেশক কবিতাটি ('আমারে পড়েছে আজ ডাক') ১৩৪৭ বৈশাখের 'ভাইবোন' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়; উহাতে গ্রন্থ-সংকলিত পাঠের অতিরিক্ত এই দুইটি ছত্র সর্বশেষে ছিল—

যদি বল 'কথাস্ত্রো যেমন dry bones'
রাগব না, ছুটি নিয়ে যাও ভাইবোনস।

গল্প ও কবিতাগুলির রচনাকাল নিয়ে সংকলিত হইল—

বিজ্ঞানী	৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
পাঁচটা না বাজতেই	১ মার্চ ১৯৪১
রাজার বাড়ি	৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে	২ মার্চ ১৯৪১
বড়ো খবর	১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
পালের সঙ্গে দাঁড়ের বৃষ্টি	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪
চণ্ডী	১০ মার্চ ১৯৪১
যেমন পাজি তেমনি বোকা	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০
রাজরানী	১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
আসিল দিয়াড়ি হাতে	৩ মার্চ ১৯৪১
মুনশি	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
ভীষণ লড়াই তার	৮ মার্চ ১৯৪১
ম্যাজিশিয়ান	১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
ঘেটা বা হয়েই থাকে	১১ মার্চ ১৯৪১
পরী	২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১

যেটা তোমার লুকিয়ে আনা	১১ মার্চ ১৯৪১
আরও-সত্য	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
আমি যখন ছোটো ছিলাম	২ মার্চ ১৯৪১
ম্যানেজার বাবু	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
ভূমি ভাষো এই-বে বোটা	৩ ডিসেম্বর ১৯৪০
বাচস্পতি	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
যার যত নাম আছে	২ মার্চ ১৯৪১
পাশালাল	২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
মাটি থেকে গড়া হয়	১১ মার্চ ১৯৪১
চন্দন	২ মার্চ ১৯৪১
দিনখাটুনির শেষে	১০ মার্চ ১৯৪১
ধ্বংস	৬ মার্চ ১৯৪১
মাহুম সবার বড়ো	৫ মার্চ ১৯৪১
ভালোমাহুম	৭ মার্চ ১৯৪১
যশিরাম সত্যই সত্যনা	২৩ জানুয়ারি ১৯৪১
মুকুতকুমল	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
‘দাদা হব’ ছিল বিষম শব্দ	১২ মার্চ ১৯৪১

বাংলাভাষা-পরিচয়

‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ ইংরেজি ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে ইহার ‘ভূমিকা’টি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় (১৩৪৫) মুদ্রিত হয়। পত্রিকা-মুদ্রিত ‘ভূমিকা’র কিয়দংশ (যদি অল্পক্ষেত্র) গ্রন্থপ্রকাশকালে উহার উপসংহাররূপে সংকলিত হইয়াছে। উক্ত উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ নিজের যে পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা জীবনবিহারী ভট্টাচার্যকে লিখিত হইয়াছিল।

পঞ্চের সংকলন

‘পঞ্চের সংকলন’ ১৩৪৬ সালের ভাদ্র মাসে প্রথম মুদ্রিত হয়। ১৩৫৪ সালের বৈশাখে উক্ত গ্রন্থের যে পূর্ণাঙ্গ সংকলন বাহির হয় রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে তাহাই মুদ্রিত

হইল। ১৯১২ সালে বিদেশযাত্রার প্রারম্ভে ও পথে এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পরিভ্রমণকালে স্ববীক্ষণাধে যে-সকল প্রবন্ধ রচনা করেন ইহা তাহারই সমষ্টি।

এই গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে, প্রবাসকালে লিখিত প্রবন্ধ ও চিঠিপত্র হইতে কয়েকটি নির্বাচিত রচনা "পরিবর্তিত আকারে" প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে নূতন প্রবন্ধ যোগ করা হইয়াছে বলিয়া, সমস্ত রচনাই মূলপাঠ অনুসারে মুদ্রিত হইল। যে-কয়টি চিঠি প্রথম সংস্করণের পরিসিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল সেগুলি বর্তমান সংস্করণ হইতে বর্জিত হইয়াছে; স্ববীক্ষণাধের 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় বথাদ্বানে প্রকাশিত হইবে। এই-জাতীয় অন্যান্য বহু বিলাতের চিঠি ইতিপূর্বেই 'চিঠিপত্র' চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯১২ সালে কবির প্রবাসচিহ্নার সমষ্টিরূপে প্রসিকল্পিত 'পথের সঙ্গ'এর এই দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে, ১৯২০ সালে লিখিত 'বিলাত-বাজীর পত্র' বর্জিত হইয়াছে; ইহাও 'চিঠিপত্র' গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইবে।

বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি সমস্তই বাংলা ১৩১৯ সালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত। নিম্নে প্রকাশ্যুচী দেওয়া গেল—

রচনা	পত্রিকা	কাল
যাত্রার পূর্বপত্র	ভববোধিনী	আষাঢ়
বোম্বাই শহর	ভববোধিনী	আষাঢ়
জলস্থল	প্রবাসী	শ্রাবণ
সমুদ্রপাড়ি	ভববোধিনী	শ্রাবণ
যাত্রা	ভববোধিনী	শ্রাবণ
আনন্দরূপ	ভববোধিনী	শ্রাবণ
তুই ইচ্ছা	প্রবাসী	শ্রাবণ
অস্তর বাহির	ভারতী	শ্রাবণ
খেলা ও কাজ	ভববোধিনী	ভাদ্র
লগনে	প্রবাসী	ভাদ্র
বহু	ভারতী	কার্তিক
কবি মেইস্	প্রবাসী	কার্তিক
স্টপ্‌ফোর্ড্ ক্রক ^১	প্রবাসী	কার্তিক

১ প্রথমসংস্করণ পথের সঙ্গের 'বিচ্ছিন্ন' নামে মুদ্রিত।

২ 'বিলাতের চিঠি' এই নামে প্রবাসীতে মুদ্রিত।

রচনা	পত্রিকা	কাল
ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ	তত্ত্ববোধিনী	কার্তিক
ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাত্র	তত্ত্ববোধিনী	পৌষ
সংগীত	ভারতী	অগ্রহায়ণ
সমাজভেদ	তত্ত্ববোধিনী	আশ্বিন
সীমার সার্থকতা	তত্ত্ববোধিনী	আশ্বিন
সীমা ও অসীমতা	তত্ত্ববোধিনী	কার্তিক
শিক্ষাবিধি	প্রবাসী	আশ্বিন
লক্ষ্য ও শিক্ষা	তত্ত্ববোধিনী	অগ্রহায়ণ
আমেরিকার চিঠি	তত্ত্ববোধিনী	ফাল্গুন

ছেলেবেলা

‘ছেলেবেলা’ ১৩৪৭ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম মুদ্রিত হয়।

ইংরেজি ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে যংপু-বাসের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলার জীবনীচিত্র গদ্যছন্দে প্রথম লিখিতে শুরু করেন বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রসদনে-রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে দুইটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে ; নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

পালকি

প্রপিতামহী-আমলের সেই পালকিখানা

নবাবি-যুগের অভিমান মেলে আছে

আসিত তার আসনে,

ষোলো বেহারার কাঁধের মাপের ডাণ্ডায়।

এ দিকে, এ কালের বরখাস্ত-করা

নাম-কাটা অপমানের নানা দাগ

তার সকল গায়ে।

দে প’ড়ে থাকত দালানের বারান্দায় এক ধার ঘেঁষে

ঠেলাঘারা ব্যস্ত কালকে পথ ছেড়ে দিয়ে।

আমার তলিয়ে-বাওয়া ডুবসাতার ছিল ওরই গভীরে

ছুটির দিনে, দরজা বন্ধ ক’রে।

খুঁজে বের করার অতীত ছিলেন আমি
 এতেই ছিল আমার খুশি,
 এক যুহুর্তে পেরিয়ে যেতুম
 সন্তক সংসারের সকল নজরবন্দির বাইরে।

বাইরে বাড়িভরা লোক,
 সামনের আড়িনার চলছেই আনাগোনা।
 বখন আটটা-ন'টা বেলা
 এই আড়িনার ভিখিরি জমেছে মুষ্টিভিঙ্গার ঢালের অন্তে,
 প্যারীবুড়ি ধামা কাঁধে হাত ছলিয়ে আনছে তব্বিতরকারি,
 বাঁক কাঁধে নিয়ে চলছে দুখন বেহারী
 গজার জল বড়ায় ভ'রে—
 অক্ষরমহলে তাঁতিনি যাচ্ছে
 নতুন-ফ্যাশান শাড়ির সওয়া করতে,
 সাকরা আসছে পাওনার দাবি জানাতে
 খাতাখিখানায়,
 পুরনো লেপের তুলো ধুনতে
 এসেছে ধুতুরি—
 দেউড়িতে মাঝে মাঝে বাজছে বঁটা।

আমি একলা,
 এইটুকু সীমানার অসীমে আমি একেশ্বর।
 মনে মনে চলেছে সেই পালকি—
 বাহক নেই, পথ নেই
 দিনরাতের চিহ্ন-হীন অবকাশে।
 বালকের ইচ্ছাপ্রবণের বাহন ঐ পালকি,
 ও তার গল্পের অগতের অচল গতির পল্লিরাজ।

আগের সন্ধ্যাবেলায়
 ঝাঁঝি ডাকছিল বাইরের কোণে,

ঘোষা ডাকাতেই গল্প জমেছিল

ছায়া-কাঁপা ঘরে ষিট্‌মিটে আলোতে—

দেয়ালে টিক টিক করে চলছিল ঘড়ি ।

ছুটির দিনের আত্ম লাগল ।

বিনা চলায় চলল আবার পালকি

অদৃষ্ট ঠিকানায় ভয়ের খোঁজে ।

নিঃশব্দের শিরায় শিরায় তাল দিতে লাগল

বেহারাগুলোর হাইহাই হাইহাই ।

ধূ ধূ করে মাঠ,

বাতাস কাঁপে রোদহরে,

আকাশের রসহীন জিভ ঘেন ভুজায় করছে হী হী ।

দূরে ঝিক ঝিক করে কালীদিঘির জল

চিক চিক করে বাজি—

ডাডার উপর থেকে হেলে পড়েছে ফাটল-ধরা ঘাটের দিকে

প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ ।

ঐ অখ্যাত কুবুজাভে

জমা হয়ে আছে ঝাঁকড়া চুল নিয়ে গল্পের আতঙ্ক

গাছের ডলায়, ঝোপের মধ্যে ।

এগোচ্ছি কাছে, ছুঁ ছুঁ করছে বুক,

ভয় পামছি পুলকিত মনে ।

বাঁশের লাঠির পিড়ল-বাঁধানো আগাগুলো

দেখা যাচ্ছে দুটো-একটা ঝোপের উপর দিকে ।

কাঁধ বদল করবে বেহারাগুলো ঐখানে,

জল খাবে—

জ্বর পরে ?

রেঁরেঁরেঁ রেঁরেঁরেঁ !

দেউড়িতে বঁটা বাজল— এক দুই তিন,

একালের সময় এসে পড়ল

পালকির পাঁজি ভিড়িয়ে,
চিংপুর রোডে পাহারাওয়াল
বাড়িয়ে আছে গল্পটাকে বাড়িয়ে দিয়ে ।^১

মংগু

২৪ এপ্রিল ১৯৪০

বালাবলা

ভয় ঘরের ছেলে,
ছাঁচে-ঢালা পালিশ-করা সংসার ।
অসমান নেই কোথাও কিছু,
হঠাৎ চমক লাগে না কোনোখানে ।
দিনগুলো চলে লম্বা সারে পোষা পশুর যন্তো
একটার পিছনে আর-একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা ।

মল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে ।
নিয়মনিষ্ঠ মাস্টার আসে ঠিক সময়ে
সাতটা বাজতেই ।
নিয়মভীতু আমি পড়ি কার্ভস্ট, বুক রীডার—
কালো মলার্টটা ঢিলে,
পাতাগুলো অনিচ্ছুক হাতের অবহেলায় দাগ-পড়া ।
নিজের বুদ্ধি নিয়ে যোজাই শুনি একই বিচার,
মন্তব্যটা স্বয়ংস্ব হ'ল চড়ে চাপড়ে ।
পাশের বারান্দায় বুড়ো দাঁড়ি, চোখে চশমা,
ঝুঁকে প'ড়ে কাপড় পেলাই করছে একমনে—
দেখি তাকে আর ভাবি, স্থখে আছে নেয়াযত ।
দেউড়ির সামনে চন্দ্রজান লম্বা বাড়ি
কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁচড়ে তুলছে
ছুই কানে ছুই ভাগে,
কাছে বসে আছে কাকন-পর্য ছোকরা ঘরোয়ান

১ ছেলেবেলায় ২ পরিচ্ছেদের আরম্ভস্থ ও ৩ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয় ।

কুটছে দোস্তা ।

উঠোনে ঘোড়া ছুটো সন্ধ্যাবেলাই খেয়ে গেছে

বালতিতে বরাবর দানা ।

কাকগুলো ঠোকরাচ্ছে ছিটিয়ে-পড়া ছোলা,

অনি কুকুরটা ধামকা অনাবস্তক কর্তব্যবুদ্ধিতে

সশব্দে দিচ্ছে এসে তাড়া ।

শূঁষ উপরে উঠে যায়, অর্ধেক আঙিনায় পড়ে বীকা ছায়া,

ন'টা বাজে ।

বেঁটে কালো গোবিন্দ, কাঁধে হলদে রঙের গামছা,

নিম্নে যায় স্নান করাতে ।

সাড়ে ন'টা বাজতেই দৈনিক অন্নের পুনরাবৃতি—

খেতে হয় না কচি ।

নির্মম ঘণ্টা বাজে দশটার ।

মন-উদাস-করা হাঁক শোনা যায় দূরে

কাঁচা আম -ওয়ালার ।

বাগনওয়াল ঠং ঠং আওয়াজ দিয়ে চলেছে গলি বেয়ে

দূরের থেকে দূরে ।

বড়োবউদিদি পাশের বাড়িতে

ভিক্ষে চুল এলিয়ে দিয়েছে পিঠে,

পশমের গলাবন্ধ বুনছে মাথা নিচু করে ।

ছাতের উপর কুসুম আর মনি

কড়ি নিয়ে খেলেই যাচ্ছে,

কোনো তাড়া নেই ।

বুড়ো ঘোড়া আমাকে টেনে নিয়ে যায় পালকিগাড়িতে

আমার দৈনিক নির্বাসনে ।

সমস্ত পথে দুর্ভাবনার অটল সহচর

মাগটারমশারের

সকল-সমাসীন কবাহীন সৃষ্টি ।

কিরে আসি ইন্সুল থেকে ।

বিরস দিনের মরচে-পড়া আলো মিলিয়ে আসে
ইটকাঠের জটিল অঙ্গলে ।

বিজ্ঞানহীন শহরের পাঁচশিলেপি আপসা শব্দ
অথের সুর লাগায়

ভ্রমাজড়িম প্রকাণ্ড বাস্তবলেবরে ।

পড়বার ঘরে জলে ওঠে তেলের বাতি,
অনবচ্ছিন্ন শাসনবিধির তর্জনী-শিখা—
পরদিনের পড়া চাই ।

কঠিন গাঁঠ বেঁধে দেয় সজ্জা

এ দিনের বেরঙা অভ্যাসের সঙ্গে ও দিনের ।

পড়তে পড়তে ঢুলি, ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠি ।
বিছানায় ঢোকায় আগে একটুখানি থাকে পোড়ো অবকাশ,
সেখানে শুনতে শুনতে শোনা শেষ হয় না—
রাজপুত্র চলেছে তেপান্তর পার হতে ।

একদিন বাজল সানাই বারোঁয়া স্বরে ।

শুকনো ডাঙায় প্রাবন নেমে
ঢেকে দিল তার ফ্যাকাসে চেহারা ।
বাড়িতে এলো নতুন বউ,
কচি বয়সের লাষণো ঢলঢল ।

কাঁচা-শায়লা রঙের হাতে সন্ম সোনার চুড়ি ।

মলিন দিনশ্রেণীর কালো-ছাপ-লাগা পাঁচিল
ছঁকাক হয়ে গেল আত্মমত্রে,
দেখা দিল অপূর্ব দেশের অপরূপ রাজকন্যা ।

ছম ছম করতে লাগল সজ্জা,

কাঁপতে লাগল অদৃশ্য আলোয় ।

সুখে বেড়াই, সাহস হয় না কাছে আসতে ।

ও দিকে থাকে অভাবনীয়, এ দিকে থাকে উপেক্ষিত ।

রাত হয়ে আসে ।

বরুণসর্দার হাঁক দিয়ে যায় ।

ছেঁড়া শেলাই-করা দড়িতে-ঝোলানো মশারি,

তার ভিতরের আকাশ ভরে ওঠে

গোধূলিলয়ের সিঁছুরি রঙে,

চেলির রাঙা অঙ্ককারে ।^২

মংপু

২৮৪৪০

শেষের কবিতাটি শ্রীমৈত্রেয়ী দেবীর ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’ গ্রন্থে (প্রথম সংস্করণ, পৃ ২৪১-৪৪) উদ্ধৃত হইয়াছে। “মল্লিকদের বাড়ি ঘণ্টা বাজে” পংক্তিটির পরে সেখানে তিনটি অতিরিক্ত পংক্তি পাওয়া যায়—

অম্বর মহল থেকে দুধ আসে এক বাটি,

আমার তখন দুধ-বিত্তকার বয়েল—

খেতেই হয় যে ক’য়েই হোক ।

“একদিন বাজল সানাই বারোয়ান সুরে” হইতে শেষ পঙ্ক্তিকয়টিকে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে পাণ্ডুলিপির এক স্থলে ‘বধু’ নামে স্বতন্ত্র কবিতা বলিয়াও নির্দেশ দিয়াছিলেন ।

আলোচ্য গ্রন্থটির প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থপরিচয়ের ‘জীবনস্মৃতি’ অংশ প্রণিধানযোগ্য । এই গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক তথ্যের পূর্ণতর পরিচয় সেখানে পাওয়া যাইবে ।

ছেলেবেলার ‘ভূমিকা’র উল্লিখিত “গৌসাইজি” শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয়ে সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী ।

সত্যতার সংকট

‘সত্যতার সংকট’ ১৩৪৮ সালের পঞ্চমা বৈশাখ তারিখে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পুস্তিকা-আকারে বিতরণ করা হইয়াছিল । এই অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সর্বশেষ জন্মোৎসব । নববর্ষের সারাদিনে, উত্তরায়ণ-

২ ছেলেবেলার ৭ পরিচ্ছেদের শেষাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয় ।

প্রাচ্যেণ সমবেত আশ্রমবাসী ও অতিথি-অভ্যাগতের সমক্ষে পঠিত এই অভিভাষণই কবীজীবনের সর্বশেষ অভিভাষণ। কবির উপস্থিতিতে ঐকিত্তিবোহন সেন সেদিন ইহা পাঠ করিয়াছিলেন; তৎপূর্বে মুখবন্ধরূপে আশ্রমবাসীদের সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলেন, 'নির্বাণ' গ্রন্থে তাহা মুদ্রিত আছে।' উপসংহারে 'ঐ মহামানব আসে' গানটি সভায় গীত হইয়াছিল।

১ ঐকিত্তিমা গীকর-প্রণীত নির্বাণ, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৫৪-৫৫

সম্বোধন। পৃ ২৫, শেষ দ্বয়ে '১৯৫০' স্থলে : ১৯৩৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অস্তর বাহির	...	৫০২
অলস মনের আকাশেতে	...	৩
অম্পট	...	১৩৫
আগমনী	...	১৬৮
আজ হল রবিবার, খুব মোটা বহরের	...	৩০
আনন্দরূপ	...	৪৩৫
আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি ছায়া	...	৪৭
আমারে পড়েছে আজ ডাক	...	৩০১
আমি যখন ছোটো ছিলাম, ছিলাম তখন ছোটো	...	৩৩৭
আমেরিকার চিঠি	...	৫৮০
আরও-সত্য	...	৩৩৫
আরো একবার যদি পারি	...	৪২
আলো যার মিটমিটে	...	৩১২
আসিল দিঘাড়ি হাতে রাজার ঝিয়ারি	...	৩২৪
ইংলণ্ডের পল্লীগ্রাম ও পাত্রি	...	৫৩২
ইংলণ্ডের ভাবুকসমাজ	...	৫৩৩
উপসংহার	...	১৪২
এক ছিল মোটা কৈদো বাঘ	...	২২৮
একটি চাউনি	...	১০৩
একটি দিন	...	১০৪
ঐ মহাযানব-আসে	...	৪৩, ৬৪১
ওরে পাখি, থেকে থেকে তুলিস কেন সুর	...	৪০
কথিকা	...	১৭২
কদমাগঞ্জ উজাড় ক'রে	...	৬
কবি য়েট্‌স্	...	৫২১
কর্তার ভূত	...	১২৩
কৃত্রিম শোক	...	১০৫
খেলনা খোকার হারিয়ে গেছে, মুখটা শুকোনো	...	৩১৩
খেলা ও কাজ	...	৫০৭

খোঁজাবার এখো পুকুর, বাছ উঠেছে ভেসে	...	২০
গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি	...	২৪
গলি	...	১০২
গল্প	...	১০৯
জগৎপদে মন করো অর্পণ	...	৬৯
গেছো বাবা	...	২০০
ঘোড়া	...	১২৬
চণ্ডী	...	৩১৭
চন্দনী	...	৩৪৮
চলচ্চিত্র	...	৬৪৪
ছড়া	...	৬৪৩
ছেঁড়া মেঘের আলো পড়ে	...	১৬
জলস্থল	...	৪৭৯
জীবন পবিত্র জানি	...	৪৩
বিনেদার জমিদার কালাচাঁদ রায়রা	...	১০
ভব জন্মদিবসের দানের উৎসবে	...	৪৯
তুমি ভাব এই-যে বোটা	...	৩৪১
ভোতাকাহিনী	...	১৩২
তোমার সৃষ্টিতে কতু শক্তিরে কর না অপমান	...	২৩০
তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকর্ষণ করি	...	৫০
‘দাদা হব’ ছিল বিবম শব্দ	...	৩৬১
দিন-খাটুনির শেষে	...	৩৫২
দুই ইচ্ছা	...	৪৯৭
দুঃখের আধার স্নানি বারে বারে	...	৫০
ধ্বংস	...	৬৫৩
নতুন গুলুল	...	১৩৯
নাগের খেলা	...	১১৩
পট	...	১৩৭
পথিক হে, পথিক হে	...	১৭৭
পরী	...	৩৩৩

পরীক্ষা পরিচয়	...	১৫৭
পান্নালান	...	৩৪৫
পালকি	...	৬৫৬
পালের সঙ্গে কাড়ের বুঝি গোপন রেবারেখি	...	৩১৬
পায়ে চলার পথ	...	২০
পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইরে	...	২৭৫
পুনরাবৃত্তি	...	১৪৪
পুরোনো বাড়ি	...	১০১
পাঁচটা না বাজতেই তুলুয়ায় শরী সে	...	৩১০
প্রথম চিঠি	...	১৫২
প্রথম দিনের সূর্য	...	৪২
প্রথম শোক	...	১০৬
প্রপিতামহী-আমলের সেই পালকিখানা	...	৬৫৬
প্রের	...	১০৭, ৬৫১
প্রাণ ভরিয়ে, তুষা হরিষে	...	৪২৬
প্রাণমন	...	১৬২
বড়ো ধবর	...	৩১৪
বন্ধু	...	৫১৬
বয়স তখন ছিল কাঁচা, হালকা দেহখানা	...	৫৮৭
বাচস্পতি	...	৩৪২
বাগী	...	২৫
বাগীর মুরতি গড়ি	...	৪৬
বালক	...	৫৮৭
বালাদশা	...	৬৫২
বাসাখানি গারে-লাগা আখানি গির্জার	...	১৪
বানি	...	২২
বিজ্ঞানী	...	৩০৫
বিদ্বক	...	১২৪
বিবাহের পঞ্চম বয়সে	...	৪৫
বোখাই শহর	...	৪৭৫

ভদ্র ঘরের ছেলে	...	৬৫২
ভালোমাসুখ	...	৩৫৬
ভীষণ লড়াই তার উঠোন-কোণের	...	৩২৮
ভুল স্বপ্ন	...	১১৬
বণিরাম সত্যই সত্যনা	...	৩৫৮
মাঝরাতে ঘুম এল, লাউ কেটে দিতে	...	৩৬
মাটি থেকে গড়া হয়, পুন হয় মাটি	...	৩৪৮
মাটির প্রদীপখানি আছে	...	১৭২
মাথার থেকে ধানী রঙের	...	৬৪৪
মাসুখ সবার বড়ো জগতের ঘটনা	...	৩৫৪
মার মার মার হবে মার গাঁটো	...	২৭৫
মৌরু	...	১১১
মুক্তকুন্তলা	...	৩৫২
মুক্তি	...	১৫৫
মুনশি	...	৩২৫
মেঘদূত	...	২৭
মেঘলা দিনে	...	২৪
মেঘের ফুরোল কাজ এইবার	...	১৮৩
ম্যাগ্নিশিয়ান	...	৩২২
ম্যান্নেজারবাবু	...	৩৩৮
যাত্রা	...	৪২০
যাত্রার পূর্বপত্র	...	৪৫২
যার বত নাম আছে সব গড়া-পেটা	...	৩৪৪
যেটা তোমায় লুকিয়ে-জানা সেটাই আমার পেয়ার	...	৩৩৪
যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই	...	৩৩২
যেমন পাকি তেমনি বোকা	...	৩২০
রথযাত্রা	...	১৫৩
রাজপুত্র	...	১১৩
রাজরানী	...	৩২১
রাজার বাড়ি	...	৩১১

বর্ণানুক্রমিক সূচী

৬৬৯

রাস্তিরে কেন হল যজ্ঞি	...	২৬
রাহুর মতন কৃত্য	...	৩৯
রিপোর্ট	...	১২৪
রূপনারায়নের কূলে	...	৪৮
রৌদ্রতাপ বাঁধা করে	...	৪১
সক্য ও শিক্কা	...	৫৭৩
সওনে	...	৫১৩
শিক্কাবিধি	...	৫৬৭
শেষ পারানির খেয়ার ভূমি	..	২২২
শোন্ রে শোন্ অবোধ মন	...	৮৪
সওগাত	...	১৫৪
সংসীত	..	৫৪৭
সতেরো বছর	...	১০৫
সক্য ও প্রভাত	...	১০০
সমাজভেদ	...	৫৫৪
সমুখে শাস্তিপারাবার	...	৩২
সমুদ্রপাড়ি	...	৪৮৩
সিউড়িতে হরেরার মৈত্টির	...	৩২
সিদ্ধি	...	১৪৮
সীমা ও অসীমতা	...	৫৬৪
সীমার সার্থকতা	...	৫৬০
স্ববলদাদা আনল টেনে আদমদিঘির পাড়ে	...	৫, ৬৪৩
স্বয়োরানীর সাধ	...	১২২
স্বন্দরবনের কেঁদো বাধ	..	২৩১
স্টপ্‌কোর্ড ক্রক	...	৫২৮
স্বর্গ-মর্ত	...	১৭২
হৈ রে হৈ মারহাট্টা	...	২৭৬